ভারতীয়
মহাবিদ্রোহ
১৮৫৭

প্রমোদ সেনগুপ্ত

অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম. পি.
লিখিত ভূমিকা সহ

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড
৭২, মহাত্মা গান্ধী (হ্যারিসন) রোড
কলিকাতা ৯

উৎসর্গ

মাতৃদেবী ও পিতৃদেবের

স্মরণে—

প্রকাশকের নিবেদন

সিপাহী বিদ্রোহের শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষ্যে জাতীয় ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ওই অধ্যায়টি সম্পর্কে একখানি গ্রন্থ প্রকাশের আগ্রহ ছিল আমাদের বহুদিন থেকে। শ্রীযুক্ত প্রমোদ সেনগুপ্তের গ্রন্থখানি পেয়ে আমাদের সেই আগ্রহ মিটেছে বলে আমরা মনে করি। কারণ, এ বিষয়ে তিনি সুদীর্ঘ দিন ধরে পড়াশুনা করেছেন, India to-day-র লেখক বিশ্ববিশ্রুত রজনীপাম দত্তের তিনি সহকারী হিসেবে একদা কাজ করেছেন এবং প্যারিসের সরবঁন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতের কৃষি-অবস্থার পরিবর্তন সম্পর্কে একদা তিনি গবেষণাও করেছিলেন। ভারত ইতিহাসের দীর্ঘ ৩০ বৎসরেব ছাত্র তিনি, তাঁর অনুশীলন বৈপ্লবিক ও বাস্তব দৃষ্টিসম্পন্ন।

তাঁর এই পাণ্ডিত্যের পাশাপাশি, তাঁর জীবনও বিচিত্র অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ। সাধারণ বাঙালীর কাছে সে জীবন যেমন অশান্ত—তেমনি বিচিত্র। দুরন্ত একটা জীবনের বেগ তাঁকে দেশ থেকে দেশান্তরে ঠেলে নিয়ে গেছে—যার ফলে মাতৃভূমি থেকে তাঁর বিচ্ছেদ ২০ বছরের। জেল থেকে গ্রাজুয়েট হবার পর তিনি অক্সফোর্ডে গেলেন ভাল ছেলের মতো আই. সি. এস. হতে, কিন্তু বৃটিশ সরকার তাঁকে 'মন্দ ছেলে' মার্কা দিয়ে পরীক্ষায় বসতে দিলেন না। ১৯২৯ সালে গেলেন বার্লিন। ওই সময়ে প্রথম সংস্পর্শে এলেন মানবেন্দ্রনাথ রায়, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, নলিনী গুপ্ত, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির। ফেরবার পথেই ধরা পড়ে গেলেন আগ্নেয়াস্ত্র সমেত ফরাসী নিরাপত্তা পুলিসের হাতে। পরে ওখান থেকে মুক্ত হয়ে ইংল্যাণ্ডে ফিরে শুরু করলেন সাংবাদিক জীবন এবং ওই সময়েই সকলতওয়ালা, রজনীপাম দত্ত, কৃষ্ণ মেনন প্রভৃতির সঙ্গে ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করলেন। ১৯৩৬ সালে স্পেন ও ফ্রান্সের পপুলার ফ্রণ্টের অভিজ্ঞতার জন্যে ছুটলেন ওই দেশ দুটিতে। এর পর থেকে ফ্রান্সেই হল তাঁর

অবস্থান। ওখানকার একটা স্কলারশিপ নিয়ে বিখ্যাত সরবঁন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ডক্টরেটের জন্য আবার ভাল ছেলের মতো লেখাপড়া শুরু করলেন। কিন্তু স্পেনের যুদ্ধ তাঁর অশান্ত মনকে আবার টান মারলে। এর পর এল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতার পর্ব। জার্মান আক্রমণ ও প্যারিস পতনের তিনি প্রত্যক্ষ সাক্ষী। পেঁতা সরকারের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পেও তাঁকে থাকতে হয়েছে তিনটি মাস। পরে, ১৯৪২ সালে প্যারিসে ঘটে তাঁর নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎ—এইখান থেকে সূত্রপাত হল 'আজাদ হিন্দ ফৌজ'-এর জীবন। জার্মানীতে এসে 'আজাদ হিন্দ' পত্রিকা সম্পাদন ও রেডিও পরিচালনের দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করলেন। এই সময়ে রচিত তাঁর 'হিন্দু-মুসলমান সমস্যা' উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। বার্লিনের পতন ঘটলো তাঁর চোখের সামনে। ইণ্ডিয়ান মিলিটারী মিশনের হাতে ধরা পড়ে এক কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে ১০ মাস তাঁকে বৃটিশ অফিসারদের হাতে নানা নির্যাতন ভোগ করতে হয়। তারপর দীর্ঘ ২০ বছর পরে তিনি অনুমতি পেলেন মাতৃভূমিতে ফেরবার। গণতন্ত্র, ফাসিজ্‌ম্‌, কমিউনিজ্‌ম্‌, যুদ্ধ ও ধ্বংস, তার মধ্যে পৃথিবীর সাধারণ মানুষের সত্যকার আকাঙ্ক্ষা ও আবেগের পরিচয় নিয়ে তিনি স্বদেশে ফিরলেন এবং বলা বাহুল্য, তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা এখানেও তাঁকে স্থির থাকতে দিলে না। স্বদেশের নানা গণ-আন্দোলন ও কার্যকলাপের সঙ্গে তিনি সংযুক্ত। ফলে 'স্বদেশী' জেলও ১৯৫০ সালে তাঁকে নিস্তার দেয়নি। বর্তমান গ্রন্থ তাঁর দীর্ঘ পরিশ্রম, বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও দেশাত্মবোধের ফলশ্রুতি।

কলিকাতা
১৬ই আগস্ট, ১৯৫৭

ভূমিকা

প্রায় দু' বছর হয়ে গেল, কলকাতার ইতিহাসের এক নামকরা অধ্যাপকের বাড়িতে আমরা ক'জন কয়েকবার জড়ো হয়েছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল অত্যন্ত সাধু। ১৮৫৭ সালের অভ্যুত্থানের শতবার্ষিকী উপলক্ষে যাতে সেই বিরাট ঘটনার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে সবাই মিলে সহযোগিতা করে একটা ভাল বই খাড়া করা যায়—এই ছিল আমাদের ইচ্ছা। একটা খসড়া ছক্ তৈরি করা হয়েছিল, লেখকের মধ্যে অনেকের নামও স্থির হয়ে গেল, উপস্থিতদের মধ্যে প্রায় সকলেই এক একটা অধ্যায়ের ভার নেবেন বলে ঠিক হল। আর দু' একজন ঠেকে-শিখে-বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছাড়া আমরা সবাই বেশ উৎফুল্ল হলাম যে, এবার একটা কাজের মতো কাজ বোধ হয় করা যাবে।

ফলে কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের ভবিষ্যৎ দৃষ্টি নির্ভুল প্রমাণ হল। লেখা সম্বন্ধে প্রায় কোনো প্রতিশ্রুতিই রক্ষিত হল না। আর প্রকাশ যাঁরা করবেন বলে আন্দাজ করা গিয়েছিল, তাঁদের একদিকে একান্ত ঔদাসীন্য আর অন্যদিকে উন্নাসিক অস্থির-মতিত্ব এ পরিকল্পনাকে একেবারে ব্যর্থ করে দিল।

আমার বন্ধু শ্রীপ্রমোদ সেনগুপ্ত আন্তরিক উৎসাহ নিয়ে ঐ আলোচনায় যোগ দিয়েছিলেন। যখন সবই অসার মনে করে তথ্যান্বেষণের পরিশ্রম থেকে রেহাই নেওয়া তাঁর পক্ষে অন্যান্য সহযোগীর মতোই সহজ ছিল, তখন কিন্তু তিনি তা করলেন না। রোজ নিয়মিত ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা খাটতে লাগলেন, বিস্তর মালমশলা জড়ো করলেন, বাংলা আর ইংরেজীতে ১৮৫৭ সম্বন্ধে বহু কথা লিখে কাগজ ভরালেন—আর নানা বাধা কাটিয়ে "আনন্দবাজার পত্রিকা"-তে ধারাবাহিক অনেকগুলো প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন। ইংরেজীতেও একটা মোটা বই বার করার মত লেখা তাঁর প্রস্তুত হয়ে গিয়েছে। সেটা কবে ছাপা হবে, কিম্বা আমাদের দেশের প্রকাশকদের কল্যাণে আদৌ বেরোবে কি না,

আমার জানা নেই। বাংলায় যে তাঁর পুরো বই প্রকাশ হচ্ছে, এতে আমি খুবই খুসী।

প্রমোদবাবু প্রায় বিশ বছর ইয়োরোপে কাটিয়েছেন। ইয়োরোপের অন্তত তিনটে বড়ো দেশের সাম্যবাদী আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়েছিল। সাংবাদিকতাই ছিল তাঁর একরকম পেশা, তাই দেখা এবং শেখার সুযোগ তিনি কম পাননি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তাঁর যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা ঘটেছিল, তার বিবরণ তিনি লেখেননি—যদি লেখেন তো বেশ হয়। ফ্রান্সের বিখ্যাত বিদ্যায়তন "সর্‌বঁন্"-এ যে 'থীসিস্' তিনি লিখেছিলেন, যুদ্ধের গণ্ডগোলে তার পাণ্ডু-লিপি পর্যন্ত নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। জার্মানীতে সুভাষচন্দ্রের সাহচর্যে 'আজাদ হিন্দ্' সংগঠনে তাঁর অভিজ্ঞতারও অনেক দাম আছে। কিন্তু তাঁর কথা প্রায় কেউ এখনও শুনতে পাননি। যুদ্ধশেষের সময় তিনি ছিলেন বার্লিনে—ইংরেজ বাহিনীর ভারতীয় চাকুরীয়াদের (যাঁদের মধ্যে অন্তত একজন স্বাধীন ভারতে প্রধান সেনাপতি হয়েছিলেন।) হাতে যে-নিগ্রহ তাঁকে ভোগ করতে হয়েছিল আর তাঁদের চরিত্রের যে-পরিচয় তিনি পেয়েছিলেন, তাও হচ্ছে শোনবার মত জিনিস। যাই হোক, দেশে ফিরে 'আজাদ হিন্দ্' ফৌজের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সত্ত্বেও দেখা গেল যে কর্তৃপক্ষীয়েরা প্রমোদবাবুর উপর অপ্রসন্ন। যে সব কাগজ ইয়োরোপ থেকে তাঁর পাঠানো লেখা বহুবার ছাপিয়েছে, তারাই পরে তাঁর সাম্যবাদী দুর্নাম আছে বলে দরজা বন্ধ করে দিল। তাই বোধ হয় আজ এ দেশে যে পরিচিতি ও খ্যাতি প্রমোদবাবুর পক্ষে একান্ত সঙ্গত ভাবেই প্রাপ্য ছিল, তা তিনি এখনও পাননি।

কিন্তু এ-বই লিখে তিনি আবার নতুন করে আমাদের সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। বাংলা লিখতে তিনি অভ্যস্ত নন, কিন্তু লিখতে তিনি একটুও পেছপাও হননি। বিশবছর প্রবাসী থেকে, আর দেশে ফিরে নানা বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হয়ে তাঁর কাজে যে ঘাটতি পড়ে গিয়েছিল, তা এইবার তিনি পুরিয়ে দিতে চলেছেন।

১৮৫৭ সালের অভ্যুত্থান সম্বন্ধে আমি একজন বিশেষজ্ঞ নই। কিন্তু সম্প্রতি শতবার্ষিকী উপলক্ষে যেসব কাণ্ড হচ্ছে, তা দেখে আমি স্তম্ভিত। কর্তৃপক্ষীয়েরা

এক সময় শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান সম্বন্ধে উৎসাহ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু সে উৎসাহ রীতিমতো ঝিমিয়ে এসেছে। পণ্ডিতদের মধ্যে যাঁরা কেও-কেটা, তাঁরা গম্ভীরভাবে এমন কথা বলে যাচ্ছেন যাতে ধারণা হয় যে, ১৮৫৭ সালের ঘটনাগুলো শুধুই একটা 'সিপাহী বিদ্রোহ', জাতীয় জীবনে তার বিশেষ ছাপ পড়েনি, স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে তার কোনোই যোগাযোগ ছিল না ইত্যাদি ইত্যাদি। সব চেয়ে মারাত্মক কথা এই যে, যাঁদের আমরা ঘোর প্রগতিবাদী বলে জানি, তাঁদেরই কেউ কেউ 'কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিদ্রোহের' নিন্দাবাদ আরম্ভ করেছেন। সুবিখ্যাত 'পরিচয়' মাসিকপত্রের চৈত্র ১৩৬৩ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার এ বিষয়ে 'আজি হতে শতবর্ষ পূর্বে' বলে যে নিবন্ধ লিখেছেন, তা আমাকে বিস্মিত করেছে। গোপালবাবুকে আমি শ্রদ্ধা করি। তাঁর মতের মূল্য দিতে আমি সঙ্কুচিত নই, তাঁর আন্তরিকতা সম্বন্ধে আমার লেশমাত্র সংশয় নেই। কিন্তু ১৯৫৭ সালে 'পরিচয়' পত্রিকায় তাঁর এই নিবন্ধ কেমন করে প্রকাশ হতে পারল, তা আমার ধারণার অতীত। গোপালবাবুর লেখার সমালোচনা এই মুখবন্ধের উদ্দেশ্য নয়—তার উল্লেখ করলাম শুধু এই কারণে যে, প্রমোদবাবুর বই থেকে এমন বহু তথ্য মিলবে, যা আজ ১৮৫৭ সালের বিরাট অভ্যুত্থানকে ছোট করে দেখার ঝোঁক থেকে আমাদের মুক্তি দিতে পারবে।

ইংরেজ রাজত্ব যাঁদের মনমত হয়েছিল, যাঁরা বলতে দ্বিধা করেন নি যে, বিধাতার মঙ্গলময় বিধানেই ইংরেজ এ দেশের রাজা হয়েছে, ইংরেজ দয়া করে আমাদের টেনে না তুললে আমরা চিরকাল অন্ধকারাতেই বাস করতাম বলে যাঁদের বিশ্বাস, তাঁদের যত গুণই থাকুক, স্বাধীনতা সংগ্রামের পুরোধা বলে তাঁদের কথা ভাবা যায় না। 'সামন্ত প্রতিক্রিয়া' বলে 'সিপাহী বিদ্রোহ'কে যতই উড়িয়ে দেওয়া হোক না কেন, দেশের মানুষের মনে ১৮৫৭ যে দাগ কেটেছিল তাকে স্বাধীনতার অভিযানের সঙ্গে একান্তভাবে সংযুক্ত না করার মতো ঐতিহাসিক অন্যায় আর নেই।

সার চার্লস্ মেটকাফের মতো দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি ১৮১৪ এবং ১৮২৪ সালে লিখেছিলেন যে, সারা ভারতবর্ষ ইংরেজের পতনের জন্য উন্মুখ হয়ে রয়েছে আর ইংরেজের ধ্বংস ঘটলে ভারতবাসী সবাই উৎফুল্ল হয়ে উঠবে। বড়লাট হয়ে এ দেশে

আসার ঠিক আগে খোদ লর্ড ক্যানিং বলেছিলেন: "আমি চাই আমার কাজের সময় যেন দেশে শান্তি থাকে। কিন্তু আমি ভুলতে পারি না যে, ভারতবর্ষের আকাশ এখন নির্মল হলেও একটা ছোট্ট মেঘ সেখানে দেখা দিতে পারে, যা বেড়ে উঠে ঝড় তুলে আমাদের ধ্বংস ঘটাতে পারে।" কথাটা যে তিনি অকারণে বলেননি, তা তো ইতিহাসই প্রমাণ করেছিল। এই ক্যানিং সাহেবই পরে বিদ্রোহের সময় বলেছিলেন যে, সিন্ধিয়া সিপাহীদের সঙ্গে যোগ দিলে "আমায় কালই পাত্তাড়ি গুটোতে হবে" ("I shall have to pack off to-morrow")। এডওয়ার্ড টম্সন্ সাহেব বহু পরে লিখেছিলেন যে, কোনো বিদেশী বিজেতার বিরুদ্ধে এত ব্যাপক বিদ্রোহ ভারতবর্ষের ইতিহাসে কখনও ঘটেনি। সেদিন এক নামজাদা বাঙ্গালী ঐতিহাসিক বলেছেন যে, ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ যখন দেশের এক-চতুর্থাংশ অঞ্চলে মাত্র হয়েছিল, তখন তাকে সারা দেশের অভ্যুত্থান বলা যায় কেমন করে? এঁকে যদি ফরাসী বিপ্লব বা রুশ বিপ্লব (যে দুটো বিপ্লব হল ইতিহাসে সব চেয়ে বড়) ফ্রান্স এবং রুশিয়ার কতটা আয়তনে প্রথমে ঘটেছিল, তার মাপ-জোখের কাজে পাঠানো যায় তো মন্দ হয় না!

'সামন্ত প্রতিক্রিয়া' সম্বন্ধে গালভরা কথা যখন খুবই শুনছি, তখন জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয়: যে-পোলাণ্ডে জাতীয়তার জন্ম বলে বহু পণ্ডিত প্রচার করেছেন, যেখানে জাতীয় আন্দোলনের সূত্রপাত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে, সেখানকার 'feudal' চরিত্র ঘুচতে কতদিন লেগেছিল? ১৮৪৮ সালের হাঙ্গেরী জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে একটা তীর্থস্থান বিশেষ, কিন্তু সেখানে 'feudal' ব্যাপারের ছড়াছড়ি কি সেদিন পর্যন্ত ছিল না? মাৎসিনি প্রমুখ যাঁরা জাতীয়তা মন্ত্রের উদ্গাতা বলে কীর্তিত, তাঁদের ইতালিতে 'feudal' ধারার কি অভাব ছিল? 'ফিউডল্' ছোঁয়াচ্ লেগেছে তো তখনই আন্দোলনের জাতীয় চরিত্র নষ্ট হয়েছে, এমন ছুঁৎমার্গী মনোভাব কি অন্যায় নয়? কেউ বলবে না যে, 'সিপাহী বিদ্রোহে' জাতীয় সংগ্রামের সুপরিণত মূর্তি দেখা যায়—তা অসম্ভব। কিন্তু তাই বলে দেশের একটা বিরাট এলাকা জুড়ে, আর সারা দেশের মন মাতিয়ে একটা বিপুল ঘটনা ঘটল, ইংরেজ শাসন বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা

স্পষ্ট হয়ে উঠল, সাম্রাজ্যবাদী নিষ্ঠুরতা মরিয়া হয়ে একেবারে নারকীয় রূপে দেখা দিল—আর সেই অভূতপূর্ব ঘটনার কদর্থ করব, জাতির মনে তার যে-স্মৃতি জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে—তাকে মলিন করার চেষ্টায় নামব, 'সামন্ত প্রতিক্রিয়া' প্রভৃতি বুলি আউড়ে তথ্যান্বেষীকে বিভ্রান্ত করে দেব, এ হল কি ধরনের ইতিহাসবোধ, কি ধরনের দেশপ্রেম ?

তাই আজ দেখতে হচ্ছে, ব্যারাকপুরে বীর মঙ্গল পাণ্ডের অদ্ভুত আত্মাহুতিকেও দেশ সম্মান দেয় না। শুনতে হচ্ছে—বাহাদুর শাহ আর ঝান্সীর রানী ইংরেজকে তাড়াতে চাননি (যাঁরা এ কথা বলেন তাঁরাই আবার সেই সব মহারথীকে স্বাধীনতার ধ্বজাধারী বলে থাকেন যাঁরা ইংরেজ শাসনকে 'বিধির সদয় বিধান' বলে অভ্যর্থনা করেছেন)! সুভাষচন্দ্র বসু যখন বর্মায় বাহাদুর শাহ্‌-এর কবরের পাশে অশ্রুবিসর্জন করেছিলেন আর 'চলো দিল্লী' আওয়াজ বেছে নিয়েছিলেন তাঁর অভিযানের মন্ত্র হিসাবে, তখন তার মধ্যে ঢের বেশী ইতিহাস-বোধ ছিল আজকের ঐতিহাসিক আর বিদগ্ধ মহলের তুলনায়।

প্রমোদবাবুর লেখা থেকে অনেক দামী খবর আমরা পাব, আর তাঁর এলাকায় অনধিকার প্রবেশ আমার পক্ষে অনুচিত। তবে একটা কথা না বলে পারছি না। প্রায়ই শোনা যায় যে, বাঙ্গালীরা বিদ্রোহটাকে অপছন্দ করেছিল, আর লেখকরা তো বটেই। কথাটা পুরো মানতে রাজী হতে পারি না। প্রমোদবাবু দেখিয়েছেন যে, ফেব্রুয়ারি মাসে (১৮৫৭) যখন বহরমপুরে সিপাহীদের মধ্যে বিদ্রোহ হয়, তখন মুর্শিদাবাদের জনসাধারণ হাজারে হাজারে বিদ্রোহে নেতৃত্বের আশায় নবাবের দিকে চেয়ে ছিল, কিন্তু তাঁর মির্জাফরী মুখ থেকে কথা বেরোয়নি। ইংরেজরা যে সেখানে দারুণ একটা কিছু ঘটবার মতো অবস্থা ছিল জেনে আতঙ্কগ্রস্ত, তা তাদেরই সাক্ষ্যে প্রমাণ করা যায়। বহরমপুরে এবং পরে ব্যারাকপুরে বিদ্রোহের খবর পেয়ে নদীয়া, চব্বিশ পরগনা, বর্ধমান, যশোর, বাঁকুড়া, বীরভূম ও অন্যান্য জেলায় বাঙ্গালী জনসাধারণ যে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, তার অনেক পরিচয় ইংরেজদের তরফ থেকেই পাওয়া যায়। ব্যারাকপুরে যখন সিপাহীদের শায়েস্তা করা হচ্ছিল, তখনই কলকাতা শহরে ইংরেজ আর ফিরিঙ্গীদের মধ্যে যে নিদারুণ আতঙ্ক দেখা দিয়েছিল, সে ঘটনার নিশ্চয়ই একটা

অর্থ আছে। বাস্তবিকই চট্টগ্রাম থেকে ময়ূরভঞ্জ পর্যন্ত ১৮৫৭ সালে ইংরেজের যে বিপদ দেখা দিয়েছিল, তা কাটল প্রধানতঃ বর্ধমানের মহারাজা প্রভৃতি বিভীষণের সহায়তায়। লাট কর্নওয়ালিস বৃথাই 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' করে যাননি !

আর বাঙ্গালী লেখকদের কথা? হাজার অসুবিধা সত্ত্বেও নির্ভীক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৮৫৭ সম্বন্ধে যা লিখেছিলেন, সেদিকে নজর যায় না কেন? অক্ষয়কুমার দত্তের লেখা কি নগণ্য? ঈশ্বর গুপ্তের কতকগুলি শ্লেষাত্মক কবিতায় কি '৫৭ সালের ছাপ নেই? কয়েক বছর বাদে যুবক কালীপ্রসন্ন সিংহ যখন লিখলেন, তখন তাতে কি '৫৭ সাল সম্বন্ধে অনেক কিছু খবর পাওয়া যায় না, যা বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন প্রভৃতির চাপে ধামাচাপা পড়ে যায়নি? 'ফিউডল্' বলে 'সিপাহী বিদ্রোহই' অশুদ্ধ হয়ে গেল, আর জমিদারদের আঁচল-ধরা বাক্যবাগীশেরা 'বুর্জোয়া জাতীয়তার' নেতা বনে গেলেন, এই অদ্ভুত যুক্তিই আজ যেন চল্ হয়ে এসেছে।

১৮৫৭ সালের স্মৃতির প্রতি আমাদের একটা কর্তব্য আছে। সে কর্তব্য পালনে কর্তৃপক্ষীয়েরা এবং বিদগ্ধ সমাজ (প্রগতিবাদীরাও অনেকে এর অন্তর্ভুক্ত) যদি পরাঙ্মুখ হন তো অত্যন্ত পরিতাপের কথা। প্রমোদবাবুর রচনা ও সিদ্ধান্ত একেবারেই তর্কাতীত নয়, কিন্তু যে উদ্ভট ধারা এসে উপস্থিত হয়ে '৫৭ সালের ইতিহাসকে বিকৃত করছে, তাকে খানিকটা প্রতিরোধ করতে এ বই সাহায্য করবে বলেই এর প্রভূত প্রচার কামনা করি।

কলকাতা
১লা আগস্ট, ১৯৫৭

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

মুখবন্ধ

১৮৫৭-৫৯ সালের ভারতীয় জাতীয় মহাবিদ্রোহ সম্বন্ধে নতুন করে অনুসন্ধান ও আলোচনা করার যে কতখানি প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, তা বলাই বাহুল্য। এই বিরাট ঐতিহাসিক ঘটনা সম্বন্ধে যা কিছু ইতিহাস ইত্যাদি এ পর্যন্ত লেখা হয়েছে, তা প্রায় সবই সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই লেখা। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে একমাত্র সাভারকার ছাড়া আর কেউ এ বিষয়ে লেখেননি। কিন্তু সাভারকার অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করার ফলে তাঁর বইয়ের ঐতিহাসিক মূল্য অনেক খর্ব হয়েছে। সুতরাং ভারতীয় জাতীয়তাবাদের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ঐতিহাসিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে এই বিদ্রোহের পুনর্বিচারের সময় এসেছে। বিদ্রোহের শতবার্ষিকীকে উপলক্ষ্য করে এ কাজ অবশ্য শুরুও হয়েছে।

এই পুনর্বিচারের সময় বিদ্রোহের মৌলিক প্রশ্নগুলি সম্পর্কে যে সব মতভেদ দেখা দিয়েছে, তা খুবই স্বাভাবিক। এর ফলে অনেকেই কিন্তু বিস্মিত ও বিভ্রান্ত হয়েছেন। জগতে এমন কোন্ বিদ্রোহ বা বিপ্লব ঘটেছে, যার মূল্যবিচারে সকলেই একমত হতে পেরেছেন? ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ সম্বন্ধে অনেক মতভেদ রয়েছে—এটাই প্রধান দুঃখের বিষয় নয়। দুঃখের বিষয় হল এই যে, এক শ্রেণীর ভারতীয় নিরপেক্ষতার আবরণে এই বিদ্রোহের প্রাথমিক তথ্যগুলিকে উপেক্ষা ও বিকৃত করে তাঁদের মতবাদ প্রচার করছেন। ১৩৬১ সালের আষাঢ় মাসের 'প্রবাসী' পত্রিকার (পৃঃ ২৫৮) সম্পাদকীয় মন্তব্যই তার প্রমাণ:

"পলাশী যুদ্ধের ঠিক একশত বৎসর পরে, ১৮৫৭-৫৮ সনে যে সিপাহী বিদ্রোহ হয়, তাঁহাকে কেহ কেহ ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীনতার সমর বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। ইহা যে জরাজীর্ণ শত বিচ্ছিন্ন দিল্লীর বাদশাহী তক্তকে পুনরায় পূর্ব-গৌরবে বসাইবার জন্যই একটি মধ্যযুগীয় প্রচেষ্টা, যাহার সঙ্গে জনসাধারণের যোগ ছিল না বলিলেই চলে, সে কথা নিরপেক্ষ তথ্যদর্শী ঐতিহাসিক মাত্রই স্বীকার করিবেন।…শুধু ভাবালুতার বশবর্তী হইয়া সিপাহী বিদ্রোহকে প্রথম স্বাধীনতার সমর আখ্যা দিয়া আমরা যেন ঐতিহাসিক সত্য ও তথ্যকে ক্ষুণ্ণ ও বিকৃত না করি।"

সহজ ভাষায়, 'প্রবাসী' সম্পাদকের মতে: (ক) ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ জাতীয় অভ্যুত্থান নয়, সিপাহীদেরই একটা বিদ্রোহ মাত্র; (খ) এটা মরণোন্মুখ বাদশাহীকে

পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা মাত্র; (গ) কোনোরূপ প্রগতি-চেতনাশূন্য এটা একটা মধ্যযুগীয় বর্বরতার অন্ধ প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়; (ঘ) এই বিদ্রোহের সঙ্গে জনসাধারণের কোনো যোগাযোগ ছিল না। ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ও এই একই মত ব্যক্ত করেছেন।

"ভাবালুতার বশবর্তী" না হয়ে এবং "ঐতিহাসিক তথ্যকে ক্ষুণ্ণ ও বিকৃত" না করে, উপরন্তু তথ্য প্রমাণের দ্বারা ১৮৫৭-৫৯ সালের মহাবিদ্রোহ যে স্বাধীনতা-প্রয়াসী ভারতবাসীর ঐক্যবদ্ধ প্রথম জাতীয় অভ্যুত্থান, এটা দেখানোই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। ইংরেজ লেখকেরা তাঁদের লেখাতে যে সমস্ত তথ্য পরিবেশন করেছেন, তাতেই নিঃসন্দেহে প্রমাণ হয় যে, এই বিদ্রোহ একটা ভারতীয় জাতীয় বিদ্রোহই ছিল এবং ভারতের স্বাধীনতার জন্য একটা ব্যাপক গণ-অভ্যুত্থানও বটে। বর্তমানে ভারতীয় ঐতিহাসিকরা এই সম্বন্ধে বিভিন্ন অঞ্চলে যে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করছেন, তাতেও এই বিদ্রোহের গণ-চরিত্র ও জাতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের চরিত্রই আরও স্পষ্টভাবেই পরিস্ফুট হয়ে উঠছে।

'প্রবাসী' সম্পাদক মহাশয় এই প্রসঙ্গে "ঐতিহাসিক সত্য", "নিরপেক্ষতা," ইত্যাদি কথাও তুলেছেন। মুখবন্ধে তার বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নয়। সংক্ষেপে এইটুকুই বলা চলে যে, 'ইতিহাস' পত্রিকায় অগ্রহায়ণ-মাঘ (১৩৬২) সংখ্যায় ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার এইসব বিষয়ে যে আলোচনা করেছিলেন, তার যথোপযুক্ত উত্তর অধ্যাপক সুশোভন সরকার মহাশয় ঐ পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায় দিয়েছেন।

ইতিহাসে কল্পিত ঘটনার আমদানী করা চলে না। প্রাথমিক তথ্যের স্তরকে অগ্রাহ্য করে ইতিহাস রচনা নিশ্চয়ই কাল্পনিক হতে বাধ্য। তাই ঐতিহাসিকের প্রথম কর্তব্য—প্রাথমিক সত্য বা ফ্যাক্ট নির্ণয় করা, "নিরপেক্ষভাবে" যার সত্য নির্ধারণ করা খুব কঠিন কাজ নয়; এই কর্তব্যের আর একটি হল, বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে যোগসূত্র ও কার্যকারণ-সম্বন্ধের সন্ধান করা ও ঘটনার ফলাফল নির্ণয় করা। ঘটনার মূল্য-বিচার ইতিহাস-বিচারের দ্বিতীয় স্তর এবং এই মূল্য-বিচার কালেই বিভিন্ন ও বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ পেয়ে থাকে—যেমন, সাম্রাজ্যবাদী, জাতীয়তা-বাদী, সাম্প্রদায়িক, ডায়লেকটিকাল বস্তুবাদী ইত্যাদি। তার পরেই আসে যুক্তি ও বিশ্লেষণের সাহায্যে নানা দৃষ্টিভঙ্গীর বিচার, আপেক্ষিক সত্যাসত্যের বিচার।

প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের মত ঐতিহাসিক অখণ্ড সত্য নির্ধারণের দাবি করেন না; আপেক্ষিক সত্যাসত্য নির্ধারণ করেন মাত্র। কোন ঐতিহাসিকই আজ পর্যন্ত

সমাজনিরপেক্ষ অখণ্ড সত্য দাবি করতে পারেননি। বহুধা-বিভক্ত সমাজে দৃষ্টি-ভঙ্গীর বিরোধ অনিবার্য ; বিশেষ করে অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সম্বন্ধে—যেমন, ইউরোপের রিফর্মেশন, ফরাসী বিপ্লব, রাশিয়ার বলশেভিক বিদ্রোহ, চীন বিপ্লব ইত্যাদি। মহাপ্রতিভাশালী ঐতিহাসিকও দৃষ্টিভঙ্গীর হাত থেকে রেহাই পাননি, পেতে পারেন না ; কারণ, ঐতিহাসিকও একজন সামাজিক জীব।

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের ইতিহাস লেখার একটা মস্ত বড় অসুবিধা হচ্ছে এই যে, এ সম্বন্ধে যা কিছু লেখা হয়েছে, তা সবই ইংরেজ পক্ষের সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টি-ভঙ্গীতে লেখা। ভারতীয় পক্ষে যাঁরা বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁরা কোন ইতিহাস বা স্মৃতিকথা রেখে যাননি। ভারতীয় পক্ষের এই নীরবতা দুনিয়ার ইতিহাসে একটা আশ্চর্য রকমের ব্যতিক্রম। তার ফলে, বিদ্রোহী অঞ্চলগুলিতে যুদ্ধ ও নতুন শাসনযন্ত্র পরিচালনার জন্য কি রকম ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছিল, বিদ্রোহীদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় কি কি পরিবর্তন ঘটেছিল, বিদ্রোহীদের ও নেতাদের চিন্তাধারা, আশা-আকাঙ্ক্ষা কিরূপ ছিল, ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তৃতভাবে জানা খুবই কঠিন। সুতরাং প্রাথমিক তথ্যের জন্য বর্তমান গ্রন্থকারকে ইংরেজ পক্ষের লেখার উপরেই নির্ভর করতে হয়েছে।

বিদ্রোহের পরাজয়ের পরে, বিদ্রোহী ও ইংরেজ উভয় পক্ষই যে অনেক মূল্যবান দলিলপত্র ধ্বংস করে ফেলেছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। অবশিষ্ট দলিলপত্রগুলি —যাদের ঐতিহাসিক মূল্যও কম নয়—দিল্লী, কলকাতা ইত্যাদি স্থানে ন্যাশনাল আরকাইভে রক্ষিত রয়েছে। বস্তুতঃ ন্যাশনাল আরকাইভের দলিলগুলি হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ দলিলের এক রত্নাগারবিশেষ। সেখান থেকে প্রচুর মূল্যবান তথ্যের সন্ধান পাওয়া খুবই সম্ভব। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সাধারণ লোকের পক্ষে—যাঁরা এ বিষয়ে কাজ করতে চান, এই সব স্থানে প্রবেশ করার অনুমতি পাওয়া এক রকম অসম্ভব বললেই চলে। কেবল সাধারণের পক্ষেই নয়, ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মত একজন প্রতিষ্ঠাবান ঐতিহাসিককেও তাঁর গ্রন্থের ভূমিকাতে অভিযোগ করতে হয়েছে যে, ন্যাশনাল আরকাইভের "এইরূপ শোচনীয় অবস্থার প্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বারবার ব্যর্থ হয়ে, আমি এইসব কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি, দোষ ধরবার উদ্দেশ্য নিয়ে নয়, বরং এই আশা নিয়ে যে, এর সত্যকার উন্নতির জন্য জনসাধারণের মধ্যে একটা প্রবল আন্দোলনের সৃষ্টি হবে।"

এই গ্রন্থ রচনার প্রথম থেকেই বন্ধুবর অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম. পি. যেভাবে আমাকে উৎসাহ দিয়ে এসেছেন ও নানা প্রকারে সাহায্য করেছেন, তার জন্য তাঁর নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকব। এই গ্রন্থের কিছু কিছু অংশ 'রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকা'য় ১৯৫৫ সালের ১৭ই জুলাই থেকে ২০শে নভেম্বর পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। তার জন্য 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র কর্তৃপক্ষকে ও বিশেষ করে শ্রীকানাইলাল সরকারকে আমার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 'বিংশ শতাব্দী' মাসিক পত্রিকার সম্পাদক শ্রীহরপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বাংলা দেশের বিদ্রোহ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ ছাপিয়ে আমার ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেডের শ্রীদীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উৎসাহ না পেলে এই বই এত তাড়াতাড়ি শেষ করা ও ছাপানো সম্ভব হত না। শ্রীমনোমোহন মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপক সুশীল জানা আগ্রহসহকারে পাণ্ডুলিপি পড়ে নানা বিষয়ে উপদেশাদি দিয়ে সম্পাদনার কাজে খুবই সাহায্য করেছেন। শ্রীসত্য চক্রবর্তী প্রুফ দেখে দিয়েছেন ও নানাভাবে প্রভূত সাহায্য করেছেন। ডাঃ মহাদেব সাহা, শ্রীসরোজ দত্ত, শ্রীমহাদেব সরকার এবং আরও নানাজনে এই বই লিখতে নানাভাবে সাহায্য করে আমাকে উৎসাহিত করেছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারিক শ্রীশিবদাস চৌধুরী এবং ন্যাশনাল লাইব্রেরীর কর্মিবৃন্দ প্রয়োজন মত পুস্তকাদি সরবরাহ করে আমাকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছেন। সকলকেই আমি এজন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

দ্রুত প্রকাশ করার জন্য ভুলত্রুটি মুদ্রণ-প্রমাদ অবশ্যই থাকা সম্ভব। গ্রন্থ মুদ্রণের শেষে আরও অনেক কথা মনে এসেছে, অনেক তথ্যও হাতে এসেছে, দু-একটি অধ্যায় একটু আগে-পরে অন্যভাবে সাজালে হয়তো পাঠকদের পক্ষে সুবিধে হত। যেমন—"দ্বিতীয় উদ্যম ও ব্যর্থতা" এবং "নেতৃত্বের অভাব" অধ্যায় দুটি "বিদ্রোহী দিল্লীর অভ্যন্তরে জনসাধারণ" শীর্ষক অধ্যায়টির পরেই সন্নিবেশ করলে ভাল হত। পরবর্তী সংস্করণে এগুলি সংশোধন করার ইচ্ছা রইল।

২১৪।১৫ লোয়ার সার্কুলার রোড
কলিকাতা ১৭
১৫ই আগস্ট, ১৯৫৭

গ্রন্থকার

বিষয় সূচী

চিত্র সূচী

মানচিত্র

চিত্র

ভারতীয়
মহাবিদ্রোহ
১৮৫৭

মহাবিদ্রোহের পটভূমি

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র জাতীয় গণ-অভ্যুত্থান। এর আগে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে ইংরেজ শাসনাধীনে একশত বৎসর ধরে বহুবার সিপাহীদের ও জনসাধারণের পৃথক পৃথক ভাবে বিদ্রোহ ঘটেছে, কিন্তু তা কখনও আঞ্চলিক সীমা ছাড়িয়ে বৃহত্তর জাতীয় আকার ধারণ করেনি। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহই জাতীয় বিদ্রোহে প্রথম রূপান্তরিত হল। এ কথা সত্য যে, বর্তমান যুগের জাতীয়তা বোধ এর অনেক আগেই রামমোহন রায়ের সময় থেকে ভারতে বিস্তার লাভ করছিল। কিন্তু তা তখনও জনসাধারণের মধ্যে বিস্তার লাভ করে একটা জনজাগরণে পরিণত হতে পারেনি। ১৮৫৭-র বিদ্রোহ ভারতীয় জনজাগরণের প্রথম সূত্রপাত ও জনগণের রাজনৈতিক জাতীয় চেতনার প্রথম উন্মেষ। অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'ইণ্ডিয়া স্ট্রাগল্স্ ফর ফ্রিডম্" গ্রন্থে এই বিদ্রোহের চরিত্র সম্বন্ধে ঠিকই বলেছেন যে, এ ছিল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের "প্রথম অপক্ক অভিব্যক্তি"। কিন্তু অপরিণত, অপরিপক্ক ও অনেক বিষয়ে সামন্ততান্ত্রিক ভাবধারায় দুর্বোধ্য হলেও এটাকেই সর্বভারতীয় জাতীয় চেতনার প্রথম শক্তিশালী তেজস্বী আত্মপ্রকাশ বলা যায়।

১৮৫৭ সালের জাতীয় অভ্যুত্থান আকস্মিকও নয়, অথবা কেবলমাত্র সিপাহীদেরই একটা সামরিক বিদ্রোহও নয়। সিপাহীদের দ্বারা শুরু হলেও সকল শ্রেণীর লোকই এতে যোগ দিয়েছিল। এই বিদ্রোহ ঘটেছিল কতকগুলি সুদূরপ্রসারী জাতীয় কারণ বশতঃ। এই বিদ্রোহ অনেকগুলি ঐতিহাসিক ঘটনারই পুঞ্জীভূত ফল। মিরাট ও দিল্লীতে বিদ্রোহের প্রথম বিস্ফোরণের মাত্র

কয়েকদিন পরেই সমকালীন সত্যদর্শী সাংবাদিক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই বিদ্রোহের রূপ ও কারণ বিশ্লেষণে যে দ্ব্যর্থহীন মত ব্যক্ত করেছেন, তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও সকলের অনুধাবনযোগ্য :

"এই বিদ্রোহ এখন আর সিপাহীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এ এখন ব্যাপক বিদ্রোহ। সিপাহীরা তাদের জীবনের সর্ব স্বার্থ উৎসর্গ করেছে। এবং দেশবাসীরাও তাদের মহান জাতীয় আদর্শরূপ পবিত্রব্রতে উৎসর্গীকৃত-প্রাণ শহীদরূপে গণ্য করেছে। বেসামরিক জনসাধারণ এই বিদ্রোহে সিপাহীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে এবং তাদের সাহায্য করেছে। ... ভারতবাসীদের মধ্যে এমন কেউই নেই, পরাধীনতার ক্ষোভ ও তার পীড়ন যে সম্যক্ অনুভব না করে, সে ক্ষোভের একমাত্র কারণই হচ্ছে ভারতে বৃটিশ শাসনের অস্তিত্ব এবং সে ক্ষোভ বিদেশী শাসনের আধিপত্যের সঙ্গে একেবারে অবিচ্ছেদ্য। ভারতীয় শিক্ষিতদের মধ্যে এমন একজনও নেই যিনি চিন্তা করেন না যে, তাঁর ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা ও তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা এই বিদেশীদের আধিপত্যের ফলে খর্ব হচ্ছে না।"—('হিন্দু পেট্রিয়ট'—২১শে মে, ১৮৫৭)। ব্যারাকপুরে বিদ্রোহের অব্যবহিত পরেই হরিশ্চন্দ্র ঐ পত্রিকাতেই ৯ই এপ্রিলে লিখেছিলেন যে, সাধারণ সংস্কারের দ্বারা সিপাহীদের মনকে আর এবার ঠাণ্ডা করা যাবে না, "সব টোটাগুলি যদি সিপাহীদের চোখের সামনে পুড়িয়েও ফেলে দেওয়া হয়, তা হলেও তাদের অসন্তুষ্টি দূর হবে না। তাদের অসন্তোষের কারণ সুদূরপ্রসারী এবং তা এই সব উপায়ে দূর হবার নয়। ...এইরূপ মনোভাব তাদের একদিনে জন্মায়নি এবং তা একদিনে দূর হবারও নয়। সকলেই আজ স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছেন যে সিপাহীদের মনে এক স্থায়ী পরিবর্তন ঘটেছে।"

একশত বৎসর ধরে ইংরেজের অবাধ লুণ্ঠন ও শোষণের প্রতিক্রিয়ার ফলেই এই মহাবিদ্রোহ ঘটে। রাজা, নবাব, জমিদার, ব্যবসায়ী, কৃষক, শিল্পজীবী, জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলকেই বৃটিশের সর্বগ্রাসী ক্ষুধানল নিবৃত্তির জন্য উপকরণ যোগাতে হয়েছিল। এই ঔপনিবেশিক লুণ্ঠনের অর্থ ও ঐশ্বর্যের দ্বারা ইংরেজ যেমন একাধারে তাদের দেশের নূতন-পুরাতন সকল শিল্পকে বড় করে গড়ে তুলতে লাগল, অন্যধারে তেমনি এই নূতন ক্ষমতায় বলীয়ান হয়ে ভারতের সমৃদ্ধিশালী শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষি ধ্বংস করে ভারতের শিল্পজীবী, ব্যবসায়ী ও কৃষকদের সর্বস্বান্ত করে দিতে লাগল।

এইখানেই ইংরেজের সঙ্গে অন্যান্য বিদেশী বিজেতাদের প্রভেদ। ইংরেজের পূর্বে যত বিদেশী ভারতে এসেছিল, তারা ভারতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে

মিশে যেত এবং ক্রমে ক্রমে নিজেরাও ভারতীয় হয়ে যেত, যার ফলে ভারতের জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনে বিশেষ কোনো বিপর্যয় ঘটত না। কিন্তু ইংরেজরাই প্রথম সারা ভারতের পুরাতন অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোটাকে ভেঙে চুরমার করে দিল। কৃষি ও শিল্পের অবিচ্ছেদ্য বন্ধনই ছিল ভারতীয় অর্থনীতির মূল ভিত্তি। আবহমান কাল হতে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম্য সংস্থাগুলি (Village Republics) এবং সমাজ-কাঠামোর অস্তিত্ব এই কৃষি-গৃহশিল্পের যৌগসূত্রের উপর নির্ভর করে চলে আসছিল।

ভারতের এই পুরাতন অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোকে ভেঙে দেওয়া একটা ভয়ানক ক্ষতিকর ব্যাপার নাও হতে পারত, যদি তার জায়গায় নূতন একটা উন্নত ব্যবস্থা সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠত। বর্তমান যুগে পুরাতন কাঠামোকে ধ্বংস করে দিয়ে এ রকম নূতন ব্যবস্থা ইউরোপের অনেক দেশেই হয়েছে এবং তার ফলে সেখানকার মানুষ প্রগতির পথে দ্রুত এগিয়ে যেতে পেরেছে। কিন্তু ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে তা ঘটল না।

ইংরেজ শাসনের পূর্বে ভারতের সামাজিক ক্রমবিকাশ সেই প্রগতির পথেই ক্রমশঃ অগ্রসর হচ্ছিল। এবং এতে কোনো সন্দেহই নেই যে, বহিরাগত প্রবলতর শক্তির হস্তক্ষেপ না হলেও কালক্রমে নিজের শক্তিতে সময়োপযোগী একটা নূতন সমাজ-ব্যবস্থাও ভারতবাসীরা গড়ে তুলতে পারত। এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, আকবরের সময় থেকে পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত ভারতবর্ষ শিল্পক্ষেত্রে ইউরোপের চাইতে কোনো অংশে পশ্চাৎপদ তো ছিলই না, বরং অনেক ক্ষেত্রে অগ্রসরই ছিল। এই কারণেই ইউরোপের বণিক সম্প্রদায় অত্যধিক আগ্রহান্বিত হয়ে ভারতের বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করবার জন্য এতখানি লালায়িত হয়ে উঠেছিল। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের আলোকপ্রাপ্ত পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকেই ভারতের ইতিহাসের এই তাৎপর্যপূর্ণ সত্যটিকে ভুলে যান এবং ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ থেকে তার স্বাভাবিক বৈপ্লবিক সম্ভাব্যতাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেন। ভারতে ইংরেজ শাসন স্থাপিত না হলে ভারত প্রগতির পথে অগ্রসর হতে পারত না, কিম্বা ১৮৫৭ সালে বিদ্রোহীরা বিজয়ী হলে ভারতবাসীকে আবার মধ্যযুগীয় বর্বরতার যুগে ফিরে যেতে হত, এই ধরনের চিন্তাধারা (যা এখনও একশ্রেণীর ভারতবাসীর মধ্যে বর্তমান) আত্মবিশ্বাসহীনতা ও দাসসুলভ মনোভাবেরই পরিচয়।

যাই হোক, ইংরেজরা ভারতে এসে পুরাতন কাঠামোটা তো ভাঙলই, নূতন যেটা গড়ে উঠতে যাচ্ছিল সেটাকেও একেবারে অঙ্কুরে ধ্বংস করে দিল। ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭—এই দীর্ঘ একশ' বছর-জোড়া ইংরেজ-ভারতের ইতিহাস একটা

ধ্বংস ও লুটপাটের ইতিহাস; সুস্থ সবল একটা কিছু গড়ে তোলার ইতিহাস নয়। এই ঘটনাটিই হল ইংরেজ শাসিত ভারতের ট্র্যাজেডি।

নবাবী শাসনের শেষ বৎসরে ১৭৬৪-৬৫ সালে বাংলার রাজস্ব আদায় হয়েছিল ৯০ লক্ষ টাকার কিছু কম। পরের বৎসরে অর্থাৎ ইংরেজ শাসনের প্রথম বৎসরেই তা প্রায় দ্বিগুণ করে বাড়িয়ে ১৪৭ লক্ষ টাকায় তোলা হল। ইংরেজের এই দানবীয় নির্মম শোষণ প্রতি বৎসর নিষ্ঠুরভাবে বেড়েই যেতে লাগল।

১৭৭০-৭১ সালে (বাংলা ১১৭৬ সাল) বাংলায় যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল, যা ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বলে সব বাঙ্গালীর কাছেই পরিচিত, তার প্রধান কারণই হল বিদেশী বণিকদের অমানুষিক শোষণ। এই মন্বন্তরের ফলে বাংলার এক-তৃতীয়াংশ মানুষ প্রাণ হারালেও এবং সুজলা সুফলা বাংলা দেশ একেবারে শ্মশানে পরিণত হলেও, ইংরেজ কিন্তু কৃষকদের এক পয়সাও খাজনা মকুব করেনি। বরং সেটাকে আরও বাড়িয়ে পরের বৎসর (১৭৭১-৭২ সালে) ২৩৫ লক্ষ টাকার রাজস্ব আদায় করল। ১৭৯৩ সালে কর্নওয়ালিস বাংলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা প্রবর্তন করবার সময় বাংলার রাজস্ব ৩৪০ লক্ষ টাকা ধার্য করলেন এবং সেই সঙ্গে পোষ্য জমিদারদের জন্য আরও ১০।১২ কোটি টাকা প্রজাসাধারণের কাছ থেকে আদায় করবার কায়েমী বন্দোবস্ত করে দিলেন। মোট কথা, ইংরেজ শাসনের প্রথম ৩০ বৎসরের মধ্যে বাংলা দেশে তার ভূমি-রাজস্ব খাতে আদায় বেড়ে গেল চারগুণেরও বেশী। বাংলা দেশে যা ঘটেছিল ইংরেজ শাসিত অন্যান্য প্রদেশেও তার কোনো রকম ব্যতিক্রম হয়নি।

শিল্পক্ষেত্রেও এই একই পীড়াদায়ক ইতিহাস। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে ইংরেজ ভারতের শিল্প ধ্বংস করতে থাকে। ১৮১৫ সালে ভারত থেকে ইউরোপে বস্ত্র রপ্তানি হয়েছিল ১৩০ লক্ষ টাকার। এই রপ্তানি কমতে কমতে ১৮৩২ সালে এসে দাঁড়াল মাত্র ১০ লক্ষ টাকায় এবং তার কয়েক বৎসর পরেই তা একেবারে শূন্যে বিলীন হয়ে গেল। আবার অন্য দিকে, ইংল্যাণ্ড থেকে ভারতে বস্ত্রের আমদানি—১৮০০ সালে যার কোনো অস্তিত্বই ছিল না—বাড়তে বাড়তে ১৮৩২ সালে এসে পৌঁছল ৪০ লক্ষ টাকায়। যে ভারতবর্ষ এক সময় নিজের চাহিদা মিটিয়ে প্রতি বৎসর এক কোটি থেকে দেড় কোটি টাকার বস্ত্র বিদেশে রপ্তানি করত, ১৮৫০ সালের মধ্যে তাকে হয়ে পড়তে হল ইংরেজের উপর নির্ভরশীল। তার নিজের চাহিদার তিন-চতুর্থাংশ সে নিজে তৈরি করতে লাগল, আর বাকি এক-চতুর্থাংশ ইংল্যাণ্ড থেকে আসতে লাগল। এই ভাবে

ভারতের বস্ত্রশিল্পই শুধু নয়, তার রেশম, পশম, লোহা, কাচ, কাগজ, ধাতু ইত্যাদি শিল্পগুলিও ইংরেজ ধ্বংস করে দিল।

এই প্রকার শিল্প ধ্বংসের ফলে লক্ষ লক্ষ ভারতীয় শিল্পজীবীর কি দুরবস্থা হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। ১৮৪০ সালে স্যার চার্লস্ ট্রিভেলিয়ান এক পার্লামেণ্টারী কমিটির সম্মুখে সাক্ষ্যদান কালে বলেছিলেন: "ঢাকা শহরের লোক-সংখ্যা ১,৫০,০০০ থেকে ৩০,০০০-তে কমে গিয়েছে। এই বর্ধিষ্ণু শহর, যা ভারতের মানচেস্টার ছিল, তা আজ অত্যন্ত গরীব ও খর্ব হয়ে গিয়েছে, জঙ্গল ও ম্যালেরিয়া তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে এবং তার দুর্দশার সীমা নেই।" স্যার হেনরি কটন ১৮৯০ সালে লিখেছিলেন: "মাত্র একশ' বছর আগেও ঢাকা শহরে ২ লক্ষ লোক বাস করত এবং তার বাৎসরিক ব্যবসায়ের পরিমাণ ছিল এক কোটি টাকার উপর। ১৭৮৭ সালে ঢাকা থেকে ৩০ লক্ষ টাকার মসলিন কাপড় বিদেশে রপ্তানি হয়েছিল। ১৮১৭ সালে তা একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল। এই অধঃপতন কেবলমাত্র ঢাকাতেই নয়, সব জেলাতেই হয়েছে।" ঢাকার ন্যায় মুর্শিদাবাদ, সুরাট, কালিকট ইত্যাদি অন্যান্য শিল্পপ্রধান শহরগুলিরও এই একই রকমের শোচনীয় পরিণতি হল, যা ঐতিহাসিক মণ্টোগোমারি মার্টিনের কথায়— "বর্ণনা করা বেদনাদায়ক।"

আলেকজাণ্ডারের 'ইস্ট ইণ্ডিয়া এণ্ড কলোনিয়াল ম্যাগাজিনে' (৯ম খণ্ড, ৫৪নং, ১৮৩৬) লেখা হয়েছিল যে—"১৮২০ সালের ঢাকার একজন অধিবাসী চীন থেকে বিশেষ অর্ডার পেয়ে দশ গজ লম্বা ও এক গজ চওড়া দুখণ্ড মসলিন দুশ' টাকায় কিনেছিলেন। মসলিনের ওজন ছিল সাড়ে দশ তোলা। ১৮২২ সালে ঐ লোকই অনুরূপ দ্বিতীয় অর্ডার পান। যারা প্রথমবার মসলিন দিয়েছিল এর মধ্যে তাদের মৃত্যু হয়েছে, এবং আর কোথাও সেরূপ মসলিন না পাওয়ায় চীনেরও অর্ডার বাতিল হয়ে গেল। এই দৃষ্টান্ত থেকে দেখা যাবে যে, মসলিন তৈরির কুশলতা বৃটিশ শাসনের অসাধু ও অত্যাচারী বাণিজ্যনীতির ফলে লোপ পেয়ে গেছে।"

বাংলা দেশের দেওয়ানী পাবার পর ক্লাইভ কোম্পানির ডাইরেক্টরদের লিখে পাঠালেন (৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৭৬৫) যে, বাংলার বাৎসরিক মোট রাজস্ব এখন ২৫০ লক্ষ টাকা হবে। সামরিক ও বেসামরিক বিভাগ দুটির জন্য খরচ হবে ৬০ লক্ষ টাকা, আর নবাবকে ভাতা দিতে হবে ৪২ লক্ষ টাকা ও মোগল সম্রাটকে কর দিতে হবে ২৬ লক্ষ টাকা; কোম্পানির উদ্বৃত্ত থাকবে মোট ১২২ লক্ষ টাকা; এই টাকাটা কোম্পানির 'পরিষ্কার লাভ'। প্রতি বৎসর কোম্পানির এই 'পরিষ্কার লাভের' অংশ বেড়ে যেতে লাগল এবং ৬।৭ বৎসরে তার পরিমাণ হয়ে দাঁড়াল

৪ কোটি টাকারও বেশী। বলা বাহুল্য যে, সে টাকাটা প্রতি বৎসর ইংল্যাণ্ডে চলে যেতে লাগল।

কোম্পানির এই লুণ্ঠন ছাড়াও, কোম্পানির ছোট বড় কর্মচারীদের ব্যক্তিগত লুণ্ঠনের পরিমাণ এর চাইতে অনেক বেশী ছিল। যে ক্লাইভ নিঃস্ব অবস্থায় ভারতে এসেছিলেন তিনি যখন ইংল্যাণ্ডে ফিরে গেলেন তখন তাঁর সম্পত্তির মূল্য ধার্য করা হয়েছিল ২৫ লক্ষ টাকা। তা ছাড়া, তিনি তাঁর ব্যক্তিগত ভারতীয় সম্পত্তি থেকেও বছরে আয় করতেন আড়াই লক্ষ টাকারও বেশী। অন্যান্য বড় বড় ইংরেজ কর্মচারীরাও এইরূপ বিরাট ঐশ্বর্যের মালিক হয়ে দেশে ফিরতেন। তা ছাড়াও তাঁরা ভারতের রাজস্ব থেকে মোটা পেন্সন ভোগ করতেন। লর্ড কর্নওয়ালিস পেতেন প্রতি বৎসর ৫০,০০০৲ টাকা। ওয়ারেন হেস্টিংস্ পেতেন ৪০,০০০৲ টাকা। ওয়েলেস্‌লী থেকে ডালহাউসি পর্যন্ত সকল গভর্নর জেনারেলকে একসঙ্গে ৬ লক্ষ টাকা করে দিয়ে দেওয়া হত। ছোট কর্মচারীরাও এই প্রসাদ থেকে বঞ্চিত হত না। একজন সাধারণ কেরানীও ১৫।২০ বৎসর ভারতে কোম্পানির কাজ করে ৪৫ বৎসর বয়সে অনায়াসে ৩ লক্ষ টাকার মালিক হয়ে ইংল্যাণ্ডে ফিরে যেতে পারতেন।

একটার পর একটা প্রদেশ দখল করে এত লুণ্ঠন, এত শোষণ করেও ইংরেজের ক্ষুধার নিবৃত্তি হল না। হারবার্ট স্পেনসার তাঁর 'সোশ্যাল স্টাটিস্‌টিক্‌স্' নামক বইতে ১৮৫১ সালে লিখেছিলেন যে—"একটা নির্মম বিশ্বাসঘাতকতাই হল ভারতে ইংরেজ শাসকদের স্থায়ী নীতি। রাজাদের ফুস্‌লিয়ে একজনকে আর একজনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামানো হয়েছে, তারপর একজন রাজা যখন আর একজনকে হারিয়ে দিয়েছে তখন এই জয়ী রাজাকেও কোনো-না-কোনো ছুতো করে সিংহাসনচ্যুত করা হয়েছে। ছুতো হিসেবে সরকারী নেকড়ে বাঘগুলির জন্য ঘোলা জলের নদী সব সময়ই হাতের কাছে প্রস্তুত আছে। আকাঙ্ক্ষিত রাজ্যের রাজাদের নিকট থেকে করের পর কর আদায় করে চূড়ান্ত ভাবে শোষণ করে নিঃশেষ করে দেওয়ার পর যখন তাঁরা আমাদের অফুরন্ত দাবি পূরণ করতে আর সক্ষম হন না তখন তাঁদের রাজদ্রোহের অপরাধে রাজ্যচ্যুত করে চরম শাস্তি দেওয়া হয়। ··· বর্তমানেও আমাদের চোখের সামনেই কত না অত্যাচার কত না শোষণ চলেছে। আমাদের চোখের সামনেই তো দেখতে পাচ্ছি যে অতি ক্ষতিকর একচেটিয়া লবণের ব্যবসায় মারফত, আর নির্দয় ভাবে করের উপর করের বোঝা চাপিয়ে গরীব কৃষকদের কাছ থেকে তাদের অর্ধেক ফসল আমরা শুষে নিচ্ছি। আমাদের চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি, কি শয়তানী উপায়ে ভারতীয় রাজ্য জয় করবার জন্য

এবং তাদের দাবিয়ে রাখার জন্য ভারতীয় সৈন্যদের ব্যবহার করছি, আবার এই সৈন্যদেরই, যখন তারা কিছুদিন পূর্বে উপযুক্ত পোশাকের অভাবে মার্চ করতে অস্বীকার করেছিল, তখন তাদের একটা গোটা রেজিমেণ্টকেই হত্যা করেছি। আমাদের চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি যে, পুলিসরা ধনী লোকদের সঙ্গে জোট বেঁধে প্রতিষ্ঠিত আইন-আদালতকে নিজেদের লুণ্ঠন ও অত্যাচারের কাজে লাগাচ্ছে। আমাদের চোখের সামনে আরও দেখতে পাই যে, তথাকথিত গণ্যমান্য ব্যক্তিরা হাতি চড়ে কৃষকদের ফসল-ক্ষেতের উপর দিয়ে যদিচ্ছা ঘুরে বেড়ান এবং কোনো রকম মূল্য না দিয়েই কৃষকদের কাছ থেকে নিজেদের জন্য রসদ সংগ্রহ করেন।"

সিন্ধুর আমিরদের সঙ্গে ইংরেজ সন্ধি-চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু এই সন্ধি উপেক্ষা করে ইংরেজরা সিন্ধু দখল করল। ১৮৪৩ সালে জেনারেল চার্লস্ নেপিয়ার তাঁর ডায়েরিতে এ সম্বন্ধে লিখেছিলেন যে—"সিন্ধু দেশ দখল করার আমাদের কোনো অধিকার নেই ; দখল করা হবে মস্ত বড় একটা শয়তানি। কিন্তু শয়তানি জেনেও আমরা সিন্ধু দেশ দখল করব, কারণ তা হবে আমাদের পক্ষে খুবই লাভজনক।"

এই একই রকম শয়তানী উপায়ে ভারতে ডালহাউসির ৮ বৎসর রাজত্বকালে (১৮৪৮—১৮৫৬) আরও ৮টি ভারতীয় রাজ্য ইংরেজরা অধিকার করে। ডালহাউসি ভারত ত্যাগ করবার পূর্বে তাঁর শেষ রিপোর্টে কোম্পানির ডাইরেক্টরদের নিকট গর্ব করে লিখেছিলেন যে, তিনি পাঞ্জাব, পেগু, নাগপুর, অযোধ্যা, সাতারা, ঝান্সী ও নিজাম রাজ্যের একটা অংশ ইংরেজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছেন—সে সব রাজ্যগুলি অধিকার করার ফলে ইংরেজ সরকারের বাৎসরিক আয় ৪ কোটি টাকা বেড়ে যাবে।

এত গ্রাস করার পরও কিন্তু ইংরেজের শয়তানি ও ছলচাতুরীর শেষ হল না। ভারতের রীতিনীতিগুলিকে সম্পূর্ণভাবে পদদলিত করে, অন্যান্য অবশিষ্ট দেশীয় রাজ্যগুলিকে গ্রাস করবার উদ্দেশ্যে ডালহাউসি একটা 'ডক্‌ট্রিন্ অব ল্যাপ্‌স্' ঘোষণা করলেন। এই নীতির দ্বারা ইংরেজ সরকারকে ক্ষমতা দেওয়া হল যে, কোনো দেশীয় মৃত রাজার স্বাভাবিক উত্তরাধিকারী না থাকলে, তাঁর কোনো দত্তকের সিংহাসনে আরোহণ করবার দাবি গ্রাহ্য করা হবে না এবং ঐ রাজ্য আপনা থেকেই বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। ডালহাউসির এই দাম্ভিক নীতিও ইংরেজ শাসকদের বিশ্বাসঘাতকতার ফল। কয়েক বৎসর পূর্বেও ইংরেজ শাসকবর্গ শাস্ত্রসম্মত ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন মেনে নিয়েছিলেন। ১৮২৫

সালে কোটার রাজার মৃত্যুর পর তাঁর দত্তককে তাঁর প্রকৃত উত্তরাধিকারী রাজা বলে স্বীকার করে কোম্পানির ডাইরেক্টরবর্গ লিখেছিলেন—"অন্যান্য হিন্দুদের মতো কোটার রাজারও দত্তক ও উত্তরাধিকারী নির্বাচন করার ক্ষমতা আছে।"[১] তারপর, ১৮৩৭ সালে যখন অরছার রাজা দত্তক উত্তরাধিকারী নির্বাচন করলেন, তখনও কোম্পানির ডাইরেক্টররা পুনরায় তা স্বীকার করে লিখলেন যে, "স্বগোত্রোদ্ভূত ব্যক্তিদের বাদ দিয়ে অন্য যাকেই হোক দত্তক উত্তরাধিকারী নির্বাচন করার অধিকার হিন্দু রাজাদের আছে। কেবলমাত্র দেখতে হবে যে, এই দত্তক নির্বাচন যেন ঠিকভাবে হিন্দু শাস্ত্রসঙ্গত হয়।"[২] এইভাবে ১৮৪৮ সাল পর্যন্ত অনেক ছোট ছোট রাজাদের দত্তককে প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলে বিনা দ্বিধায় আইনসঙ্গত বলেই ইংরেজ সরকার মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু ডালহাউসি ভারতে এসেই হিন্দু শাস্ত্র, আইন ও রীতিনীতি উপেক্ষা করে 'ডক্‌ট্রিন্ অব ল্যাপ্‌স্'-এর সাহায্যে সাতারা, নাগপুর ও ঝান্সীর রাজ্যগুলিকে স্বাভাবিক উত্তরাধিকারীর অভাবের অজুহাতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন।

এই সম্বন্ধে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন: "এই সব দুষ্কার্যের দ্বারা ইংরেজ যে কেবলমাত্র তাদের পবিত্র প্রতিজ্ঞাগুলিকেই ভঙ্গ করেছিল তাই নয়, তারা যুগ যুগান্তরের পবিত্র অধিকারগুলিকে, যার থেকে মানুষ কোনো রাজশক্তির দ্বারাই বঞ্চিত হতে পারে না, পদদলিত করে অবিমৃষ্যকারিতার পরিচয় দিয়েছে। এই সব রাজ্যগুলি দখল করার ফলে যাঁরা সব থেকে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন, তাঁদের কার্যাবলী, তা ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে যতই শত্রুতাপূর্ণ হোক না কেন, সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত, এবং সেই জন্য তাঁরা সমস্ত সভ্যজগতের সহানুভূতি পেতে বাধ্য।"

নাগপুর রাজ্য দখল সম্বন্ধেও হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন—"ডালহাউসি যতগুলি রাজ্য দখল করে বাহবা পেয়েছেন তার মধ্যে নাগপুর রাজ্য অধিকার ও নাগপুর রাজ-পরিবারের সমস্ত সম্পত্তি লুণ্ঠন সব থেকে বেশী বিশ্বাসঘাতকতা, হিংসাপূর্ণ ও বিচার-বর্জিত।"—('সিলেক্‌সন্‌স্ ফ্রম দি রাইটিংস্ অব হরিশ্চন্দ্র মুখার্জী—হিন্দু পেট্রিয়ট': নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত সম্পাদিত; পৃঃ ৩-৪)।

'ডালহাউসি ডক্‌ট্রিনের' ফল হল এই যে, অন্যান্য সকল শ্রেণীর ভারতবাসীর মতো রাজা, মহারাজা ও নবাবেরা পর্যন্ত সকলেই ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন: এইবার বুঝি ইংরেজ আর ভারতের কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখতে দেবে না। ইংরেজের এই সব শয়তানি ও ধূর্তামির জন্য ডালহাউসির রাজত্বকাল থেকেই

১। "পার্লামেন্টারী পেপার্স", ১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৫০, পৃঃ ১৫৩। ২। ঐ পৃঃ ১৫১।

সকল ভারতবাসীর মনেই ইংরেজের প্রতি একটা ঘৃণা ও ভয়, সন্দেহ ও ক্রোধ ঘনীভূত হতে থাকে। ১৮৫৭-র ১০।১৫ বৎসর পূর্ব থেকেই, বস্তুতঃ সিন্ধু জয়ের সময় থেকে, এই অবিশ্বাস ও সন্দেহের বীজ বপন হতে শুরু হয়। বৎসরের পর বৎসর তারা দেখতে পেল যে, ভগবানের নাম করে ইংরেজরা নিজেরাই যেসব পবিত্র সন্ধি স্থাপন করেছিল সেগুলি ভাঙতে ইংরেজদের এক মুহূর্তও বিলম্ব হয় না, তাদের বিবেকেও এতটুকু বাধে না। ইংরেজের এই সব কপট আচরণের বিশ্লেষণ করে একজন ইংরেজ জেনারেল বিদ্রোহের সময় লিখেছিলেন যে, "ভারতবাসীরা অনেকদিন ধরে যে পীড়ন অনুভব করছিল ও যে প্রকার অত্যধিক ঘৃণা পোষণ করছিল, যার ফলে তাদের মনের মধ্যে বিদ্রোহের আকাঙ্ক্ষা ধূমায়িত হয়ে উঠছিল, সেই মনোভাবই বিনা প্রস্তুতিতে ও ঠিক সময় আসবার আগেই বিপ্লবের আকারে হঠাৎ ফেটে পড়ল। ··· এই ভারতীয় বিদ্রোহকে কেবলমাত্র একটা সিপাহীদের বিদ্রোহ বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করার মানে হচ্ছে যে, বৃটিশ রাজত্বের অনেক বৎসরের কুশাসন ও দুঃশাসনের উপর পর্দা টেনে দেওয়া। আসলে ইংরেজের এতদিনকার দুঃশাসনই তাদের এই জাতীয় সামাজিক বিদ্রোহের দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল।"[১]

ইংরেজ রাজত্বে ভারতবাসীর নানাপ্রকারের অপমান ও লাঞ্ছনার সীমা ছিল না। ১৮১৮ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জ লিখেছিলেন যে—"বিদেশী বিজেতারা পরাজিত জাতির উপর নির্দয় ও হিংসাত্মক ব্যবহারই করে থাকে, কিন্তু আমরা যতখানি ঘৃণায় তাদের সঙ্গে ব্যবহার করেছি তা কেউই করেনি; ভারতীয়দের অবিশ্বাস-যোগ্য, অসৎ এবং রাজকার্যে অনুপযুক্ত বলে আমাদের মতো আর কেউই মনে করেনি।" ১৮২৪ সালে হার্ডিঞ্জ ইংরেজ শাসকদের সাবধান করে বলেছিলেন যে, এই ধরনের উগ্র ও অসম্ভব মনোভাব সব থেকে অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগেও কেউ দেখায়নি, এবং এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ একদিন যখন এই অসন্তোষ বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে ফেটে পড়বে তখন "তা এত শক্তিশালী হবে যে তা দমন করা আমাদের পক্ষে খুবই কষ্টকর হবে।"[২] হার্ডিঞ্জের এই ভবিষ্যৎ বাণীই যে ৩০ বৎসর পরে সফল হতে চলেছিল তা বলাই বাহুল্য।

মাদ্রাজের গভর্নর স্যার টমাস্ মুনরোও এই রকম সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, প্যাক্স ব্রিটানিকার ফলে ভারতে আইন

১। জেনারেল স্যার রবার্ট গার্ডিনার: "মিলিটারি এনালিসিস্ অব দি রিমোট এণ্ড প্রক্সিমেট কজেস্ অব দি ইণ্ডিয়ান রিবেলিয়ান," পৃঃ ৩২-৩৩।

২। স্যার জন এডি: "রিকলেক্শনস্ অব এ মিলিটারি লাইফ", পৃঃ ১৫০।

ও শৃঙ্খলার প্রবর্তন হয়েছে সত্য, কিন্তু শান্তি স্থাপিত হয়েছে ভারতীয় জাতীয় সত্তা —যে জাতীয় সত্তা মানুষকে সম্মানীয় করে—তাকে বিনষ্ট করে; ভারতবাসীদের পশুর স্তরে নামিয়ে দিয়ে আমরা শান্তি স্থাপন করেছি। মুনরো আরও বলেছিলেন :

"আমাদের রাজত্বের প্রধান দোষই হল এই যে, আমরা ভারতীয়দের সব থেকে নিম্নস্তরে দাবিয়ে রেখেছি। ··· প্রত্যেকটি বিশ্বস্ত ও বড় চাকুরী থেকে আমরা তাদের দূরে সরিয়ে রেখেছি। ··· আমরা তাদের নিকৃষ্ট জাতি বলে গণ্য করি। যেসব লোক, আমরা না থাকলে ভারতীয় রাজত্বে প্রথম স্থানগুলি সম্মানের সঙ্গে অধিকার করতে পারতেন, যাঁরা গভর্নরের পদে বসতে পারতেন, তাঁদের আমরা বাসার চাকরের মতো গণ্য করি, এবং অনেক সময় আমরা তাদের ভৃত্যের মতোই বেতন দেই, এবং আমাদের উপস্থিতিতে তাঁদের আমরা চেয়ারে পর্যন্ত বসতে দেই না। ··· ভারতে মুসলমান রাজত্বেও সরকারের সর্বোচ্চ আসনগুলিতে হিন্দুরা অধিকারী ছিলেন, এবং প্রায়ই তাঁরা তাঁদের বিজেতাদের থেকে এই সব চাকুরীতে বেশী অংশ পেতেন।"

ভারতীয় সিপাহীদের সম্বন্ধে মুনরো লিখেছিলেন যে, একজন ভারতীয় সুবাদারের চাইতে বড় অফিসার হবার আশা করতে পারে না, এবং এই সুবাদার হচ্ছে একজন সর্বনিম্ন ইংরেজ অফিসার, এন্‌সাইনেরও নিম্নে ; অর্থাৎ, একজন এন্‌সাইন কমাণ্ডার-ইন-চীফের যতটা নীচে, সুবাদারও এন্‌সাইনের ততটা নীচে।[১] একজন সুবাদারের উচ্চতম বেতন ছিল মাসিক ১৭৪৲ টাকা, কিন্তু একজন অতি নিম্নশ্রেণীর ইংরেজ সৈন্যের মাহিনাও প্রায় ততখানি।

ইংরেজরা সাধারণতঃ ভারতবাসীদের কতখানি ঘৃণার চক্ষে দেখত তা এই উদাহরণটির থেকে বেশ বোঝা যায়। জর্জ বোরো নামক একজন লেখক 'রোমানী রাই' নামে একটি উপন্যাস লেখেন। এই উপন্যাসের শেষ অধ্যায়ে নায়কের সঙ্গে কোম্পানির একজন রিক্রুটিং সার্জেণ্টের সঙ্গে পরিচয় হল, যে তাঁকে কোম্পানির চাকুরীতে প্রবেশ করবার জন্য আহ্বান করল। এই চাকুরীতে কি কি সুবিধা আছে—এই প্রশ্নের উত্তরে রিক্রুটিং সার্জেণ্টটি উত্তর দিলে : "ভারতবর্ষ হচ্ছে সব থেকে সুন্দর দেশ, যদিও তার লোকগুলি হচ্ছে একদল বদমাশ (rascals) যাদের এতটুকু মূল্য নেই, এবং যারা একটা অবোধ্য ভাষায় কথা বলে।" কোম্পানি তার চাকুরীয়াদের কাছ থেকে কি কাজ আশা করে ? "এই সব বদমাশগুলিকে লাথি মারা আর কেটে ফেলা, আর তাদের কাছ থেকে

১। গ্লীগ্ : "লাইফ অব স্যার টমাস্ মুনরো।"

রজতমুদ্রাগুলি কেড়ে নেওয়া।" আশ্চর্যের বিষয় এই যে দৈব-ঘটনা বশতঃ 'রোমানী রাই' প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৫৭ সালে—ঠিক যে সালে ঐ 'নেটিভ রাস্কেল'গুলি এই অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য মরিয়া হয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিল।

ভারতবাসীর মনে ইংরেজের প্রতি অবিশ্বাস ও ঘৃণা এত শক্তভাবে শিকড় বিস্তার করেছিল যে, ১৮৫৮ সালে সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্রের প্রচারের পর হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'হিন্দু পেট্রিয়টে' লিখেছিলেন :

"বারংবার বিশ্বাসভঙ্গের ফলে ইংরেজ সরকারের ইজ্জত এত কমে গিয়েছে যে, সততার বাস্তব প্রমাণ না দিলে এই ঘোষণাপত্র যাদের উদ্দেশ্যে প্রচার করা হয়েছে তারা সহজে এ বিশ্বাস করবে না। এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই যে, আবার সুযোগ বুঝে সরকার তাদের এই পবিত্র প্রতিজ্ঞাগুলি ভঙ্গ করবে না। রাজাদের সঙ্গে যেসব সন্ধিগুলি প্রচলিত পন্থা অনুসারে পবিত্র প্রতিশ্রুতির দ্বারা স্বাক্ষরিত হয়েছিল, সেই সন্ধিগুলিই যখন বিনা দ্বিধায় ও নিঃসঙ্কোচে যাদের দ্বারা ভঙ্গ হতে পেরেছিল, তারাই যে এই নতুন প্রতিশ্রুতিগুলি অনুসারে কাজ করবে, তার গ্যারাণ্টি কোথায়, যদিও এই প্রতিশ্রুতিগুলি মহিমান্বিতা সম্রাজ্ঞীর মুখ থেকে বের হয়েছে ?"

ভারতবাসীর মনে ইংরেজের শয়তানি ও বিশ্বাসঘাতকতা সম্বন্ধে এই ধারণা বদ্ধমূল হবার আরও একটা গুরুতর কারণ ছিল। একটি একটি করে ভারতীয় প্রদেশগুলিকে দখল করে, লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীকে শোষণ করে নিঃস্ব ও বেকার করেই ইংরেজরা ক্ষান্ত হল না, তারা ভারতীয় জনসাধারণকে বিধর্মী ও বিজাতীয় মনোভাবাপন্ন করে তুলবার জন্য অনেকদিন ধরে চেষ্টা করে আসছিল। ভারতীয় ধর্ম, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও রীতিনীতিগুলিকে তারা ইচ্ছা করে যখন তখন অবমাননা ও লাঞ্ছিত করতে লাগল এবং ইংরেজ শাসক ও পাদ্রীরা লোভ ও চাকুরীর প্রলোভন দেখিয়ে, ছলচাতুরীর দ্বারা যে কোনো উপায়ে ভারতীয়দের খৃষ্টান করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল। এই হীন প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখের গৌরবময় সংগ্রাম এই প্রসঙ্গে সকল ভারত-বাসীরই স্মরণীয়।

কোম্পানির একজন অভিজ্ঞ উচ্চ কর্মচারী, স্যার চার্লস্ ট্রিভেলিয়ান ১৮৫৩ সালে হাউস অব লর্ডস্ কমিটিতে সাক্ষ্যদান কালে বলেছিলেন (প্রশ্ন : ৬৮৫৮-৯) :

"কলকাতা ত্যাগ করবার পূর্বে শিক্ষিত খৃষ্টধর্ম গ্রহণকারীদের আমি একটা তালিকা তৈরি করেছিলাম। তাঁরা প্রায় সকলেই হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন এবং আমি দেখলাম এই খৃষ্টধর্ম গ্রহণকারীদের বেশীর ভাগই চরিত্রে, শিক্ষায় ও মনের

জোরে খৃষ্টধর্মের প্রধান সহায়ক। ... আমার মনে হয় যে, আমাদের পূর্বপুরুষদের যে ভাবে ধর্মান্তর ঘটেছিল, ভারতবর্ষ ঠিক সেইরূপে পাইকারী ভাবে অচিরেই খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হবে। সরাসরি মিশনারী প্রচারের দ্বারা ও পরোক্ষভাবে নানাপ্রকার বইএর ভেতর দিয়ে, আলোচনার ভেতর দিয়ে ও সর্বপ্রকার জ্ঞান প্রচারের মধ্যে দিয়ে খৃষ্টীয় শিক্ষা চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়া হবে। তারপর যখন এই ভাবে সমস্ত সমাজ এই খৃষ্টীয় জ্ঞানে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং যখন জনমত এইদিকে ঘুরে দাঁড়াবে, তখন ভারতীয়রা হাজারে হাজারে খৃষ্টান হয়ে যাবে।"[১]

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রধান কর্মকর্তা ও বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীর একজন প্রধান দিক্‌পাল ম্যাংগল্‌স্ মহাবিদ্রোহের কিছুকাল পূর্বে ইংল্যাণ্ডের পার্লামেণ্টে সকলকে আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন:

"ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত যাতে যিশু খৃষ্টের নিশান বিজয় গৌরবে উড়তে পারে, তারই জন্য ভগবান এই বিরাট রাজ্য আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। আমাদের সকলকে সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করতে হবে, সমস্ত ভারতবাসীকে যাতে খৃষ্টধর্মাবলম্বী করে তোলা যায়। এই মহৎ কাজে এতটুকু অবহেলা করা চলবে না।"

এই নীতি অবলম্বনে ভারতীয় ধর্মের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার করে, প্রলোভন দেখিয়ে ও নানাপ্রকার ছলচাতুরীর বলে সব ভারতীয়দেরই খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা হয়েছিল। সিপাহীদের মধ্যেও এই চেষ্টা চলছিল অবাধ। সিপাহীদের লোভ দেখানো হত যে, তারা যদি খৃষ্টান হয়, তা হলে যে সিপাহী আছে সে হয়ে যাবে হাবিলদার, আর হাবিলদার হয়ে যাবে স্থবাদার, মেজর ইত্যাদি।[২]

খৃষ্টান ধর্মের প্রতি একান্ত অনুরক্তিবশেই কি ইংরেজ শাসকরা ভারতীয়দের খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করবার জন্য এতখানি আগ্রহান্বিত হয়ে উঠেছিলেন? তা মোটেই নয়। ইংরেজের এই ধর্ম প্রচারের প্রচেষ্টার প্রধান কারণ ছিল রাজনৈতিক, ধর্ম-নৈতিক নয়। তাঁরা নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে দেখতে পেয়েছিলেন, যেসব ভারতীয় খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিল, তারা নিজেদের দেশীয় সত্তা হারিয়ে বিজাতীয়

১। জে. বি নর্টন: "টপিক্‌স্ ফর ইণ্ডিয়ান ষ্টেটস্‌ম্যান," পৃঃ ৩৭৭।

২। "কজেস্ অব দি রিভোল্ট": বাই এ 'হিন্দু'। মঙ্গল পাণ্ডের বিচারের সময় ব্যারাকপুরের ৩৪শ বাহিনীর অধিনায়ক কর্নেল হুইলার তাঁর সাক্ষ্যদান কালে বলেছিলেন যে, তিনি সিপাহীদের মধ্যে তাদের খৃষ্টান করবার জন্য ২০ বৎসর ধরে চেষ্টা করেছিলেন।—(ফরেষ্ট: "ষ্টেট পেপার্স", ১ম খণ্ড এবং কে': "হিষ্ট্রি অব সিপয় ওয়ার ইন ইণ্ডিয়া"—১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৮০)

মনোভাবাপন্ন হয়ে ইংরেজের প্রতি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। অজ্ঞ জনসাধারণকে রাজার ধর্মে দীক্ষিত করে তাদের চিরকালের জন্য ইংরেজ-রাজের অনুগত গোষ্ঠীতে পরিণত করাই ছিল এই খৃষ্টধর্ম প্রচারের প্রধান উদ্দেশ্য।

এই হীন প্রচেষ্টার ফলে ভারতবাসীরা ভাবতে শুরু করল যে, ছলে বলে কৌশলে ইংরেজরা যে ভাবে ভারতের প্রদেশগুলিকে দখল করেছে, ঠিক সেই ভাবেই ভারতবাসীদের খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করে তাদের ধর্ম, সভ্যতা ও স্বাতন্ত্র্যও নষ্ট করে দেবে। কতকগুলি কারণে ভারতবাসীর মনে, বিশেষ করে সিপাহীদের মনে, আরও একটা সন্দেহ জাগল যে, ভারতীয়দের ধর্ম নষ্ট করে ইংরেজরা তাদের বিদেশে পাঠাবে ইংরেজদের স্বার্থে অন্যান্য দেশ জয় করবার জন্য। এই প্রসঙ্গে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মিরাট বিদ্রোহের একদিন পূর্বে, ৯ই মে তারিখে হেনরি লরেন্স লর্ড ক্যানিংকে লিখেছিলেন—একজন ৪০ বৎসর বয়সের পুরাতন ও চরিত্রবান ভারতীয় সিপাহী-অফিসার তাঁকে বলেছিল যে, সে এবং অন্যান্য সিপাহীরা সকলেই বিশ্বাস করে—সরকার ছলে বলে ভারতবাসীর ধর্ম নাশ করবার জন্য গত দশ বৎসর থেকে চেষ্টা করে আসছে, ঠিক যে ভাবে তারা ভারতবাসীর দেশ কেড়ে নিয়েছে। সিপাহী-অফিসারটি আরও বলেছিল যে, তাদের ধর্ম নষ্ট করার পর তাদের সাগরপারের অন্যান্য দেশগুলিকে ইংরেজের জন্য জয় করতে পাঠানো হবে। সিপাহীদের এই ধরনের উক্তি থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে, যখন সেকালের বুদ্ধিজীবী ও প্রগতিশীলদের মধ্যেও এই প্রকার রাজনৈতিক বোধশক্তি জন্মায়নি, তখনও এই সব 'অজ্ঞ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন' সিপাহীদের মধ্যে নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে কি ভাবে দেশাত্মবোধ ও জাতীয় চেতনা ধীরে ধীরে জেগে উঠছিল।

ইংরেজ ঐতিহাসিক মীড তাঁর 'সিপয় রিভোল্ট' গ্রন্থে লিখেছেন :

"আমাদের মনে রাখতে হবে যে ক্রাইমিয়াতে রুশদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই হবার সময় আমাদের সংবাদপত্রগুলিতে দাবি উঠেছিল যে, ভারতীয় সিপাহীদের এই যুদ্ধে নিয়োগ করা হোক। অনেক সময় এই দাবিও করা হয় যে, আমাদের উপনিবেশগুলিতে ইংরেজ সৈন্যদের স্থানে ভারতীয় সিপাহীদের পাঠানো হোক। ক্রমশঃ এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে দাঁড়াল যে, ক্রাইমিয়াতে ভারতীয় সৈন্য যদি না পাঠানো হয় তা হলে রুশরাই জয়ী হবে। কিন্তু সিপাহীদের বিদেশে পাঠাতে হলে তার পূর্বে তাদের ধর্ম ও জাতি নষ্ট করা প্রয়োজন। পারস্য ও চীনের যুদ্ধের সময় এই ধারণা বিস্তার লাভ করল যে, এই সব বিদেশের যুদ্ধক্ষেত্রে ইংরেজ তাদের অত্যাবশ্যক মনে করে ও সেখানে গেলে হয় তাদের উপবাসে মরতে হবে, নতুবা তাদের অখাদ্য কুখাদ্য খেতে হবে।"

সিপাহীদের যে এই সন্দেহ অমূলক ছিল না তার প্রমাণ হচ্ছে ভারত সরকারের ১৮৫৬ সালের ২৫শে জুলাই-এর 'জেনারেল এনলিস্টমেণ্ট অ্যাক্ট'। ১৮৫৬ সাল পর্যন্ত সিপাহীরা যেখানে মার্চ করে যেতে পারবে সেখানেই তারা যুদ্ধ করবে, এই বলে চাকুরীর শর্তে সই করে দিত। এর ফলে সরকার সিপাহীদের সমুদ্রযাত্রায় বাধ্য করতে পারত না। কিন্তু এই জেনারেল এনলিস্টমেণ্ট অ্যাক্টের দ্বারা ঘোষণা করা হল যে, এখন থেকে যেসব লোক সিপাহী রেজিমেণ্টে নাম লেখাবে তাদের যেখানেই সরকার হুকুম করবে সেখানেই যেতে হবে। এই জেনারেল এনলিস্টমেণ্ট আইন ডালহাউসি প্রস্তুত করে গিয়েছিলেন—আর ক্যানিং ভারতে আসার পরই এই আইন চালু করে কাজ শুরু করে দিলেন। এর ফলে সিপাহীদের মনে বিক্ষোভ, সন্দেহ ও অবিশ্বাস দ্রুত বেড়ে গেল। ফরেস্ট বলেন: "একজন ভারতীয় রাজভক্ত অফিসার বিদ্রোহের কারণগুলি বিশ্লেষণ করে বলেছিলেন যে, 'যখন পুরানো সিপাহীরা এই জেনারেল এনলিস্টমেণ্টের কথা জানতে পারল তখন তারা অসন্তুষ্ট ও ভীত হয়ে উঠল। তারা বললে, যেসব সিপাহীরা আফগানিস্তানে যুদ্ধ করতে গিয়েছিল তাদের অনেককেই এখনও পর্যন্ত জাতে ফিরিয়ে নেওয়া হয়নি ; এখন এই আইনের বলে কে জানে ইংরেজ আমাদের কোথায় জোর করে পাঠাবে? এর পর হয়ত তারা আমাদের লণ্ডন পাঠিয়ে দেবে।"—('হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়ান মিউটিনি', পৃঃ XXII)।

ভারতবাসী ও সিপাহীদের মন যখন এই সব ঐতিহাসিক কারণে খুবই বিক্ষুব্ধ অবস্থায়, ঠিক সেই সময় ভারতে শুয়োর-গরুর চর্বি মিশ্রিত টোটার প্রশ্ন দেখা দিল। চর্বি মিশ্রিত টোটা চালু করবার প্রচেষ্টার মতো এত বড় মূর্খতা বোধ হয় ইংরেজ শাসকবর্গ আর কোনো কালেই করেনি। হিন্দু-মুসলমানের যে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য তারা এতদিন ধরে প্রাণপণ চেষ্টা করে এসেছে, তা এক মুহূর্তে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে তাদের একতাকে সুদৃঢ় করে দিল। ভারতের চতুর্দিকে রাষ্ট্র হতে শুরু করল, এই টোটা দিয়েই ইংরেজরা হিন্দু-মুসলমান সকল সিপাহীদের জাত নষ্ট করবে এবং তাদের খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করবে। ধর্ম নষ্ট হওয়ার ভয় যে কেবলমাত্র একটা কুসংস্কারের প্রশ্নই নয়, তা ইংরেজ ঐতিহাসিক লেকি বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি তাঁর 'ম্যাপ অব লাইফ'-এ লিখেছিলেন যে, "সিপাহীদের টোটা ব্যবহার করতে বলা আর ১৭শ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের পিউরিটান সৈন্যদের পরলোকের মুক্তির আশা ত্যাগ করতে বলা ও তাদের খৃষ্টান ধর্মকে অপমান করতে বলা একই কথা।"

টোটা ব্যবহারের প্রতিবাদে সিপাহীদের বিদ্রোহকে অনেক আলোকপ্রাপ্ত ভারতীয় (এবং অনেক ইংরেজও) অজ্ঞ অন্ধ সিপাহীদের কুসংস্কারের ফল বলেই

মনে করেন। বিদ্রোহের সময় কতকগুলি ইংরেজী সংবাদপত্র ভারতীয় শিক্ষিতদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে বলতে থাকে যে, 'নেটিভ'দের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তার হওয়ার ফলেই এই বিদ্রোহ ঘটেছে। তার উত্তরে 'হিন্দু' নামধারী 'মিউটিনিজ এণ্ড দি পিপ্‌ল্' বইএর লেখক তীব্র প্রতিবাদ করে বলেন যে—"সিপাহীদের অজ্ঞতা ও কুসংস্কারই এই বিদ্রোহ ঘটিয়েছে, ভারতীয় ভদ্রলোকদের শিক্ষা এর জন্য দায়ী নয়।"—(পৃঃ ৪১)। ··· তিনি আরও বলেন যে, যদি সিপাহীরা ভদ্রলোকদের মতো শিক্ষিত হত তা হলে চর্বি মিশ্রিত টোটার কথা কিম্বা খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করার কথা তারা মোটেই বিশ্বাস করত না। সুতরাং, "জনসাধারণকে শিক্ষা দাও, তা হলে দেখবে যে, জমিদার ও মহাজনদের মতো সিপাহীরাও ইংরেজের অনুগত হবে এবং প্রতি গ্রামের কৃষকরা সিপাহীদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন না হয়ে ও তাদের সাহায্য না করে, তাদের ধ্বংস করবে।"—(ঐ—পৃঃ ৪১)। ছদ্মনামধারী এই 'হিন্দু' ভদ্রলোকটি ছিলেন তৎকালীন একজন বুদ্ধিজীবী প্রগতিশীল বাঙ্গালী।

ভারতীয়দের জাতীয় আবেগকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ইংরেজ যে চর্বি মিশ্রিত টোটা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল, সেই টোটাই ভারতের স্তূপীকৃত বারুদে স্ফুলিঙ্গের কাজ করল। এ সম্বন্ধে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন: "এই গুরুতর ভুল ভারতের বিস্ফোরক স্তূপ, যা ইংরেজের পূর্ববর্তী কুকার্যের ফলে রাশীকৃত হয়ে জমে উঠেছিল, তাতে অগ্নিসংযোগ করল। সিপাহীদের আবেগ ও মনোভাব একেবারে উপেক্ষা করে সামরিক বিভাগ তাদের মধ্যে টোটা চালু করতে পারবে, সামরিক বিভাগের এই অজ্ঞতা খুবই আশ্চর্যের বিষয়। অন্য সময়ে হয়ত এই টোটা উপলক্ষ্য করে এত বড় গুরুতর ঘটনা নাও ঘটতে পারত যদি না সিপাহীদের মন ইংরেজের প্রতি সন্দিগ্ধ ও বিক্ষুব্ধ হয়ে থাকত।"—('রাইটিংস্ অব হরিশ্চন্দ্র মুখার্জী', পৃঃ ১৮)। ঐতিহাসিক জাস্টিন ম্যাকার্থীও ঠিকই বলেছেন যে, "এই টোটার প্রতিবাদই ভারতীয় বিস্ফোরক পরিস্থিতিতে আকস্মিক অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের স্পর্শ যোগাল। যদি এই স্ফুলিঙ্গের দ্বারা ইন্ধনের কাজ না হত, তা হলে অন্য কোনো বস্তু সেই ইন্ধন যোগাত।" ১৮৫৭ সালে সিপাহী ও ভারতবাসীর মন বিদ্রোহের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়েছিল, তা না হলে টোটার পক্ষে এই বিস্ফোরণ ঘটানো কখনও সম্ভব হত না, এবং টোটার সমস্যা সহজেই সমাধান হতে পারত।

বস্তুতঃ বিদেশী শাসকদের শোষণ, অত্যাচার ও অবমাননার ফলে যে আক্রোশ ভারতবাসী ও সিপাহীদের মনে বহুদিন ধরে পুঞ্জীভূত হয়েছিল, তাই টোটার প্রশ্নে অকস্মাৎ সশস্ত্র বিদ্রোহের আকারে ফেটে পড়ল। ভারতের এই পরিস্থিতি আলোচনা করতে গিয়ে পার্লামেণ্টে একজন সভ্য বলেছিলেন—ভারতে এত

অসন্তোষ জমে উঠেছে যে, তা অন্তত: ডজন খানেক বিদ্রোহ ঘটিয়ে দিতে পারে। ইটালিতে একটি প্রবাদ বাক্য আছে যে, "প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষা অনেকদিন সুপ্ত থাকতে পারে, কিন্তু কখনও তার মৃত্যু ঘটে না।" উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারত সম্বন্ধে এ কথা খুবই প্রযোজ্য। নর্টন ঠিকই মন্তব্য করেছিলেন যে—"দুদিন পূর্বেই হোক, আর দুদিন পরেই হোক; কোনো স্থানে, কোনো উপায়ে, কোনো সময়ে, যদিও মানুষের পক্ষে তার সঠিক স্থান, কাল, পাত্র নির্ণয় করা সম্ভব নয়, মহাকাল অপরিহার্য ভাবে এই সব অন্যায়ের প্রতিশোধ নেবেই; যে বিষ-বৃক্ষ আমরা রোপণ করেছি, তার বিষময় ফল আমাদের ভোগ করতে হবেই।"[১]

ভারত সরকারের সামরিক ইনটেলিজেন্স দপ্তরের প্রধান কর্মকর্তা উইলিয়াম মুইর বিদ্রোহের কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে—"একটা আত্মশক্তির চেতনা সিপাহী বাহিনীতে জেগে উঠেছিল, যার স্ফুরণ কেবলমাত্র বিদ্রোহের মধ্য দিয়েই সম্ভব ছিল। টোটার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বিদ্রোহের সেই সুপ্ত শক্তিকে শুধু কার্যকরী করে তুলল।"[২]

বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রসার বেড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বেঙ্গল আর্মির শক্তিও বেড়ে যেতে লাগল। ১৮৫৭ সালে বিদ্রোহের পূর্বে ভারত সরকারের সৈন্যসংখ্যা ছিল প্রায় ৩,২৪,০০০ ও কামানের সংখ্যা ছিল ৫১৬টি। এর মধ্যে ইংরেজ সৈন্যের সংখ্যা ছিল প্রায় ৫০,০০০; এই ইংরেজ সৈন্যদের প্রায় ৪৫,০০০ হাজার অবস্থান করত উত্তর ভারতে।

ভারতের বাহিনী তিনটি অংশে বিভক্ত ছিল—বেঙ্গল আর্মি, মাদ্রাজ আর্মি ও বম্বে আর্মি। এগুলির মধ্যে বেঙ্গল আর্মিই ছিল সব থেকে শক্তিশালী ও তার কার্যক্ষেত্র ছিল আসাম থেকে পেশোয়ার, আর সিমলা থেকে নর্মদা। বেঙ্গল আর্মির সিপাহীদের সংখ্যা ছিল পদাতিক, অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ মিলিয়ে ১,৪০,০০০। এর মধ্যে ভারতীয় গোলন্দাজদের সংখ্যা ছিল ২,০০০। এই গোলন্দাজরা যে সিপাহী বাহিনীর মেরুদণ্ড ছিল ও সিপাহীদের আত্মশক্তিকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসবান করে তুলেছিল তাতে সন্দেহ নেই।

১৮৫৭ সালে সমগ্র ভারতের সৈন্যবাহিনী কি ভাবে গঠিত ছিল তার রূপটি ফরাসী ঐতিহাসিক সার্ল মার্তাঁ রচিত 'লা পুইসানস্ মিলিটেইর ডেজাংলেই ডাঁ ল্যান্দ' গ্রন্থের ২২৩ পৃষ্ঠায় যে ভাবে দেওয়া হয়েছে সেটি পরের পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করা হল।

১। জন ব্রুস্ নর্টন: "টপিক্স্ ফর ইণ্ডিয়ান ষ্টেটস্‌ম্যান," পৃঃ ৪৩।

২। "রেকর্ডস্ অব দি ইনটেলিজেন্স ডিপার্টমেন্ট ডিউরিং দি মিউটিনি," ২য় খণ্ড, পৃঃ ১২০।

	বেঙ্গল আর্মি—	মাদ্রাজ আর্মি—	বম্বে আর্মি—	মোট বাহিনীসংখ্যা	প্রতি বাহিনীতে গড়পড়তা সৈন্যসংখ্যা—	মোট সৈন্যসংখ্যা—
ভারতীয় সাময়িক অশ্বারোহীবাহিনী	৩১	৪	৬	৪১	৫০০	২০৫০০
নিয়মিত অশ্বারোহীবাহিনী	১০	৮	৩৭	৫৫	৫০০	২৭৫০০
সাময়িক পদাতিকবাহিনী	৪১	৬	৮	৫৫	১০০০	৫৫০০০
ভারতীয় পদাতিকবাহিনী	৭৪	৫২	২৯	১৫৫	১১০০	১৭০৫০০
ইংরেজ পদাতিকবাহিনী	৩	৩	৩	৯	১০০০	৯০০০
ভারতীয় ফিল্ড গোলন্দাজবাহিনী	৩	২	২	৭	৬৪০	৪৪৮০
ইংরেজ ফিল্ড গোলন্দাজবাহিনী	৬	৪	২	১২	৩৩৭	৪০৪৪
ভারতীয় অশ্বারোহী গোলন্দাজবাহিনী	৪	×	×	৪	১১০	৪৪০
ইংরেজ অশ্বারোহী গোলন্দাজবাহিনী	৯	৬	৪	১৯	১৪০	২৬৬০
ইরেজ পদাতিকবাহিনী	১৪	৪	৪	২২	১১০০	২৪২০০
ইংরেজ অশ্বারোহীবাহিনী	১	×	১	২	৭০০	১৪০০
অফিসার	২৯০১	২০১৯	১২৮৯	×	×	৬২১৫

একজন ইংরেজ বিদ্রোহের সময় লিখেছিল :

"বিদ্রোহের পূর্বে বেঙ্গল আর্মিতে শাসক জাতি অধীন জাতির লোকদের হাতে এতগুলি কামান কি করে ছেড়ে দিয়েছিল তা ভেবে সকলেই আশ্চর্য হতেন। পাঞ্জাব, অযোধ্যা ও গোয়ালিয়র কনটিন্‌জেন্ট ইত্যাদি সাময়িক বাহিনীর কামানগুলি ছাড়াও নিয়মিত গোলন্দাজ বাহিনীগুলির মধ্যে পাঁচ ভাগের দু' ভাগ কামান ছিল নেটিভদের হাতে।" তারপর উপসংহারে এই ইংরেজ বীরপুরুষটি বলছেন যে, "কামানগুলি রাখা উচিত কেবলমাত্র ইংরেজদের হাতে। নেটিভদের হাতে কোনো কামানই রাখা উচিত নয়। নেটিভরা যাতে আমাদের ভয় ও সম্মান করে, তার জন্য তারা যাতে নিজেদের দুর্বল ও অসহায় মনে করে তা করতে হবে।"[১]

বিদ্রোহের সময় সিপাহীরা কামানের দ্বারা ইংরেজ শিবিরে কি ভয়ঙ্কর আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল তা বিদেশী শাসকরা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছিল। তাই বিদ্রোহের পর, ভারতীয়দের হাতে আর কোনো কামান দেওয়া হবে না, এই সিদ্ধান্ত তারা গ্রহণ করেছিল। লর্ড এলেনবোরো এই সম্বন্ধে লিখেছিলেন :

"কামান তৈরি করতে ও কামান চালনা করতে নেটিভদের একটা প্রতিভা আছে ; এবং এর সুযোগ যাতে তারা আর না পায় সেটা আমাদের দেখতেই হবে। ··· নেটিভরা কামানের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরবে, তবু কামান ছেড়ে দেবে না। এই যুদ্ধে তাদের কৃতিত্ব খুব কম করে আমাদের সমানই ছিল।"[২]

লর্ড ক্যানিং বলেছিলেন :

"ভারতীয়রা অতি উৎকৃষ্ট গোলন্দাজ, কিন্তু তাদের হাতে কামান দিতে আর বিশ্বাস হয় না ; তারা কামানকে ধর্মনিষ্ঠার সঙ্গে পূজা করে।"[৩]

পাঞ্জাবের কমিশনাররাও এই একই মত ব্যক্ত করেছিলেন—"পৃথিবীর অন্য যে কোনো দেশ থেকে কামানের মূল্য বোধ হয় এশিয়াতেই সব থেকে বেশী। ভারতীয়রা কামানকে অত্যধিক ভয় পায়, তার জন্যই ভারতীয় গোলন্দাজদের কাছে কামান অনুরাগ ও পূজার বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। ইংরেজের একটি ছোট বাহিনীর হাতে শক্তিশালী কামান থাকলে তারা দুর্নিবার হয়ে উঠবে ; এবং সিপাহীদের কামান ছাড়া কোনো বিদ্রোহে জয় হবার আশা থাকবে না।—('পীল কমিশনের সাপলিমেণ্টারী পেপার্স', পৃঃ ৬)।

বিদ্রোহের পর ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত ভারতীয় গোলন্দাজ বাহিনী আর গঠন করা হয়নি। আর ১৯৩৫-এও মাত্র একটি বাহিনীই গঠন করা হয়েছিল।

১। "ক্যালকাটা রিভিউ", সেপ্টেম্বর, ১৮৫৭—পৃঃ ৯৯-১০০।

২। "রিপোর্ট অব দি পীল কমিশন", ১৮৫৮-৫৯ এপেণ্ডিক্স ২। ৩। ঐ, এপেণ্ডিক্স ৫৪।

বেঙ্গল আর্মির আত্মশক্তির উপর নির্ভরশীল হবার আরও একটি কারণ ছিল। বেঙ্গল আর্মি যে ভাবে গঠিত হয়ে উঠেছিল, তা সিপাহীদের মধ্যে একতা গড়ে উঠবার সহায়ক ছিল। প্রধানতঃ অযোধ্যা ও পশ্চিম বিহারের ব্রাহ্মণ, রাজপুত ও মুসলমানদেরই এই বাহিনীতে নেওয়া হত। এই ধরনের সিপাহী সংগঠনকে বলা হত 'সাধারণ সংমিশ্রণ' প্রথা, অর্থাৎ জাতিধর্ম নির্বিশেষে সব সিপাহীদের একই দলভুক্ত করা। বম্বে ও মাদ্রাজের বাহিনীগুলিও এই প্রথাতেই সংগঠিত ছিল, তবে সেখানে নিম্নবর্ণের লোকদের ও খৃষ্টানদের সংখ্যা অনেকবেশী ছিল।

বেঙ্গল আর্মি সম্বন্ধে ঐতিহাসিক কে' লিখেছিলেন ঃ

"এই বেঙ্গল সিপাহী ··· সব থেকে উৎকৃষ্ট সৈনিক, দীর্ঘদেহী, সুগঠিত ও মহত্বপূর্ণ, কিন্তু দক্ষিণী সিপাহীদের মতো নম্র ও সেবাপরায়ণ নয়। ভাল মেজাজে থাকলে তার থেকে উৎকৃষ্ট সৈনিক পৃথিবীতে আর কেউ হতে পারে না। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই যে, সে সব সময় ঠিক ভাল মেজাজে থাকে না। সে প্রায়ই যে রকম খারাপ মেজাজের পরিচয় দেয়, তা তার কমাণ্ডারদের কাছে খুবই ক্লেশদায়ক এবং অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের পক্ষে বিপদ্‌জনক।"[১]

কে' আরও এক জায়গায় বলেছেন, "এই সিপাহীরা নির্ভীকভাবে মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছে এবং সর্বপ্রকারের বিপদ, অনাহার ও কষ্টের মধ্য দিয়ে তাদের যেতে হয়েছে। যে অফিসারকে তারা বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করে, তার দ্বারা চালিত হলে, তারা এমন কিছু কষ্ট নেই যা সহ্য করবে না, আর এমন কিছু কাজ নেই যা করবে না। তারা এমন দুর্গম স্থানে বাহিনীর পতাকা তুলে ধরেছে, যেখানে পৌছতে ইংরেজের শক্তি ও অধ্যবসায় ব্যর্থ হয়েছে।"—(পৃঃ ২০২-২০৩)

স্যার টমাস্ মুনরো যখন মাদ্রাজে গভর্নর ছিলেন, তখন সিপাহীদের নিকট থেকে তিনি একটি বেনামী চিঠি পান। এই চিঠিতে সিপাহীরা লিখেছিল ঃ

"আমরা সিপাহীরা যদি তলোয়ারের জোরে কোনো প্রদেশ জয় করি, কাপুরুষ ফিরিঙ্গী সন্তানেরা সেই দেশ দখল করে সেখানে নবাব হয়ে বসে এবং অল্প সময়ের মধ্যে টাকা-পয়সায় তাদের বাক্স ভর্তি করে ইউরোপে ফিরে যায়। কিন্তু একজন সিপাহী যদি সারা জীবন ধরেও খেটে মরে, তবু পাচটি কড়িও সে বেশী পায় না।" ১৭৪৮

এই চিঠিতে আরও বলা হয়েছিল যে, মোগল রাজত্বে এই রকম অবস্থা ছিল না, কারণ যুদ্ধে জয়ী হলে তখন সৈনিকদের জায়গীর দেওয়া হত এবং অনেকেই

১। কে' ঃ "হিষ্ট্রি অব সিপয় ওয়ার ইন ইণ্ডিয়া", ১ম, পৃঃ ২১৩।

উচ্চপদ লাভ করত। এর উপর কে' মন্তব্য করেছিলেন যে, এ রকম আবেগপূর্ণ চিন্তাধারা সিপাহীদের মধ্যে সব সময়ই বদ্ধমূল ছিল এবং অল্প চেষ্টাতেই তাকে বাস্তব রূপ দেওয়া কিছুই শক্ত কাজ ছিল না।[১] এই সব তাৎপর্যপূর্ণ তথ্যগুলি থেকে এটা স্পষ্টই বোঝা যায় যে, টোটার বিরুদ্ধে কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই সিপাহীরা বিদ্রোহ করেছিল, তাদের মধ্যে জাতীয় চেতনা ও দেশাত্মবোধের উন্মেষ হয়নি, বিদেশী শাসকদের অত্যাচার ও শোষণের ফলে জাতীয় অপমান-বোধ তাদের মধ্যে জাগেনি—এই সব অসত্য ও অনৈতিহাসিক উক্তি যে পণ্ডিতেরা করেন, তাঁদের মধ্যে প্রকৃত ঐতিহাসিক বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব আছে।

ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার সিপাহীদের দস্যু, লুণ্ঠনকারী, ধর্ষণকারী, স্বার্থপর, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ইত্যাদি নানাপ্রকার বিশেষণে বিভূষিত করে বলেছেন—সমস্ত সমসাময়িক ভারতীয়দের বিবরণী থেকে বিশেষ একটা তাৎপর্যপূর্ণ সত্য ধরা পড়ে, তা হল এই যে, পরবর্তীকালে ভাবালুতার অপপ্রয়োগ করে সিপাহীদের যাঁরা দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামকারী বীর দেশপ্রেমিক বলে চিত্রিত করেছিলেন, বাস্তবিক-পক্ষে বিদ্রোহী সিপাহীরা সেই প্রকার কল্পনাপ্রসূত সিপাহীদের চাইতে সম্পূর্ণ অন্য প্রকারের ছিল।[২] লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে যে, ডাঃ মজুমদার যেসব সমসাময়িক ভারতীয়দের উল্লেখ করেছেন, তাঁরা প্রায় সকলেই ছিলেন ইংরেজের চাকুরিয়া অথবা তাদের আশ্রিত। তারপর, ডাঃ মজুমদার তাঁর গ্রন্থের (পৃঃ ২৩৭) আর এক স্থলে বলেছেন, "বস্তুতঃ ১৮৫৭ সালে কিম্বা তার পূর্বে আমরা ভারতে কোনো জাতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম আশা করতে পারি না। কারণ জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেম, সঠিক অর্থে (in the true sense), আরও অনেক পরবর্তীকাল পর্যন্ত ভারতে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। ডাঃ মজুমদার তাঁর এই 'সঠিক অর্থ'টি যে কি বস্তু, তা কোথাও পাঠকদের কাছে ব্যাখ্যা করেননি। কিন্তু এ কথাটা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে ডাঃ মজুমদারের মতে, পূর্বে জাতীয়তাবাদের কোনো অস্তিত্ব ছিল না—তার জন্ম নেই, আরম্ভ নেই, বিকাশ নেই, উন্মেষ নেই, তার স্তর-ভেদ নেই, দেশ কাল পাত্র ভেদ নেই। একেবারে নিজের মনগড়াভাবে 'সঠিক অর্থে' তা একদিন হঠাৎ চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে; আর তা হলেই, ডাঃ মজুমদার তাকে জাতীয়তাবাদ ও স্বদেশপ্রেম বলে স্বীকার করে নেবেন!

১। কে': পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ১ম, পৃঃ ২৬৪।

২। রমেশচন্দ্র মজুমদার: "সিপয় মিউটিনি এণ্ড দি রিভোল্ট অব এইটিন্ ফিফটি সেভেন্" —পৃঃ ১৭৮।

যাই হোক, এখন পূর্ব প্রসঙ্গে আসা যাক। পীড়নের একটা চাপের মধ্যে এই প্রকার জাতীয় চেতনার উন্মেষের ফলে বেঙ্গল আর্মির সিপাহীদের মধ্যে সর্বত্র এক ঐক্যবোধ জেগে উঠল। পরস্পরের মধ্যে অবাধ মেলামেশার ফলে তাদের সামাজিক ও ধর্মীয় বৈষম্যগুলি ঘসামাজায় সমতল হয়ে গেল ও সিপাহীরা একটা নব আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠল। ১৮৫৭ সালে বেঙ্গল আর্মিতে কলকাতা থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত বিদ্রোহ যে এত দ্রুত প্রসার লাভ করতে পেরেছিল, তার একটা প্রধান কারণ হচ্ছে সিপাহীদের মধ্যে এই একাত্মবোধ ও জাতীয় চেতনার উন্মেষ।

ভারতবাসীদের মধ্যে এই নব চেতনা ও ঐক্যবোধই যে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের প্রধান শত্রু, তা এই দেশের কয়েকজন আলোকপ্রাপ্ত পণ্ডিতেরা না বুঝলেও ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী ভাল ভাবেই বুঝতে পেরেছিল। তাই তাদেরই একজন উচ্চ সামরিক অফিসার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জন কোক্ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে লিখেছিলেন ঃ

"বিভিন্ন বর্ণ (castes) ও ধর্মাবলম্বীদের একটা বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করলে তারা সংমিশ্রিত হয়ে একত্রিত হয়ে যায় ও একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করে। কিন্তু তাদের যদি বিভিন্ন বাহিনীতে রাখা হয় তা হলে এ রকম ফল হয় না। হিন্দু, মুসলমান ও শিখেরা পরস্পরের স্বাভাবিক (!) শত্রু; কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের এইরূপ দলে রাখার ফলে তারা সকলেই সরকারের বিরুদ্ধে হাত মিলিয়েছিল, শুধু তাই নয়, তারা হিন্দু ও মুসলমান জমিদারদেরও তাদের সঙ্গে যোগ দেবার জন্য উত্তেজিত করেছিল, যা করা কখনই সম্ভব হত না যদি বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের লোকগুলিকে বিভিন্ন দলে তফাত করে রাখা হত। সুতরাং, আমাদের কর্তব্য হচ্ছে যে, এই বিভিন্ন জাতি ও ধর্মগুলির (যার অস্তিত্ব আমাদের পক্ষে খুবই সৌভাগ্যের বিষয়) পরস্পরের মধ্যেকার পার্থক্যকে সম্পূর্ণভাবে বজায় রাখা ও তাদের সংমিশ্রণের সুযোগ না দেওয়া। 'বিভক্ত করা ও শাসন করা' এই হবে ভারত সরকারের নীতি।"

বিদ্রোহের পরবর্তীকালে কি ভাবে ভারতীয় সেনা বাহিনী পুনর্গঠিত হবে, তাই ছিল পীল কমিশনের বিচার্য বিষয়। পীল কমিশন রায় দিয়েছিলেন যে সিপাহীদের সংখ্যা অর্ধেক কমিয়ে দিতে হবে আর ইংরেজ সৈন্যের সংখ্যা দ্বিগুণ বাড়াতে হবে, যদিও একজন ইংরেজ পুষতে একজন সিপাহী থেকে ৪।৫ গুণ বেশী খরচ হয়; বিদ্রোহের পূর্বে যেখানে একজন ইংরেজ সৈন্যের অনুপাতে ৫ জন সিপাহী ছিল, সেই স্থানে এখন থেকে হবে ২ জন, বড় জোর ৩ জন সিপাহী; কামানগুলি থাকবে কেবলমাত্র ইংরেজ গোলন্দাজদের হাতে; প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে শক্তিশালী

ইংরেজ বাহিনী রাখতে হবে। ভারসাম্য রক্ষার জন্য এইটেই যথেষ্ট হল না। পাঞ্জাব কমিশনাররা বললেন (এবং সরকারও তা মেনে নিলেন) যে, "অধিক সংখ্যক ইংরেজ সৈন্যবাহিনী দিয়ে ভারসাম্য রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োগ করতে হবে আরও একটা ভারসাম্য রক্ষার ব্যাপার—সেটা হচ্ছে নেটিভদের বিরুদ্ধে নেটিভদের দিয়ে ভারসাম্য রক্ষা। 'সাধারণ সংমিশ্রণ' তত্ত্ব হিসেবে ভাল শোনালেও আমাদের খুব উপকারে লাগেনি। দেখা গিয়েছে যে বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের লোকদের এক সঙ্গে রাখলে তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলি বেশী দিন বজায় থাকে না। অন্যের প্রতি তাদের জাতিগত বিদ্বেষ ও বিরূপ মনোভাবগুলি দুর্বল হয়ে যায়, অবশেষে তারা একতন্ত্রী হয়ে পড়ে; তাদের মধ্যে সংঘর্ষ যাতে বেড়ে যায়—এই উদ্দেশ্য নিয়ে তাদের যে মিশ্রিত করা হয়েছিল—সেই উদ্দেশ্যই অনেক পরিমাণে ব্যর্থ হয়ে যায়। তাদের বৈশিষ্ট্যগুলি (যার ফলে এক প্রদেশের মুসলমানরা আর এক প্রদেশের মুসলমানদেরও ভয় ও ঘৃণা করে থাকে) বাঁচিয়ে রাখা নিতান্ত প্রয়োজন, এবং ভবিষ্যতে সিপাহী দলগুলি হবে প্রাদেশিক, যার মধ্যে দিয়ে অনৈক্য ও রেষারেষি তীব্রভাবে বেড়ে যাবে।"—(পীল কমিশনের সাপ্লিমেণ্টারী পেপার্স, পৃঃ ৩০)।

চীফ-অব-স্টাফ, জেনারেল ম্যানস্ফিল্ড আরও একধাপ এগিয়ে গিয়ে বললেন —"আমি দৃঢ়ভাবে মনে করি যে হিন্দু ও শিখদের সঙ্গে একই কোম্পানিতে কিম্বা একই বাহিনীতে মুসলমানদের রাখা উচিত হবে না, এবং হিন্দু ও শিখদেরও একই দলে মিশতে দেওয়া উচিত হবে না। প্রতি বাহিনীতে এই বিভেদগুলি অতিশয় যত্ন নিয়ে রক্ষা করতে হবে; আমি একথাও বলব যে বিভিন্ন দলগুলির মধ্যে রেষারেষি এবং এমন কি ঘৃণাও যাতে বেড়ে যায় তা দেখতে হবে। এই নীতির ফলে সিপাহীদের শৃঙ্খলা ভেঙে যাবে সে ভয়ের কোনো কারণ নেই; বরং এর ফলে আমাদের প্রতি সিপাহীদের নির্ভরতা অনেক পরিমাণে বেড়েই যাবে।"

দলমত নির্বিশেষে ইংরেজ শাসকরা সকলেই এই একই মত ব্যক্ত করলেন; এমন কি লর্ড এলফিনস্টোনের মতো একজন শিক্ষিত উদারনৈতিক লোকও এই মতে সায় দিলেন (—'পীল কমিশন রিপোর্ট', এপেণ্ডিক্স, পৃঃ ১৪)। মহাবিদ্রোহের পর থেকে ইংরেজ সরকার সচেতন ভাবে ও পরিকল্পনা করে যেমন ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে তেমনই সামরিক বিভাগে ভেদনীতি (Divide and Rule) চালু করতে শুরু করে দিলেন।

১৮৫৭-র বিদ্রোহ কেবলমাত্র সিপাহীদেরই একটা সামরিক বিদ্রোহ ছিল, কিম্বা এটি প্রকৃতপক্ষে গণবিদ্রোহ ও স্বাধীনতার যুদ্ধ ছিল,—এই প্রশ্ন নিয়ে ইংরেজ লেখকরা অনেক তর্কাতর্কি করেছেন। অবশেষে তাঁদের অধিকাংশই এই

মত ব্যক্ত করেছেন যে, এটা একটা সিপাহীদেরই সামরিক বিদ্রোহ ছিল, জাতীয় স্বাধীনতার সমর এ নয়।[১] এবং দুঃখের বিষয় যে কয়েকজন ভারতীয় ঐতিহাসিকও বিনা বিচারে এই মতই মেনে নিয়েছেন। কিন্তু অকাট্য যুক্তি ও তথ্য দ্বারা তাঁরা কেউই এই মত নিঃসংশয়তার সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। বরং আশ্চর্যের বিষয় এই যে তাঁরা যেসব তথ্য তাঁদের বইতে পরিবেশন করেন, তাতে পরিষ্কার ভাবেই প্রমাণ হয় যে, এই বিদ্রোহ ভারতীয় জনগণের স্বাধীনতার সংগ্রামই ছিল।

এই গণবিদ্রোহকে কেবলমাত্র সিপাহীদের একটা বাহিনীগত সামরিক বিদ্রোহ বলে প্রমাণ করবার প্রচেষ্টার পিছনে ইংরেজ শাসকদের একটা উদ্দেশ্য ছিল। সে সম্বন্ধে ইংরেজ লেখক নর্টনই বলেছেন যে: "যদি এটা কেবলমাত্র একটা সামরিক বিদ্রোহই হত, তা হলে তার প্রতিকারও সহজ, সরল ও পরিষ্কার হত; কিন্তু এটা যদি একটা জাতীয় বিদ্রোহ হয়, তা হলে তার প্রতিকার অতি কঠিন।"—('টপিক্স্ ফর স্টেটস্‌ম্যান', পৃঃ ৩)।

এই জাতীয় মহাবিদ্রোহ যে শুধু মাত্র সিপাহীদের একটা হাঙ্গামা ছিল, এই আত্মশান্তনাপূর্ণ মতটা প্রমাণ করার জন্য ইংরেজ লেখকরা এই যুক্তিগুলি দিয়ে থাকেন:

(ক) শিখরা ইংরেজের পক্ষে ছিল। এ কথা আধা সত্য, যা মিথ্যারই নামান্তর; পাতিয়ালা, নাভা, ঝিন্দ ও কাপুরতলার শিখ মহারাজারা—যারা দুটি শিখ যুদ্ধেই ইংরেজের পক্ষে ছিল এবং নিজেদের শিখ জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল—মাত্র তারা তাদের সৈন্যবাহিনী নিয়ে প্রথম থেকে বিদ্রোহীদের বিপক্ষে লড়েছিল। কিন্তু পাঞ্জাবের শিখ জনসাধারণ প্রথম দিকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও উদাসীন ছিল। ইংরেজ লেখকরা এ কথাও বারবার বলেছেন যে, সাধারণতঃ শিখদের মনোভাব ইংরেজদের বিপক্ষেই ছিল। যুদ্ধের শেষ দিকে পাঞ্জাবের সর্দারদের সাহায্যে কিছু সংখ্যক শিখদের তাদের সৈন্য-দলভুক্ত করতে পেরেছিল। তা ছাড়া, আর একটি সত্য এই যে, কিছু সংখ্যক শিখ বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়েছিল।

(খ) গোয়ালিয়র, ইন্দোর, বরোদা, হায়দরাবাদ ও রাজপুতনার রাজারা এই বিদ্রোহে যোগ দেননি। কিন্তু তাঁরা এই আসল সত্যটি ভুলে যান যে, গোয়ালিয়র ও ইন্দোর রাজাদের সৈন্যবাহিনী বিদ্রোহ করেছিল, গোয়ালিয়রের রাজাকে তাঁর রাজ্য ছেড়ে পালাতে হয়েছিল ও ইংরেজের আশ্রয় নিতে হয়েছিল, এবং উপরোক্ত

(১) "রিপোর্ট অব দি পীল কমিশন", পার্লিয়ামেণ্টারী পেপার্স, পৃঃ ২৭৯।

প্রত্যেকটি রাজ্যে বিদ্রোহী মনোভাবাপন্ন জনসাধারণকে দাবিয়ে রাখতে দেশীয় রাজাদের, ইংরেজের সম্পূর্ণ সাহায্য পাওয়া সত্ত্বেও, কম বেগ পেতে হয়নি। বস্তুতঃ, ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত জনসাধারণের সহানুভূতি যে সর্বত্র ইংরেজের বিরুদ্ধে ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিদ্রোহের অনুকূলে ছিল সে সম্বন্ধে প্রচুর তথ্য ফরেস্ট, কে', ম্যালিসন, চার্লস্ বল্, মণ্টোগোমারি, মার্টিন প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ ঐতিহাসিকদের বইগুলিতে ও সরকারী রিপোর্টগুলিতেই পাওয়া যায়।

ঐতিহাসিক তথ্য ও বাস্তবতাকে অস্বীকার করে মহাবিদ্রোহের কারণ সম্বন্ধে অনেকেই নানারকমের অদ্ভুত কথা বলে গিয়েছেন। যেমন ঔপনিবেশিক 'হিরো' জেনারেল স্যার জেমস্ আউটরাম বলেছেন যে, এই বিদ্রোহ ঘটেছিল মুসলমানদের চক্রান্তের ফলে, যারা হিন্দুদের অসন্তোষকে নিজেদের কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছিল। তিনি আরও বলেছেন ইংরেজরা, যে সমস্ত সামাজিক সংস্কার ও আধুনিক শিক্ষার প্রচলনের ব্যবস্থা করছিলেন, তার বিরুদ্ধে নেটিভরা বিদ্রোহ করেছিল। তাঁর মতে,—

"শিশু হত্যা, সতীদাহ নিবারণ, টিকা নেবার প্রথা প্রচলন, হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহ আইনসঙ্গত করা, কলেজে ভূতত্ত্ব, জ্যোতিষী বিজ্ঞানের সত্যগুলি প্রচার করা, মেডিক্যাল স্কুলে শবদেহ ব্যবচ্ছেদ করা, নারী শিক্ষা প্রচলনের ব্যবস্থা করা, ইত্যাদি বিষয়গুলি, যার দ্বারা আমরা মানুষের উপকার সাধন করছিলাম—এই সব উদারনৈতিক ব্যবস্থাগুলিকে হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের বিরুদ্ধে আক্রমণ বলে সিপাহীদের ও জনসাধারণকে ক্ষেপিয়ে তোলা হয়েছিল।"[১]

আউটরামের এই উক্তি যে কত বড় অসত্য তা সিভিল সার্ভিসের বেসামরিক এক উচ্চ ইংরেজ কর্মচারী, হবসন্ প্র্যাট, বলে গিয়েছেন। তিনি লণ্ডনের বিখ্যাত 'ইকনমিস্ট' (১৫ই অগাস্ট, ১৮৫৭) পত্রিকায় লিখেছিলেন : "সামাজিক সংস্কারের পক্ষে যে আন্দোলন, তা সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় সমাজেই শুরু হয়। ··· অনেক বৎসর ধরে খ্যাতিসম্পন্ন হিন্দুরা হিন্দু নারীদের বর্তমান দুরবস্থা সম্বন্ধে আন্দোলন করে আসছেন। বিধবাদের পুনর্বিবাহের আইন পাস করবার জন্য যে দরখাস্ত সরকারের নিকট করা হয়েছিল, তাতে যে কেবলমাত্র 'ইয়ং বেঙ্গলের' সভ্যরাই স্বাক্ষর দিয়েছিলেন তা নয়, হিন্দু ধর্মের প্রতি আস্থাবান অনেক পুরাতনপন্থী হিন্দুদেরও স্বাক্ষর ছিল। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই সংস্কার আন্দোলনের স্রষ্টা হচ্ছেন একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, যাঁকে তাঁর পবিত্র শাস্ত্রের গভীর জ্ঞানের জন্য সকল হিন্দুই

(১) লী ওয়ারনার : "ডালহাউসি," ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৫৫।

সর্বোচ্চ স্থান দিয়ে থাকেন।" প্র্যাট তারপর আরও বলেন যে, ১৮২৯ সালে সতী-দাহ নিবারণের আইন পাস হবার পর বিদ্রোহের সময় পর্যন্ত কোথাও সিপাহীরা কিম্বা জনসাধারণ এই আইনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেনি। সর্বশেষে প্র্যাট লিখেছেন: "সুতরাং আমরা বিশ্বাস করি যে সরকারের সামাজিক সংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ফলে বিদ্রোহ ঘটেছে এ কথা বলার কোনো ভিত্তি নেই।"

ইংরেজ শাসকরা তাদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের জন্য যে কোনো কোনো সময়ে এই ধরনের বাচালতা ও মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করবে তা স্বাভাবিক, কিন্তু যখন দেখা যায় যে, আত্মসম্মান ও সত্যনিষ্ঠা বর্জিত দু' একজন তথাকথিত ভারতীয় পণ্ডিত ও প্রভু এই অসত্য উক্তিগুলি নির্বিকারে তোতাপাখির মতো আওড়াতে থাকেন, তখন তাদের ক্ষমা করা কঠিন হয়ে পড়ে। জনৈক অধ্যাপক, ধর্ম ভান্ম, তাঁর মৌলিকত্ব দেখাবার জন্য বলেছেন যে, ১৮৫৭ সালের অভ্যুত্থান সিপাহীদের বিদ্রোহও নয়, স্বাধীনতার সমরও নয়; এটা ছিল কতকগুলি সাধারণ লোকের, কয়েকজন রাজার ও কিছু সিপাহীদের বিদ্রোহ—"যারা সকলেই নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ও নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে এই বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল। ...তাদের প্রত্যেকেই কেবলমাত্র নিজের লাভের কথা ভেবেছিল; কেউই সমষ্টিগত কর্মপন্থার জন্য চেষ্টা করেনি। ... এই বিদ্রোহ ঘটেছিল একটা সাময়িক বিদ্যুদ্‌বৎ কল্পনার দ্বারা, যে কল্পনা কয়েকজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও অসন্তুষ্ট লোকের মনে জন্ম গ্রহণ করেছিল।"[১]

যাই হোক, ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ যে সম্পূর্ণভাবে একটা জাতীয় বিদ্রোহই ছিল তা ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী কিন্তু ভাল ভাবেই জানতেন। বিদ্রোহ শুরু হবার কিছুকাল পরে ইংল্যাণ্ডের পার্লামেণ্ট বিদ্রোহের প্রাথমিক ও আশু কারণগুলি নির্ণয় করবার জন্য জেনারেল স্যার রবার্ট গার্ডিনারকে নিযুক্ত করেন। গার্ডিনার তাঁর রিপোর্টে (১৮৫৮) লিখেছিলেন: "ভারতের এই বিদ্রোহের দুটি চরিত্র দেখা যায়; প্রথমটির রূপ হল একটি জনসাধারণের বিদ্রোহ, আর দ্বিতীয়টির রূপ হল সিপাহীদের একটা সামরিক বিদ্রোহ। ... এই দুটি বিদ্রোহ মিশে গিয়ে একটা সামাজিক বিদ্রোহে পরিণত হল। সামরিক কারণের জন্যই এই বিদ্রোহ ঘটেনি; ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজ জাতিকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার জন্যই শক্তিশালী ব্যক্তিদের প্রতিনিধিদের প্ররোচনার ফলেই এই বিদ্রোহ ঘটেছিল।"[২] গার্ডিনার তার পরেই

১। "ইণ্ডিয়ান হিষ্টোরিকাল কোয়ার্টার্লি", ডিসেম্বর, ১৯৫২।

২। জেনারেল স্যার রবার্ট গার্ডিনার: "মিলিটারি এনালিসিস্ অব দি রিমোট এণ্ড প্রক্সিমেট কজেস্ অব দি ইণ্ডিয়ান রিবেলিয়ান," পৃঃ ১৩।

বলছেন, "ভারতের জনসাধারণের ইংরেজদের প্রতি অন্তর্নিহিত ঘৃণা যে স্বভাবতই সিপাহীদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছিল তা পরিষ্কার হয়ে গেল বিদ্রোহের এরূপ আকস্মিক বিস্ফোরণে ও তার ভয়ঙ্কর প্রতিহিংসাপরায়ণ আক্রোশের দ্বারা। ••• সারা ভারতবর্ষে নিপীড়িত পরাধীনতার সর্বব্যাপী একটা অনুভূতি জেগে ওঠার জন্যে সাধারণভাবে সকলেই আমাদের উচ্ছেদ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে দাঁড়িয়েছিল ; এবং অন্ধ ক্রোধের বশবর্তী হয়ে প্রচণ্ডভাবে এই সম্মিলিত সামাজিক ও সামরিক বিদ্রোহ বজ্রাঘাতের মতো আমাদের উপর পতিত হল।"[১]

গভীর জাতীয় সংকট মুহূর্তে সৈন্যদের বিদ্রোহ যে জাতীয় বিদ্রোহের সঙ্গে একই সূত্রে বাঁধা পড়ে যায়, পৃথিবীর ইতিহাসে তার উদাহরণের অভাব নেই। সিপাহীরা জনসাধারণের একটা অংশ বিশেষ, তার তাৎপর্য জেনারেল ব্রিগস্ বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি ভারতীয় সিপাহীদের সম্বন্ধে পার্লামেন্টে বলেছিলেন, "কৃষক শ্রেণী হতে সিপাহীদের নেওয়া হয়। কৃষকদের কতকগুলি অধিকার আছে, এবং যদি এই অধিকারগুলিকে লঙ্ঘন করা হয়, তা হলে সৈন্য-বাহিনীর বিশ্বস্ততার উপর আর নির্ভর করা যায় না। আমাদের ক্ষমতাকে রক্ষা করার জন্য ২,৫০,০০০ সিপাহীর একটা ভারতীয় বাহিনী আছে এবং এই বাহিনীর বিশ্বস্ততার উপরই আমাদের রাজত্ব নির্ভর করে। কিন্তু এটা তোমরা নিশ্চয় জেনে রেখো যে, তোমরা যদি ভারতীয় জনগণের অধিকারগুলি খর্ব করতে থাক, সিপাহী বাহিনী জনসাধারণের প্রতিই সহানুভূতি দেখাবে, কারণ তারা হল জনগণেরই একটা অংশ। তোমরা যখনই মানুষের যে কোনো অধিকারকে লঙ্ঘন কর, জেনে রেখো যে তখনই তোমার সৈন্যবাহিনীর সিপাহীদের নিজেদের অধিকারে, অথবা তাদের পুত্রদের, পিতাদের, আত্মীয়স্বজনের অধিকারে হস্তক্ষেপ করছ। যে মুহূর্তে সিপাহী বাহিনীর বিশ্বস্ততা ভেঙে পড়বে, সেই মুহূর্তে আমাদের ক্ষমতার অবসান ঘটবে।"—(ঐ, পৃঃ ২৯-৩০)।

এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ ভারতীয় জনসাধারণের জাতীয় বিদ্রোহ ছিল, যদিও আংশিক ভাবে এটি সিপাহীদেরই বিদ্রোহ ছিল, এবং যদিও সিপাহীরাই এই বিদ্রোহে অধিকাংশ স্থলে তার পুরোভাগে ছিল। সৈন্যদের কতকগুলি নিজস্ব দাবিদাওয়ার উপর ভিত্তি করে সামরিক বিদ্রোহ ঘটে, যেমন বেতন বৃদ্ধি, ভাতা, সৈন্য বিভাগীয় অব্যবস্থা ইত্যাদি। সামরিক বিদ্রোহের লক্ষ্য সীমাবদ্ধ ; বিদ্যমান সরকারকে উচ্ছেদ করা তার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু যখন সৈন্যরা বিদ্যমান সরকারকে ধ্বংস করবার

১। গার্ডিনারের পূর্বোক্ত গ্রন্থ : পৃঃ ১৭।

জন্য ও তার স্থানে একটা নতুন সরকার স্থাপনের জন্য জনসাধারণের বিদ্রোহের সঙ্গে সামিল হয়ে যায়, তখন এই সৈন্য-বিদ্রোহ জাতীয় বিদ্রোহের সঙ্গে মিশে যায় ; ১৮৫৭ সালে ভারতেও ঠিক তাই ঘটেছিল।

এই বিদ্রোহে আর একটি দ্রষ্টব্য বিষয় হচ্ছে এই যে, অনেক স্থানে জনসাধারণই বিদ্রোহের পুরোভাগে ছিল। এই সব ক্ষেত্রে সাধারণ বিদ্রোহ ঘটে যাবার পর সিপাহীরা বিদ্রোহে যোগ দেয়। "অসন্তোষ ও চাঞ্চল্য সাধারণ মানুষের মধ্যে সর্বত্র এতই বিস্তার লাভ করেছিল যে অনেক ক্ষেত্রে সিপাহীরা বিদ্রোহে যোগ দেবার অনেক পূর্বেই সাধারণ অধিবাসীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। এমন কি গ্রামগুলিতে পর্যন্ত এই অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়েছিল, এবং বিদ্রোহের জন্য মানুষের মনকে প্রস্তুত করে রেখেছিল।"[১]

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল এই যে, ভারতের একটি বিস্তৃত অংশে, প্রায় সারা উত্তর ভারতে ও মধ্য ভারতে—রাজা, জমিদার, শহরবাসী, ব্যবসায়ী ও কৃষক প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকই এই বিদ্রোহে স্বেচ্ছায় ও অধিক সংখ্যায় যোগ দিয়েছিল। এডোয়ার্ড টমসন্ তাই ঠিকই বলেছেন যে, ভারতের এই স্বাধীনতার যুদ্ধে "এতগুলি বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের সম্মিলিত সমাবেশ হয়েছিল যে পূর্বে আর কোনো বহিরাগত বিজেতার বিরুদ্ধে এতগুলি শক্তির বিন্যাস ঘটেনি।"[২] তাই এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে ১৮৫৭ সালের ভারতীয় বিদ্রোহে জাতীয় বিদ্রোহের সর্বপ্রকারের রূপগুলিই বিদ্যমান ছিল।

১। "অক্সফোর্ড হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়া", পৃঃ ৭২২-২৩।

২। এডোয়ার্ড টমসন : "এ হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়া," পৃঃ ৭০

মহাবিদ্রোহের সূচনা

১৮৫৭ সনের জাতীয় বিদ্রোহের স্থচনা হয় বাংলা দেশেই। এই বৎসরের শুরুতে ভারতের বৃটিশ শাসকশ্রেণী ভাবতেই পারেনি যে তাদের শীঘ্রই একটা অতি ভয়ঙ্কর বিপদের সম্মুখীন হতে হবে। যদিও দেশের জনসাধারণের মনে অসন্তোষের অভাব ছিল না, তবু ভারতের রাজনৈতিক আকাশে তখনও কোনো প্রকারের মেঘ ঘনীভূত হয়ে ওঠেনি। স্থতরাং ইংরেজদের মধ্যে বিশেষ কোনো দুঃশ্চিন্তাও ছিল না।

সরকার তখন ব্রাউন বেস্ বন্দুকের জায়গায় নতুন এন্‌ফিল্ড বন্দুক সিপাহীদের মধ্যে প্রচলন করবার ব্যবস্থা করছিল। এই এন্‌ফিল্ড বন্দুক পুরাতন বন্দুকের তুলনায় অনেক উৎকৃষ্ট, এর গুলীর পরিসর বেশী, আর তা ছাড়া ওজন কম হওয়ার জন্য তা বহন করা সৈন্যদের পক্ষে কম কষ্টসাধ্য। এমন একটি উন্নততর অস্ত্র ব্যবহার করতে পারবে জেনে সিপাহীদের মন খুশী হয়ে উঠেছিল।

দমদম, মিরাট ও আম্বালা—এই তিন জায়গায় এন্‌ফিল্ড রাইফেল চালনার শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হল। শিক্ষার কাজ ভাল ভাবেই চলতে লাগল। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যে একটা বিষয়ে সিপাহীদের মনে সন্দেহ দেখা দিল। এই এন্‌ফিল্ড বন্দুকের গুলী ছিল এক রকম চর্বি মিশ্রিত কাগজে মোড়া; বন্দুক ব্যবহার করতে হলে কাগজটা আগে দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ফেলতে হত। এই কাগজ দেখে সিপাহীদের মনে সন্দেহ জাগল যে, এটা নিশ্চয়ই শুয়োর ও গরুর চর্বি দ্বারা মিশ্রিত, যা হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের পক্ষেই মুখে লাগানো তো দূরের কথা, ছোঁওয়া পর্যন্ত ঘোরতর পাপ।

চর্বি মিশ্রিত টোটা ইংল্যাণ্ড থেকে ১৮৫৩ সালে ভারতবর্ষের সৈন্যবাহিনীতে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছিল। বাংলা সৈন্যদলের এডজুটাণ্ট জেনারেল কর্নেল

টাকার এই টোটা দেখেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, এগুলি সিপাহীদের মধ্যে ভয়ানক উত্তেজনার সৃষ্টি করবে। তিনি তখনই তাঁর ঊর্ধ্বতন অফিসারদের কাছে একটি সাবধানতাসূচক চিঠি লিখলেন। কিন্তু এই চিঠি মিলিটারি বোর্ডের অবহেলায় ধামাচাপা হয়ে পড়ে রইল, উপরতলায় আর পৌঁছল না। পরে দমদম ও মিরাটে এই টোটা তৈরি করার কারখানা খোলা হল[১] এবং ধীরে ধীরে সিপাহীদের মধ্যে এর প্রচলনের ব্যবস্থা চলতে থাকল। এই টোটা সিপাহীদের কাছে যাতে সহজে গ্রহণযোগ্য হয় তার জন্য সরকার এমন আদেশও জারী করল যে, টোটার কাগজ দাঁতে না কেটে হাত দিয়ে ছিঁড়ে তারা বন্দুকে ব্যবহার করতে পারবে। সরকারের এই রকম গোঁজামিল দেবার চেষ্টা দেখে সিপাহীদের সন্দেহ আরও বেড়ে গেল। তা ছাড়া, তারা জানত যে, কাজের সময় টোটার কাগজ হাতে ছিঁড়ে বন্দুকে দিতে অনেক সময়ের প্রয়োজন, দাঁত দিয়েই তা তাদের কাটতে হবে। হিন্দু-মুসলমান সব সিপাহীরই জাতিধর্ম সংক্রান্ত এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটির কোনো মীমাংসাই হল না। তাই সিপাহীদের মধ্যে অসন্তোষ বেড়েই চলল। ঠিক এই অবস্থায় দমদমে একদিন বারুদখানার একজন নিম্নজাতীয় খালাসী জল পান করবার জন্য একটি ব্রাহ্মণ সিপাহীর কাছে তার লোটা চেয়ে বসল। সিপাহী তার লোটা দিতে অস্বীকার করাতে খালাসীটি উদ্ধত ভাবে উত্তর দিল: "তুমি তোমার জাত নিয়ে তো খুব গর্ব করছ। কয়েকদিন সবুর কর, সাহেবরা যে শুয়োর ও গরুর চর্বি দিয়ে টোটা তৈরি করছে, তা যখন দাঁত দিয়ে কাটতে হবে, তখন দেখব তোমাদের জাত কোথায় থাকবে?"[২] খালাসীর এই রূঢ় বাক্য এক ব্যারাক থেকে আর এক ব্যারাকে, এক স্থান থেকে আর এক স্থানে, দেখতে দেখতে সমস্ত দেশময় ছড়িয়ে পড়ল। এই ভাবে টোটার প্রশ্নটি সাধারণ লোকের মধ্যে, বিশেষ করে সিপাহীদের মধ্যে, প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়াল এবং সারা ভারতবর্ষব্যাপী একটা উত্তেজনা ও আশঙ্কার সৃষ্টি করল।

১। কে' বলেন যে, ১৮৫৬ ও ১৮৫৭-র জানুয়ারিতে কলকাতা ও মিরাটে যেসব টোটা প্রস্তুত হয়েছিল তাতে গরুর চর্বি মিশ্রিত ছিল, কিন্তু শুয়োরের চর্বি ছিল না।—("হিস্ট্রি অব সিপয় ওয়ার ইন ইণ্ডিয়া, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫১৯)। এবং লর্ড রবার্ট আরো খোলাখুলি স্বীকার করেন যে, এই টোটা গরু এবং শুয়োর উভয়ের চর্বি মিশ্রিত ছিল (ঐ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৩১-৩২)। ভারনম্ বার্টলেট্ও বলেন: "দুঃখের বিষয় যে উলউইচে (ইংল্যাণ্ডে) অস্ত্রাগারে টোটা তৈরি করবার জন্য এই চর্বি ব্যবহার করা হয়েছিল, কিন্তু ভারতবর্ষে এই কথা অস্বীকার করা হয়েছিল।"—('ইণ্ডিয়া', পৃঃ ১৩১)।

২। ফরেষ্ট: "ষ্টেট পেপারস" ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৫।

এই ঘটনা লেফটেনান্ট রাইট তার উর্ধ্বতন অফিসার মেজর বন্‌টিন্‌কে ২২শে জানুয়ারিতে রিপোর্ট করেন এবং তাতে সিপাহীদের মধ্যে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হচ্ছে তাও তিনি জানালেন। মেজর বন্‌টিন্‌ও তাঁর উর্ধ্বতন কর্মচারী প্রেসিডেন্সী ডিভিসনের সৈন্যাধ্যক্ষ জেনারেল হিয়ার্সেকে জানালেন। ২৪শে জানুয়ারি হিয়ার্সে এই সংবাদ একটা 'অত্যন্ত জরুরী' মার্কা খামে করে কলকাতায় এডজুটান্ট জেনারেলের অফিসে পাঠালেন। কিন্তু এবারও কর্তৃপক্ষ এই গুরুতর অভিযোগের প্রতিকারের জন্য কোনো ব্যবস্থাই অবলম্বন করলেন না।

২৮শে জানুয়ারি হিয়ার্সে আবার সরকারকে লিখলেন যে—"মতলববাজ কতকগুলি লোক, খুব সম্ভব ব্রাহ্মণ কিম্বা কলকাতার কোনো হিন্দু পার্টির প্রতিনিধি[1] একটা গুজব রটাচ্ছে যে, সিপাহীদের জোর করে খৃষ্টান করা হবে; তার আগে তাদের জাত নষ্ট করা হবে; সেইজন্যই এন্‌ফিল্ড বন্দুকের টোটার কাগজও শুয়োর ও গরুর চর্বি দ্বারা তৈরী। এই চিঠিতে হিয়ার্সে আরও লিখলেন যে, এই সব 'ভিত্তিহীন আজগুবী গুজব' না হয় উপেক্ষা করা যেত, কিন্তু "রানীগঞ্জে একজন সার্জেন্টের বাংলোতে আগুন ধরিয়ে দেওয়ায় (২য় সিপাহী বাহিনীর একটি অংশ ঐ স্থানে আছে) এবং টেলিগ্রাফ অফিস সমেত আরও এইরূপ তিনটি অগ্নিকাণ্ড গত চারদিনের মধ্যে এই ব্যারাকপুরে ঘটে যাওয়াতে ··· আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে অসন্তুষ্ট সিপাহীদের দ্বারাই এই অগ্নিকাণ্ড ঘটছে।"—(ফরেস্ট : স্টেট পেপার্স—১ম, পৃঃ ৪)

জানুয়ারি মাস শেষ হতে না হতে এই ভাবে টোটার প্রশ্নটাই সবচেয়ে গুরুতর প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াল। ভারতের প্রতিটি সিপাহী ব্যারাকে, বাজারে ও অন্যান্য স্থানে ব্যারাকপুর থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত আন্দোলন শুরু হল। সিপাহীদের মধ্যে অনেকে আরও সক্রিয়ভাবে ইংরেজ অফিসারদের বাংলোতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু করে দিল। এই অগ্নিকাণ্ড শুধু ব্যারাকপুরেই সীমাবদ্ধ রইল না; আম্বালা ও অন্যান্য স্থানেও ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

১। সাম্প্রদায়িক মনোভাব নিয়ে কি ভাবে যে ইংরেজ অফিসাররা ভারতীয় সিপাহীদের মধ্যে ঐ সময় থেকেই কাজ করেছিলেন, হিয়ার্সের এই উক্তি তার একটি প্রমাণ। মঙ্গল পাণ্ডের বিচারের সময় প্রমাণ হয়েছিল যে অযোধ্যার নবাব, রাজা মানসিংহ প্রভৃতির প্রতিনিধিরা কোনো কোনো সিপাহী অফিসারদের সঙ্গে এই সময় যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন। অর্থাৎ এই আন্দোলনে হিন্দু-মুসলমান উভয়েই প্রথম থেকে সমানভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।—(ফরেষ্ট : "ষ্টেট পেপার্স," ১ম খণ্ড, ১৫৫-১৫৯)।

বিভিন্ন স্থানের অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য লক্ষ্য করার আছে—একই পদ্ধতিতে ইংরেজদের বাংলোগুলিতে আগুন লাগানো হচ্ছিল। তীরের মুখে একটা কাপড়ের টুকরো জড়িয়ে তাতে তেল ঢেলে আগুন ধরিয়ে ধনুক দিয়ে বাংলোতে ছুঁড়ে মারা হত। কে' উল্লেখ করে গেছেন যে, সাঁওতাল বিদ্রোহের সময় ২য় গ্রেনাডিয়ের বাহিনীর সিপাহীরা সাঁওতালদের কাছ থেকে এই পদ্ধতি শিখেছিল।

সিপাহীদের মধ্যে টোটার জন্য এত অসন্তোষের কারণ নির্ণয় করার উদ্দেশ্যে ৬ই ফেব্রুয়ারিতে একটি সামরিক আদালতের অধিবেশনে বহু সিপাহীকে প্রশ্ন করা হয়। সকলেই তখন খোলাখুলি ভাবে দৃঢ়তার সঙ্গে বলে যে, এই টোটা অত্যন্ত সন্দেহজনক চর্বি দ্বারা তৈরী এবং তা তারা কিছুতেই ব্যবহার করবে না। সামরিক আদালতের ইংরেজ অফিসাররা সিপাহীদের অনেক আশ্বাস দিলেন যে, টোটার কাগজে কোনো রকম সন্দেহজনক চর্বি নেই, এবং এটা একটা সাধারণ কাগজ ব্যতীত আর কিছু নয়, ইত্যাদি। কিন্তু এই মিথ্যা স্তোকবাক্যে সিপাহীরা ভুলল না। হাবিলদার অযোধ্যা সিং আদালতের কাছে স্বীকার করলেন যে, টোটা ব্যবহার করতে যদিও তাঁর নিজের কোনো আপত্তি নেই, তা হলেও তিনি "তা করতে পারবেন না; তার কারণ, অন্য সিপাহীরা তাতে ঘোরতর আপত্তি করবে।"[১] আদালত স্পষ্টই বুঝতে পারল যে টোটার বিরুদ্ধে সকল সিপাহীই একমত এবং দু' একজন সিপাহী-অফিসারের ইচ্ছে থাকলেও এই ব্যাপারে সাধারণ সিপাহীদের মতের বিরুদ্ধে যেতে সাহস করবে না। হিয়ার্সের মতে, এই রকম সংকটের সময় সিপাহী-অফিসাররা সরকারের পক্ষে অকেজো হয়ে যায়। তিনি লিখলেন: "বাস্তব সত্য হচ্ছে এই যে, তারা তাদের সিপাহীদের অত্যন্ত ভয় করে এবং কোনো কাজ করতে সাহস করে না। এইরূপ সংকটের অবস্থায় সব সময়েই এই রকম ঘটেছে, এবং আমাদের রাজত্ব যতদিন থাকবে ততদিন এই রকমই ঘটবে। স্যার চার্লস্ মেটকাফ্ ঠিকই বলেছিলেন যে, তিনি একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখবেন যে ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্ব আর নেই।"—(ফরেস্ট—'স্টেট পেপার্স', পৃঃ ২৭)।

এই আদালতের সমস্ত তথ্য বিচার করার পর জেনারেল হিয়ার্সে সরকারকে লিখলেন যে, যে কোনো কারণেই হোক টোটা যে শুয়োর ও গরুর চর্বি দ্বারা তৈরী —এই ধারণা সিপাহীদের মনে একেবারে বদ্ধমূল হয়ে দাঁড়িয়েছে, "এই অবস্থায়, আমার মতে, এই ধারণা দূর করার চেষ্টা করা একেবারে বৃথা ও নিতান্ত নির্বোধের

১। ফরেষ্ট: "ষ্টেট পেপার্স", ১ম, পৃঃ ৯।

কাজ হবে।" হিয়ার্সে তারপর সুপারিশ করলেন যে, "পূর্বে মাস্কেট বন্দুকের জন্য যে রকম টোটার কাগজ তৈরী হত, যদি সম্ভব হয় নতুন বন্দুকের জন্যও তদনুরূপ কাগজ তৈরীর ব্যবস্থা অবলম্বন করার হুকুম দেওয়া হোক। এই উপায়ের দ্বারাই সিপাহীদের ভিত্তিহীন সন্দেহ ও তাদের আপত্তি শীঘ্র দূর করা সম্ভব হবে।"[১]

সরকার কিন্তু জেনারেল হিয়ার্সের পরামর্শ মতো কাজ করলেন না এবং নিজেরাও অন্য কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন না। সিপাহীদের মধ্যে অসন্তোষ যতই বেড়ে যেতে লাগল, সংকট দিনের পর দিন ততই ঘনীভূত হতে থাকল। এই বিপদজনক অবস্থাটা বুঝতে পেরে হিয়ার্সে ১১ই ফেব্রুয়ারি আবার সরকারকে লিখলেন: "আমরা একটা প্রকাণ্ড বিস্ফোরক বোমার উপর বাস করছি—তার যে কোনো মুহূর্তে বিস্ফোরণ হতে পারে।"[২]

ইতিমধ্যে ব্যারাকপুরের সিপাহীরা গোপনে মিটিং করে তাদের কর্মপন্থা আলোচনা শুরু করে দিয়েছে। ৫ই ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যার পর জমাদার দুর্লভ ঐ স্থানের কমাণ্ডিং অফিসার ব্রিগেডিয়ার গ্র্যাণ্টকে গিয়ে খবর দিল যে, ৩০০ সিপাহী ঐ সময় প্যারেড গ্রাউণ্ডে সভা করছে। পরের দিন আবার আর একজন সিপাহী-অফিসার রামসহায় লালা লেফটেনাণ্ট এ্যালেনকে রিপোর্ট করল যে, সিপাহীদের প্রতিনিধিরা একটা গুপ্ত বৈঠকে বসে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র করছে; কি ভাবে সিপাহীরা প্রথমতঃ ব্যারাকপুর দখল করবে, তারপর তারা কলকাতায় মার্চ করে যাবে ও ফোর্ট উইলিয়াম ও ট্রেজারি দখল করবে—এই সমস্ত খবর দিয়ে লালা বলল যে, প্রত্যেক রেজিমেণ্টের ৮ জন করে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে আবার ঐ রাত্রেই আর একটা সভা হবে। উক্ত সিপাহী আরও জানালে যে, ইলেকৃট্রিক্ টেলিগ্রাফের তার পুড়িয়ে দেওয়া এই ষড়যন্ত্রেরই একটা অংশ, যার ফলে বিদ্রোহের সংবাদ সরকার তাড়াতাড়ি কোথাও না পাঠাতে পারে। এবং সিপাহীরা আরও ঠিক করেছে যে, অন্যান্য স্থান থেকে বৃটিশ গোলন্দাজ বাহিনী এসে তাদের পরিকল্পনা পণ্ড করে দেবার আগেই তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করবে।[৩]

এই ভাবে ব্যারাকপুরের সিপাহীরা বিদ্রোহের জন্য যখন প্রস্তুত হচ্ছে, তখন সরকার তাদের মিলিত চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেবার জন্য সিপাহীদের কোনো একটা বিশেষ কাজ দিয়ে বাংলার বিভিন্ন স্থানে পাঠিয়ে দিতে লাগল। এর ফলে যদিও বা ব্যারাকপুরের বিদ্রোহের প্রচেষ্টা কিছুদিনের মতো স্থগিত রইল, কিন্তু বাংলার অন্যান্য স্থানে বিদ্রোহ-পরিকল্পনার জাল রীতিমতো বিস্তৃত হতে লাগল।

১। ফরেষ্ট: "ষ্টেট পেপার্স", ১ম, পৃঃ ৭। ২। ঐ, পৃঃ ২৪; ৩। ঐ পৃঃ ১৭-১৮।

ব্যারাকপুরে অবস্থিত ৩৪শ সিপাহী বাহিনীর দুটি অংশ ১৮ই ও ২৫শে ফেব্রুয়ারিতে এই ভাবে বহরমপুরের শিবিরে এসে পৌঁছল। এই সময় ১৯শ সিপাহী বাহিনী বহরমপুরে অবস্থান করছিল। বৃটিশরা যখন অযোধ্যা দখল করে তখন ১৯শ ও ৩৪শ—এই বাহিনী দুটি লক্ষ্ণৌ শহরে একই শিবিরে থাকত। অন্যান্য স্থানের মধ্যে বহরমপুরের সিপাহীরাও টোটা সম্বন্ধে খুব উত্তেজিত হয়েছিল। ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম দিকে ১৯শ বাহিনীর একজন হাবিলদার তাদের কমাণ্ডিং অফিসার কর্নেল মিচেলকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, টোটা সম্বন্ধে যেসব কথা প্রচারিত হচ্ছে তা সত্য কি না? "এটা একটা মিথ্যা গুজব" এই বলেই কর্নেল মিচেল তাঁর কর্তব্য শেষ করেছিলেন। কিন্তু এখন তাদের পুরাতন বন্ধু ও সাথী ব্যারাকপুরের সিপাহীদের কাছ থেকে বহরমপুরের সিপাহীরা সমস্ত খবর জানতে পারল। ফলে ইংরেজদের প্রতি তাদের ঘৃণা ও বিদ্বেষ আরও প্রবল হয়ে উঠল।

২৬শে ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যার সময় মিচেল হঠাৎ হুকুম করলেন যে, পরদিন সকালে ১৫ রাউণ্ড গুলী নিয়ে ১৯শ বাহিনীকে প্যারেড করতে হবে। কিছুক্ষণ পরে যখন 'ক্যাপ' বিতরণ শুরু হল, সিপাহীরা তখন তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করল। সিপাহীরা জানত যে কিছুদিন পূর্বেই অনেকগুলি নতুন টোটা কলকাতা থেকে বহরমপুরে পৌঁছেছে এবং ঐদিন বিকেলে যে কতকগুলি টোটা বারুদখানা থেকে বার করা হয়েছে তাও কয়েকজন সিপাহী দেখেছে।

সিপাহীরা 'ক্যাপ' নিতে অস্বীকার করেছে শুনে কর্নেল মিচেল তৎক্ষণাৎ এসে হাজির হলেন। সিপাহী-অফিসারদের ডেকে বললেন, "তোমরা যদি টোটা না নাও, তা হলে আমি তোমাদের বর্মা ও চীনে নিয়ে যাব। সেখানে অতি কষ্টের মধ্যে তোমাদের সকলকে মরতে হবে (If you do not take the cartidges, I will take you to Burma and China where through hardship you will all die.)।"[১] এই ভাবে সিপাহীদের ভয় দেখিয়ে ইংরেজ বীরপুরুষটি চলে গেলেন। কিন্তু মিচেলের উদ্ধত বাক্যে সিপাহীরা ভয় পাবার পরিবর্তে বরং ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। চক্ষের নিমেষে তারা বারুদখানা আক্রমণ করে তার দরজা ভেঙে মাস্কেট বন্দুক ও তার টোটা নিয়ে তাদের লাইনে চলে গেল। এ ঘটনা যখন ঘটল তখন প্রায় মধ্যরাত্রি।

এদিকে মিচেল তাঁর বাংলোতে ফিরে গিয়ে অশ্বারোহী ও গোলন্দাজদের নিয়ে তৈরী হয়ে বসেছিলেন। সিপাহীদের বিদ্রোহমূলক কাজের খবর পেয়েই আবার তিনি তাঁর লোকজন ও কামান নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন। সিপাহী-

১। ফরেষ্ট: "ষ্টেট পেপার্স," পৃঃ ৯১।

অফিসারদের সামনে ডেকে তিনি আদেশ দিলেন—এখনি সিপাহীদের অস্ত্র সমর্পণ করতে বল। সিপাহী-অফিসাররা জানালেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না অশ্বারোহী ও গোলন্দাজরা কামানগুলি ওখান থেকে সরিয়ে নিচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত সিপাহীরা অস্ত্র কিছুতেই সমর্পণ করবে না; আর যদি তা করা হয় তা হলে তারা শান্তভাবে তাদের লাইনে ফিরে যাবে।[১] মিচেল যদি তখন আবার কোনো রকমের ঔদ্ধত্য প্রকাশ করত, তা হলে এক মুহূর্তে সমগ্র বাংলা দেশে সেদিন আগুন জ্বলে উঠত। কিন্তু মিচেল ভয়েই হোক আর চাতুর্যেই হোক, তাঁর লোকজন ও কামান নিয়ে আস্তে আস্তে চলে গেলেন, সিপাহীরাও তাদের লাইনে ফিরে গেল। এই সময় সিপাহীদের সংখ্যা ছিল ৮০০, আর মিচেলের সঙ্গে ছিল মাত্র ২০০ গোলন্দাজ ও অশ্বারোহী। তা ছাড়া, এই অশ্বারোহীরা প্রায় সকলেই ছিল ভারতীয় সিপাহী, যাদের রাজভক্তি সম্বন্ধে মিচেলের যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। এই অবস্থায় বিদ্রোহোন্মুখ সিপাহীদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ না করে সম্ভবতঃ পৃষ্ঠপ্রদর্শন করাই শ্রেয় বলে মিচেল মনে করেছিলেন।

বহরমপুরের এই ঘটনা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এরই মাত্র দু' মাইল উত্তরে স্বাধীন বাংলার পুরাতন রাজধানী মুর্শিদাবাদ। একশত বৎসর পূর্বে মুর্শিদাবাদ যে ভারতের অন্যতম সমৃদ্ধিশালী শহর ছিল তা আর এক স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। স্বাধীন বাংলার নবাবের বংশধর নবাব নাজিম ফেরেদুন ঝা (সৈয়দ মনসুর আলি খাঁ) এই শহরে তখন বাস করছিলেন। বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে তাঁর অসন্তুষ্টির কারণ ছিল যথেষ্ট। প্রথমতঃ, তাঁর ভাতা ১৬ লক্ষ টাকা থেকে কমিয়ে ১২ লক্ষ করা হয়েছিল। তা ছাড়া, তিনি যে সমস্ত অধিকার ভোগ করতেন বৃটিশ সরকার তার কতকগুলি খর্ব করে দিয়েছিলেন, যেমন, দেওয়ানি আদালতে উপস্থিত না হওয়ার অধিকার লুপ্ত করে দেওয়া হয়েছিল; তাঁর সম্মানার্থে ১৯টি তোপ ধ্বনির বদলে ১৩টির ব্যবস্থা করা হল। এই ব্যাপারে অবশ্য তখনকার বাংলার লেফটেনাণ্ট গভর্নর স্যার ফ্রেডারিখ্ হ্যালিডে খুশী হয়ে তাঁর রিপোর্টে লিখেছিলেন যে, নবাব এত অপমানিত হওয়া সত্ত্বেও "বিদ্রোহের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি যথাসাধ্য রাজভক্তির সহিত নিজেকে পরিচালিত করেছিলেন। তিনি সর্বতোভাবে আমাদের সাহায্য করেছিলেন; তা ছাড়া, আমাদের কি আবশ্যক না আবশ্যক আমরা বলবার আগেই তিনি তা নিজে থেকে অনুমান করবার জন্য সব সময় প্রস্তুত থাকতেন।"—('বেঙ্গল গেজেটিয়ার', মুর্শিদাবাদ, পৃঃ ৯৬)।

১। ফরেষ্ট; "ষ্টেট পেপার্স," পৃঃ ৯০।

একশত বৎসরের ইংরেজ শাসন ও শোষণের ফলে মুর্শিদাবাদের পুরাতন গৌরব ও ঐশ্বর্য বিনষ্ট হয়েছিল ও তার ফলে সেখানকার জনসাধারণের দুঃখ-দৈন্যেরও অন্ত ছিল না। এই অবস্থায় নবাবের একটি কথাতেই তারা যে বিদ্রোহী সিপাহীদের পাশে এসে দাঁড়াত তাতে সন্দেহ ছিল না। কে' এই সম্বন্ধে লিখেছেন যে, "শহরে হাজার হাজার লোক ছিল যারা নবাবের নির্দেশে বিদ্রোহ ঘোষণা করত ; এই ব্যক্তিটি নিজে যদিও দুর্বল ছিলেন, কিন্তু তাঁর পিছনে ছিল একটা গৌরবময় শক্তিশালী নামের জোর।"[১]

বাংলার হৃত গৌবব ফিরিয়ে আনবার ও বিদেশী শাসকদের হাত থেকে মুক্ত হয়ে নিজের ও বংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবার এই সুবর্ণসুযোগ মুর্শিদাবাদের নবাব গ্রহণ করলেন না। সিরাজউদ্দৌল্লার সিংহাসনে বসেও তিনি মীরজাফরের অমানুষোচিত পথই বেছে নিলেন। তাঁর কাছ থেকে কোনো প্রকার নির্দেশ না পেয়ে মুর্শিদাবাদের জনসাধারণ ২৬শে ফেব্রুয়ারি রাত্রিতে শান্ত ভাবেই কাটাল। তাঁর মুখ থেকে একটি কথা, কিম্বা সামান্য একটুখানি ইঙ্গিতেই সর্বভারতীয় প্রথম সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম সেই স্থান থেকেই শুরু হতে পারত যেখানে একশত বৎসর পূর্বে ভারতের প্রথম বিদেশী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মে মাসে দিল্লীতে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল বাংলাতেও তাই হতে পারত। এই সম্ভাবনা যে একেবারেই অলীক স্বপ্ন ছিল না, তা ইংরেজ শাসকরা ভাল ভাবেই বুঝতে পেরেছিল। কে' ঠিকই বলেছিলেন—"এই কথাটা বোঝা মোটেই কঠিন নয় যে, যদি বহরমপুরের সিপাহীরা ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করত এবং মুর্শিদা-বাদের জনসাধারণ নবাবকে সামনে রেখে তাদের সঙ্গে হাত মেলাত, তা হলে সমগ্র বাংলা দেশে দেখতে দেখতে আগুন জ্বলে উঠত।"[২] গভর্নর জেনারেল ১৯শ বাহিনীকে বহরমপুর থেকে ব্যারাকপুরে ২২০ মাইল মার্চ করিয়ে এনে নিরস্ত্র করে বরখাস্ত করার হুকুম দিলেন। এই শাস্তির কথা সিপাহীরা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জানতে পারেনি। যাই হোক, একটা গোটা বাহিনীকে নিরস্ত্র করা সহজ কাজ নয়। বিশেষ করে ব্যারাকপুরের মতো স্থানে যেখানে সিপাহীদের মধ্যে বিদ্রোহের মনোভাব সতেজ হয়ে উঠেছে। কিন্তু লর্ড ক্যানিং সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত হয়েই এই হুকুম জারি করেছিলেন। ২৭শে মার্চ তারিখে তিনি লিখলেন—"দমদমে বহুসংখ্যক গোলন্দাজের উপস্থিতি, আমার বডি গার্ড, দুটি বৃটিশ রেজিমেন্ট, যাদের

১। "There were thousands in the city who would have risen at the signal of one who, weak himself, was yet strong in the prestige of a great name."—(Kaye, Vol. I., p. 498)

২। কে', পৃঃ ৪৯৮-৯৯।

একটিকে (৮৪শ রেজিমেণ্টকে,) এই কাজের জন্যই বর্মা থেকে নিয়ে আসা হয়েছে, তারা যে কোনো বিদ্রোহের প্রচেষ্টাকে দমন করতে যথেষ্ট হবে।"[১] ফেব্রুয়ারি মাসে সিপাহীরা আশঙ্কা করেছিল যে, শীঘ্রই সরকার বহুসংখ্যক ইংরেজ সৈন্য আমদানি করে তাদের বিদ্রোহের প্রচেষ্টাকে পণ্ড করে দেবে। তাই ঘটল এক মাসের মধ্যেই।

ইতিমধ্যে ভারতের রাজধানী কলকাতা শহরের বুকের উপর ঘটে গেল এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ১০ই মার্চ রাত্রে ফোর্ট উইলিয়ামের পাহারাদার ২য় বাহিনীর দুজন সিপাহী ট্রেজারির পাহারাদার ৩৪শ বাহিনীর সুবাদারের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। সিপাহী দুটি সুবাদারকে বললেন—ঐ রাত্রে তাদের বাহিনী বিদ্রোহ ঘোষণা করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে এবং তাঁর ৩৪শ বাহিনী যদি তাঁদের সঙ্গে যোগ দেয়, তা হলে তাঁরা সকলে মিলে সমগ্র কলকাতা শহর সহজেই দখল করতে পারবেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বিদ্রোহ ভাবাপন্ন ৩৪শ বাহিনীর সুবাদার স্বয়ং কিন্তু সিপাহী দুটিকে তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করে ইংরেজের হাতে সমর্পণ করে দিলেন।

এদিকে মার্চ মাসের শেষ দিকে ব্যারাকপুরে সংকট ঘনীভূত হয়ে এল। গভর্নর জেনারেলের চিঠিতে আমরা দেখতে পেয়েছি যে, ওখানে ইংরেজ সৈন্য আমদানি করে ১৯শ বাহিনীকে নিরস্ত্র করার জন্য ও ব্যারাকপুরের সিপাহীদের বিদ্রোহের প্রচেষ্টাকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করার জন্য সরকার প্রস্তুত হচ্ছিল। ২৯শে মার্চ, রবিবার, সকালে সিপাহীদের মধ্যে রটে গেল যে, ইংরেজ সৈন্য ব্যারাক-পুরের ঘাটে অবতরণ করছে।[২]

সিপাহীরা বুঝতে পারল এইবার তাদের সংকট মুহূর্ত এসে গিয়েছে, এখন ইংরেজরা বলপূর্বক তাদের দিয়ে চর্বি মিশ্রিত টোটা ব্যবহার করাবে। হয় এই মুহূর্তে আঘাত হানতে হবে, তা না হলে আর কখনও হবে না। অন্ততঃ ৩৪শ বাহিনীর একজন সিপাহীর মনে আর কোনো দ্বিধা রইল না—তিনি হচ্ছেন ছাব্বিশ বছরের যুবক মঙ্গল পাণ্ডে। পাণ্ডে তাঁর ইউনিফর্ম পরে, কোমরে তলোয়ার ও কাঁধে বন্দুক নিয়ে তাঁর কুঠি থেকে বেরিয়ে এলেন ও তাদের ধর্ম ও সম্মান বাঁচাবার জন্য তাঁর সাথীদের আহ্বান জানালেন।

এই ঘটনা ঘটল কোয়ার্টার গার্ডের সামনে, যেখানে ৩৪শ বাহিনীর ২০ জন সিপাহী জমাদার ঈশ্বরী পাণ্ডের অধীনে পাহারা দিচ্ছিল। দেখতে দেখতে

১। ফরেষ্ট : "ষ্টেট পেপার্স", ১ম পৃঃ ৯৪। ২। ঐ, ১ম, পৃঃ ১১৬।

উত্তেজিত সিপাহীরা পাণ্ডের চারপাশে জমা হতে লাগল। দুজন অশ্বারোহী ইংরেজ অফিসার, লেফটেনাণ্ট বগ্ ও সার্জেণ্ট মেজর হিউসন্ নিকটেই ছিলেন। তাঁরা ঈশ্বরী পাণ্ডেকে হুকুম করলেন মঙ্গল পাণ্ডেকে নিরস্ত্র ও গ্রেপ্তার করতে, কিন্তু তাতে কোনো ফল হল না। তখন তাঁরা নিজেরা দুজনে একসঙ্গে মঙ্গল পাণ্ডেকে আক্রমণ করলেন ও তাঁকে লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়লেন। পাণ্ডেও গুলী চালালেন, তাতে বগের ঘোড়া নিহত হল। তখন ইংরেজ অফিসার দুজন তলোয়ার নিয়ে পাণ্ডেকে যুগপৎ আক্রমণ করলেন। কিছুক্ষণ লড়বার পর পাণ্ডে তাঁর দুজন ইংরেজ প্রতিদ্বন্দ্বীকেই ক্ষতবিক্ষত করে দিলেন এবং তিনি বগ্‌কে যেই শেষ আঘাত হানবার জন্য তলোয়ার তুললেন ঠিক সেই মুহূর্তে শেখ পল্টু নামক একজন সিপাহী পিছন থেকে এসে প্রাণপণে পাণ্ডের কোমর জড়িয়ে ধরল। এই সুযোগে বগ্ ও হিউসন্ রক্তাক্ত কলেবরে টলতে টলতে পালিয়ে কোনো মতে নিজেদের প্রাণ বাঁচালেন।[১]

মঙ্গল পাণ্ডেকে জড়িয়ে ধরে পল্টু পাহারারত সিপাহীদের ও ঈশ্বরী পাণ্ডেকে বারবার আহ্বান করল মঙ্গল পাণ্ডেকে গ্রেপ্তার করার জন্য। মঙ্গল পাণ্ডের বিচারের সময় পল্টু বলেছিল, "কিন্তু তারা কেউ এগিয়ে এলই না, বরং উল্টে সকলেই আমাকে গালাগালি করছিল ও আমাকে এই বলে শাসাচ্ছিল যে, আমি যদি পাণ্ডেকে না ছেড়ে দিই তবে তারা আমাকে গুলী করবে।"[২]

ইংরেজ দুজন পালাবার পর পল্টু পাণ্ডেকে ছেড়ে দিল। পল্টু যদিও তাকে বাধা দিয়েছিল, হিন্দুস্থানী বলে পাণ্ডে কিন্তু তাকে কিছুই বলেননি। ফিরিঙ্গীদের ধ্বংস করবার জন্য অস্ত্র হাতে বেরিয়ে আসতে বললেন তিনি, সিপাহীদের আবার আহ্বান করলেন, "নিকাল আও, পল্টন, নিকাল আও হামারা সাথ।"

এমন সময় ৩৪শ বাহিনীর কমাণ্ডিং অফিসার কর্নেল হুইলার এসে উপস্থিত হলেন। কোয়ার্টার গার্ডে এসে তিনি প্রহরারত সিপাহীদের হুকুম করলেন তাঁর সঙ্গে আসতে। বারবার তিনবার এই হুকুম করার পর সিপাহীরা কয়েক পা অগ্রসর হল। তারপর হঠাৎ থেমে গেল, আর এক পাও অগ্রসর হল না। হুইলার হেড কোয়ার্টার্সে এসে এই ঘটনা রিপোর্ট করলেন। ইতিমধ্যে খবর পেয়ে জেনারেল হিয়ার্সে দমদম ও চুঁচুড়ার সমস্ত ইংরেজ সৈন্যদের তৎক্ষণাৎ আসবার জন্য হুকুম দিয়ে নিজে কয়েকজন ইংরেজ অফিসার ও শিখ সিপাহী সঙ্গে করে ঘটনাস্থলে হাজির হলেন।

১। মঙ্গল পাণ্ডের বিচারকালে বগের সাক্ষ্য—ফরেষ্ট: "ষ্টেট পেপার্স", ১ম, পৃঃ ১৩০।
২। ঐ, পৃঃ ১৩০।

কোয়ার্টার গার্ডের সিপাহীরা হিয়ার্সের আদেশ মতো এবার তাঁর সঙ্গে চলল। হিয়ার্সেকে আসতে দেখেই তাঁকে লক্ষ্য করে মঙ্গল পাণ্ডে তাঁর বন্দুক উঁচু করে তুলে ধরলেন। কিন্তু এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করে তিনি বন্দুক নামিয়ে ফেললেন। তিনি দেখলেন তাঁর সাথীরা কেউই তাঁর সঙ্গে যোগ দিল না, কেউই নিজেদের ধর্ম ও সম্মান রক্ষা করার জন্য ফিরিঙ্গীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল না। তিনি আরও দেখতে পেলেন যে, ফিরিঙ্গী অফিসারের পাশে তাঁরই হিন্দুস্থানী ভাইরা তাঁরই বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়ে আসছে। তখন তিনি বিরাগে হতাশায় নিজের বন্দুক আপনার বুকের দিকে লক্ষ্য করে পা দিয়ে ঘোড়া টিপে দিলেন। গুলী সবেগে তাঁর শরীরে প্রবেশ করল। মঙ্গল পাণ্ডে আহত ও হতজ্ঞান হয়ে ধূলায় লুটিয়ে পড়লেন।[১]

২৯শে মার্চের ঘটনায় স্পষ্টই বোঝা গিয়েছিল যে, সিপাহীদের সহানুভূতি মঙ্গল পাণ্ডের দিকেই ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও খোলাখুলি ভাবে তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়ে তাঁরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেনি। তারা যে নিস্পৃহ ভাবে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করেছিল তা নয়—বরং পরোক্ষে তারা মঙ্গল পাণ্ডেকেই সাহায্য করেছিল। এমন কি পাহারারত সিপাহীরাও বারবার ইংরেজ অফিসারদের হুকুম অমান্য করেছিল। সামরিক কাজে উর্ধ্বতন কর্মচারীর আদেশ অমান্য করা যে কত বড় গুরুতর অপরাধ এবং তার জন্য যে কত বড় ভয়ানক শাস্তি হয়ে থাকে তা তাদের ভাল ভাবেই জানা ছিল। বস্তুতঃ ২৯শে মার্চ সিপাহীদের ব্যবহার রাজদ্রোহিতারই সামিল এবং এই অপরাধে তাদের শাস্তিও ভোগ করতে হয়েছিল। তা ছাড়া, ২৯শে মার্চের ঘটনা একেবারে আকস্মিকও বলা চলে না—বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র দু' তিন মাস ধরেই চলছিল। কিন্তু তবুও মঙ্গল পাণ্ডের উদাহরণ অনুসরণ করে ঐদিন তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করবার সুযোগ গ্রহণ করল না। সিপাহীদের এই স্ববিরোধী ব্যবহারের কারণ কি—এই প্রশ্ন মনে ওঠা স্বাভাবিক।

জানুয়ারি মাস থেকেই যে ইংরেজ-বিরোধী একটা চক্রান্ত শুরু হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অযোধ্যার নবাব, রাজা মানসিংহ প্রভৃতির সহযোগীরা ব্যারাকপুরের সিপাহীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। সিপাহীরাও যে সভাসমিতি করে এ বিষয়ে আলোচনা করছিল তাও আমরা দেখতে পেয়েছি। কিন্তু সিপাহীরা কোনো বিশেষ কর্মপন্থায় উপনীত হতে পারেনি। বিদ্রোহ করতে প্রস্তুত, অথচ কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি—এই অবস্থাই সিপাহীদের দোদুল্যমান অবস্থার কারণ। খুব সম্ভব সেই কারণেই ২৯শে মার্চ মঙ্গল পাণ্ডের আহ্বানে তারা অগ্রসর হয়ে আসতে পারেনি।

১। রজনীকান্ত গুপ্ত: "সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস", ২য়, পৃঃ ৪৩।

১৯শ বাহিনী ২০শে মার্চ বহরমপুর ত্যাগ করে ব্যারাকপুর থেকে ৮ মাইল দূরে বারাসাতে ৩০শে তারিখে এসে পৌছল—অর্থাৎ মঙ্গল পাণ্ডের বিদ্রোহের একদিন পরে—যখন ব্যারাকপুর একটি ধূমায়িত আগ্নেয়গিরির অবস্থায় পরিণত হয়েছে। ব্যারাকপুরের কয়েকজন সিপাহী প্রতিনিধি বারাসাতে ১৯শ বাহিনীর নিকট বিদ্রোহ ঘোষণার প্রস্তাব করলেন। তখন পর্যন্ত ১৯শ বাহিনী সশস্ত্র অবস্থাতেই ছিল। কিন্তু তবুও তারা বিদ্রোহ করতে অসম্মতি জানাল।

পরদিন ৩১শে মার্চ প্রত্যূষে ১৯শ বাহিনীকে মার্চ করিয়ে ব্যারাকপুরের প্যারেড গ্রাউণ্ডে নিয়ে আসা হল। যখন তাদের থামতে হুকুম দেওয়া হল, তখন তারা সামনের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল—গোরা সৈন্য পরিবেষ্টিত ইংরেজদের কামানের মুখে এসে তারা দাঁড়িয়ে আছে। এতটুকু এদিক ওদিক হলেই নিমেষে কামানের গোলায় তাদের উড়িয়ে দেওয়া হবে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ১৯শ বাহিনীকে নিরস্ত্র করে তৎক্ষণাৎ তাদের বরখাস্ত করে দেওয়া হল। যে বাহিনী দ্বিতীয় শিখযুদ্ধের সময় খালসা বাহিনীর বিরুদ্ধে কৃতিত্বের সঙ্গে লড়াই করে ইংরেজের হাতে পাঞ্জাবকে তুলে দিয়েছিল—আজ ৮ বৎসর পর সেই ১৯শ বাহিনী তার উপযুক্ত পুরস্কার পেল!

নিজের গুলীতে মঙ্গল পাণ্ডের মৃত্যু হয়নি, তিনি গুরুতরভাবে জখম হয়েছিলেন এবং তাঁর অবস্থা দিনের পর দিন খারাপই হচ্ছিল। সকলেই বুঝতে পারল কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু অনিবার্য। ৬ই এপ্রিল একটি সামরিক আদালতের বিচারে তাঁর ফাঁসীর আদেশ হয় এবং ৮ই এপ্রিল ব্যারাকপুরের সমস্ত সিপাহীদের সম্মুখে মরণোন্মুখ মঙ্গল পাণ্ডেকে টেনে তুলে ফাঁসীর দড়ি তাঁর গলায় জড়িয়ে দেওয়া হয়।

একজন ইংরেজ ঐতিহাসিক মঙ্গল পাণ্ডের ফাঁসীর দৃশ্য এইভাবে বর্ণনা করেছেন:

"ব্যারাকপুরের প্যারেড গ্রাউণ্ডের কেন্দ্রস্থলে ফাঁসীর মঞ্চ তৈরি করা হল। কামানের শব্দ হওয়া মাত্রই সৈন্যবাহিনী এসে একটি বর্গের (square) তিন দিকে দাঁড়িয়ে গেল। এর একধারে ৭০শ, ৪৩শ, ২য় ও ৩৪শ (মঙ্গল পাণ্ডের বাহিনী) সিপাহী বাহিনী আলাদা বর্গ তৈরি করে দাঁড়িয়েছিল, আর তাদের মুখোমুখী হয়ে লাইন করে দাঁড়িয়েছিল গভর্নর জেনারেলের বডি গার্ড ও ৫৩শ ইংরেজ বাহিনী। বর্গের তৃতীয় দিকে লাইন করে ছিল ৮৪শ ইংরেজ বাহিনী, আর তাদের পাশে দুটি ইংরেজ কামান বাহিনী। বডি গার্ডদের একটি অংশ অপরাধীকে সঙ্গে করে নিয়ে এল। তাদেরই পেছনে এল ইংরেজ সৈন্য

পরিবেষ্টিত হয়ে কোয়ার্টার গার্ডের কয়েদী সিপাহীরা। এই ভাবে সকলে নিজ নিজ স্থানে দাঁড়াবার পর সিপাহী বাহিনী চারটিকে ফাঁসীর মঞ্চের মুখোমুখী এনে দাঁড় করানো হল।" ··· মঙ্গল পাণ্ডের ফাঁসী হয়ে যাবার পর, "সিপাহীদের আবার ফাঁসীর মঞ্চের সামনে দিয়ে মার্চ করিয়ে তাদের ব্যারাকে নিয়ে যাওয়া হল।"[১]

এই ভাবে মঙ্গল পাণ্ডে ভারতের প্রথম জাতীয় মহাবিদ্রোহের প্রথম শহীদ হলেন।

মঙ্গল পাণ্ডেকে ফাঁসীর দড়ি গলায় পরিয়ে দেবার জন্য ব্যারাকপুরের কোনো লোকই রাজী হয়নি, সুতরাং এই জঘন্য কাজ করার জন্য "চারজন নীচ জাতীয় নেটিভকে কলকাতা থেকে আসতে বাধ্য করা হয়।"[২]

বন্দী অবস্থায় মঙ্গল পাণ্ডের কাছ থেকে ইংরেজরা চক্রান্তকারী সিপাহীদের নাম বের করার জন্য সকল রকমের উপায়ই অবলম্বন করেছিল, কিন্তু তাঁর মুখ থেকে একটি কথাও বের হয়নি। তাঁর বিচারের সময় তিনি বলেছিলেন—যে দুজন ইংরেজ অফিসারকে তিনি আহত করেছিলেন, তাঁদের প্রতি তাঁর কোনো ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ছিল না, এবং যে জন্য তাঁর ফাঁসী হবে তাতে তিনি তাঁর সহকর্মীদের জড়াতে রাজী নন।[৩]

মঙ্গল পাণ্ডের ফাঁসীর কয়েকদিন পর ২১শে এপ্রিল জমাদার ঈশ্বরী পাণ্ডেরও ফাঁসী হয় এবং কোয়ার্টার গার্ডের অন্যান্য সিপাহীদেরও দীর্ঘ কারাবাসের হুকুম হয়। পল্টুর রাজভক্তির জন্য ইংরেজরা অবশ্য তাকে পুরস্কৃত করতে ভুলল না। আরদালী থেকে তাকে হাবিলদার করে দেওয়া হল। তারপর ৬ই মে তারিখে, অর্থাৎ মিরাট বিদ্রোহের মাত্র ৪ দিন পূর্বে, ১৯শ বাহিনীকে যে ভাবে নিরস্ত্র ও বরখাস্ত করা হয়েছিল, ৩৪শ বাহিনীকেও সেই ভাবে বরখাস্ত করা হল। ৩৪শ বাহিনীকে বিদ্রোহের অপরাধে এর আগেও আর একবার বরখাস্ত করা হয়েছিল।

ব্যারাকপুরের বিদ্রোহের সময় ইংরেজ সরকার যে তাদের ভেদনীতির (Divide and Rule Policy) উপর অনেকখানি নির্ভর করেছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই সময়কার সরকারী মহলে একটা বদ্ধমূল ধারণা জন্মে গিয়েছিল যে, হিন্দু সিপাহীরাই হচ্ছে যত অনিষ্টের মূল, আর মুসলমান ও শিখরা খুব রাজভক্ত।

১৮৪৯ সালে পাঞ্জাব অধিকার করার পর ইংরেজ সরকার এই নীতি অবলম্বন করেছিল যে, বেঙ্গল আর্মিতে পুব-দেশী প্রাধান্য খর্ব করার জন্য প্রত্যেক

১। চার্লস্ বল্: হিষ্ট্রি অব ইণ্ডিয়ান মিউটিনি" ১ম, পৃঃ ৫০। ২। ঐ, পৃঃ ৫০।
৩। ঐ, পৃঃ ৫০।

বাহিনীতে ২০০ জন করে শিখ ভর্তি করা হবে। তারপর থেকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সিপাহীদের মধ্যে যাতে জাতীয় মনোভাব বৃদ্ধি না পেতে পারে তার জন্যও তারা নানা উপায়ে পরস্পরের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করছিল।

বাংলা দেশের ঘটনাবলী পর্যালোচনা করে জেনারেল হিয়ার্সে তাঁর রিপোর্টে লিখেছিলেন যে, "মুসলমান ও শিখ সিপাহীদের মধ্যে একটি সুস্থ মনোভাব দেখা যায়, কিন্তু হিন্দুরা বর্তমান অবস্থায় বিশ্বাসযোগ্য নয়।"[১] ৩৪শ বাহিনীর কমাণ্ডিং অফিসার কর্নেল হুইলারও এই একই মত ব্যক্ত করেছিলেন, "আমি কেবলমাত্র শিখ ও মুসলমানদের উপর নির্ভর করতে পেরেছিলাম।"[২] কিন্তু ইংরেজ শাসকদের এই ভ্রমাত্মক বিশ্বাস ভাঙতে বেশী দিন লাগেনি। তাঁদের ঐতিহাসিক কে' নিজেই লিখছেন, "এপ্রিল মাস শেষ হতে না হতেই লর্ড ক্যানিং বেশ বুঝতে পারলেন যে, এশিয়ার জাতিগুলির মধ্যে আত্মকলহ এ পর্যন্ত আমাদের ক্ষমতার ও নিরাপত্তার প্রধান উপাদান বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল, তা থেকে আর কিছু আশা করা যায় না। মুসলমান ও হিন্দুরা সকলেই আমাদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত ভাবে দাঁড়াল।"[৩]

এত সহজে ব্যারাকপুরের বিদ্রোহ দমন করবার পর সরকার ভাবল যে, দেশের অবস্থা এখন তাদের আয়ত্তে এসেছে এবং অপরাধীদেরও যথোপযুক্ত শাস্তি হয়েছে। বিপদের আর কোনো সম্ভাবনা নেই ভেবে তাঁরা নিশ্চিন্ত হলেন। ৮৪শ বাহিনীকে বাংলায় আর রাখার প্রয়োজনীয়তা নেই মনে করে তাদের ব্রহ্ম দেশে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন।

১৭ই মে মিরাট বিদ্রোহের সাত দিন পরের কথা। কলকাতার এসপ্লানেড ময়দানে তখন যে ২৫শ বাহিনী অবস্থান করছিল, তাদের কয়েকজন প্রতিনিধি ফোর্ট উইলিয়ামের ২য় ও ৭০শ বাহিনীর সঙ্গে ঐ দুর্গ দখল করে কলকাতায় বিদ্রোহ ঘোষণা করবার কথা আলোচনা করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ সঙ্গে সঙ্গে এই ষড়যন্ত্রের খবর পেয়ে দমদম থেকে ৫৩শ ইংরেজ বাহিনীকে নিয়ে এলেন এবং পরের দিন বিদ্রোহ ভাবাপন্ন সিপাহীরা কিছু করবার পূর্বেই ২৫শ

১। ফরেষ্ট—"ষ্টেট্ পেপার্স", ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬০। ১৮৫৭ সালের মার্চ মাসে ৩৪শ বাহিনীতে ১,০৮৯ জন সিপাহী ছিল—তাদের মধ্যে ৩৩৫ জন ব্রাহ্মণ, ২৩৭ জন ক্ষত্রিয়, ২৩১ জন অন্যান্য হিন্দু, ২০০ জন মুসলমান, ৭৪ জন শিখ ও ১২ জন খৃষ্টান।—(ঐ, পৃঃ ১৭৭)। বেঙ্গল আর্মির অন্যান্য বাহিনীগুলিও মোটামুটি এই ধাঁচেই গঠিত ছিল।

২। ঐ, পৃঃ ১৬৪।

৩। কে'—১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৬৫।

বাহিনীকে নিরস্ত্র করে বরখাস্ত করা হল। কয়েকদিন পর ৭০শ বাহিনীকেও এই ভাবে নিরস্ত্র ও বরখাস্ত করা হল।

২৫শে মে তারিখে ব্যারাকপুরে ৭০শ ও ৪৩শ সিপাহী বাহিনী দরখাস্ত করে সরকারকে জানাল যে, দিল্লীর বিদ্রোহী সিপাহীদের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য যে কোনো সময়ে তারা যাত্রা করতে প্রস্তুত। বলা বাহুল্য, রাজভক্তির এইরূপ উদাহরণ দেখে সরকার খুবই পুলকিত হয়েছিল। জুন মাসের প্রথম দিকে আবার এই সব সিপাহীরা সরকারের কাছে আবেদন করল যে, তাদের এখনই দিল্লীতে পাঠানো হোক, চর্বি মিশ্রিত টোটা ব্যবহার করতে কোনো আপত্তি তাদের নেই। বাস্তবিকই সরকার যখন এই দুটি সিপাহী বাহিনীকে এন্‌ফিল্ড রাইফেল দ্বারা সজ্জিত করে দিল্লী পাঠাবার ব্যবস্থা করছিলেন, ঠিক সেই সময় ১৩ই জুন সন্ধ্যার সময় নাগাদ জেনারেল হিয়ার্সে গভর্নর জেনারেলকে জরুরী খবর পাঠালেন যে, বিশ্বস্ত সূত্রে তিনি জানতে পেরেছেন যে ব্যারাকপুরের সিপাহীরা ঐ রাত্রেই বিদ্রোহ ঘোষণা করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। সেই রাত্রে কলকাতা ও চুঁচুড়া থেকে ইংরেজ সৈন্যদের দুটি বাহিনী ব্যারাকপুর নিয়ে যাওয়া হয় ও পরের দিন প্রত্যুষে যথারীতি কামানের মুখে দাঁড় করিয়ে সিপাহীদের নিরস্ত্র ও বরখাস্ত করা হয়।

ব্যারাকপুরে যখন ১৪ই জুন তারিখে সিপাহীদের নিরস্ত্র করা হচ্ছিল, ঠিক সেই সময় কলকাতায় ইংরেজ ও ফিরিঙ্গীদের ভেতর মুহূর্তের মধ্যে ভয়ানক ভাবে প্রচার হয়ে গেল যে, ব্যারাকপুরের বিদ্রোহী সিপাহীরা কলকাতা আক্রমণ করতে আসছে। এই জনরবের ফলে কলকাতায় ইংরেজ বীরপুরুষদের যে কি শোচনীয় অবস্থা হয়েছিল তা একজন সমসাময়িক ইংরেজ লেখকই সুন্দরভাবে বর্ণনা করে গিয়েছেন:

"কলকাতার সর্বত্রই অত্যধিক আতঙ্ক, বিশৃঙ্খলা ও হতাশা, ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর জনরব চারদিকে প্রচারিত হচ্ছে। সকলেই বিশ্বাস করে বসে আছে যে ব্যারাক-পুরের সিপাহীরা দ্রুতবেগে কলকাতার দিকে ছুটে আসছে, শহরতলিগুলিতে সমস্ত লোক বিদ্রোহ করছে, অযোধ্যার নবাব তাঁর লোকজন নিয়ে গার্ডেনরীচ অঞ্চলে লুট করছেন, ইত্যাদি। সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত কর্মচারীরাই এই কাজে প্রথম উদ্যোগী হয়েছিলেন। গভর্নমেণ্টের সেক্রেটারীরা ও গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিলের সভ্যরা ছুটোছুটি করে পরস্পরের ঘাড়ের উপর পড়ছিলেন; কেউ বা পিস্তলে গুলী ভরতে ব্যস্ত, কেউ বা দরওয়াজায় ব্যূহ রচনা করছিলেন; কাউন্সিলের সভ্যরা তাঁদের পরিবার সমেত গৃহত্যাগ করে জাহাজে আশ্রয় নিচ্ছিলেন; এবং তাদের এক ধাপ নিম্নস্তরের অথচ স্বনামখ্যাত ব্যক্তিরা তাঁদের উপরওয়ালাদের

উদাহরণে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁদের মূল্যবান দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহ করে ঊর্ধ্বশ্বাসে ফোর্টের দিকে দৌড়তে লাগলেন, যদি কোনো মতে ফোর্টের কামানগুলির নীচে একটু মাথা গুঁজবার স্থান পাওয়া যায়। সর্বরকমের ও রঙবেরঙের ঘোড়া, গাড়ি, পাল্কী ইত্যাদি রিকুইজিশন করে রিফিউজিদের কাল্পনিক হত্যাকারীদের হাত থেকে বাঁচিয়ে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। শহরতলিগুলিতে দেখতে দেখতে প্রত্যেক খৃষ্টানের বাড়ি খালি হয়ে গেল। তখন এই অবস্থায় মাত্র আধ ডজনখানেক দৃঢপ্রতিজ্ঞ লোক শহরের তিন-চতুর্থাংশ অনায়াসে ধ্বংস করে দিতে পারত।"[১]

কলকাতার ইংরেজ সমাজে এই প্রকার অশোভন আতঙ্কের একটা কারণ ছিল। মিরাট ও দিল্লীর ঘটনায় ইংরেজরা উপলব্ধি করতে পারে যে ভারতবর্ষে তাদের সত্যিকারের বন্ধু বলতে কেউ নেই। সকল ভারতবাসীই প্রত্যক্ষ কিম্বা প্রচ্ছন্নভাবে তাদের শত্রু। জুন মাসে যখন বিদ্রোহের আগুন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল, ভারতবাসীদের মধ্যে অসন্তোষ এত ব্যাপক দেখে লর্ড ক্যানিং খুব আশ্চর্য হয়ে গেলেন। গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিলের সভ্য গ্র্যান্ট ক্যানিংকে বারবার জানাতে লাগলেন যে কলকাতার আশে পাশে যেসব সিপাহী বাহিনী আছে তারা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়, দমদমে সিন্ধু প্রদেশের আমিরের লোকেরা, গার্ডেনরীচের অযোধ্যার নবাবের লোকেরা এবং কলকাতার মুসলমানরা ও "এই মহানগরীর সর্বশ্রেণীর বদমাশরা" ভয়ানক ভীতির কারণ। "বিদ্রোহ দ্রুতবেগে বিস্তার লাভ করছে এবং ক্রমশই আমাদের নিকট এসে যাচ্ছে। ··· আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, এমন কি সামান্য একটা রাস্তার গণ্ডগোলের ফলেও এই রাজধানীতে একটা হুলুস্থুল কাণ্ড বেধে যেতে পারে। শুধু বাংলাতেই নয়, বোম্বাই ও মাদ্রাজেও এরূপ ঘটনার সম্ভাবনা আছে।"[২]

ইংরেজদের সৌভাগ্য যে সিপাহীদের সব কয়টা ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহের প্রচেষ্টা পর পর ব্যর্থ হয়ে গেল এবং জনসাধারণও ইংরেজদের এই আতঙ্কের মূহূর্তে অগ্রসর হয়ে এল না। ভারতবাসীর দুর্বলতার এই সুযোগ নিয়ে ইংরেজরা তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে লাগল। প্রথমেই অযোধ্যার নবাব তাঁর মন্ত্রীদ্বয় আলি নকী খাঁন ও টিকত রাওকে গ্রেপ্তার করে ফোর্ট উইলিয়ামে বন্দী করে রাখল। আরও বহুসংখ্যক লোক এই ভাবে বন্দী হলেন।"[৩]

এই ঘটনার কিছুদিন পূর্বে অযোধ্যার রাজা মানসিংহ ও কয়েকজন তালুকদার কলকাতায় এসে অযোধ্যার নবাব ও কয়েকজন সিপাহী প্রতিনিধির সঙ্গে কথাবার্তা বলে গিয়েছিলেন।

১। "রেড প্যাম্পলেট", পৃঃ ১০৫। ২। কে'—৩য় খণ্ড, পৃঃ ১১। ৩। মার্টিন: ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৭০।

১৩ই জুন কাউন্সিলের অধিবেশনে ক্যানিং একটি প্রেস আইন পাস করিয়ে নিলেন। এই আইনের বলে যেসব প্রেসে বই ও সংবাদপত্র ছাপানো হত তাঁরা সরকারের লাইসেন্স নিতে বাধ্য হলেন ও সরকারকে যে কোনো ছাপা লেখা বাজেয়াপ্ত করবার অধিকার দেওয়া হল। এই প্রেস আইনের জোরে সরকার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার 'দূরবীন', 'সুলতান-উল্-আকবর', 'সমাচার সুধাবর্ষণ' প্রভৃতি সংবাদপত্রগুলির মুদ্রাকর ও প্রকাশকদের রাজদ্রোহ প্রচারের জন্য সুপ্রিম কোর্টে অভিযুক্ত করলেন। জুলাই মাসের মধ্যে 'গুলশান-ই-নও-বাহার' ও আরও কয়েকখানা সংবাদপত্র বাজেয়াপ্ত করা হল। কিছুদিনের মধ্যে কলকাতার 'হিন্দু ইন্টেলিজেন্শিয়া' ও লক্ষ্ণৌর 'সেন্ট্রাল স্টার'ও বন্ধ করে দেওয়া হল।

কলকাতার পরিস্থিতি এই ভাবে সরকারের আয়ত্তের মধ্যে এলেও সমগ্র বাংলা দেশ ১৮৫৭ সালের শেষ ৬ মাস একটা খুব সংকটের মধ্য দিয়েই যাচ্ছিল। সর্বত্র জনসাধারণ একটা উৎকণ্ঠা ও প্রত্যাশার মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছিল। তারা আশা করছিল যে, যে কোনো মুহূর্তে একটা ভয়ানক কিছু ঘটবে। অন্যান্য প্রদেশের মতো বাংলাতেও তখন কৃষকদের মধ্যে, বিশেষ করে নীল চাষীদের মধ্যে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হয়েছিল। কলকাতা কিম্বা অন্য কোনো বড় শহরে যদি বিদ্রোহ শুরু হয়ে যেত, তা হলে উত্তর ভারতের মতো বাংলা দেশেও গ্রামাঞ্চলে তৎক্ষণাৎ ছড়িয়ে পড়বার মতো প্রায় সব বাস্তব অবস্থাই তৈরী হয়েছিল। একজন ইংরেজ ঐতিহাসিক তখনকার অবস্থা এইভাবে বর্ণনা করেছেন: "বাংলা সরকারের অধীনে এমন একটা জেলা ছিল না যা প্রত্যক্ষ বিপদের মধ্য দিয়ে যায়নি কিম্বা ঘোরতর বিপদের আশঙ্কা করেনি।"[২]

বাস্তবিকপক্ষে মঙ্গল পাণ্ডের ফাঁসীর সঙ্গেই বাংলার বিদ্রোহ শেষ হয়ে যায়নি। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মঙ্গল পাণ্ডের বিদ্রোহের পর ব্যারাকপুরে ৩৪শ বাহিনীকে মে মাসের প্রথমে নিরস্ত্র ও বরখাস্ত করা হয়। ঐ বাহিনীর তিনটি কোম্পানি, অর্থাৎ প্রায় ৩০০ সিপাহী, এই সময় চট্টগ্রামে ছিল; তাদের বরখাস্ত করা হয়নি। ১৮ই নভেম্বর, মঙ্গল পাণ্ডের ফাঁসীর ছ' মাস পরে চট্টগ্রামের এই সিপাহীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করল। "তারা ধনাগার লুণ্ঠন করে ও জেল ভেঙে কয়েদীদের খালাস করে, শহরের অধিবাসীদের কোনো রকম ক্ষতি না করে, ত্রিপুরা পাহাড়ের ধার দিয়ে সিলেট হয়ে কাছাড়ের দিকে চলে গেল ও সেখানে কয়েকজন

২। বাকল্যাণ্ড: "বেঙ্গল আণ্ডার দি লেফটেনাণ্ট গভর্নরস্", ১ম, পৃঃ ৬৮।

ধরা পড়ল, আর প্রায় সকলেই গুর্খা বাহিনী ও কুকী স্কাউটদের সঙ্গে লড়াই করে প্রাণ হারাল।"[১]

সিলেট দিয়ে যাবার সময় লাটু নামক স্থানে মেজর বিং-এর অধীনে ইংরেজ বাহিনী বিদ্রোহীদের পথরোধ করে দাঁড়িয়েছিল। লাটুর যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষের অনেক লোক প্রাণ দিয়েছিল, তাদের মধ্যে মেজর বিংও একজন। লাটুর ব্যূহ ভেদ করে বিদ্রোহীরা কাছাড়ে পৌছয় এবং সেখানে ২৩শে ডিসেম্বর; ১২ই, ২২শে ও ২৬শে জানুয়ারি তারিখে খণ্ড খণ্ড লড়াই হয়ে যায়।[২]

এতগুলি যুদ্ধ করার পর যে কয়জন বিদ্রোহী বেঁচে ছিল, তারা মনিপুর রাজ্যে প্রবেশ করল এবং এই সময়ে মনিপুরে একজন রাজকুমার তাঁর কিছু লোকজন নিয়ে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিলেন। এই অবশিষ্ট বিদ্রোহীরা শেষ যুদ্ধ করেন লক্ষ্মীপুর নামক স্থানে। যে কয়জন বিদ্রোহী লক্ষ্মীপুরের যুদ্ধের পর বেঁচে ছিল তারা পাহাড়ের জঙ্গলে আশ্রয় নিল। "তারা আর কোনো রকমে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করতে পারছিল না। তাদের কয়েকজনকে মৃত অবস্থায় জঙ্গলে পাওয়া গিয়েছিল, অনাহারেই যে তাদের মৃত্যু ঘটেছিল তাতে সন্দেহ নেই। বাকি কয়েকজনকে কুকী স্কাউটরা মেরে ফেলে। প্রত্যেকটি সিপাহীকে মারবার জন্য কুকীদের পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল।"[৩]

চট্টগ্রামের মাত্র ৩০০ সিপাহীর বিদ্রোহের ফলে নোয়াখালি, কুমিল্লা প্রভৃতি জেলার ইংরেজ কর্মচারী ও স্থানীয় জমিদারদের মধ্যে কি ভয়ানক সন্ত্রাসের সৃষ্টি হয়েছিল এবং জমিদাররা কি ভাবে লোকজন ও অর্থ দ্বারা ইংরেজদের সাহায্য করছিল তার বিবরণ ১৮৫৭ সালের ডিসেম্বর মাসের 'ইংলিসম্যান' পত্রিকায় পাওয়া যায়।

চট্টগ্রামের বিদ্রোহের ৪ দিন পর, ২২শে নভেম্বর ৭৩শ বাহিনীর যে ২০০ সিপাহী ঢাকা দুর্গে ছিল তারাও বিদ্রোহ ঘোষণা করল। এই সময় ঢাকায় প্রায় ২০০ ইংরেজ নাবিক, সৈন্য ও ভলান্টিয়ার ছিল। চটগ্রামের বিদ্রোহের খবর পেয়ে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ ইংরেজ সৈন্যদের সাহায্যে সিপাহীদের নিরস্ত্র করতে শুরু করে। দুর্গের সিপাহীদের কাছে দুটি কামান ছিল। তারা ইংরেজ নাবিকদের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করে দিল। এই যুদ্ধে ৪১ জন সিপাহীর মৃত্যু হয় ও ২০ জন সিপাহী ইংরেজের হাতে বন্দী হয়। এই বন্দীদের কয়েকদিন পর ফাঁসী হয়। অবশিষ্ট বিদ্রোহীরা দুর্গ ত্যাগ করে সাঁতার কেটে নদী পার হয়ে যায়। নদী পার হবার

১। "ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার অব ইণ্ডিয়া : ইষ্টার্ন বেঙ্গল এণ্ড আসাম", পৃঃ ৩৯৬।

২। ঐ, পৃঃ ৪৪৩। ৩। "আসাম ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার : সিলেট", পৃঃ ৬১।

সময়ও কয়েকজন সিপাহী নিহত হয়। যে কয়জন বেঁচে ছিল তারা ময়মনসিং, রংপুর, উত্তর বিহার অতিক্রম করে অযোধ্যায় বিদ্রোহীদের সঙ্গে গিয়ে যোগ দেয়।[১]

১৮৫৭ সালে বাংলা দেশে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা গণবিদ্রোহের অনুকূল হওয়া সত্ত্বেও বাঙ্গালীরা কেন সক্রিয়ভাবে বিদ্রোহে যোগ দেয়নি, কেন এই বিদ্রোহের প্রচেষ্টা কেবলমাত্র পশ্চিমী সিপাহীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল, কেন শোষিত ও নিপীড়িত বাংলার অগণিত কৃষকরা এই অপূর্ব সুযোগ গ্রহণ করল না, কেনই বা বাংলার অগ্রগামী উন্নত বৈপ্লবিক চিন্তাধারার বাহকেরা অগ্রসর হয়ে এসে ভারতের এই স্বাধীনতা সংগ্রামে যুগোপযোগী গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব দিলেন না—এই সব প্রশ্নগুলির আলোচনা করার সময় এসেছে।

ইউরোপের বিপ্লবী, দার্শনিক, ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিকদের গ্রন্থাবলী রাজা রামমোহন রায়ের (মৃত্যু—১৮৩৩) সময় থেকেই আমাদের দেশে আমদানি হতে থাকে। বিশেষ করে বাংলা দেশে ভল্‌টেয়ার, রুশো, টমাস্ পেইন, বেকন্, হিউম্, লক্, বেন্‌থাম্ প্রভৃতির বই শিক্ষিত সমাজে খুবই জনপ্রিয় ছিল। রামমোহন ফরাসী বিপ্লবের ও নেপোলিয়ন বোনাপার্টের সম্রাট হবার পূর্ব পর্যন্ত তাঁর বৈপ্লবিক যুদ্ধগুলির প্রসংশা মুক্তকণ্ঠে প্রচার করতেন। ১৮২৩ সালে স্পেনে ও দক্ষিণ আমেরিকায় গণতান্ত্রিক বিপ্লব জয়ী হবার পর রামমোহনের নেতৃত্বে কলকাতায় এক সাধারণ ভোজসভায় সমর্থন জানানো হয়। ১৮৩০ সালে ফরাসী বিপ্লবের সময়ও রামমোহন এই বিপ্লবকে প্রকাশ্যভাবে সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন। এই দ্বিতীয় ফরাসী বিপ্লবকে কলকাতার শিক্ষিত সমাজ ১০ই ডিসেম্বর, ১৮৩০ সালে টাউন হলের সভায় অভিনন্দন জানিয়েছিলেন, এবং এই বিষয়ে তাঁরা এতই উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিলেন যে, ২৫শে ডিসেম্বর খৃষ্টের জন্মোৎসবের দিন অক্টারলোনি মনুমেন্টের উপর ফরাসী দেশের বৈপ্লবিক পতাকা উড়িয়ে দিয়েছিলেন। "ফরাসী বিপ্লবের অনুরূপ বিপ্লব ভারতেও ঘটুক এই আশা হিন্দু কলেজের অনেক ছাত্র তাঁদের হৃদয়ে পোষণ করতেন। এবং এই চিন্তাধারাই ভারতীয় সমস্যা আলোচনা প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রবন্ধে 'জনৈক বৃদ্ধ হিন্দু'র নামে 'বেঙ্গল হরকরা'তে ১৮৪৩ সালে প্রকাশিত হয়।[২]

তৎকালীন ইংরেজ শাসকদের মুখপত্র 'ফ্রেণ্ড্ অব ইণ্ডিয়া' বাঙ্গালী 'নেটিভদের' এই 'ঔদ্ধত্য' সহ্য করতে পারেনি। বাঙ্গালীদের থিয়ার্স্ ও এলিসনের বই পড়বার

১। "ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার : ইষ্টার্ন বেঙ্গল এণ্ড আসাম", পৃঃ ৩২৩।

২। বিমানবিহারী মজুমদার : "হিষ্ট্রি অব পলিটিক্যাল থট ইন ইণ্ডিয়া", পৃঃ ৮৪।

উপদেশ দিয়ে ১৬ই মার্চের (১৮৪৩) সংখ্যায় উক্ত পত্রিকায় বিপ্লবের ভয়াবহতা প্রমাণ করবার জন্য বলা হয়েছিল যে, বিপ্লব যদি ঘটে "তা হলে হুগলী নদীতে রক্তের বন্যা বয়ে যাবে, আর ট্যাঙ্ক স্কোয়ারে একটা চিরস্থায়ী গিলোটিন স্থাপিত হবে।"[১]

পরবর্তীকালে কার্ল্ মার্ক্সের রচনাবলী সারা পৃথিবীর মানুষকে যে প্রেরণা দিয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মার্কিন স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেরণাদাতা টমাস্ পেইনের 'এইজ অব রিজন' ও 'রাইটস্ অব ম্যান' কতকটা সেই কাজ করেছিল। পেইনের চিন্তাধারা তখনকার শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল সে সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শী পাদ্রী ডাফ্ লিখেছিলেন :

"কেবলমাত্র একটা জাহাজেই এক হাজার সংখ্যা 'এইজ অব রিজন' কলকাতায় এসে পৌঁছল, প্রথম দিকে প্রতিটি বই এক টাকা করে বিক্রী হচ্ছিল ; কিন্তু এই বইএর চাহিদা এতই বেশী ছিল যে, দেখতে দেখতে এর দাম অনেক বেড়ে গেল। ··· কিছুদিনের মধ্যে পেইনের সব লেখার একটা সস্তা সংস্করণ প্রকাশিত হল।"

বৈপ্লবিক চিন্তাধারার এই প্রচার কার্য, যা শুরু হয়েছিল রামমোহনের সময়কাল থেকে, তা আরও বিস্তার লাভ করেছিল উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ দশকে। এই কাজে অগ্রণী ছিলেন ডিরোজিওর অনুগামী ইয়ং বেঙ্গল দল, মাইকেল মধুসূধন দত্ত, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, অক্ষয় কুমার দত্ত, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। এঁদের মধ্যে অক্ষয়কুমার সব থেকে অগ্রগামী চিন্তাধারা প্রচার করতে থাকেন। তিনি বলেন, "মানুষের দারিদ্র্যই তার অপরাধ, অজ্ঞতা, রোগ ও দোষের জন্য দায়ী।" সমাজের বিভিন্ন মানুষের অবস্থার মধ্যে এত অধিক অসমতা দেখে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলেন। তিনি বলতেন, "সকল দেশের ধনী মহাজনরা চায় যে পৃথিবীর সব কিছু শ্রেষ্ঠ জিনিস তাহারাই উপভোগ করুক, আর তাদের ভোগের বস্তু সরবাহ করার জন্য অন্যেরা সকলে ক্রীতদাসের মতো খেটে চলুক। যে সমাজে অধিকাংশ লোককে মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে রাজার হালে রাখবার জন্য দিনরাত্র ভূতের বেগার খাটতে হয়, সেই সমাজের কোনো উন্নতি হতে পারে না। ভগবান সকল শ্রেণীর লোককেই বুদ্ধি ও ধর্মপ্রাণতা দিয়েছেন, কিন্তু দারিদ্র্য ভগবানদত্ত এই গুণগুলির উৎকর্ষ সাধন থেকে মেহনতী মানুষকে বঞ্চিত করেছে।"[২]

১। বিমানবিহারী মজুমদার : 'হিস্ট্রি অব পলিটিক্যাল থট ইন ইণ্ডিয়া,'' পৃঃ ৮৪।

২। ঐ, পৃঃ ১৫৩।

১৮৪২-এ স্থাপিত ইয়ং বেঙ্গলের মুখপত্র 'বেঙ্গল স্পেকটেটর' ও ১৮৫৩ সালে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত 'হিন্দু পেট্রিয়ট' উক্ত ধরনের চিন্তাধারার প্রচার কার্য চালিয়ে যাচ্ছিল। ১৮৫৭-র বিদ্রোহের সময় 'হিন্দু পেট্রিয়ট'ই বাঙ্গালী প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের সব থেকে প্রিয় ও শক্তিশালী মুখপত্র ছিল। বিদ্রোহকালে হরিশচন্দ্র তাঁর এই সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের মারফত ভারতীয়দের উপর বৃটিশের নৃশংসতার তীব্র প্রতিবাদ করতে কখনও পশ্চাৎপদ হননি। ১৮৫১ সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদকতায় সর্বমতের লোক নিয়ে কলকাতায় 'বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' স্থাপিত হলে ভারতের নানাপ্রকার জাতীয় দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন শুরু হয়েছিল। ১৮৫৩ সালের চার্টার অ্যাক্ট পাস হবার সময় অনেকেই আশা করেছিলেন যে, ভারতবাসীর অনেক দাবি বৃটিশ শাসকরা মেনে নেবে, কিন্তু তা না হওয়াতে ভারতীয় বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর মধ্যে বিক্ষোভ বেড়ে যেতে থাকে এবং এই নিয়ে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন আন্দোলনও চালিয়ে যেতে থাকে।

তৎকালীন বাংলার কৃষক সমাজের মধ্যেও অসন্তোষের অভাব ছিল না। সরকার, জমিদার, নীলকর ও মহাজনদের শোষণ ও অত্যাচারের ফলে তাদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছিল। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে তাদের কেউ নেতৃত্ব দিলেই যে তারা বিদ্রোহে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করত তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিছু পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি যে ২৬শে ফেব্রুয়ারিতে যখন বহরমপুরে সিপাহীদের মধ্যে বিদ্রোহ হয় তখন মুর্শিদাবাদের জনসাধারণ নবাবের মুখ থেকে একটি কথার জন্য অপেক্ষা করেছিল। বাংলার দুর্ভাগ্য যে নবাবের নিকট থেকে, কিম্বা অন্য কোনো ব্যক্তি বা সংগঠনের নিকট থেকে বিদ্রোহের নির্দেশ আসেনি। বহরমপুরে ও পরে ব্যারাকপুরের সিপাহীদের বিদ্রোহের সংবাদে নদীয়া, চব্বিশ পরগনা, বর্ধমান, যশোহর, বাঁকুড়া, বীরভূম ও অন্যান্য জেলাগুলিতে জনসাধারণ যে খুবই চঞ্চল হয়ে উঠেছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এ সম্পর্কে ও. ম্যালী তাঁর 'বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স'-এ লিখেছেন যে, বহরমপুরের বিদ্রোহের খবর ছড়িয়ে পড়া মাত্রই একটা অস্বস্তিকর আবহাওয়া কৃষ্ণনগর, যশোহর ও সমগ্র ডিভিসনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল।—(ডিসট্রিকট গেজেটিয়ার—নদীয়া, পৃঃ ৩২)। বাঁকুড়া জিলায় সাঁওতাল ও চুয়াড়দের মধ্যে যে কোনো সময় বিদ্রোহের সম্ভাবনা আছে বলে কর্তৃপক্ষ আশঙ্কা করছিলেন।—(ঐ, বাঁকুড়া, পৃঃ ৪১)।

এইরূপ অবস্থায় বাংলায় একটা বিরাট সম্মিলিত সিপাহী ও কৃষক বিদ্রোহের সংগঠন ও পরিচালনা করা খুব শক্ত কাজ ছিল না। কিন্তু তৎকালীন বাঙ্গালী

বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর লোকেরা এই বিদ্রোহে বর্তমান যুগোপযোগী গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব দিতে স্বক্ষম হলেও তাঁরা সম্পূর্ণভাবে নিষ্ক্রিয়ই রয়ে গেলেন। ইতিপূর্বে তাঁরা আমেরিকার বিপ্লব, ফরাসী বিপ্লব ইত্যাদি সম্বন্ধে কম আলোচনা করেননি, কিন্তু একদিন যে তাঁদের তদনুরূপ বিপ্লবের সম্মুখীন হতে হবে এ কথা বোধ হয় তাঁরা স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি! তা ছাড়া, কিছুকাল থেকে তাঁরা দলে দলে ইংরেজ সরকারের চাকুরীতেও ঢুকে পড়ছিলেন। "ডিরোজীওর অনেক ছাত্রকে সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ করার ফলে আদর্শবাদী চরমপন্থীদের স্থান ক্রমশঃ শূন্য হতে থাকে। ১৮৩৩ সালের চার্টার অ্যাক্ট অনুসারে ১৮৪৫-এ কতকগুলি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ সৃষ্টি করা হয় এবং ঐ সব পদে হিন্দু কলেজের ভাল ভাল পূর্বতন ছাত্রদের নিয়োগ করা হয়।"[১] এই ভাবে সরকারী চাকুরী গ্রহণ করে ইংরেজী শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকেরা ভারতবর্ষের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগলেন।[২]

আর এক শ্রেণীর লোক যাঁদের ডাকে বাঙ্গালীরা সেই সময়ে বিদ্রোহের দিকে অগ্রসর হতে পারত তাঁরা হলেন বাংলার শক্তিশালী জমিদার শ্রেণী—যা ঘটেছিল অযোধ্যায় ও অন্যান্য স্থানে। কিন্তু কতকগুলি ঐতিহাসিক কারণে বাংলায় তা ঘটা সম্ভব ছিল না।

বাংলায় ইংরেজ শাসনের প্রথম দিকে, অর্থাৎ প্রায় ১৮০০ সাল পর্যন্ত, অনেক প্রাচীন ও প্রতিপত্তিশালী জমিদার বংশ ইংরেজের বর্ধিত খাজনা দিতে অক্ষম

১। বিমানবিহারী মজুমদার: "হিস্ট্রি অব পলিটিকাল থট ইন ইণ্ডিয়া", পৃঃ ৯৬।

২। "বাঙ্গালীর অগ্রগতির পথে" নামক এক প্রবন্ধে ('প্রবাসী' ভাদ্র, ১৩৬২) বাঙ্গালীর বর্তমান দুর্দশার কথা 'আলোচনা প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার গর্বের সঙ্গে বলেছেন যে বৃটিশ আমলে বাঙ্গালীদের অবস্থা কত অগ্রসর ছিল—"আমাদের প্রপিতামহদের সময় এমন একদিন ছিল, যখন বাঙ্গালীরা প্রাণের আগ্রহে ইংরেজী শিক্ষালাভ করিয়া নিজ বুদ্ধি ও হৃদয়বল খাটাইয়া ভারতের সর্বত্রই ইংরেজী শাসনযন্ত্রের অত্যাবশ্যক সহায়ক হইয়া ছড়াইয়া পড়ে, আর ধনে মানে বাড়িয়া উঠে। কোয়েটা হইতে ভামো পর্যন্ত বাঙ্গালী কমিসারিয়েট, গোমস্তা, ডাক কর্মচারী, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, ডাক্তার, কেরানীতে ভরা ছিল। ঝান্সীর রানী লক্ষ্মীবাঈ যখন বিদ্রোহ করিলেন তখন সেই শহরে বাঙ্গালী ডাক কর্মচারী, পথ বিভাগের কেরানী ইত্যাদি ছিল। বিদ্রোহী সিপাইরা তাহাদের মারপিট করিয়া বন্দী করিল ইংরেজের বন্ধু বলিয়া।" স্যার যদুনাথের এই মন্তব্য প্রসঙ্গে এখানে এটুকু বলা প্রয়োজন যে, ঝান্সীতে যেদিন সিপাহীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে ইংরেজদের হত্যা করতে শুরু করে সেইদিন একজন বাঙ্গালী ডাক কর্মচারী কয়েকজন ইংরেজকে তার বাড়িতে আশ্রয় দিয়ে প্রভুভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিল। সিপাহীরা তা জানতে পেরে এই বাঙ্গালী প্রভুভক্তটিকে খুব প্রহার করে। সিপাহীরা ঝান্সী ত্যাগ করে দিল্লী অভিমুখে রওনা হয়ে যাবার পর রানী লক্ষ্মীবাঈ ওখানকার সকল বাঙ্গালীদের বাংলায় ফিরে আসবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

হওয়ায় ক্রমশঃ ঋণের দায়ে ধ্বংস হয়ে যায় কিম্বা খর্ব হয়ে যায়। ১৭৯৫ সালে নদীয়া রাজের খাজনা বাকি পড়ায় সেই জমিদারী কয়েক বছরের জন্য ট্রাস্টির হাতে দেওয়া হয়। ১৭৯৩ সালে বাকি খাজনার দায়ে-নাটোরের রাজাকে তাঁর নিজের বাড়িতে বন্দী করে রাখা হয়। বীরভূম ও রাজসাহীর জমিদারদের অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়ে। ১৮০০ সালে দিনাজপুরের রাজবংশের প্রায় সব সম্পত্তি নিলাম হয়ে যায়। এইভাবে পুরাতন জমিদাররা অনেকেই—যদিও সকলেই নয়, বেশীর ভাগও নয়—তাঁদের জমিদারী হারালেন। কিন্তু ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কায়েম হবার পর থেকে বাংলার জমিদারদের অবস্থার আমূল পরিবর্তন হল। বাস্তবিক পক্ষে জমিদারী অত্যন্ত লাভজনক হয়ে দাঁড়াল। তাই ইংরেজের আওতায় যত সব বণিক, মহাজন, ব্যবসাদার, বেনিয়ান, দালাল, মুৎসদ্দি কিছু কিছু টাকার মালিক হয়েছিল তারা জমিদারী, পত্তনি কিনে জমিদার হয়ে বসতে লাগল।

অতীতে জমিদাররা ছিলেন রাজস্ব আদায়কারী। তখন দেশীয় রীতি অনুসারে খোদখাস্ত প্রজাদের বংশানুক্রমে চাষের ও বাসের ভূমির উপর অধিকার ছিল। তা থেকে জমিদাররা তাদের বঞ্চিত করতে পারত না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারদের শ্রেণী-চরিত্রের মৌলিক রূপান্তর ঘটল—তাঁরা সম্পূর্ণভাবে জমির মালিক হয়ে পড়লেন। এই নতুন ব্যবস্থার ফলে জমিদারের অত্যাচার ও শোষণের ক্ষমতা—যা পূর্বে অনেকখানি সঙ্কুচিত ছিল—দুর্দম ভাবে বেড়ে গেল। প্রজাদের রক্ষণ করার কিম্বা আর কোনো কিছুর দায়িত্বই রইল না। প্রজাদের উচ্ছেদ করা, খাজনা বৃদ্ধি করা, যে কোনো রকমের আবওয়াব আদায় করা, মধ্যসত্বভোগীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা ইত্যাদি সব কিছুরই অধিকার পেলেন জমিদাররা। ইংরেজরা বাংলার জমিদারদের আরও অনেক ক্ষমতা দিয়েছিলেন। গভর্নর জেনারেল, ৭ই ডিসেম্বর, ১৭৯২, তাঁর রিপোর্টে বলেন: "জমিদারদের (বর্ধমান, নদীয়া ও অন্যান্য অঞ্চলের) গ্রামের আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য থানাদার, পাইক ইত্যাদি নিযুক্ত করার অধিকার দেওয়া হয়েছিল। তার ব্যয়ভার বহনের জন্য সরকার পৃথক ব্যবস্থা করেছিল। ...যেসব জমিদারদের উপর এই দায়িত্ব দেওয়া হল তাঁরা তা সৎভাবে পালন করা প্রয়োজন বোধ করলেন না। পেশাদার ডাকাতদের তাঁরা থানাদার নিযুক্ত করতেন। এই থানাদাররা লুটতরাজ করার কাজেই তাঁদের সাহায্য করত। বড় বড় ডাকাতের দলগুলির সঙ্গে জমিদারদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সর্বত্র দেখা যায়।"[১]

১। এইচ. বেরী: "জমিন্দারী সেটেলমেন্ট অব বেঙ্গল", পৃঃ ২৬১।

ওয়েলবি জ্যাক্‌সন তাঁর রিপোর্টে লিখেছিলেন: "জমিদারদের লাঠিয়ালরা অধিকাংশই বাঙ্গালী নয়, উত্তর পশ্চিম ও বিহারের বাছাই বাছাই ভাড়াটে গুণ্ডা। জমিদারেরা এই সব বিহারী ও পাঠান লাঠিয়ালদের বেতন দিয়ে রাখতেন প্রজাদের উপর অত্যাচার করার জন্য।"[১] এই সমস্ত লাঠিয়ালদের কেবলমাত্র বাঙ্গালী কৃষকদের উপর অত্যাচার করবার জন্যই নিয়োজিত করা হত তা নয়,—১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের সময় এই সব ভাড়াটিয়া লাঠিয়ালদেরই পাঠিয়েছিলেন বাংলার জমিদাররা সিপাহীদের হাত থেকে তাঁদের ইংরেজ প্রভুদের এবং নিজেদের জমিদারী বাঁচাবার জন্য।

ভারতে জাতীয় সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘটবার বহু পূর্বেই গভর্নর জেনারেল উইলিয়াম বেনটিঙ্ক (১৮২৮-৩৫) বাংলার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথার তাৎপর্য পরিষ্কারভাবে বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি একটি বক্তৃতায় বলেছিলেন: "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা যদিও অনেক বিষয়ে এবং বিশেষ করে এর গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু যদি ভারতে গণবিক্ষোভ বা বিপ্লবের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার কথা ভাবা যায়, আমি নিশ্চয়ই বলব যে, এই প্রথায় অন্ততঃ একটি সুফল হয়েছে এই যে, এতে বহু-সংখ্যক শক্তিশালী ও ধনী জমিদার সৃষ্টি হয়েছে যারা ভারতে বৃটিশ শাসন বাঁচিয়ে রাখতে ব্যগ্র ও যারা জনসাধারণকে সম্পূর্ণভাবে দমন করে রাখতে সক্ষম।"

বেনটিঙ্ক কোনো অত্যুক্তি করেননি। ১৮৫৭ সালে বিদেশী শাসন ও শোষণের হাত থেকে ভারতকে মুক্ত করবার জন্য জাতীয় মহাবিদ্রোহ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলার জমিদাররা তাদের সমস্ত শক্তি নিয়ে ইংরেজ সরকারকে রক্ষা করবার জন্য তাদের পাশে এসে দাঁড়ালেন। বিদ্রোহীরা জয়ী হলে ইংরেজের এই পোষ্য জমিদাররাও যে ধ্বংস হয়ে যাবে তা তাঁরা আপন স্বার্থ ও সংস্কারবশে যেন বুঝতে পেরেছিলেন। "১৮৫৫ সালে সাঁওতাল বিদ্রোহের সময় বর্ধমানের মহারাজা ইংরেজ বাহিনীকে যানবাহন ও খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করে সাহায্য করেছিলেন। ১৮৫৭-এ সিপাহী বিদ্রোহের সময় মহারাজা তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়ে সরকারের শক্তি বৃদ্ধি করেছিলেন। তিনি সরকারকে প্রচুর হাতী ও গরুর গাড়ি দিয়েছিলেন এবং বর্ধমান থেকে কাটোয়া ও বর্ধমান থেকে বীরভূম পর্যন্ত সব রাস্তাঘাটগুলি আমাদের জন্য নিরাপদ রেখেছিলেন, যার ফলে রাজধানীর সঙ্গে বহরমপুর ও বীরভূম প্রভৃতি উত্তেজিত অঞ্চলগুলির যোগাযোগ ও খবরাখবর রাখতে ব্যাঘাত ঘটেনি।"[২]

১। এইচ. বেরী: "জমিন্দারী সেটেলমেণ্ট অব বেঙ্গল", পৃঃ ২৭১।

২। ও'ম্যালী: "বেঙ্গল ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার—বর্ধমান", পৃঃ ৩৮।

নোয়াখালিতে চট্টগ্রামের বিদ্রোহের খবর পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে ওখানকার ম্যাজিস্ট্রেট সাইমন ২,০০০ সশস্ত্র লোক নিয়ে প্রস্তুত হয়ে রইলেন। "এই সব সশস্ত্র লোকদের ভুলুয়ার রাজারা, প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ পাঠিয়েছিলেন। ভুলুয়া রাজার শক্ত দেওয়াল দিয়ে ঘেরা পাকা কাছারি বাড়ি আমাদের ব্যবহারের জন্য রাজারা ছেড়ে দিলেন—এইটাই আমাদের দুর্গ হল।"[১]

তৎকালীন একজন বেনামী লেখক বলেছেন—"এই রাজাদের বাংলা প্রদেশের উত্তরে ও দক্ষিণে সর্বত্র জমিদারী রয়েছে এবং বিদ্রোহের ফলে অন্য রাজাদের থেকে তাঁদের বেশী ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু তাঁদের জমিদারীর ভেতর যখনই কোথায়ও কোনো গণ্ডগোল হয়েছে তৎক্ষণাৎ তাঁদের কর্মচারীরা সরকারের সাহায্যে তা দমন করেছে। সরকার মুক্তকণ্ঠে তাঁদের সাহায্যের কথা স্বীকার করেছেন এবং সম্প্রতি সংবাদপত্রে আমরা দেখতে পেয়েছি যে, একস্থানে সরকারী কর্মচারীরা যেখানে ব্যর্থ হলেন সেখানে এই রাজাদের একজন নায়েব অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন ও তার জন্য সরকার তাঁকে পুরস্কৃত করেছেন।"[২]

চট্টগ্রামে সিপাহীরা বিদ্রোহ করার পর চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, নোয়াখালি প্রভৃতি অঞ্চলে আবার নতুন করে চতুর্দিকে একটা প্রচণ্ড আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। এই সময় ত্রিপুরার মহারাজা ও স্থানীয় জমিদাররা তাঁদের সৈন্য, পাইক, বরকন্দাজ ইংরেজের সাহায্যে পাঠিয়ে দিলেন। চট্টগ্রামের ম্যাজিস্ট্রেট লান্স তখন মফঃস্বলে ছিলেন। বিদ্রোহী সিপাহীরা শহর ছেড়ে চলে যাওয়ার পর এই সব জমিদারদের লাঠিয়াল, বরকন্দাজ নিয়ে তিনি পুনরায় বীরদর্পে চট্টগ্রামে প্রবেশ করলেন।[৩] বিদ্রোহের সময় ইংরেজকে সাহায্য করার জন্য ময়ূরভঞ্জের রাজাকে 'মহারাজা' উপাধি দেওয়া হয়েছিল ও সরকারকে দেয় তাঁর খাজনা অনেক পরিমাণে কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল।[৪] অন্যান্য জমিদাররাও নানাভাবে প্রভুভক্তির জন্য পুরস্কৃত হয়েছিলেন।

বিদ্রোহের চার পাঁচ দিন পর ১৫ই মে তারিখে জমিদাররা কলকাতায় এক সভা করে সরকারকে তাঁদের আনুগত্য জানান ও সর্বতোভাবে ইংরেজকে সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দেন। এই সভায় শোভাবাজারের রাজা বাহাদুর রাধাকান্ত দেব

১। "ইংলিশম্যান", ৩রা ডিসেম্বর ১৮৫৭।
২। 'হিন্দু' কর্তৃক লিখিত "মিউটনিজ এণ্ড দি পিপ্‌ল্", পৃঃ ১০০।
৩। "ইংলিশম্যান", ১৪ই ডিসেম্বর, ১৮৫৭।
৪। "ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার অব ইণ্ডিয়া,—বেঙ্গল", ২য়, পৃঃ ৪৪৩।

সভাপতিত্ব করেন ও পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর প্রভৃতি বড় বড় জমিদাররা সকলেই উপস্থিত ছিলেন।[১]

১৭ই জুন হুগলী জেলার ৫০ জন জমিদার ও মহাজন উত্তরপাড়ায় সভা করে ইংরেজ প্রভুদের জানালেন যে, যদিও ব্যারাকপুরে ১৯শ ও ৩৪শ সিপাহী বাহিনীদ্বয়কে বরখাস্ত করা হয়েছে, তবুও এই বরখাস্ত পশ্চিমা সিপাহীরা সুস্পষ্ট কারণবশতঃ তাদের দেশে ফিরে যাচ্ছে না, এবং যদি এই সব সিপাহীরা আক্রমণ করে ও জনসাধারণ তাদের সঙ্গে হাত মেলায় তা হলে একটা ভয়ঙ্কর অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। তাই শ্রীরামপুরে এক রেজিমেণ্ট ইংরেজ সৈন্য রাখার দাবি জানিয়ে জমিদাররা প্রস্তাব গ্রহণ করলেন, "আমরা যারা জমিদারী পেয়েছি—এতদ্বারা সরকারকে জানাচ্ছি যে আমরা সৈন্যবাহিনীতে রিক্রুট করার জন্য লোক জোগাড় করতে প্রস্তুত আছি।"[২] বাঁকুড়া, রাজসাহী, শ্রীহট্ট, বারাসাত, শান্তিপুর ইত্যাদি স্থানেও জমিদারদের এইরূপ সভা হয়।

জমিদারদের এই আশাতীত সাহায্যের জন্য লণ্ডনের টাইম্‌স্‌, ৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৮ সালে সম্পাদকীয় মন্তব্যে লেখে যে—"বাংলার জমিদার ও মহাজনদের সমবেত ধনসম্পদ লণ্ডনের লম্বার্ড স্ট্রীটকে কিনে নিতে পারে। তাঁদের জমিদারীর পরিমাণ দেখে একজন ইংরেজ ডিউকেরও হিংসার উদ্রেক হতে পারে। সরকারের নিকট আবেদন পত্রে যাঁরা স্বাক্ষর করেছেন তাঁদের একজন হচ্ছেন মুসলমানদের দ্বারা বঙ্গ বিজয়ের পূর্বেকার দক্ষিণ বঙ্গের পুরাতন হিন্দু রাজবংশের বংশধর। বর্ধমানের মহারাজা সরকারকে প্রতি বৎসর ৫০ লক্ষ টাকা রাজস্ব দিয়ে থাকেন। …আর শ্যামাচরণ মল্লিকের রাজভক্তির আংশিক কারণ হিসাবে এই ব্যাখ্যা করা যায় যে, তিনি হচ্ছেন বাংলা দেশে সব থেকে বড় কোম্পানি-কাগজের মালিক।"

বাঙ্গালী কৃষকরা কিন্তু তাদের সংগ্রামশীলতার পরিচয় ইংরেজ রাজত্বের প্রথম দিকে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সময় থেকেই দিয়ে আসছে। মহাবিদ্রোহের কয়েক বৎসর পূর্ব থেকে আবার তারা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। ১৮৩১-৩২ তিতুমীরের নেতৃত্বে ২৪ পরগনা, যশোহর, নদীয়ার কৃষকদের ব্যাপক বিদ্রোহ হয়েছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে তিতুমীরের মৃত্যুর পর এ আন্দোলন শুদ্ধ হয়ে যায়নি। বাংলার নীল চাষী ও অন্যান্য কৃষকদের এই আন্দোলন অনবরত চলতে থাকে ও অবশেষে তার পরিণতি ঘটে ১৮৫৮ সালে নীল বিদ্রোহে। ১৮৫৬ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহও বাংলার সীমান্তে কৃষক আন্দোলনের আর একটা পরিণতি।

১। "হিন্দু"—'মিউটিনিজ এণ্ড দি পিপ্‌ল্‌", পৃঃ ২১৬।

২। ঐ, পৃঃ ২২৮।

ভারতের আরও কতকগুলি স্থানের ন্যায় বাংলাতেও বিদ্রোহাত্মক ওয়াহাবী ও ফরাজী আন্দোলন এই সময় খুব জোরদার হয়ে ওঠে। হাণ্টার বলেন যে—"১৮৫৩ সালে এই আন্দোলন এতই ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে যে সরকারকে একটা বিশেষ তদন্ত কমিটি গঠন করতে হয়। বাংলার পুলিস বিভাগের কর্মকর্তা রিপোর্ট করেন যে এঁদের মাত্র একজন নেতার ডাকেই ৮০,০০০ লোক এক স্থানে জমায়েৎ হয়েছিল। তারা যে সকলেই সমান এই কথা ঐ নেতা তাদের নিকট ঘোষণা করেন। কয়েক বৎসর পর পাটনার ফালিফ ইয়াহিয়া আলি বাংলার ফরাজীদের ও উত্তর ভারতের ওয়াহাবীদের একত্রিত করেন এবং গত কয়েক বছরে এরা যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে মরেছে, সেই রকম আদালতেও অনেকে অভিযুক্ত হয়েছে।"[১]

বিদ্রোহের সময় নর্টন মাদ্রাজের 'মাদ্রাজ এথেনিয়ম' পত্রিকায় ও তাঁর পুস্তক 'টপিকস্ ফর ইণ্ডিয়ান স্টেটস্‌ম্যান'-এ লিখেছিলেন যে, বাঙ্গালীরা সরকারের বিরোধী ও তাদের রাজভক্তি কেবলমাত্র মৌখিক। তার উত্তরে 'ইণ্ডিয়ান ফিল্ড' নামক কলকাতার একখানি ইংরেজী পত্রিকা, ১৮৫৯ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি যা লিখেছিল তাতে বাংলার জমিদার ও কৃষক উভয়েরই ভূমিকা স্পষ্ট বোঝা যায়:

"মিঃ নর্টন বাঙ্গালীদের নিন্দা করে খুব অন্যায় করেছেন। তিনি লিখেছেন—'এখানে সেখানে দু'একজন বাঙ্গালী নেটিভকে দেখতে পাওয়া যায় যারা আমাদের প্রতি মৌখিক সহানুভূতি জানাচ্ছে, কিন্তু আমাদের এই ভয়ানক বিপদের সময়, তাদের কেউ কি ব্যক্তিগত ভাবে কিম্বা তাদের অর্থ দিয়ে আমাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে এসেছে? ··· তারা বিপদের ধার-কাছ দিয়েও যায়নি, তারা কোনো রকম কাজে সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে আসেনি, তারা বিনা ইম্‌প্রেসমেণ্ট আইনে আমাদের কোনো গরুর গাড়ি ইত্যাদি দেয়নি; তারপর দিল্লীর পতনের পর রাজভক্তি প্রকাশ করা মন্দ চালাকি নয়, আর তার ভাষাই বা কি রসাল। কিন্তু সত্য ঘটনা হচ্ছে যে, এই সব বিবৃতি ও মানপত্রগুলি নিছক ভণ্ডামি মাত্র।' ··· মিঃ নর্টনের মত একেবারেই ভ্রান্ত। মিঃ নর্টন যদি ইম্‌প্রেসমেণ্ট আইনের দ্বারা সজ্জিত হয়ে বাংলার যে কোনো একটি গ্রামে যেতেন, তা হলে নিশ্চয়ই দু'একটা ভাঙা গাড়ি ও কানা বলদ যোগাড় করতে পারতেন, কিন্তু একটাও কার্যোপযোগী গাড়ি কিম্বা বলদ পেতেন না। এইরূপ অবস্থা বুঝতে পেরে গভর্নমেণ্ট আর ইম্‌প্রেসমেণ্ট আইন ব্যবহার করেননি। সরকার জমিদারদের

১। হাণ্টার: "ইণ্ডিয়ান মুসলমানস্", কলকাতা এডিশন, পৃঃ ৯২

কাছে আবেদন করলেন এবং জমিদাররা রাজভক্তির সঙ্গে আমাদের সাহায্য করতে লাগলেন। তাঁরা গাড়ি ও গরুর মালিকদের টাকার প্রতিশ্রুতি দিলেন, তাদের পরিবারদের রক্ষা করবার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন, তাদের অগ্রিম টাকা দিলেন এবং আরও অনেক রকমের প্রলোভন দেখালেন, যা একমাত্র জমিদাররাই করতে পারেন। এর ফল হল এই যে, অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই রানীগঞ্জে ৭,০০০ গাড়ি জমায়েত করে ফেললেন। কলকাতার ইংরেজরা, যারা এত বড় বড় কথা বলেছে, তারা কি একটাও ঘোড়া কিম্বা গাড়ি দিয়েছিল? দিয়েছিল বলে আমরা কোনো দিন শুনিনি। ··· বাংলার জমিদাররা তাদের প্রত্যেকটি হাতী সরকারকে বিনা পয়সায় ছেড়ে দিয়েছিল; আমরা এমন উদাহরণও জানি যে, ইংরেজরা তাদের হাতী দিতে অস্বীকার করেছিল। প্রত্যেকেই জানেন যে, ঢাকায় যখন বিদ্রোহ হয় তখন জমিদাররা কি ভাবে লোকজন নিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটদের সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন। ··· তাঁদের ক্ষমতায় যা ছিল তার দ্বারা তাঁরা স্বেচ্ছায় ও সানন্দে সরকারকে সাহায্য করেছিলেন।"

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, একশ' বছরের ইংরেজ রাজত্বে বাংলা দেশে (এবং মোটামুটি বম্বে ও মাদ্রাজেও) ইংরেজের আওতায় তাদের সঙ্গে ব্যবসা করে এক শ্রেণীর লোক—বণিক, মহাজন, ব্যবসাদার, বেনিয়ান, দালাল, মুৎসদ্দি প্রভৃতি—কিছু টাকার মালিক হতে পেরেছিল, যে শ্রেণীর লোককে বলা হয় কম্প্রাডোর বুর্জোয়াজি, অর্থাৎ যারা বিদেশী বুর্জোয়া শ্রেণীর লেজুড় হয়ে গড়ে ওঠে, নিজেদের স্বাধীন পদ্ধতিতে নয়। এদের কোনো নিজস্ব স্বাধীন সত্তা না থাকায় এই শ্রেণীর লোক প্রভুদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নিজেদের সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন করার কথা চিন্তাও করতে পারত না। বাংলার কম্প্রাডোর বুর্জোয়াজির আর একটা বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, এদের অধিকাংশই ছিল আধা বুর্জোয়া, আর আধা জমিদার। ব্যবসায় কিছু টাকা করেই এরা জমিদারী কিনে বসত, আবার এই জমিদারীর টাকাই ব্যবসায়ে খাটাত। যোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয় ঠিকই বলেছেন যে, "সেকালে যত বড়লোক উদ্ভূত হয়েছিল তার অধিকাংশই এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফল। ইংরেজের আশ্রয়ে এক শ্রেণীর বাঙ্গালী আগেই বর্ধিত হয়ে উঠেছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফল তারাও অনেকটা ভোগ করতে পায়। এই শ্রেণীর বাঙ্গালী বড়লোকদের সঙ্গে কোম্পানির বড় বড় চাকরদের বেশ দহরম মহরম ছিল। সামাজিক মেলামেশা এদের দৈনন্দিন ব্যাপার ছিল। ··· ইংরেজ অধিকৃত অঞ্চলে, বিশেষতঃ বাংলা দেশে যে শ্রেণীর বড়লোকের সৃষ্টি হল তারা ইংরেজকে পরিত্রাতা বলেই গণ্য করতে লাগল। কোনো দিন ইংরেজদের স্বার্থে

ও তাদের স্বার্থে যে সংঘাত উপস্থিত হতে পারে এ তারা তখন ধারণাই করতে পারেনি।"[১]

তাই মহাবিদ্রোহের সময় বাংলার জমিদারদের মতো এই কম্প্রাডোর বুর্জোয়া শ্রেণীও (শুধু বাংলাতেই নয়, বম্বে ও মাদ্রাজেও) যে ইংরেজের পাশে এসে দাঁড়াবে তাতে আর আশ্চর্য কি? বিশেষ করে, ইংরেজের এই যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় ইংরেজ বাহিনীর জন্য খাদ্যদ্রব্য ও নানা রকম জিনিসপত্র উচ্চমূল্যে সরবরাহ করে নিজেদের মুনাফার পাহাড় গড়ে তোলার এই যে মহাসুযোগ, তা তারা ছেড়ে দেয় কি করে? কোনো স্বাধীন দেশের মহাস্বদেশপ্রেমিক ধনিক-বণিকরা এ রকম মওকা ছেড়ে দেয় না; তা ছাড়া, এই সব লেজুড় শ্রেণীগুলির স্বদেশ বলে তো কোনো বস্তুর বালাই-ই ছিল না!

তখনকার ইয়ং বেঙ্গল ও প্রগতিবাদীদের যোগসূত্র ছিল এই কম্প্রাডোর বুর্জোয়াজি ও জমিদার শ্রেণীর সঙ্গেই। এঁদের অনেকেই ছিলেন ঐ সম্প্রদায়ভুক্ত, (নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণী এদেরই নেতৃত্ব মেনে চলত; তারা তখনও শক্তিশালী হয়ে উঠেনি)। তার উপর আবার এঁরা সংখ্যায়ও ছিলেন অল্প। তাই এদের দৌড়ও খুব বেশী দূর পর্যন্ত ছিল না। চাকুরী পাবার সঙ্গে সঙ্গে অনেকের মনের বিপ্লবী আগুন স্তিমিত হয়ে গেল। তাঁরা ভল্‌টেয়ার, রুশো, পেইনের বুর্জোয়া বিপ্লবী চিন্তাধারা আলোচনা করতেন বটে, কিন্তু বৃটিশ শাসন থেকে নিজেদের মুক্ত করবার জন্য নিজেদের বিদ্রোহ কিম্বা বিপ্লব করতে হবে, তা কখনও তাদের মানসপটে উদয় হয়নি। তাই এ সম্বন্ধে যোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয়ের উক্তি কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। তিনি বলেছেন: "এখানে একটি কথা মনে রাখা আবশ্যক। নব্যদল রাজনীতিতে চরমপন্থী হলেও বৃটিশ শাসনকে সর্বদা স্বীকার করে নিয়েই তবে সব রকমের আলোচনা চালিয়েছেন।"[২] অর্থাৎ বুর্জোয়া বিপ্লবকে বাদ দিয়ে বুর্জোয়া রাজনীতি, আসল বস্তুটিকে বাদ দিয়ে আর অন্য সব কিছু গ্রহণ করা, এই ছিল তখনকার প্রগতিবাদীদের পন্থা। (শুধু তখনই নয়, পরবর্তীকালেও এইরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নেই)।

যোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয় তাঁর বিস্তৃত সমালোচনায় একেবারে ঠিক জায়গায় আঘাত করেছেন। তিনি আরও বলেছেন: "বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের প্রচেষ্টা বা 'নীল বিদ্রোহে'র সঙ্গে সিপাহী যুদ্ধের পার্থক্য মূলগত। প্রথম দুটি আন্দোলন চলেছিল (বৃটিশ) গভর্নমেণ্টের কর্তৃত্ব স্বীকার করে। গভর্নমেণ্টের নিকট ন্যায় বিচার পাওয়া যাবে এই আশায়ই এদের পরিচালকগণ সকল কাজ

১। যোগেশচন্দ্র বাগল: "মুক্তির সন্ধানে ভারত", পৃঃ ১২। ২। ঐ, পৃঃ ৫৩।

নিয়ন্ত্রিত করেছেন। কিন্তু সিপাহী যুদ্ধের প্রকৃতি হল ভিন্ন রূপ। এ একেবারে ইংরেজের কর্তৃত্ব অস্বীকার করে নিজেই প্রভু হতে চাইলে, আর ইংরেজ শাসনের ভিত্তি মূলে প্রবল ভাবে ধাক্কা দিলে।"[১]

এখানে বলে রাখা ভাল যে, তখনকার ইয়ং বেঙ্গল ও প্রগতিবাদীদের অবদান অবশ্য স্বীকার্য। বর্তমানযুগীয় চিন্তাধারায় ও রাজনৈতিক আন্দোলনে তাঁরাই যে বাঙ্গালীকে প্রথম উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, বাঙ্গালীর নবজাগরণের মূলে যে তাঁরাই ছিলেন, তাকে কে অস্বীকার করতে পারে? কিন্তু তাই বলে তাঁদের দুর্বলতা সম্বন্ধে অন্ধ হয়ে থাকলে, অথবা তাঁদের কথা ও কাজের মধ্যে বৈপরীত্য ও বৈষম্যগুলিকে ভ্রান্ত ব্যাখ্যা দ্বারা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলে প্রগতিশীল চিন্তা-ধারার পূর্ণ বিকাশের মূলেই কুঠারাঘাত করা হবে। দুঃখের বিষয় শ্রদ্ধেয় শ্রীগোপাল হালদার মহাশয় তাঁর 'আজি হতে শতবর্ষ পূর্বে'[২] প্রবন্ধে ঠিক এই রকমই একটা অস্পষ্ট চেষ্টা করেছেন। তাঁর বক্তব্যের সারাংশ হল এই ঃ

প্রথম, "শিক্ষিত বাঙ্গালীরা ইংরেজের কাছ থেকে অনেক উপকার পেয়েছে; কৌশল হিসাবে রাজানুগত্য প্রকাশ করাই তাই স্বাভাবিক। মনে হতে পারে —এ কারণেই বাঙ্গালী শিক্ষিত শ্রেণী রাজা রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে সিপাহী বিদ্রোহের বিরোধিতা ঘোষণা করে থাকবেন; আর 'হিন্দু পেট্রিয়টের' পাতায় বিদ্রোহকালে করেছেন মৌখিক নিন্দা, আর বিদ্রোহ-শেষে ইংরেজদের প্রতিহিংসা-পরায়ণতার বিরুদ্ধে আন্তরিক প্রতিবাদ। ··· রাজনীতিতে সেরূপ কৌশল একেবারে অগ্রাহ্য নয়।" বিদ্রোহের যারা সক্রিয় বিরোধিতা করেছিল তারা পুরাতন ল্যাণ্ডহোল্ডার্স এসোসিয়েশনের জমিদার ও কম্প্রাডোর বুর্জোয়ারাই প্রধান এবং রাজা রাধাকান্ত দেব প্রভৃতি তাঁদের অগ্রণী। সাধারণতঃ বাঙ্গালী শিক্ষিত শ্রেণী, বিশেষ করে মধ্যবিত্ত শিক্ষিতরা বিদ্রোহের বিপক্ষে ছিল এ কথা ঠিক বলা চলে না। তারা ছিল নিরপেক্ষ। 'হিন্দু পেট্রিয়টের' সম্পাদক হরিশ মুখোপাধ্যায় বিদ্রোহের প্রথম থেকেই তীব্র ভাষায় ইংরেজ শাসনের সমালোচনা করেছেন যে, এ বিদ্রোহ ইংরেজের শোষণ ও অত্যাচারের ফলেই ঘটেছে এবং তিনিই বারবার বলেছেন যে এটা একটা জাতীয় বিদ্রোহ। তিনি বিদ্রোহীদের কতকগুলি কাজের নিন্দা করলেও, বিদ্রোহের নিন্দাটা তিনি বরং এড়িয়েই গিয়েছেন। তাঁর লেখা থেকে যে উদ্ধৃতিগুলি কিছু পূর্বে দেওয়া হয়েছে তার থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যাবে।

দ্বিতীয়, "স্বার্থবশে ও বিপদের ভয়ে বাঙ্গালী শিক্ষিত শ্রেণী সিপাহী বিদ্রোহ থেকে দূরে ছিলেন, আর সেই বিপদের ভয় তত নেই বলে নীল বিদ্রোহে এগিয়ে

১। যোগেশচন্দ্র বাগল ঃ "মুক্তির সন্ধানে ভারত", পৃঃ ৭৫। ২। 'পরিচয়', চৈত্র, ১৩৬৩।

গিয়েছেন, এরূপ কল্পনা করতে অনেক বাধা আছে। শিক্ষিত শ্রেণীর সমস্ত বিকাশধারাই সেরূপ সিদ্ধান্তের বিরোধী।” নিজেদের ও শ্রেণীর স্বার্থবশেই ও বিপদের ভয়েই এক শ্রেণীর শিক্ষিত বাঙ্গালী, অর্থাৎ ইংরেজের পোষ্য জমিদার ও ধনীরা যে ইংরেজের দিকে গিয়েছিল তার প্রমাণের অভাব নেই, এবং এই শ্রেণীর লোকদের হাতেই ছিল তখনকার বাংলার রাজনৈতিক নেতৃত্ব।

তৃতীয়, “ব্যক্তি বা শ্রেণীগত লাভ-লোকসানের হিসাব করে তাঁরা সিপাহী বিদ্রোহের প্রতি বিরূপ হননি, আসলে সিপাহী বিদ্রোহই তাঁদের হৃদয়মন, বুদ্ধি ও চেতনা স্পর্শ করতে পারেনি। ··· ১৮৫৭-৫৮-তে সামন্ত প্রতিক্রিয়া হিসাবে দেখে তাঁরা সিপাহী বিদ্রোহের প্রতি উদাসীন ছিলেন—অথচ স্বাধীনতা হীনতায় বাঁচিতে চান মোটেই এমন নয়। বরং বুঝতে পেরেছেন কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিদ্রোহের পথে স্বাধীনতা অসম্ভব। তাই সিপাহী বিদ্রোহের নিষ্ফলতায়ও তাঁরা ব্যাহতবোধ না করে নীল আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।”

গাড়িটাকে আগে আর ঘোড়াটাকে পিছনে দাঁড় করিয়ে দিলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়, এ যেন তাই—জোর জবরদস্তি করেও অগ্রসর হওয়া যায় না। অশিক্ষিত ও ‘কুসংস্কারাচ্ছন্ন’ সিপাহী ও জনসাধারণ বুর্জোয়া চিন্তাধারার বাহক ও যুগধর্মের ধ্বজাধারীদের হৃদয়মন, বুদ্ধি ও চেতনা স্পর্শ করবে, না শিক্ষিতরাই সাধারণ মানুষকে নেতৃত্ব দিয়ে তাদের তখন বুর্জোয়া বিপ্লবের দিকে নিয়ে যাবে? ‘সিপাহী বিদ্রোহ’ ও ‘নীল আন্দোলন’কে পরিমাণগত ও গুণগতভাবে কি সমপর্যায়ে ফেলা যায়? তার উত্তর কিছু পূর্বে যোগেশচন্দ্র বাগলের উদ্ধৃতিতেই দেওয়া হয়েছে। ‘সিপাহী বিদ্রোহ’ ছিল বিদেশী ইংরেজ শাসনকে সমূলে ভারত থেকে উৎখাত করা। এখানে আপসের কোনো পথও নেই; হয় জয়ী হতে হবে, নতুবা মৃত্যু অনিবার্য। ১৮৫৭-৫৮ সালে বিদ্রোহীরা যে সাহস, বীরত্ব ও আত্মোৎসর্গের পরিচয় দিয়েছিল তা শুধু অন্যান্য দেশের বৈপ্লবিক আন্দোলনগুলিতেই দেখা যায়। কিন্তু নীল আন্দোলনের গুরুত্বকে অস্বীকার না করেও, এবং তার বৈপ্লবিক দিকটাকে উপেক্ষা না করেও, এটা বলা চলে যে নীল আন্দোলন ছিল বিদেশী ইংরেজ শাসনকে মেনে নিয়ে আইনসঙ্গত উপায়ে একটা সংস্কার আন্দোলন; ইংরেজ শাসনকে ধ্বংস করার আন্দোলন তা নয়।

বাংলা দেশে মহাবিদ্রোহের সময়, যে শ্রেণীর বাঙ্গালী মানসিক অগ্রগতির দিক থেকে এই জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে তৎকালীন যুগোপযোগী নেতৃত্ব দিতে সক্ষম ছিলেন, অর্থাৎ জমিদার ও বুর্জোয়া শ্রেণী, তারা এই সুবর্ণসুযোগ গ্রহণ করার পরিবর্তে বিদেশী শাসকদের গোলামিই বেছে নিলেন। উচ্চ চিন্তাধারায়

ও স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে যে তাঁরা ইংরেজদের দিকে যাননি তা বোঝা শক্ত নয়। কুসংস্কারাচ্ছন্ন সামন্ততান্ত্রিকতার প্রতি বীতশ্রদ্ধাবশতই যে তাঁরা বিদ্রোহের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন তা বলা একটা যুক্তিহীন, তথ্যহীন অসত্য। এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে বাংলার এই জমিদার ও কম্প্রাডোর বুর্জোয়ারা তাঁদের নিজেদের ব্যক্তিগত লাভের জন্য ও শ্রেণী স্বার্থের জন্যই নিজেদের দেশবাসীদের বিরুদ্ধে বিদেশী শাসকদের সাহায্য করেছিলেন—দেশের ও জাতির স্বার্থের জন্য নয়।

আর এক শ্রেণীর লোক, যাঁরা বিদ্রোহের অগ্রগামী নেতৃত্ব দিতে পারতেন তাঁরা হচ্ছেন বাংলার প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা। কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক, —সাহসের অভাব, চাকুরীর মোহ, সংখ্যার স্বল্পতা, জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্নতা, ইত্যাদি—এই বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক চিন্তাধারায় প্রভাবান্বিত লোকেরাও বিপ্লবের দিকে অগ্রসর না হওয়ার ফলে বিদ্রোহী মনোভাবাপন্ন বাংলার কৃষক শ্রেণী একক ও অসহায় হয়ে পড়ল, এবং ইচ্ছা সত্ত্বেও নেতৃত্বের অভাবে, সংগঠনের অভাবে, তারা বিদ্রোহের দিকে অগ্রসর হতে পারল না। শুধু বাংলা দেশেই নয়, ভারতের অন্যান্য স্থানেও, বিশেষ করে বম্বে ও মাদ্রাজে, ইংরেজী-শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরা সমশ্রেণীর বাঙ্গালীর মতো একই প্রকারের কাপুরুষতা, স্বার্থপরতা ও ঘৃণ্য দাস-মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েছিল। কৌশলের দোহাই দিয়ে, সিপাহীদের মধ্যযুগীয় কুসংস্কারাচ্ছন্নতার উপর দোষ চাপিয়ে দিয়ে এই শ্রেণীর কাপুরুষতা ও দাসসুলভ মনোভাবকে পর্দা দিয়ে ঢেকে রাখা যায় না, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাদের অবদান যত বড়ই হোক না কেন। এই শ্রেণীর লোকদের এইরূপ ব্যবহার, কেবলমাত্র ১৮৫৭ সালেই নয়, পরবর্তীকালেও জাতীয় সংকট মুহূর্তে আরও অনেকবার দেখা গিয়েছে।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা এই যে, এইরূপ ব্যবহার কেবলমাত্র ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী ও ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদেরই বৈশিষ্ট্য নয়; এটা একটা সর্বজাতিক বৈশিষ্ট্য—অনুরূপ অবস্থায় সর্বত্রই এই শ্রেণীর লোকদের একই প্রকারের ব্যবহার। বর্তমান সমাজ-বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা কার্ল মার্ক্স্ ও ফ্রেডারিখ্ এঙ্গেল্স্ ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বৈপ্লবিক আন্দোলনগুলি বিশ্লেষণ করে এই শ্রেণীর চরিত্র সম্বন্ধে যা বলে গিয়েছিলেন, ভারতেও ওই শ্রেণীর সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য হুবহু প্রজোয্য। এঙ্গেল্স্ লিখেছিলেন: "১৮৩০ সাল থেকে জার্মানিতে, ফ্রান্সে ও ইংল্যাণ্ডে সব রাজনৈতিক আন্দোলনেই অপরিবর্তনীয় ভাবে দেখা যায় যে এই শ্রেণীর লোক যতক্ষণ পর্যন্ত না কোনো বিপদ দেখা যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত খুব বড় বড় কথা বলছে, বড় বড় প্রতিজ্ঞা করছে ও এমন কি ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর শব্দও উচ্চারণ

করছে ; সামান্য বিপদ দেখার সঙ্গে সঙ্গেই তারা ভীত, সন্ত্রস্ত ও আপস ভাবাপন্ন হয়ে পড়ে ; আর যখনই দেখে যে তারা যে আন্দোলনকে তাতিয়ে তুলেছিল, সেই আন্দোলনকে অন্য শ্রেণীর লোকেরা অধিকার করেছে ও গুরুত্ব দিয়েছে, তখনই তারা আশ্চর্য, উদ্বিগ্ন ও দোদুল্যমান হয়ে পড়ে ; আর যখনই অস্ত্র ধারণ করে যুদ্ধ করার প্রশ্ন ওঠে তখনই এই ক্ষুদে বুর্জোয়ারা তাদের সংকীর্ণ-অস্তিত্বের স্বার্থে সমগ্র আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে ; এবং সর্বশেষে, যখন প্রতিক্রিয়াশীলরা জয়ী হয়, তখন এরাই তাদের নিজেদের লঘুচিত্ততার জন্য বিশেষ করে বঞ্চিত ও নিপীড়িত হয়।”[১]

১। “করেসপণ্ডেন্স অব কার্ল মার্ক্‌স্ এণ্ড ফ্রেডারিখ্‌ এঙ্গেল্‌স্” (ন্যাশনাল বুক এজেন্সী লিঃ কলিকাতা), পৃঃ ২২।

মিরাট বিদ্রোহ

আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি যে, টোটার ব্যাপারে শুধু ব্যারাকপুরেই নয়, সমগ্র উত্তর ভারতে সিপাহীদের মন উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। আম্বালাতে মার্চ মাসে কয়েকজন ইংরেজ অফিসারের বাংলো পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। ঐ স্থানেই একদিন এপ্রিল মাসে যখন দুজন ইংরেজ অফিসার ৩৬শ বাহিনীর ব্যারাক পর্যবেক্ষণ করতে গিয়েছিলেন, ঐ বাহিনীর সুবাদার, তাঁদের 'স্যালিউট' করার পরিবর্তে, তাঁদের দিকে আঙুল দেখিয়ে ঘৃণা ও বিরক্তির সঙ্গেই বলেছিলেন যে—এই সব লোকগুলো আমাদের খৃষ্টান করবার চেষ্টা করছে। এই ঘটনার কিছুদিন পর, এন্‌ফিল্ড বন্দুক চালনার শিক্ষক লেফটেনাণ্ট মার্টিনকে একজন সিপাহী খুব মর্মাহত হয়ে জানালেন যে, যেহেতু তিনি টোটা ব্যবহার করেছেন, সেইজন্য তাঁর জাতি নষ্ট হয়েছে এবং কোনো সিপাহী তাঁর সঙ্গে আর একত্র খাবে না। উত্তর ভারতে প্রায় সর্বস্থানে সিপাহীদের মধ্যে এই নিয়ে একটা উত্তেজনা ও অসন্তোষ লক্ষ্যিত হচ্ছিল।

ভারতে বৃটিশ বাহিনীর কমাণ্ডার-ইন-চীফ, জেনারেল এনসন্ এই সময় সিমলায় যাওয়ার পথে আম্বালায় থামলেন। টোটার প্রশ্নে সিপাহীদের মন যে কতখানি চঞ্চল হয়ে উঠেছে তা তিনি সেখানে ভাল ভাবেই বুঝতে পারলেন। ২৩শে এপ্রিল প্যারেডের সময় 'টোটা শূয়র বা গরুর চর্বি মিশ্রিত নয়' এই বলে তিনি সিপাহীদের অনেক আশ্বাস দিলেন। প্যারেডের পর একদল সিপাহী প্রতিনিধি এসে তাঁকে জানালেন যে তাঁরা নিজেরা তাঁর কথায় বিশ্বাস করতে রাজী হলেও তাঁদের আত্মীয়স্বজনেরা করবে না, এবং তাঁরা যদি টোটা ব্যবহার করেন, তা হলে সামাজিকভাবে তাঁরা জাতিচ্যুত হবেন ; টোটা দাঁতে কাটলে শুধু তাদের

নিজেদেরই জাত যাবে তা নয়, তারা নিজেদের পরিবার ও স্বজনদেরও কলঙ্কিত করবেন।[১]

আম্বালা ছেড়ে যাবার পূর্বে এনসন্ সিপাহীদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলেন যে, একটা বিশেষ তদন্ত না হওয়া পর্যন্ত এই টোটাগুলি যাতে আর বিতরণ করা না হয় তার ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু এটা বৃটিশের পক্ষে একটা সম্মানজনক পন্থা হবে না মনে করে গভর্নর জেনারেল পাণ্টা হুকুম করলেন যে, সিপাহীদের মধ্যে টোটা বিতরণ করা হোক। এই হুকুমের পর থেকেই আবার অফিসারদের বাংলোতে আগুন জ্বলতে শুরু করল। কর্তৃপক্ষ অনেক চেষ্টা করেও কোনো অগ্নিসংযোগকারীকেই ধরতে পারল না, এবং "অগ্নিসংযোগ এত ঘন ঘন হতে লাগল ও তার ধ্বংসকারীতা এতই বেড়ে যেতে লাগল যে সরকার ঘোষণা করল —অপরাধীকে ধরতে পারলে ১০০০৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।"[২] বৃটিশ অফিসারদের বাংলো ছাড়াও একজন সিপাহী-অফিসার ও ৫জন সিপাহীর ঘরও জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল, কারণ তারা টোটা ব্যবহার করেছিল।

ভিতরে ভিতরে এত অসন্তোষ জমাট হয়ে থাকলেও, সিপাহীদের মধ্যে তার কোনো বাহ্যিক প্রকাশ দেখা যাচ্ছিল না। আম্বালার কমাণ্ডিং অফিসার জেনারেল বারর্নাড ১লা মে তারিখে গভর্নর জেনারেলকে লিখলেন—সিপাহীরাই যে অগ্নিকাণ্ড ঘটাচ্ছে তা ভাববার কোনো হেতু নেই, কারণ তাদের মধ্যে অসন্তোষের কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। পাঞ্জাবের চীফ কমিশনার জন লরেন্স এই সময় আম্বালা পরিদর্শন করে এই একই মত ব্যক্ত করলেন। জেনারেল এনসন্ও জানালেন যে তাঁর মিষ্টি কথায় যদিও বা কাজ না হয়, তা হলে অন্ততঃ ব্যারাকপুরে ১৯শ বাহিনীর বরখাস্তের উদাহরণটি সিপাহীদের মধ্যে বিদ্রোহের মনোভাবটাকে নিশ্চয়ই দাবিয়ে রাখবে।[৩]

উচ্চস্থানীয় ইংরেজ শাসকবর্গ ভারতবর্ষের জনসাধারণ থেকে কতখানি বিচ্ছিন্ন ছিল তা উপরোক্ত মন্তব্যগুলি থেকেই বোঝা যায়। এটা যে একটা ঝড়ের পূর্বেকার নিস্তব্ধতা তা তারা মোটেই বুঝতে পারেনি। জনসাধারণের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অসন্তোষের কারণগুলি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকল। মার্চ ও এপ্রিল মাসে উত্তর ভারতের অনেক স্থানে খাদ্যাভাব দেখা দিল ও জিনিসপত্রের মূল্য বেড়ে গেল। যে প্রকারের আটা, ময়দা, চিনি, ঘি বাজারে আমদানি হতে লাগল তাতে লোকের

১। ফরেষ্ট: "ষ্টেট পেপার্স", ১ম, ভূমিকা, পৃঃ ৩১।
২। বল্: "হিষ্ট্রি অব ইণ্ডিয়ান মিউটিনি", ১ম, পৃঃ ৫১।
৩। ফরেষ্ট: "ষ্টেট পেপার্স", ১ম, পৃঃ ৩১।

সন্দেহের যথেষ্ট কারণ ছিল। দেখতে দেখতে চারিদিকে গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে, ইংরেজরা চর্বি মিশ্রিত টোটা দিয়ে শুধু যে সিপাহীদেরই ধর্ম নষ্ট করবে তা নয়, ঘিয়েও শুয়োর গরুর চর্বি এবং ময়দা, আটা, চিনিতেও অস্থিচূর্ণ মিশিয়ে সাধারণ লোককেও ধর্মচ্যুত করবে।

ঠিক এই সময়েই উত্তর ও মধ্য ভারতে গ্রাম থেকে গ্রামে চাপাটি বিতরণ হতে লাগল। কোনো গ্রামে হঠাৎ একজন লোক এসে মোড়লের হাতে একটি চাপাটি দিয়ে বলত—"উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম।" মোড়ল গ্রামের সকল লোককে ডেকে চাপাটিটি বিতরণ করত। তারপর আরও কতকগুলি চাপাটি তৈরি করে চতুর্দিকের গ্রামগুলিতে একটি কথা বলে ছড়িয়ে দিত। গুরুগাঁও জেলার কালেক্টর ফোর্ড চাপাটি বিতরণের কথা সর্বপ্রথম জানতে পেরে উত্তর পশ্চিম প্রদেশের লেফটেনাণ্ট গভর্নর কলভিনকে জানালেন। কলভিনের আদেশে সমস্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটরা তদন্ত করে জানালেন যে, চাপাটি সর্বত্রই বিতরণ করা হচ্ছে। তাঁদের মধ্যে কেউ বললেন—এই চাপাটি বিতরণের তাৎপর্য হল এই ভাবে সকলকে জানিয়ে দেওয়া যে একটা অভূতপূর্ব ঘটনা শীঘ্রই ঘটবে। কেউ বললেন—এটা একটা দুষ্টলোকের চক্রান্ত ছাড়া আর কিছুই নয়। কেউ কেউ এটাকে অজ্ঞ-লোকদের একটা কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাস বলেই উড়িয়ে দিলেন। কিন্তু যেসব লোকের মধ্যে চাপাটি বিতরিত হল তারা বুঝল যে রুটি ও জাতীয় সম্মানের সংগ্রামে এ জনসাধারণের ঐক্যের নিদর্শনস্বরূপ। এটা নিশ্চয়ই একটা লক্ষ্য করবার বিষয় যে, যে সকল এলাকায় ভাল ভাবে চাপাটি বিতরণ করা হয়েছিল সেই এলাকাগুলিই বিশেষভাবে বিদ্রোহের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

মিরাট ক্যানটনমেণ্টের সিপাহীদের মধ্যে দমদমের খালাসীর কথাগুলি সব থেকে বেশী উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল। এখানেও বৃটিশ অফিসারদের বাংলোগুলিতে ঘন ঘন আগুন জ্বলছিল, এবং সিপাহীরা ইংরেজ অফিসারদের 'স্যালিউট' বর্জন করেছিল।

পূর্ব ভারতে ব্যারাকপুর যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করত উত্তর ভারতে মিরাটেরও সেই স্থান ছিল। বস্তুতঃ পক্ষে দিল্লী থেকে মাত্র ৩৬ মাইল উত্তরে অবস্থিত এই মিরাট সামরিকভাবে (stategically) ভারতের মধ্যে তখনকার দিনে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করছিল। মিরাট ক্যানটনমেণ্টের পরিধি ছিল ৫ মাইল ও ভারতের মধ্যে সব থেকে বড় মিলিটারি স্টেশন।

মিরাটের আর একটা বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, এখানে সব সময়ই সব থেকে বেশী সংখ্যক গোলন্দাজ, অশ্বারোহী ও পদাতিক ইংরেজ সৈন্য মোতায়েন থাকত।

তা ছাড়া, মিরাট ছিল ভারতের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ গোলন্দাজদের শিক্ষাকেন্দ্র। এই সব কারণে মিরাটের সিপাহীরা যে কোনোদিন বিদ্রোহ করতে সাহস করবে এ কথা ইংরেজ শাসকরা একেবারেই ভাবতে পারেনি। মিরাটে ১৮৫৭-র মে মাসে মোট ২,০০০ ইংরেজ সৈন্য ছিল—৬০শ রাইফেল বাহিনী, ৬টি ড্রাগুন গার্ডস্, আর ৩টি গোলন্দাজ বাহিনী; আর সিপাহীদের সংখ্যা ছিল মোট ২,৫০০—৩য় অশ্বারোহী, এবং ১১শ ও ২০শ পদাতিক বাহিনী।

৩য় অশ্বারোহী বাহিনীটিকে ভারতের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাহিনী বলে গণ্য করা হত। ভরতপুর, আফগানিস্তান, আলিওয়াল প্রভৃতি কঠিন যুদ্ধগুলিতে তারা খুব বীরত্ব দেখিয়েছিল বলে ইংরেজদের কাছে খুব সুনাম অর্জন করেছিল। উত্তর ভারতের অপেক্ষাকৃত সচ্ছল মুসলমান পরিবারগুলি থেকে এই বাহিনীর অশ্বারোহীদের সংগ্রহ করা হত।

২৩শে এপ্রিল তারিখে ৩য় বাহিনীর কমাণ্ডার কর্নেল স্মিথ্ হুকুম করলেন যে, ঐ বাহিনীকে পরের দিন নতুন রাইফেল নিয়ে প্যারেড করতে হবে। ঐ দিন সন্ধ্যাবেলা একজন সিপাহী অফিসার স্মিথ্‌কে জানালেন—সিপাহীরা স্থির করেছে যে তারা টোটা গ্রহণ করবে না। ২৩শ বাহিনীর সমস্ত ইউনিট থেকেই এই একই খবর আসতে লাগল। একটা বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি হবে এই আশঙ্কা করে কয়েকজন ইংরেজ অফিসার স্মিথ্‌কে আগামী দিনের প্যারেড স্থগিত রাখতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু এই উদ্ধত প্রকৃতির ইংরেজ কর্নেলটি[১] কারও কথায় কর্ণপাত করার প্রয়োজন বোধ করলেন না।

আদেশ মত ২৪ তারিখে প্রত্যেক ইউনিট থেকে ১৫ জন করে সব শুদ্ধ ৯০ জন সিপাহীকে নিয়ে প্যারেড হল। স্মিথ্ ব্যাখ্যা করে বললেন যে, সরকার সিপাহীদের কথা মেনে নিয়েছে এবং সম্মতি জানিয়েছে যে, সিপাহীরা টোটা দাঁতে কাটবার পরিবর্তে হাত দিয়ে ছিঁড়তে পারবে। এই উপায়ে কি ভাবে বন্দুকে টোটা ভর্তি করতে হয় তা দেখিয়ে দেবার জন্য তিনি একজন হাবিলদার মেজরকে আদেশ দিলেন। সিপাহী অফিসার তৎক্ষণাৎ সেই অদেশ পালন করলেন। তারপর স্মিথ্ সিপাহীদের মধ্যে টোটা বিতরণ করবার আদেশ দিলেন। কিন্তু ৯০ জন সিপাহীর মধ্যে ৮৫ জন টোটা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। এই ৮৫ জন সিপাহীকে বন্দী করে রাখা হল। মিরাটের সামরিক কর্তৃপক্ষ কমাণ্ডার-ইন-চীফের কাছে এই সম্বন্ধে একটা রিপোর্ট পাঠিয়ে দিয়ে তাঁর নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

১। হোমস্ঃ "সিপয় মিউটিনি", পৃঃ ১০০।

এই ঘটনার ফলে মিরাট শহরের জনসাধারণের মধ্যে খুব উত্তেজনার সৃষ্টি হল ও তাদের মধ্যে সর্বত্র এই নিয়ে আলোচনা হতে লাগল। সিপাহীদেরও প্রত্যহ গুপ্ত বৈঠক বসতে লাগল। শহরের অধিবাসীরা সিপাহীদের জিজ্ঞাসা করতে লাগল—তারা বন্দী সিপাহীদের সম্বন্ধে কি করবে। অফিসারদের বাংলোগুলিতে অগ্নিসংযোগের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেল। যে ৫ জন সিপাহী টোটা গ্রহণ করেছিল তাদের কুঠিগুলোও ভস্মীভূত হল।

কমাণ্ডার-ইন-চীফের আদেশ মত ৮ই মে তারিখে সামরিক আদালতের বিচারে বন্দীদের প্রত্যেকের ১০ বৎসর করে সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হল। পরদিন ৯ই মে প্রত্যুষে সিপাহীদের প্যারেডের সময় বন্দীদের নিয়ে আসা হল। মিরাট ক্যানটনমেণ্টের কমাণ্ডাণ্ট, জেনারেল হিউইট, সামরিক আদালতের রায় বন্দীদের পড়ে শোনালেন। ইংরেজ ঐতিহাসিক কে' এই সম্বন্ধে লিখেছেন—

"ইংরেজ সৈন্য, গোলন্দাজ বাহিনী ও কামানগুলি এমন ভাবে সাজানো হয়েছিল যে, সিপাহীদের মধ্যে এতটুকু বিদ্রোহী মনোভাবের প্রকাশ পাওয়া মাত্র তাদের মুহূর্তের মধ্যে ধূলিসাৎ করে দিতে পারত।"[১]

তারপর শুরু হল তিন ঘণ্টা ব্যাপী অত্যন্ত এক হীন ও অপমানসূচক নাটক। একটি একটি করে 'অপরাধী' সিপাহীদের ইউনিফর্ম খুলে নেওয়া হল এবং সঙ্গে হাতুড়ি দিয়ে প্রত্যেকের দুই গোড়ালিতে লোহার বেড়ি পরিয়ে দেওয়া হতে লাগল। সমস্ত সিপাহীরা নিশ্চল হয়ে নিস্পলক নেত্রে দাঁড়িয়ে এই হীন দৃশ্য ৩ ঘণ্টা ধরে দেখতে বাধ্য হল। এই নিষ্ঠুর অনুষ্ঠান শেষ হলে এই ৮৫ জন 'কয়েদীকে' ক্যানটনমেণ্ট ও শহরের মধ্য দিয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে মার্চ করিয়ে মিরাট জেলে নিয়ে যাওয়া হল। কমাণ্ডার-ইন-চীফ এই ঘটনার রিপোর্ট পড়ে মন্তব্য করেছিলেন যে, এই রকম প্রকাশ্য ভাবে বন্দী সিপাহীদের পায়ে বেড়ি পরিয়ে দেওয়া উচিত হয়নি। গভর্নর জেনারেল আরও কড়া মন্তব্য করে বলেছিলেন যে,—"এই কাজটি একটি কল্পনাতীত নির্বুদ্ধিতা"।—(ফরেস্ট : 'স্টেট পেপার্স', ১ম, এপেণ্ডিক্স, ই)।

ঐ দিনটা ক্যানটনমেণ্টে এক রকম শান্ত ভাবেই কেটে গেল। ইংরেজ অফিসাররা সিপাহীদের মধ্যে বিশেষ কোনো চাঞ্চল্যের লক্ষণ দেখতে পেলেন না। বিদ্রোহের মনোভাব অঙ্কুরেই ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে—তাদের মস্তিষ্কে এর বেশী আর কিছু প্রবেশ করল না। সন্ধ্যাবেলা ইংরেজ বীরপুরুষেরা ডিনার টেবিলে মিলিত হয়ে ঐদিনকার সাফল্যের জন্য পরস্পরকে প্রশংসা করলেন। তাঁরা

১। কে' : "সিপয় ওয়ার ইন ইণ্ডিয়া", ২য়, পৃঃ ৫১।

সকলেই বলাবলি করলেন যে, মিরাটের মতো এত বড় শক্তিশালী ইংরেজ-প্রধান ক্যানটনমেণ্টে ও পৃথিবীতে তাদের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী গোলন্দাজ কেন্দ্রে সিপাহীদের পক্ষে কোনো প্রকারের বিদ্রোহের কথা চিন্তা করাও বাতুলতামাত্র।[১] বলা বাহুল্য, এই প্রকার আত্মসন্তুষ্টির ফলে ঐ রাত্রে তাদের নিদ্রার কোনো ব্যাঘাত ঘটেনি।

সন্ধ্যাবেলায় জেনারেল হিউইট ঐদিনকার ঘটনা বিবৃত করে তাঁর রিপোর্টের উপসংহারে আত্মপ্রসংশায় গদগদ হয়ে লিখলেন—"মূর্খতা ও অবাধ্যতাই যে তাদের এতখানি হীনাবস্থার কারণ তা অধিকাংশ বন্দীই তীব্রভাবেই অনুভব করেছিল। আর অন্যান্য নেটিভ সিপাহীরা স্থির ও সৈন্যোচিতভাবেই আচরণ করেছিল।"[২] এক শ্রেণীর ইংরেজ শাসকরা নেটিভদের যে কতখানি অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখতেন তা ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সব থেকে শক্তিশালী ক্যানটনমেণ্টের অধিনায়কের এই উক্তি থেকেই বোঝা যায়। এবং আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, হিউইট এই সব কথা লিখেছিলেন এমন একটা দিনে যেদিন মধ্যাহ্নের পর থেকেই সমস্ত মিরাট শহরে একটা প্রচণ্ড হুলুস্থুল পড়ে গিয়েছিল ও শহরের প্রাচীরগুলি দেওয়ালপত্রে ভর্তি হয়ে গিয়েছিল—যাতে ফিরিঙ্গীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার জন্য সকল ভারতবাসীকে আহ্বান জানানো হয়েছিল।[৩]

১০ই মে ছিল রবিবার। চতুর্দিকে মিরাটের জনসাধারণের মধ্যে খুব উত্তেজনা; সর্বত্রই বন্দীদের কথাই আলোচনা হচ্ছিল। বাজারে কিম্বা রাস্তায় কোনো সিপাহীকে দেখলেই তারা তাদের জিজ্ঞাসা করছিল—তারা ফিরিঙ্গীদের স্পর্ধা ও অপমানের প্রতিশোধ নেবে কি না। এমন কি স্ত্রীলোকেরাও ঠাট্টা বিদ্রূপ করে তাদের প্রশ্ন করছিল, তাদের সাথীদের এই ভাবে অপমান করে ইংরেজদের জেলে পাঠিয়ে দিল, আর তারা কি তা চুপ করে শুধু দেখেই যাবে?

সিপাহীদের উত্তেজিত করেই মিরাটের জনসাধারণ চুপ করে রইল না। সিপাহীদের আগেই তারা বিদ্রোহের পথে এগিয়ে চলল। কমিশনার উইলিয়ামস্ তাঁর রিপোর্টে লিখেছেন:

"বন্দুকের কোনো গুলীর আওয়াজ হবার অনেক আগে থেকেই সদর বাজারের অধিবাসীরা তাদের তলোয়ার, বল্লম—যে যা পারল তাই নিয়ে প্রতি গলিতে ও বাজারের রাস্তার ধারে এসে জমা হতে লাগল; এবং শহর ও বাজারের চারদিকে

১। কে: পূর্বোক্ত গ্রন্থ ২য়, পৃঃ ৫৩।
২। ফরেষ্ট: "হিষ্ট্রি অব দি ইণ্ডিয়ান মিউটিনি", ১ম, পৃঃ ৩২।
৩। মার্টিন: "ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার," ২য়, পৃঃ ১৪৭।

যে সমস্ত বস্তি গজিয়ে উঠেছিল তার মধ্যে থেকেও এই রকম সশস্ত্রভাবে অসংখ্য লোক যে ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে বলে তারা বুঝতে পেরেছিল তাতে অংশ গ্রহণ করবার জন্য পিলপিল করে বেরিয়ে আসছিল।"[১]

কাজেই আমরা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি যে, ১৮৫৭-র বিদ্রোহ কেবলমাত্র সিপাহীদেরই বিদ্রোহ নয়, এ ছিল মূলতঃ জনসাধারণেরই বিদ্রোহ। বহু যন্ত্রণায় ধুঁকে মরা জীবন একটা অগ্ন্যুদগারে ফেটে পড়তে তখন মরিয়া।

অবশ্য মিরাটের সিপাহীরাও ১০ই মে তারিখে চুপ করে বসেছিল না। শহরের মতোই সিপাহী ব্যারাকগুলিতেও সকলেই খুব উত্তেজিত, ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে সমস্ত দিন ধরে তারা আলোচনা করছিল—কি ভাবে তারা এই সংকটের সম্মুখীন হবে।

সূর্যাস্তকালে ইংরেজরা রবিবারের প্রার্থনার জন্য যখন গীর্জায় এসে জড়ো হতে লাগল, এমন সময় হঠাৎ বন্দুকের গুলীর আওয়াজে তারা চমকে উঠল। এই আওয়াজের মুহূর্ত থেকেই শুরু হল ১৮৫৭-র সশস্ত্র ভারতীয় জাতীয় বিদ্রোহ। ক্যানটনমেণ্টে ৩য় অশ্বারোহী বাহিনীই বিদ্রোহে অগ্রণী হয়ে বেরিয়ে এল এবং দেখতে দেখতে ১১শ ও ২০শ বাহিনীর পদাতিক সিপাহীরাও তাদের সঙ্গে অস্ত্র ধারণ করল। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মিরাট শহরে আগুন জ্বলে উঠল।

এইখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ করা প্রয়োজন। ভুলক্রমে সিপাহীদের বিদ্রোহ শুরু হল সন্ধিক্ষণের অর্ধ ঘণ্টা পূর্বে। ১০ই মে ছিল রবিবার। গ্রীষ্মকালের জন্য সেদিনই প্রথম এই নতুন নিয়মটি ইংরেজদের মধ্যে প্রচারিত হল যে, উত্তাপ বেড়ে যাবার জন্য ঐদিন থেকে গীর্জার প্রার্থনার কাজ আধ ঘণ্টা দেরি করে শুরু হবে। কর্নেল ম্যাকেঞ্জী তাঁর 'মিউটিনি মেময়ার্সে' লিখেছেন:

"সময়ের এই পরিবর্তন আমাদের একটা ভয়ঙ্কর বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেছিল। তখনকার দিনে ইংরেজ সৈন্যরা প্রায় নিরস্ত্র অবস্থাতেই গীর্জার প্রার্থনাতে যেত। ··· অবশ্য বিদ্রোহীরা এই পরিবর্তনের কথা জানত না। তারা অর্ধ ঘণ্টা আগেই বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসল। ৬০শ ইংরেজ বাহিনী সম্পূর্ণভাবে গীর্জায় সমবেত হওয়া পর্যন্ত যদি তারা অপেক্ষা করত, তা হলে কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় গার্ডদের অভিভূত করে ফেলতে তাদের কতটুকুই বা বেগ পেতে হত? ··· স্বয়ং ভগবান আমাদের সহায় হলেন। বিদ্রোহী অশ্বারোহীদের অগ্রণী স্কাউটরা যখন ইংরেজ সৈন্যদের লাইনে এসে পৌছল, তখন তারা দেখতে পেল—ইংরেজ সৈন্যবাহিনী প্যারেডে লাইন করে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। বিপদ-

১। কে' : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ২য়, পৃঃ ৬০।

জ্ঞাপক ঘণ্টা (এলার্ম) বেজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই আকস্মিক আক্রান্ত হওয়ার শঙ্কা আর রইল না।"[১]

বৃটিশ লাইন দখল করতে অসমর্থ হয়ে বিদ্রোহীরা ক্যানটনমেণ্ট পরিত্যাগ করে মিরাটের জেল আক্রমণ করতে চলে গেল। এই জেলটি ভারতের অন্যতম সর্বাপেক্ষা বৃহৎ জেল, সেখানে ৮৫ জন সিপাহী বন্দী সমেত ৪,০০০ কয়েদী ছিল। সিপাহীরা জেল ভেঙে সমস্ত কয়েদীদের মুক্তি দিয়ে দিল। ইতিমধ্যে বিদ্রোহীদের একটা অংশ ট্রেজারি আক্রমণ করল। কিন্তু যে সমস্ত সিপাহীরা ট্রেজারি পাহারা দিচ্ছিল তারা বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিল না; বরং ইংরেজদের ট্রেজারি রক্ষা করবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে দাঁড়াল। বিদ্রোহীরা দেখল ট্রেজারি দখল করতে হলে নিজেদের ভাইদের রক্তক্ষয় করতে হয়। সুতরাং ট্রেজারি দখল না করেই তারা চলে গেল। কিছুদিন পরে কিন্তু এই রাজভক্ত সিপাহীদেরই বিশ্বাসযোগ্য নয় বলে ইংরেজরা বরখাস্ত করে দিয়েছিল। সিপাহীদের মধ্যে অনেকের এই প্রকার সংকট মুহূর্তে দোদুল্যমান মনোভাব, শত্রুকে ঠিক মুহূর্তে আঘাত করার সুযোগ ছেড়ে দেওয়া; তার একমাত্র উদাহরণ এইগুলোই নয়, বহু ক্ষেত্রেই এই ধরনের দুর্বলতা দেখিয়ে তারা নিজেদের ও দেশের স্বার্থের ক্ষতি করেছে। যাই হোক, তারপর বিদ্রোহীরা শহরে এসে কিছু সংখ্যক ইংরেজকে হত্যা করে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করল।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মিরাটে এই সময় ২,৫০০ সিপাহী আর ২,০০০ ইংরেজ সৈন্য ছিল। সিপাহীদের মধ্যেও সকলেই বিদ্রোহে যোগ দেয়নি। যারা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল তাদের সংখ্যা ছিল মাত্র ১,৫০০। একজন ইংরেজ লেখক বলেছেন:

"এই মুষ্টিমেয় বিদ্রোহীরা, কেবলমাত্র সংখ্যা দিয়ে বিচার করলেও, ইউরোপীয় সৈন্যদের সমকক্ষ হতে পারত না। ... ক্যানটনমেণ্টে তখন একটি ফিল্ড ব্যাটারি সমেত দুটি ইংরেজ অশ্বারোহী বাহিনীও ছিল—আর অন্যদিকে বিদ্রোহীদের হাতে একটি কামানও ছিল না। আমাদের ড্রাগুনরা অনায়াসে দুটো নেটিভ অশ্বারোহী বাহিনীকে একেবারে ধূলিসাৎ করে দিতে পারত; তা ছাড়া, আমাদের ৬০শ রাইফেল বাহিনী অন্ততঃ ২,০০০ সিপাহীর সমকক্ষ ছিল।"[২]

এ বিষয়ে ফরেস্টও লিখেছেন: "ভারতের অনেক গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ যত সংখ্যক সৈন্য জয় করেছিল মিরাটে তার থেকে বেশী সংখ্যক ইউরোপীয় সৈন্য ছিল, কিন্তু

১। ফরেষ্ট: "হিষ্ট্রি অফ দি ইণ্ডিয়ান মিউটিনি", ১ম, পৃঃ ৩৫।

২। মীড: "সিপয় রিভোল্ট", পৃঃ ৬৯।

এই সংকটকালে তাদের কোনো নেতা ছিল না।”—('হিস্ট্রি অব দি ইণ্ডিয়ান মিউটিনি', ১ম, পৃঃ ৩৬)। আর একজন ঐতিহাসিক বল্ বলেছেন—“মিরাটে এত ইংরেজ সৈন্য ছিল যে তারা অনায়াসে মিরাটে যত সিপাহী ছিল তাঁর তিনগুণ সিপাহীকে কাহিল করে দিতে পারত।”—(২য়, পৃঃ ৬৭)।

জেনারেল হিউইটকে যখন এই বলে অভিযুক্ত করা হয়েছিল যে, কেন তিনি বিদ্রোহীদের দিল্লীর পথে অনুসরণ করেননি, তখন তাঁর উত্তরে তিনি বলেছিলেন—মিরাটের “বদমাশদের”—যারা বৃটিশ রাজত্বের প্রথম থেকেই “বিশেষ দুষ্কৃতিকারী বলে বেশ খ্যাতি লাভ করেছিল”—তাদের সায়েস্তা করবার জন্য ইংরেজ সৈন্যদের মিরাট শহরেই রাখতে হয়েছিল। বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু মিরাটে যে পরিমাণ ইংরেজ সৈন্য ছিল তা দিয়ে কর্তৃপক্ষ দু' কাজই করতে পারতেন—বিদ্রোহীদেরও অনুসরণ করা সম্ভব ছিল, আর মিরাটের জনসাধারণকেও দাবিয়ে রাখা যেত। কারণ, একটা কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, মিরাটের লোক যতই ইংরেজ-বিরোধী হয়ে উঠুক না কেন, তাদের হাতে না ছিল অস্ত্র, না ছিল সংগঠন, না ছিল নেতৃত্ব ; আর ইংরেজের হাতে সবই ছিল—বন্দুক, অশ্বারোহী ও কামান। ঐ অবস্থায় এই কাজের জন্য মাত্র দু' চারশ' ইংরেজ সৈন্যই যথেষ্ট হত। আর বিদ্রোহীদের অনুসরণ করবার জন্যও ইংরেজ সৈন্যের অভাব ছিল না। ঐতিহাসিক ফরেস্ট লিখেছেন—“যদি কারাবিনারদের মাত্র একটা স্কোয়াড্রন ও দুশ' রাইফেলধারী সৈন্য বিদ্রোহীদের পশ্চাদ্ধাবন করত এবং দিল্লীতে তাদের কয়েক ঘণ্টা পরেও এসে পৌছত, তা হলেও পুরাতন রাজধানীকে বাঁচানো সম্ভব হত।”[১]

এ বিষয়ে মীড লিখেছেন : “বিদ্রোহীদের গন্তব্যস্থল ছিল ৪০ মাইল দূরে এবং এই সমস্ত পথটাই ছিল একেবারে সমতল ; তা ছাড়া, দুটি নদীও তাদের পার হতে হয়েছিল। রাস্তার মাঝে কয়েকটা কামান, এবং ইংরেজ সৈন্য ও অশ্বারোহীদের দ্রুত অনুধাবন—এ হলেই বিদ্রোহীদের সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে ফেলা যেত।—('সিপয় রিভোল্ট', পৃঃ ৭০)।

কিন্তু এত শক্তি থাকা সত্ত্বেও ইংরেজেরা তৎপরতার সঙ্গে মিরাটের বিদ্রোহ দমন করতে পারল না কেন? কেবলমাত্র বৃদ্ধ জেনারেল হিউইটই এই অক্ষমতার জন্য দায়ী ছিলেন না। আসল কথা হচ্ছে যে, সিপাহীদের বিদ্রোহের প্রথম আঘাতে সমগ্র বৃটিশ কমাণ্ডই আতঙ্কে দিশাহারা এবং ভেঙে পড়েছিল। এই কারণেই ইংরেজ অফিসাররা, তাদের প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও লোকবল থাকা সত্ত্বেও,

১। “পূর্বোক্ত গ্রন্থ”, ১ম, পৃঃ ৩৮।

ক্ষিপ্রতার সঙ্গে কাজ করতে পারেননি এবং দৃঢ়তা ও প্রত্যুৎপন্নতার দ্বারা মুষ্টিমেয় সিপাহীদের বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হননি। যে কর্নেল স্মিথ্ ৯ তারিখে প্যারেড গ্রাউণ্ডে এত বীরত্ব দেখিয়েছিলেন, সেই বীরপুঙ্গবটিকে পরের দিন বিদ্রোহের সময় কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি। তিনি পালিয়ে গিয়ে শহরের একটি বাড়িতে সমস্ত রাত আত্মগোপন করেছিলেন।[১]

সমগ্র ইংরেজ বাহিনীকেও তাদের ব্যারাক জয় করতে বেশ কিছু সময় লেগেছিল। তারপর তাদের সকলকে যখন প্যারেড গ্রাউণ্ডে সমবেত করা হল, তখন অন্ধকার নেমে এসেছে। তারপর তারা যখন বিদ্রোহ দমন করবার জন্য সিপাহীদের লাইনে এসে পৌঁছল, সিপাহী ব্যারাকগুলি তখন একেবারে শূন্য—সেই সময় সিপাহীরা জেল ভেঙে কয়েদীদের মুক্ত করে দিচ্ছিল। খুব বীরত্বের সঙ্গে অন্ধকারের মধ্যেই শূন্যে কতকগুলি গোলাগুলী ছুঁড়ে যখন তারা নিজেদের লাইনে ফিরে গেল, তখন তারা দেখে হতভম্ব হয়ে গেল যে তাদের বাংলোগুলি আগুনে দাউ দাউ করে জলছে।

পক্ষান্তরে, সিপাহীরা যখন বিদ্রোহ করল তখন প্রথম থেকেই তারা প্রচণ্ড শক্তি দিয়ে আঘাত করতে লাগল। বেশ কিছুক্ষণের জন্য রণক্ষেত্রের জয় সম্পূর্ণভাবে তাদের হাতেই ছিল। কিন্তু সিপাহীরা বিশেষ কোনো যোগ্য অফিসার দ্বারা চালিত হচ্ছিল না। তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল।[২] বিদ্রোহ করার পূর্বে তারা কোনো নির্দিষ্ট পন্থা ঠিক করে নেয়নি ; তাদের কোনো বিশিষ্ট লক্ষ্যও ছিল না। কেবলমাত্র প্রতিশোধ নেওয়াই ছিল প্রথম দিকে তাদের উদ্দেশ্য—ইংরেজকে ধর আর মার। এইরূপ ক্রোধ ও উত্তেজনার মুহূর্তে তারা তাদের সামরিক বোধশক্তি ও নিয়মানুবর্তিতা হারিয়ে ফেলেছিল। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিদ্রোহীদের প্রথম আঘাতে বেশ কিছু সময়ের জন্য সামরিক ও বেসামরিক সকল ইংরেজই বেশ কাবু হয়ে পড়েছিল। তারা ভয়ে ত্রাসে অভিভূত হয়ে প্রাণ বাঁচাবার জন্যে চারিদিকে অসহায়ভাবে ছুটাছুটি করছিল। এই ত্রাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইংরেজ সৈন্যদেরও প্যারেড গ্রাউণ্ডে লাইন করে দাঁড়াতে ও তাদের মধ্যে বন্দুকের গুলী বিতরণ করতে এক ঘণ্টারও কিছু বেশী সময় লেগেছিল। তা ছাড়া, এটাও লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে এই যে, "ইংরেজ

১। কে' ঃ পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ২য়, পৃঃ ৬৩।

২। জেনারেল হিউইট সিমলায় কমাণ্ডার-ইন-চীফকে ১১ই লিখেছিলেন—"আমার দৃঢ় ধারণা যে সিপাহীদের বিদ্রোহটা পূর্ব পরিকল্পিত ছিল না।"—(ফরেষ্ট ঃ "ষ্টেট পেপার্স", ১ম, পৃঃ ২৫০)।

অশ্বারোহী ড্রাগুন বাহিনীর সৈন্যরা ঘোড়ায় চড়তে জানত না, আর জানলেও সকলের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক ঘোড়া ছিল না।"[১]

এই অপূর্ব অনুকূল মুহূর্তটাকে সিপাহীরা সামরিকভাবে একেবারেই তাদের কাজে লাগাতে পারেনি। উপযুক্ত নেতৃত্ব থাকলে, বিদ্রোহী সিপাহীরা মিরাটের জনতাকে সঙ্গে নিয়ে এই অনুকূল অবস্থার সুবর্ণসুযোগ গ্রহণ করে মিরাটের ক্যানটনমেণ্ট দখল করে ভারতে ইংরেজ সরকারের প্রধান সামরিক ঘাঁটিটি ধ্বংস করে দিতে পারত এবং উত্তর ভারতের এই গুরুত্বপূর্ণ সামরিক কেন্দ্রটিকে ইংরেজের বিরুদ্ধে ভবিষ্যৎ লড়াইয়ে খুব ভাল ভাবেই নিজেদের কাজে লাগাতে পারত।

মিরাটের বিদ্রোহের আর একটি দ্রষ্টব্য বিষয় এই যে, সমগ্র উত্তর ও মধ্য ভারতের ন্যায় এই বিদ্রোহ কেবলমাত্র সিপাহী ও শহরের অধিবাসীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। শহরে যেদিন বিদ্রোহ হল, সেদিনই মিরাটের চারপাশের গ্রামগুলিতে দেখতে দেখতে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ল। কৃষক শ্রেণীও তাদের নিজস্ব দাবি নিয়ে প্রথম থেকেই বিদ্রোহের অগ্রভাগে এসে দাঁড়াল। এই কথাটিই কে' শাসকশ্রেণীর ভাষায় অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন :

"ক্যানটনমেণ্ট থেকে শুরু করে সমস্ত জেলাতে লুঠ ও হত্যাকাণ্ড ভয়ানকভাবে বিস্তার লাভ করল। বিশিষ্ট ব্যক্তি, জাতি কিম্বা ধর্ম কারুরই আর কোনো সম্মান রইল না। যাদেরই কিছু সম্পদ ছিল ও যারা তা রক্ষা করতে অক্ষম ছিল, তাদেরই দুর্বৃত্তরা নির্দয়ভাবে লুণ্ঠন করল।"[২]

এই 'লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ডের' দু' একটি উদাহরণও কে' দিয়েছেন। যথা—

"খাজনা না দিতে পারার অপরাধে আদালতের একটা ডিক্রিতে রামদয়ালকে মিরাট জেলে কয়েদী করে রাখা হয়েছিল। ১০ই মে তারিখে জেল থেকে মুক্তি পেয়ে ঐ রাত্রেই সে তার ভোজপুর গ্রামে ফিরে গেল। পরের দিন সকালে সে একদল লোক সংগ্রহ করে যে মহাজন তার বিরুদ্ধে ডিক্রি নিয়েছিল তার বাড়ি আক্রমণ করে তাকে ও তার পরিবারের আরও ছয়জন লোককে খুন করল।"[৩]

১। "ষ্টেট পেপার্স" পৃঃ ২২।

২। কে' : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ২য়, পৃঃ ১৭২।

৩। ঐ, পৃঃ ১৭৩, (কমিশনার উইলিয়ামসের সরকারী রিপোর্ট)।
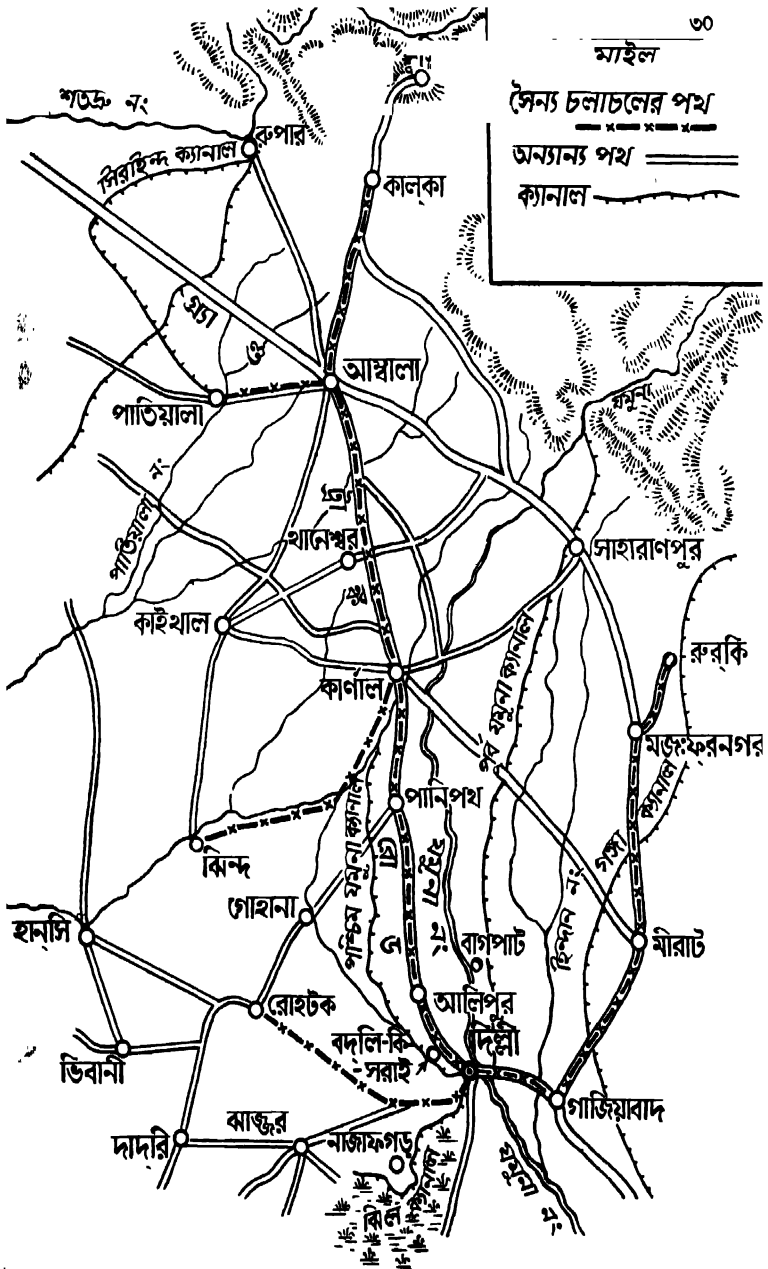
দিল্লীর অবস্থান ও ইংরেজ সৈন্য চলাচলের পথ

দিল্লী অধিকার

১৮৫৭ সালের ১১ই মে প্রত্যুষে দিল্লীর নিদ্রাভিভূত সাধারণ মানুষ 'দিন, দিন' 'মারো ফিরিঙ্গীকো' ইত্যাদি ঘন ঘন ভয়ঙ্কর শব্দে জেগে উঠল। মিরাটের ২,৫০০ অশ্বারোহী ও পদাতিক বিদ্রোহী সিপাহীরা জেল থেকে তাদের বন্দী কমরেডদের মুক্ত করে সমস্ত রাত্রি ৪০ মাইল মার্চ করে যমুনার সেতু পার হয়ে দিল্লীর প্রাচীরের নীচে এসে উপস্থিত হল। একজন ইংরেজ যিনি বিদ্রোহীদের যমুনার অপর পারে মার্চ করে আসতে দেখেছিলেন তিনি এই ভাবে তার বর্ণনা করেছেন : "অগ্রভাগে প্রায় ২৫০ অশ্বারোহী ইউনিফর্মে সম্পূর্ণ সজ্জিত হয়ে বুকের উপর মেডেল ঝুলিয়ে—যেসব মেডেল তারা পেয়েছিল বৃটিশ সরকারের জন্য লড়ে—আত্মবিশ্বাসে ও দৃঢ়তায় অনুপ্রাণিত হয়ে, ধীরগতিতে এগিয়ে চলেছিল। তাদের পিছনে, খুব বেশী পিছনে নয়, ধূলিধূসরিত লাল ইউনিফর্মে অসংখ্য পদাতিক সূর্যের আলোকে তাদের বেয়নেট ঝকমকিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছিল। এই অগ্রগামী জনতার মধ্যে এতটুকু দ্বিধা সঙ্কোচ ছিল না। তারা যে সফল হবে এই বিশ্বাস নিয়েই তারা এগিয়ে আসছিল।"—(বল্ : 'হিষ্ট্রি অব দি ইণ্ডিয়ান মিউটিনি', ১ম, পৃঃ ৭২)।

যখন বাহাদুর শাহ জানালা খুলে তাদের সামনে উপস্থিত হলেন, সিপাহীরা তাঁকে জানাল—তারা ধর্মের জন্য ও দেশকে ফিরিঙ্গীদের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে ও মিরাটের ফিরিঙ্গীদের খতম করে তারা দিল্লীকেও মুক্ত করবার জন্য এসেছে ; বাদশাহ যদি তাদের সম্রাট হতে স্বীকার করেন তা হলে সমগ্র হিন্দুস্থানকে তারা ফিরিঙ্গীদের হাত থেকে মুক্ত করবে।

বাহাদুর শাহ সিপাহীদের বলেছিলেন : "বৃটিশ সরকারের পেনশনের উপর আমাকে নির্ভর করতে হয়। আমার নিজস্ব কোনো ধনাগার নেই আমি কোথা থেকে তোমাদের বেতন দেব ?" উত্তরে সিপাহীরা তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিল যে,

ইংরেজদের সব ধনাগার দখল করে সব টাকা তারা তাঁর কাছে নিয়ে আসবে। তারপর সম্রাট সিপাহীদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন—এই রকম কাজের ফলাফল কি হতে পারে তা তারা ভেবে দেখেছে কি না ও শেষ পর্যন্ত তারা বিশ্বস্ত থাকবে কি না? বিদ্রোহীরা সমস্বরে তাদের সম্মতি জানাল। তখন বাহাদুর শাহ বিদ্রোহীদের প্রবেশ করবার জন্য প্রাসাদের দরজা খুলে দিতে অনুমতি দিয়েছিলেন।[১]

ইতিমধ্যে বাহাদুর শাহের নিজের সিপাহীরা বিদ্রোহী সিপাহীদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। তা ছাড়া, বিদ্রোহী সিপাহীদের আগমন বার্তা মুহূর্তের মধ্যে শহরে ছড়িয়ে পড়েছিল। সারা দিল্লীতে দেখতে দেখতে হুলুস্থুল পড়ে গেল। দেখতে দেখতে হাজার হাজার জনতা সিপাহীদের পাশে এসে দাঁড়াল। বিদ্রোহ আর কেবলমাত্র সিপাহীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না। অবিলম্বে বহিরাগত মুষ্টিমেয় সিপাহীদের বিদ্রোহ দিল্লীর সমগ্র জনসাধারণের বিদ্রোহে পরিণত হল।

১১ই মে তারিখের এই প্রচণ্ড বিস্ফোরণ দিল্লীর ইংরেজ কর্তৃপক্ষের নিকট বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের ন্যায় মনে হয়েছিল। নেটিভরা দাস মনোভাবাপন্ন ও তারা কখনও ইংরেজ রাজত্ব ধ্বংস করার জন্য বিদ্রোহ করার কল্পনাও করতে পারে না—এই প্রকার বদ্ধমূল ধারণা নিয়ে ইংরেজ শাসকরা বেশ নিশ্চিন্ত মনে দিন যাপন করছিলেন।

দিল্লীর ইংরেজ কর্তৃপক্ষ যে সময় মতো মিরাটে সিপাহীদের বিদ্রোহের খবর পাননি তা নয়। ঐ সিপাহীদের দিল্লীতে পৌঁছবার কয়েক ঘণ্টা পূর্বেই মিরাটের দুর্ঘটনার খবর তাঁরা পেয়েছিলেন।[২] কিন্তু মিরাটের এই 'নেটিভ রাস্কেলগুলি' ঐ রাত্রেই ডবল মার্চ করে দিল্লীতে হাজির হয়ে তাঁদের নিদ্রার ব্যাঘাত করবে

১। বাহাদুর শাহর বিচারকালীন তাঁর সেক্রেটারী মুকুন্দ্‌লালের সাক্ষ্য (মণ্টোগোমারি মার্টিন : "ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার", ৩য়, পৃঃ ১৬৯ ও মুইর : "রেকর্ডস্ অব দি ইনটেলিজেন্স ডিপার্টমেন্ট," ২য়, পৃঃ ৩৯)। অনেকের মতে সিপাহীরা জোর করে ও ভয় দেখিয়ে বাহাদুর শাহকে তাদের সঙ্গে যোগ দিতে বাধ্য করেছিল। এ কথা মোটেই সত্য নয়। বাহাদুর শাহকে বাঁচাবার জন্যই তাঁর তথাকথিত হিতৈষী বন্ধুরা এইরূপ প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছিলেন। এ বিষয়ে যা কিছু তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায় তাতে এটা প্রমাণ হয় যে, বাহাদুর শাহ স্বতঃপ্রনোদিত হয়ে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন।

২। 'দিল্লীর কমাণ্ডিং অফিসার পূর্বদিনকার মিরাট সিপাহীদের বিদ্রোহের সংবাদ খুব প্রত্যূষেই পেয়েছিলেন (বল্ : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ১ম, পৃঃ ১০৯)। বাহাদুর শাহর বিচারকালে সরকার পক্ষের প্রসিকিউটার আদালতকে একটি দলিল দিয়েছিলেন, তাতে লেখা ছিল যে, "১১ই মে, রাত্রিতে কমিশনার ফ্রেজার মিরাট থেকে একটি চিঠি পান। তাতে মিরাটের বিদ্রোহের খবর ছিল। কিন্তু তার পরেও কোনো নিরাপত্তার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়নি।"—(মার্টিন : "ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার," ২য়, পৃঃ ১৭১)।

তা তাঁরা কি করে বুঝবেন? যাই হোক, সময় মতো সঠিক ব্যবস্থা অবলম্বন করলে ইংরেজদের পক্ষে সেলিমগড়ের শক্তিশালী কামানগুলি দিয়ে এই স্বল্পসংখ্যক (১,৫০০) বিদ্রোহীদের যমুনার অপর পারেই ধ্বংস করে দেওয়া কিছুমাত্র শক্ত কাজ হত না। কিম্বা আর কিছু না হোক যমুনার সেতু ভেঙে দিয়েও বিদ্রোহীদের দিল্লী শহরে প্রবেশ বন্ধ করতে পারত। আরও একটি কথা এই যে, বিদ্রোহীদের তখন পর্যন্ত কোনো কামান ছিল না; এমন কি বিদ্রোহীদের অনেকের কাছে বন্দুক পর্যন্ত ছিল না। তা ছাড়া, এটাও লক্ষ্য করতে হবে যে, ১,৫০০ সিপাহীই এক সঙ্গে দিল্লী প্রবেশ করেনি। প্রথম যারা এসেছিল ও বাহাদুর শাহর সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়েছিল তারা ছিল মাত্র ২৫০ অশ্বারোহী। ইংরেজরা একটু কর্ম-তৎপর হলেই দিল্লীর ১১ই মে তারিখের বিদ্রোহ অনায়াসে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দিতে পারত। আবার এটাও দেখতে হবে যে, পরিপক্ক বাস্তব পরিস্থিতিতে কত সহজেই না শক্তিশালী শত্রুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা যায়!

যাই হোক, দিল্লীর রেসিডেণ্ট স্যার থিওফিলাস্ মেটকাফ ও কমিশনার ফ্রেজার বিদ্রোহীদের আগমন বার্তা শোনামাত্র ব্রিগেডিয়ার গ্রেভস্‌কে কাশ্মীর দরওয়াজা ও সেলিমগড় রক্ষা করবার জন্য হুকুম দিয়ে নিজেরা কিছু লোকজন নিয়ে লালকেল্লা বাঁচাবার জন্য ছুটলেন। সেখানে গিয়ে তাঁরা দেখলেন যে বিদ্রোহী জনতা ও সিপাহীরা সিঁড়ি দিয়ে প্রাসাদে উঠতে উদ্যত হয়েছে। ফ্রেজার ও ক্যাপ্টেন ডগলাস্ প্রাসাদ প্রহরীদের হুকুম করলেন বিদ্রোহীদের প্রতিরোধ করবার জন্য। কিন্তু তাঁদের কথায় কেউ কর্ণপাতও করল না। ফ্রেজার তখন মরিয়া হয়ে একজন প্রহরীর হাত থেকে বন্দুক ছিনিয়ে নিয়ে একজন বিদ্রোহীকে গুলী করে খুন করে ফেললেন। এই ভাবে একজন কমরেডকে খুন হতে দেখে বিদ্রোহীরা আরও উত্তেজিত হয়ে উঠল ও তৎক্ষণাৎ ফ্রেজারকে প্রাসাদের সিঁড়িতে পায়ে দলে তারা হত্যা করল। আরও যে কয়জন ইংরেজ সেখানে উপস্থিত ছিল, পাদ্রী জেনিংস্ ও তাঁর কন্যাসহ সকলকেই কয়েক মুহূর্তের মধ্যে প্রাণ হারাতে হল। কেবলমাত্র মেটকাফ কোনো মতে পালিয়ে নিজেকে বাঁচাতে পেরেছিলেন। এ সম্পর্কে মার্টিন যে ডায়েরির কথা উল্লেখ করেছেন তাতে লিখিত আছে যে, মেটকাফ যখন ঘোড়ায় চড়ে পালাচ্ছিলেন তখন "মুচী ও অন্যান্য কর্মীরা আজমীর দরওয়াজায় তাঁকে লাঠিসোটা নিয়ে তাড়া করে ধরবার ও মারবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তারা সফল হয়নি।"—(মার্টিন: 'ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার', ৩য়, পৃঃ ১৭২)। যাই হোক, যে লালকেল্লা থেকে একদিন মোগল সম্রাটরা ভারতবর্ষ শাসন করতেন সেখানে আবার ভারতের স্বাধীন পতাকা উত্তোলিত হল।

এদিকে ব্রিগেডিয়ার গ্রেভস্ কিছু সিপাহী সঙ্গে দিয়ে দুটি কামানসহ মেজর এবটস্‌কে কাশ্মীর দরওয়াজায় পাঠিয়ে দিলেন। আরও দুটি কামান ও একদল সিপাহী সমেত কর্নেল রিপলেকে পাঠালেন সেলিমগড়ে বিদ্রোহীদের বাধা দেবার জন্য। বিদ্রোহীদের সম্মুখীন হওয়া মাত্র রিপলে তাঁর সিপাহীদের বন্দুক ছুঁড়তে হুকুম দিলেন, তখন তারা বিদ্রোহীদের দিকে তাকিয়ে হতবুদ্ধি হয়ে ইতস্ততঃ করতে লাগল। বিদ্রোহীরা উচ্চস্বরে 'দিন দিন' রবে শ্লোগান দিতে লাগল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে উভয় দল পরস্পরের আলিঙ্গনাবদ্ধ হল। তাদের গুলীতে কর্নেল রিপলে ও অন্যান্য ইংরেজ অফিসাররা ঐ স্থানেই প্রাণ হারাল।

বিদ্রোহীদের হাতে যথেষ্ট পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র ও বিশেষ করে কোনো কামান না থাকাতে দিল্লীর অস্ত্রাগার অতি সত্বর দখল করা তাদের নিতান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। লালকেল্লার অনতিদূরে অবস্থিত এই অস্ত্রাগার ভারতের অন্যতম সর্ববৃহৎ অস্ত্রাগার ছিল। সেখানে ১০,০০০ বন্দুক, ৯ লক্ষ গুলী, ১০,০০০ ব্যারেল বারুদ, ছোট বড প্রচুর কামান ও কামানের অসংখ্য গোলা ছিল। আরও ছিল দুটি সম্পূর্ণ সীজ-ট্রেন (siege-train) ইত্যাদি।[১] ঐদিন মাত্র ৮ জন ইংরেজ ও একদল সিপাহী নিয়ে লেফটেনাণ্ট এই অস্ত্রাগার পাহারা দিচ্ছিলেন। বিদ্রোহীরা যখন অস্ত্রাগার আক্রমণ করল, তখন উইলোবি তাদের হাত থেকে একে রক্ষা করা অসম্ভব বুঝতে পেরে বারুদে একটি দিয়াশলাই জ্বালিয়ে দিলেন ও সঙ্গে সঙ্গে এক ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণের শব্দে সমগ্র দিল্লী শহর কেঁপে উঠল। অস্ত্রাগারে উইলোবি সমেত সকলেই ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন। তা ছাড়া, অস্ত্রাগারের চতুষ্পার্শ্বে স্ত্রীলোক ও বালকবালিকা সহ দিল্লীর বহু নিরীহ অধিবাসীরও জীবন নষ্ট হল।[২]

দিল্লীর এই বৃহৎ অস্ত্রাগার এইভাবে ধ্বংস হয়ে যাবার ফলে বিদ্রোহী পক্ষের যে যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছিল তা বলাই বাহুল্য। ধ্বংসস্তূপ থেকে কতকগুলি কামান ও বন্দুক উদ্ধার করে বিদ্রোহীরা তাদের কাজে লাগাতে পেরেছিল, কিন্তু সেই অপর্যাপ্ত পরিমাণের বারুদ তারা একটুও পেল না, এবং এই বারুদের অভাবে বিদ্রোহীরা দিল্লীর যুদ্ধে কতখানি পঙ্গু হয়ে পড়েছিল তা প্রসঙ্গতঃ দেখতে পাওয়া যাবে।

উইলোবি যে ভাবে নিজের জীবন বিসর্জন দিয়ে দিল্লীর অস্ত্রাগার উড়িয়ে দিয়েছিলেন তা যে একটা অসম সাহসের কাজ হয়েছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

১। বল্‌ঃ "হিষ্ট্রি অব দি ইণ্ডিয়ান মিউটিনি", ১ম, পৃঃ ৭২।

২। মুইর ঃ "রেকর্ডস্ অব দি ইনটেলিজেন্স ডিপার্টমেণ্ট", ২য় পৃঃ ৩৬। বলের মতে (১ম, পৃঃ ৭৬) এই বিস্ফোরণের ফলে ২,০০০ নাগরিকের প্রাণ গিয়েছিল।

এবং তাতে যে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রভূত উপকার সাধিত হয়েছিল তাও বলা বাহুল্য। এইজন্য ইংরেজ লেখকরা যে উইলোবিকে 'হিরো' প্রভৃতি সম্মানে ভূষিত করবেন তা স্বাভাবিক। শুধু এইখানেই তাঁরা ক্ষান্ত হননি। তাঁদের অনেকে উইলোবিকে থারমোপলীর বীর যোদ্ধারের সমতুল্য স্থান দিয়েছেন।[১] কিন্তু, এইরূপ তুলনা যে একেবারেই অসঙ্গত তা বলা বাহুল্য। কারণ, থারমোপলীর দেশপ্রেমিকরা নিজেদের মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন, ইহা যথার্থই প্রকৃত বীরের কাজ; আর উইলোবি জীবন দিয়েছিলেন সাম্রাজ্যবাদী দস্যুদের পরদেশে লুণ্ঠন ও দাসত্ব বিস্তারের ঘৃণিত কাজের জন্য, এটা মহৎ কাজও নয়, বীরের কাজও নয়। চোর, ডাকাত, খুনী, বদমাশরাও অনেক সময় খুব সাহসের পরিচয় দিয়ে থাকে, কিন্তু তার জন্য তাদের বীর বলা যায় না। যাঁরা স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য, সমাজের জন্য কিংবা মানবতার জন্য নিজেদের আত্মোৎসর্গ করেন তাঁরাই প্রকৃত বীর।

বিস্ফোরণের ফলে এতগুলি মৃত ও আহত স্বদেশবাসীর এই ভয়ানক রক্তাক্ত দৃশ্য জনতা ও সিপাহীদের একেবারে ক্ষিপ্ত করে তুলল। উন্মত্ত হয়ে তারা ছুটল ইংরেজ পল্লীতে—স্ত্রীপুরুষ, বালকবালিকা নির্বিশেষে একটি ইংরেজও তাঁরা জীবিত রাখবে না। যারাই তাদের হাতের সামনে পড়ল সকলকেই প্রাণ দিতে হল। ইংরেজদের বাংলো ও অফিসগুলিও আগুন লাগিয়ে ধূলিসাৎ করে দিল।[২] ইংরেজী ব্যাঙ্ক লুট হয়ে গেল ও তার ম্যানেজার ব্রেসফোর্ড তাঁর পরিবার সমেত নিহত হলেন। শহরের মুসলমানরা এবং এমন কি কিছু হিন্দুও বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল এবং সব থানা ও কোতোয়ালি ধ্বংস করে দিয়েছিল; তারপর বিদ্রোহীরা ব্যাঙ্কে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং ইউরোপীয়ানরা (দুজন পুরুষ, তিনজন স্ত্রীলোক ও দুজন শিশু) পালাবার কোনো পথ পেল না, তারা নিহত হল।··· ম্যাজিস্ট্রেটের, জজের, কমিশনারের ও অন্যান্য সরকারী অফিস সবই লুঠ করা হয়েছিল ও জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল।[৩] ইংরেজী সংবাদপত্র 'দিল্লী গেজেটে'র অফিসটাও এই ভাবে ধ্বংস হল। যখন পোস্ট ও টেলিগ্রাফ অফিস আক্রান্ত হল তখন একজন ইংরেজ কর্মচারী শেষ মুহূর্তে কোনোমতে আম্বালা ক্যানটনমেণ্টে এই মর্মে একটা খবর পাঠাতে পেরেছিলেন—"এক্ষুনি আমাদের অফিস ছেড়ে যেতে হবে। সমস্ত বাংলোগুলি মিরাটের সিপাহীরা জ্বালিয়ে দিচ্ছে। তারা আজ

১। ফ্রাউড: "সর্ট ষ্টাডিজ অব গ্রেট সাবজেক্টস্", ৩য় সংস্করণ, পৃঃ ৩৭৮।
২। মুইর: পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ৩য়, পৃঃ ৩৬ ও বল: পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ১ম, পৃঃ ৭৬।
৩। মার্টিন: পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ৩য়, পৃঃ ১৭২।

সকালে এসেছে। আমরা চললাম। বিদায়।"[১] দিল্লীর এই দুঃসংবাদ আম্বালা থেকে পাঞ্জাবের চতুর্দিকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং সেই মুহূর্ত থেকে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ বিদ্রোহ দমনের জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন।

ইতিমধ্যে ৩৮শ বাহিনীর যেসব সিপাহীরা কাশ্মীর দরওয়াজা পাহারা দিচ্ছিল তারা অস্ত্রাগার বিস্ফোরণে ভারতীয়দের নিদারুণ দুর্গতির সংবাদ পাওয়া মাত্র ইংরেজ অফিসারদের ও যে সমস্ত বেসামরিক ইংরেজ স্ত্রীপুরুষ কাশ্মীর দরওয়াজায় আশ্রয় নিয়েছিল তাদের একধার থেকে নিহত করতে শুরু করল। মেজর এবট্ যেসব সিপাহী নিয়ে কাশ্মীর দরওয়াজা রক্ষা করতে এসেছিলেন তাদের তিনি যখন বিদ্রোহীদের উপর গুলী ছুঁড়তে আদেশ দিলেন তখন তারা তা অমান্য করে তাঁকে জোর করে একধারে টেনে নিয়ে গিয়ে বললে,—"আমরা আপনাকে এতক্ষণ পর্যন্ত রক্ষা করেছি। কিন্তু আর তা সম্ভব হবে না। এইবার আপনি পালান।"

এই ভাবে সন্ধ্যার পূর্বেই সমগ্র দিল্লী শহর থেকে ইংরেজ শাসন একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেল। কিন্তু ক্যানটনমেণ্ট[১] তখনও বিদ্রোহীদের হস্তগত হয়নি; ওখানকার সিপাহীরা তখনও বিদ্রোহে যোগদান করবে কি করবে না, সে সম্বন্ধে মনস্থির করে উঠতে পারেনি। দিল্লী শহরের উত্তর-পশ্চিমে প্রায় দুশ' মাইল দূরে এই ক্যানটনমেণ্ট। আরাবল্লী পর্বতমালার দুটি ছোট শাখা, জুজুলা পাহাড় ও মেজুলা পাহাড়, উত্তর দিকে যমুনা নদী পর্যন্ত চলে গিয়েছে। এই পাহাড় (Ridge) ও যমুনার মধ্যস্থলে দিল্লী অবস্থিত, আর ক্যানটনমেণ্ট ছিল পাহাড়ের পিছন দিকে।

শহর হস্তচ্যুত হয়ে যাবার পর ক্যানটনমেণ্টের কমাণ্ডাণ্ট বিগ্রেডিয়ার গ্রেভস্ সন্ধ্যার আগে দ্বিধাগ্রস্ত সিপাহীদের একত্রিত করবার জন্য লাইনে দাঁড়াবার হুকুম করলেন। এই হুকুমে সিপাহীরা কোনো কর্ণপাতই করল না। তারা স্পষ্টই বলে দিল যে, সমস্ত ইংরেজদের তৎক্ষণাৎ ক্যানটনমেণ্ট ছেড়ে চলে যেতে হবে; তারা আর ইংরেজের গোলামি করবে না।

যেসব ইংরেজ স্ত্রীপুরুষ, বালকবালিকা তাদের জীবন বাঁচাতে পেরেছিল তারা সব পালিয়ে ক্যানটনমেণ্টে এসে জড়ো হয়েছিল এবং সর্বক্ষণ মিরাটের দিকে তাকিয়েছিল এই আশা করে যে, সেখান থেকে তাদের রক্ষা করবার জন্য যে কোনো মুহূর্তে ইংরেজ সৈন্যদল এসে উপস্থিত হবে। তারা সকলেই নিদারুণ ভাবে ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল। চারদিকে কেবল হতাশা ও বিশৃঙ্খলা। অন্ধকার নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে যে যে-ভাবে পারল ক্যানটনমেণ্ট ত্যাগ করে মিরাটের দিকে ছুটতে লাগল।

১। "পাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্ডস্", ৭ম খণ্ড, ১ম ভাগ, পৃঃ ১৭।

মিরাট ও দিল্লীর সঙ্গে সঙ্গে চারদিকের গ্রামগুলিতেও বিদ্রোহ আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল। এই সব বিদ্রোহী গ্রামগুলির মধ্য দিয়েই ইংরেজদের পালাতে হচ্ছিল। অদৃষ্টের পরিহাসে ইংরেজরা যাদের কালা আদমি বলে ঘৃণা করত, মুখে ও শরীরে কালি মেখে কালা আদমি সেজে, তাদেরই পোশাক পরে—কেউবা ফকিরের বেশে, কেউবা সন্ন্যাসীর পোশাক পরে, কবিরের দু' একটি লাইন গাইতে গাইতে কৃষকদের চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা করছিল। বলা বাহুল্য, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই প্রকার করুণ ও হাস্যকর প্রচেষ্টা সফল হয়নি। অনেকে জঙ্গলের মধ্যে ক্ষুধায় ও গরমে প্রাণ হারাল। সাধারণতঃ স্ত্রীলোক ও শিশুদের কেউ কোনো অনিষ্ট করেনি। বরং কয়েকজন গ্রামবাসী পুরুষের সাহায্যে মিরাটে পৌঁছতে পেরেছিল।

বাহাদুর শাহ

দিল্লী শহর ও ক্যানটনমেণ্ট ইংরেজদের হাত থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করে সিপাহীরা সন্ধ্যার পর লালকেল্লায় সমবেত হয়ে সর্ববাদী সম্মতিক্রমে মোগল সম্রাটদের শেষ বংশধর অশীতিপর বৃদ্ধ কবি বাহাদুর শাহকে[১] ভারতের স্বাধীন সম্রাট বলে ঘোষণা করল। এইখানে বাহাদুর শাহর একটু পরিচয় দেওয়া দরকার। বাহাদুর শাহ যখন মোগল সিংহাসনে বসেন তখন তাঁর নাম ছিল আবুল মুজফ্‌ফর স্বরাজউদ্দিন মোহাম্মদ বাহাদুর শাহ বাদশাহ-ই-গাজী। সিংহাসনে বসবার পূর্বে তিনি 'আবু জাফর' বলেই পরিচিত ছিলেন, এবং এই নামেই তিনি কবিতা রচনা করতেন।

বাহাদুর শাহ স্বেচ্ছায় ও সানন্দেই সিপাহীদের দেওয়া এই দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তার জন্য সিপাহীদের ভীতি প্রদর্শন বা বলপ্রয়োগের কোনোই প্রয়োজন হয়নি। বাহাদুর শাহ তৈমুরলঙ্গের দ্বাদশ উত্তরাধিকারী এবং চেঙ্গিস্‌ খাঁনেরও বংশধর। বাহাদুর শাহ ছিলেন একজন স্বভাব-কবি। তাঁর সম্বন্ধে একজন ইংরেজ ঐতিহাসিক বলেছেন যে, "তিনি ছিলেন একজন সাহিত্যানুরাগী ও শান্তিপ্রিয় চিন্তাশীল ব্যক্তি। যদিও তিনি বাবর ও আকবরের কতকগুলি দক্ষতায় গুণান্বিত ছিলেন, তবুও তাঁর পূর্বপুরুষদের মতো কর্মঠ ও পরিশ্রমী ছিলেন না।" ইংরেজের হাতে বাহাদুর শাহকে এক রকম বন্দী অবস্থাতেই কাটাতে হয়েছিল, কাজেই কর্মক্ষমতা দেখবার সুযোগও তাঁর খুব কমই ছিল।

মারাঠা ও রোহিলাদের সঙ্গে যুদ্ধের পর ইংরেজ সৈন্য জেনারেল লেক-এর অধীনে দিল্লী শহরে ১৮০৩ সালে প্রবেশ করে। আওরঙজেবের পৌত্র শাহ আলম তখন দিল্লীর মোগল বাদশাহ। অথর্ব, দুর্বল ও অক্ষম শাহ আলম ইংরেজের

১। ফরেষ্ট: "হিষ্ট্রি অফ দি ইণ্ডিয়ান মিউটিনি," ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৪।

॥ দিল্লী-সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ ॥

[প্রাচীন চিত্রকলা হইতে]

এক সন্ধিপত্রে সই করে মোগল সম্রাটদের যেটুকু স্বাধীনতা অবশিষ্ট ছিল তাও লুপ্ত করে দিলেন। বৎসরে সাড়ে তের লক্ষ টাকা তাঁর ভাতা ধার্য করা হল। ১৮০৬ সালে শাহ আলমের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আকবর শাহ দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন।

১৮৩৭ সালে বাহাদুর শাহ তাঁর ৬৪ বৎসর বয়সে যখন সিংহাসনে বসলেন তখন মোগল সাম্রাজ্য অনেক দিন হল লুপ্ত হয়েছে। তাঁর সিংহাসন নামে মাত্র; আর মোগল রাজত্ব তখন কেবল একটা জনশ্রুতিতে পরিণত হয়েছে। সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায় বৃদ্ধ ও অন্ধ শাহ আলম বিদেশীদের দাসখতে সই দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তখনও কিন্তু ইংরেজরা মোগল সিংহাসন অধিকার করতে সাহস করেনি। তখনকার গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেস্‌লী মোগল সিংহাসন অধিকার করার বিপজ্জনক পথে না গিয়ে, একটা 'মস্তবড় খেলা' ('a great game') শুরু করলেন—অর্থাৎ মোগল বাদশাহ নামটা থাকবে, কিন্তু তাঁর কোনো ক্ষমতাই থাকবে না; বাদশাহ থাকবেন জাঁকজমকশালী একটা দৃশ্যরূপে, যদিও প্রকৃতপক্ষে তিনি থাকবেন ইংরেজের বন্দী ও পুতুলমাত্র হয়ে। বাদশাহ থাকবেন, কিন্তু তাঁর কোনো ক্ষমতা থাকবে না, রাজা অথচ রাজা নন—একাধারে বাস্তব অথচ ছল —এই ছিল ইংরেজ সরকারের 'মস্তবড় খেলা'। ইংরেজ সাম্রাজ্য তখনও ভারতে সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত না হওয়াতে মোগল সিংহাসন সরাসরিভাবে দখল করার শক্তি ইংরেজের তখনও হয়নি। এই খেলার চাতুরীতে মুসলমান নবাব ও অভিজাতরা বেশ খুশীই থাকবে, আর জনসাধারণের কাছেও ইংরেজ শাসন গ্রহণযোগ্য বলে মনে হবে।

যদিও মোগল বাদশাহ এইভাবে সম্পূর্ণ ক্ষমতাচ্যুত হয়ে ইংরেজের হাতে পুতুল হয়ে রইলেন, তথাপি, ভারতের জনসাধারণের নিকট তাঁর সম্মান কিন্তু অক্ষুণ্ণই রইল এবং তারা তাঁকে শক্তির স্তম্ভ বলেই মনে করত। এ বিষয়ে ঐতিহাসিক কে' বলছেন যে, "বাদশাহ শুধু একটা নাম মাত্রে পর্যবসিত হলেও কেবলমাত্র এই নামটাই ভারতীয় রাজাদের ও জনসাধারণের নিকট একটা জীবন্ত ক্ষমতাশালী শক্তি হিসেবে বেঁচে ছিল। দিল্লীর বাদশাহী কেবলমাত্র কিম্বদন্তীতে পরিণত হয়েছিল বটে, তবু সকলের নিকট এই কিম্বদন্তী একটা গৌরবের বিষয় ছিল, ভারতবাসীর হৃদয়ে এটি গভীরভাবে অঙ্কিত হয়েছিল।"[১]

বহুদিন পূর্বেই লর্ড ওয়েলেস্‌লী বুঝতে পেরেছিলেন যে, বাদশাহ কেবলমাত্র একটা ছায়াতে পরিণত হলেও এবং ছিন্নবস্ত্র পরে থাকলেও যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি

১। কে': "হিষ্ট্রি অব সিপয় ওয়ার ইন ইণ্ডিয়া," ১ম, পৃঃ ২।

সাহজাহান নির্মিত দিল্লীর প্রাসাদে বাস করবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত এই নামটাকে, এই কিম্বদন্তীকে, এই ছায়াকে অবলম্বন করেই ভারতবাসী তাদের অতীত গৌরব ও স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করবে, এবং প্রতিষ্ঠা করবার সে সম্ভাবনা থেকে যাবে।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী কালে ভারতবাসী মোগল পরিবারকে কি ভাবে দেখত সে সম্বন্ধে রজনীকান্ত গুপ্ত যা বলেছেন, দীর্ঘ হলেও, তা উদ্ধৃত করা প্রয়োজন। তিনি বলেছেন ঃ

"যদিও এখন মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংস হইয়াছিল, মোগলের বিজয় পতাকা যদিও এখন ভারতের অনেক স্থান হইতে অপসারিত হইয়াছিল, তথাপি মোগলের ক্ষমতা ও গৌরবের নিকট সকলেই মস্তক অবনত করিতেছিল। এই ক্ষমতা ও গৌরবের কাহিনী এখন জনশ্রুতিতে পরিণত হইলেও, উহা সাধারণের মনে এরূপ দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়াছিল যে, কেহই সেই জনশ্রুতির অবমাননা করিতে সাহসী হয় নাই। ভারতে বৃটিশ কোম্পানির ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেও, কিছুকাল দিল্লীর মোগল ভূপতির নামে টাকা প্রস্তুত হইয়াছিল। ··· হিন্দু ও মুসলমান, উভয়েই সমভাবে এক সময়ে মোগলের সরকারে প্রধান প্রধান রাজকার্যে নিয়োজিত ছিলেন, উভয়েই সমভাবে মোগলের সৈন্য চালনা করিতেন, রাজনৈতিক বিষয়ে মোগলকে সৎপরামর্শ দিতেন এবং মোগলের অধিকৃত প্রদেশে শাসনকর্তার পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া আপনাদের ক্ষমতা ও সৎকার্যে গৌরবান্বিত হইয়া উঠিতেন। এখন তাঁহাদের সন্তানগণ দেখিলেন যে, তাঁহাদের সেই ক্ষমতা, সেই প্রাধান্য, সেই প্রভুত্ব বর্তমান শাসনকর্তাদের রাজনীতির গুণে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। মোগলের রাজ্যে তাঁহাদের পূর্বপুরুষগণ যে গৌরবে সকলের বরণীয় হইয়াছিলেন, ইংরেজের অধিকারে তাঁহাদের সে গৌরব চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইয়াছে ; স্থতরাং তাঁহারা ইংরেজ-রাজ অপেক্ষা বর্তমান মোগল অধিপতিকেই অধিকতর শ্রদ্ধা ও অধিকতর সম্মানের সহিত চাহিয়া দেখিতেন। ··· কবি যেমন উহা (দিল্লী) আপনার কবিত্ব শক্তির উদ্দীপক ভাবিতেন, শিল্পী যেমন উহা আপনার শিল্প চাতুরীর বিকাশ ক্ষেত্র বলিয়া মনে করিতেন, ঐতিহাসিক যেমন উহা আত্মগুণগরিমার পরিচয় স্থল ভাবিতেন, ভারতের হিন্দু মুসলমানগণও তেমনি উহা আত্মসম্মান ও আত্মগৌরবের নিদর্শনভূমি বলিয়া সন্তুষ্ট থাকিতেন।"[১]

মোগলরা রাজ্যচ্যুত হলেও, তাঁদের সার্বভৌমত্ব সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। ভারতের রাজারা তাঁদের সম্রাট বলে সম্মান করতেন ও তাঁদের নিকট থেকে

১। "সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস", ২য় ভাগ, পৃঃ ১৪২-৪৩।

সনন্দ গ্রহণ করতেন। নূতন কোনো গভর্ণর জেনারেল ভারতে পদার্পণ করলে মোগল সম্রাট এই সার্বভৌমত্বের পরিচয়সূচক খেলাত তাঁর নিকট পাঠিয়ে দিতেন। যে ইংরেজ সরকার মোগল বাদশাহকে নিজেদের বৃত্তিভোগী করেছিলেন, সেই ইংরেজ সরকারেরই প্রতিনিধি দিল্লীর রেসিডেণ্টও যখন বাদশাহের সঙ্গে দেখা করতে যেতেন, তিনিও জুতো পরে তাঁর সামনে যেতে সাহস করতেন না, কিম্বা উচ্চস্বরে কথা বলতে পারতেন না ; তাঁকেও নগ্নপদে দূর থেকে অভিবাদন করতে করতে বাদশাহের নিকটে এসে দাঁড়াতে হত। ১৮২৭ সাল পর্যন্ত ইংরেজ কোম্পানি তাঁর অনুজ্ঞা ও তাঁর স্বাক্ষরিত ফরমান ব্যতীত কোনো নূতন প্রদেশ দখল করতে পারত না। এই সময় পর্যন্ত ভারতের মুদ্রাও মোগল সম্রাটের নামেই বের হত।[১] কোম্পানির কর্মচারীদের সম্রাটকে, সম্রাট-পত্নীকে ও সম্রাটের উত্তরাধিকারীকে নজরানা দিতে হত। ১৮২২ সালে কোম্পানির প্রধান সেনাপতি এই নজরানা দেওয়া বন্ধ করলেন। দিল্লীর রেসিডেণ্ট কোম্পানির প্রতিনিধিস্বরূপ যে নজরানা দিতেন তাও ১৮২৭ সালে বন্ধ হয়ে গেল। এই ভাবে ১৮৩৬ সালে সব ইংরেজ কর্মচারীই নজরানা দেওয়া বন্ধ করল। ক্রমশঃ সম্রাটের দিল্লীর বাইরে যাবারও অধিকার লুপ্ত হল। শাহজাদারাও রাজকীয় সম্মানের সঙ্গে অন্যস্থানে যেতে পারতেন না। তাঁদের জন্য সম্মানসূচক তোপধ্বনিও বন্ধ হয়ে গেল। এবং সর্বশেষে ১৮৩৫ সালে দিল্লীশ্বরের নামাঙ্কিত মুদ্রা তুলে দিয়ে তার স্থানে কোম্পানির মুদ্রা চালু করা হল। এইরূপে সম্রাট-শ্রেষ্ঠ আকবরের বংশধররা তাঁদের রাজকীয় প্রভুত্ব ও সর্বপ্রকারের সম্মান-চিহ্ন হতে বঞ্চিত হয়ে ইংরেজের বন্দীরূপে দিল্লীর প্রাসাদে বাস করতে লাগলেন এবং তাঁদের প্রতি ইংরেজের ঔদ্ধত্যপূর্ণ অবমাননা ও লাঞ্ছনা দিনের পর দিন বেড়েই যেতে লাগল।

১৮৩৭ সালে ২৮শে সেপ্টেম্বর বাহাদুর শাহ মোগল সিংহাসনে আরোহণ করেই তাঁর বার্ষিক বৃত্তি বাড়িয়ে দেবার জন্য কোম্পানির ডিরেক্টরদের অনুরোধ করলেন। এইরূপ চেষ্টা এর পূর্বেও অনেকবার হয়েছিল। ১৮৩০ সালে বাহাদুর শাহর পিতা, আকবর শাহ, রামমোহন রায়কে দূত করে ও তাঁকে 'রাজা' উপাধি দিয়ে[২] এই বিষয়ে তদ্বির করবার জন্য ইংলণ্ডে পাঠিয়েছিলেন। এই তদ্বিরের ফলে

১। রাসেল : "মাই ডায়েরি ইন ইণ্ডিয়া", ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৩-৬৫।
মার্টিন : "ইণ্ডিয়ান এম্পায়র", ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৫৭-৫৯।
বল্ : "হিষ্ট্রি অব দি ইণ্ডিয়ান মিউটিনি," ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৫৪।

২। ইংরেজ সরকার মোগল প্রদত্ত রামমোহনের এই 'রাজা' উপাধি কোনো দিনই স্বীকার করেনি। কিন্তু রামমোহন নিজের স্বদেশের সম্রাটের প্রদত্ত এই উপাধিকে সর্বোচ্চ সম্মান ও গৌরবের বস্তু বলে মনে করতেন ; এবং গর্বের সঙ্গে 'রাজা' উপাধি ব্যবহার করতেন।

কোম্পানির ডিরেক্টররা এই প্রস্তাব করেন যে, যদি বাদশাহ তাঁর সমস্ত রাজকীয় ক্ষমতা ও অধিকারগুলি পরিত্যাগ করতে সম্মত হন, তা হলে তাঁরা তাঁর বার্ষিক বৃত্তি ৩ লক্ষ টাকা বাড়িয়ে দিতে প্রস্তুত আছেন। বার্ষিক এই ৩ লক্ষ টাকার জন্য আকবর শাহ নিজ পরিবারের অবশিষ্ট সম্মান ও গৌরবটুকুকে বিসর্জন দিতে রাজী হননি। এই সময়েই ডিরেক্টররা স্বীকার করেছিলেন যে, বাদশাহকে যে পরিমাণ বৃত্তি দেওয়া হয় তা অতি সামান্য এবং তা দিল্লীর বিস্তৃত রাজবংশের ভরণপোষণের জন্য যথেষ্ট নয়।[১] এ কথাও মনে রাখতে হবে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে যে সন্ধি হয় তাতে মোগল পরিবারের ভরণপোষণের জন্য যথোপযুক্ত বৃত্তি দিতে কোম্পানি ধর্মতঃ ও ন্যায়তঃ বাধ্য ছিল।

বাহাদুর শাহর অনুরোধের উত্তরেও কোম্পানি একই উত্তর দিল: "এই প্রস্তাব (অর্থাৎ মোগল বাদশাহ আপনার অবশিষ্ট ক্ষমতা পরিত্যাগ করতে রাজী হলে, তাঁর বৃত্তি বার্ষিক ৩ লক্ষ টাকা বাড়িয়ে দেওয়া হবে) পরিত্যাগ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। মোগল ভূপতি এই প্রস্তাবে সম্মত না হওয়াতে বোঝা যাচ্ছে যে, আমরা তাঁর উপকারের জন্য যে অর্থ দিতে প্রতিশ্রুত হচ্ছি, তা গ্রহণ করা তাঁর অভিপ্রায় নয়।"[২] রজনীকান্ত গুপ্ত এই সম্বন্ধে ঠিকই মন্তব্য করেছেন যে, "ইহা উপকার নহে, ঘোরতর অকৃতজ্ঞতা; দয়া নহে, ঘোরতর বিশ্বাসঘাতকতা। বণিক কোম্পানি বণিকের বেশে আসিয়া যাঁহার পুর্বপুরুষদিগের আশ্রয়ে বাস করিয়াছিলেন, যাঁহার পূর্বপুরুষগণের অনুগ্রহে ভারতে বৃটিশ কোম্পানির রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এখন তাঁহার অসীম দুর্গতির সময় কোম্পানি তাঁহাকে কিছু টাকা দেওয়ার লোভ দেখাইয়া তাঁহার হস্তে যে কিছু ক্ষমতা ছিল, সমস্তই গ্রহণ করিতে উদ্যত হন এবং এইরূপ টাকা দেওয়ার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া, জগতের সমক্ষে আপনাদের পরোপকারের পরাকাষ্ঠার পরিচয় দেন।"—('সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস,' ২য়, পৃঃ ১৫৬)।

মোগলবংশের শোচনীয় অবস্থার সুযোগ নিয়ে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা যে এরূপ হীন প্রচেষ্টার আশ্রয় নেবে তা তাদের পক্ষে একেবারেই অস্বাভাবিক নয়। বলা বাহুল্য যে, বাহাদুর শাহ ঘৃণাভরে এই প্রস্তাব মেনে নিতে অস্বীকার করে তেজস্বিতার ও আত্মসম্মানবোধের পরিচয় দিয়েছিলেন।

ইংরেজের সঙ্গে বাহাদুর শাহর সংঘর্ষের আরও একটি প্রধান কারণ ছিল। তা হচ্ছে বাহাদুর শাহর উত্তরাধিকারী সম্পর্কে। ১৮৪৯ সালে জ্যেষ্ঠ শাহজাদা

১। মার্টিন: "ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার," ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৫৯।

২। কে': "হিষ্ট্রি অব সিপয় ওয়ার ইন ইণ্ডিয়া," ২য় খণ্ড, পৃঃ ১২।

দারা বখ্‌তের মৃত্যু হয়। তখন ইংরেজ সরকার স্থির করেন যে, শাহজাদা ফকির-উদ্দিনকে তাঁরা মোগল সিংহাসনের উত্তরাধিকারী করবেন। তার কারণ সম্বন্ধে রজনীকান্ত গুপ্ত বলেছেন, "এই রাজকুমার ইংরেজদিগের প্রিয় ছিলেন, ইংরেজ সমাজে যাইতেও তিনি ভালবাসিতেন। সুতরাং ইহাকে রাজ-সিংহাসন দিলে লর্ড ডালহাউসির বাসনা অনেকাংশে পূর্ণ হইত। ডালহাউসি এই ইংরেজপ্রিয় যুবককে অনায়াসে হস্তগত করিয়া, তাঁহার প্রভুশক্তির মূলে কুঠারাঘাত করিতে সমর্থ হইতেন।"[১]

বাহাদুর শাহর সর্বকনিষ্ঠ বেগম ছিলেন জিন্নৎ মহল। তাঁর কার্যদক্ষতা, তেজস্বিতা ও সৌন্দর্য সকলেই প্রশংসা করতেন। বেগমদের মধ্যে জিন্নৎ মহলই ছিলেন বাহাদুর শাহর সব থেকে প্রিয়পাত্রী। জিন্নৎ মহলের গর্ভে জোয়ান বখ্‌ত নামে বাহাদুর শাহর যে পুত্র সন্তান হয় তাঁকেই বাদশাহ দিল্লীর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী করবেন স্থির করেন। ইংরেজ এই প্রস্তাব প্রত্যাখান করায় স্বভাবতঃই ইংরেজের বিরুদ্ধে বাহাদুর শাহর তিক্ততা আরও বেড়ে গেল।

এই প্রশ্ন ডিরেক্টরদের মধ্যে ও গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিলে সর্বত্র আলোচিত হয়ে শেষ পর্যন্ত ঠিক হল যে, ফকির-উদ্দিনকেই উত্তরাধিকারী করা হবে। ডালহাউসি দিল্লীর এজেন্ট স্যার টমাস্ মেটকাফকে ফকির-উদ্দিনের সঙ্গে বিষয়টা গোপনে পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে ফেলতে আদেশ করলেন। মেটকাফের সমস্ত শর্তেই ইংরেজভক্ত ফকির-উদ্দিন রাজী হলেন এবং দিল্লীর প্রাসাদ পরিত্যাগ করে কুতুবে চলে যেতেও তাঁর বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই জানালেন। এই অনুসারে একটি অঙ্গীকার পত্রে ফকির-উদ্দিন অনাযাসে স্বাক্ষর করে দিলেন। এই চক্রান্ত অতিশয় গোপনে সম্পন্ন হলেও রাজপ্রাসাদে তা জানাজানি হতে মোটেই বিলম্ব হল না। কিন্তু ১৮৫৬ সালের জুলাই মাসে ফকির-উদ্দিন হঠাৎ মারা গেলেন। অনেকে মনে করেন বিষ প্রয়োগের ফলেই তাঁর মৃত্যু ঘটেছিল।

যাই হোক, নানা কারণে ইংরেজ সরকার মোগল পরিবারকে দিল্লীর প্রাসাদ থেকে স্থানান্তরিত করবার জন্য তৎপর হয়ে উঠল। প্রথমতঃ, ভারতবাসীরা তাদের অতীত গৌরব ও স্বাধীনতার প্রতীক দিল্লীর প্রাসাদে অধিষ্ঠিত মোগল বাদশাহকে সামনে রেখে তাদের দেশকে বিদেশী শত্রুর হাত থেকে মুক্ত করবার জন্য ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারে—সে বিপজ্জনক সম্ভাবনা যে সব সময়েই বিদ্যমান সে বিষয়ে ইংরেজ শাসকরা খুবই সচেতন ছিল। দ্বিতীয়তঃ, দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট মোগল বাদশাহকে কেন্দ্র করে অবস্থা বিশেষে যে একটা

১। "সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস", ২য়, পৃঃ ১৫৯।

আন্তর্জাতিক সংঘর্ষেরও সৃষ্টি হতে পারে, সে সম্ভাবনার প্রতিও ইংরেজের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। বিপ্লবী ফরাসী দেশ ও নেপোলিয়নীয় সাম্রাজ্য ইংল্যাণ্ডের যেরকম ঘোরতর শত্রু ছিল, পরবর্তীকালে রুশিয়ার জার-সাম্রাজ্যও সেই স্থান অধিকার করেছিল। সাম্রাজ্যবাদের আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্বে দিল্লীর বাদশাহও যে ইংরেজের বিরুদ্ধে জড়িত হয়ে পড়তে পারেন, সে আশঙ্কাও ইংরেজ শাসকবর্গের মনে অনেক সময়ই স্থান পেয়েছিল। এই সব কারণেই মোগলদের এই অবশিষ্ট ছায়াটুকুকেও নিশ্চিহ্ন করে দেবার জন্য ইংরেজ সরকার প্রথম থেকেই সচেষ্ট ছিল। সর্বপ্রথম লর্ড ওয়েলেস্‌লী শাহ আলমকে প্রলোভন দেখিয়েছিলেন যে, যদি তিনি তাঁর পরিবারবর্গকে নিয়ে মুঙ্গেরের প্রাসাদে বাস করতে রাজী হন, তা হলে তাঁর বার্ষিক বৃত্তি বাড়িয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু দুর্বল শাহ আলমের মতো লোকও ইংরেজের এই ঘৃণ্য প্রস্তাবে সম্মত হননি।

ডালহাউসি যখন ভারতের শাসনভার গ্রহণ করলেন তখন ভারতে ইংরেজ শাসন ১৮০৫ সালের তুলনায় অনেক বেশী সুপ্রতিষ্ঠিত, সুতরাং এই অবস্থায় দিল্লীর মোগল প্রাসাদ অধিকার করতে আর বিলম্বের প্রয়োজন কি? ১৮৪৯ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারিতে ডালহাউসি তাঁর রিপোর্টে লিখেছিলেন: "ভারতের মোগল অধিপতিগণ পূর্বে যাহাই থাকুন না কেন, এখন তাঁদের রাজকীয় সম্মান অন্তর্হিত হয়েছে। এখন বৃটিশ সরকার ভারতের অদ্বিতীয় প্রভু হয়ে উঠেছে। বর্তমান মোগলদের পূর্বপুরুষগণ যে প্রভুশক্তির মহিমায় আপনাদের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন, এখন আমরা সেই প্রভুশক্তির অধিকারী হয়েছি। সুতরাং এখন দিল্লীর নামমাত্র সম্রাটকে আমাদের প্রতিযোগী করে তোলা কোনো মতেই উচিত নয়।"[১] তাই ডালহাউসি বিলাতের কর্তৃপক্ষকে জানালেন, মোগল বংশধরকে 'ভূপতি' উপাধি থেকে বঞ্চিত করতে হবে ও মোগল পরিবারকে সত্বর দিল্লীর প্রাসাদ থেকে স্থানান্তরিত করতে হবে এই কারণে যে, দিল্লীর প্রাসাদের 'রাজনৈতিক ও সামরিক' গুরুত্ব অনেক বেড়ে গিয়েছে এবং সেইজন্য এই প্রাসাদ ইংরেজের হস্তগত হওয়া এই মুহূর্তে একান্ত প্রয়োজন।

কিন্তু ইতিমধ্যে ডালহাউসি অন্যান্য স্থানে সাম্রাজ্য বিস্তারে এত ব্যস্ত হয়ে পড়লেন যে, দিল্লীর প্রাসাদের দিকে আর বিশেষ মনোযোগ দিতে পারলেন না। তারপর লর্ড ক্যানিংও ভারতে পদার্পণ করেই ডিরেক্টরদের ঐ একই দাবি জানালেন: সামরিক ও রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তায় দিল্লীর প্রাসাদ আমাদের হস্তগত হওয়া একান্ত জরুরী প্রয়োজন। অনেক আলোচনার পর ডিরেক্টররা এই

১। কে': "হিষ্ট্রি অব সিপয় ওয়ার ইন ইণ্ডিয়া," ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৬।

সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, অশীতিপর বৃদ্ধ বাহাদুর শাহর মৃত্যুর আর বিশেষ বিলম্ব নেই ; তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করাই শ্রেয় ; বাহাদুর শাহর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ সরকার মোগল প্রাসাদ দখল করবে ও তাঁর পুত্র মহম্মদ খোরাসকে 'ভূপতি'র বদলে 'শাহজাদা' উপাধি দিয়ে কুতুবে স্থানান্তরিত করবে ; এবং এ সম্বন্ধে বাহাদুর শাহ কিম্বা তাঁর উত্তরাধিকারীর সঙ্গে কোনোপ্রকার আলাপ আলোচনা হবে না ; মহম্মদ খোরাসকে তাঁর পিতার মৃত্যুর পর বৃটিশ সরকারের এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেই হবে।[১] বলা বাহুল্য যে, ইংরেজ সরকার শাহ আলমের সঙ্গে যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করেছিল তা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেই এই ঔদ্ধত্য-পূর্ণ সিদ্ধান্ত তারা গ্রহণ করল।

এই সম্বন্ধে লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে এই যে, ভারতে বৃটিশ সরকারের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও এবং মোগল পরিবার অতি দুর্বল অবস্থায় পতিত হওয়া সত্ত্বেও, ইংরেজ শাসকবর্গ বাহাদুর শাহকে জীবিত অবস্থায় মোগল প্রাসাদ থেকে স্থানান্তরিত করতে শেষ পর্যন্ত ভরসা পায়নি। কারণ, এ কথা তারা ভালভাবেই জানত যে, তখনকার ভারতের বাস্তব পরিস্থিতিতে অন্য কোনো রাজ-নৈতিক সংগঠনের অভাবে ভারতের অতীত স্বাধীনতা ও ঐক্যের প্রতীকস্বরূপ বাহাদুর শাহকে কেন্দ্র করেই অবস্থা বিশেষে ভারতের জাতীয় চেতনা জাগ্রত হয়ে উঠে সংগ্রামশীল আকার ধারণ করতে পারে। এই বৈপ্লবিক সম্ভাব্যতাকে বিজ্ঞ-ব্যক্তিরা উপেক্ষা করলেও, ইংরেজ শাসকরা এ বিষয়ে সব সময়ই শঙ্কান্বিত ছিলেন।

বার্ষিক বৃত্তি বাড়ানোর প্রশ্নে, মোগল বাদশাহের প্রভুশক্তি খর্ব করার বিষয়, উত্তরাধিকারী নির্বাচন, মোগল পরিবারকে দিল্লীর প্রাসাদ হতে স্থানান্তরিত করার হীন প্রচেষ্টা—এই সব প্রশ্নগুলিকে কেন্দ্র করে বাহাদুর শাহর সঙ্গে ইংরেজের যে সংঘর্ষ ঘনীভূত হয়ে উঠছিল, তা শুধুমাত্র বাহাদুর শাহর একটা ব্যক্তিগত স্বার্থেরই ঝগড়া ছিল না। কিম্বা মোগল বাদশাহের এই বিরোধকে মৃত মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্রের ভগ্নাবশেষকে জীবিত রাখবার একটা হাস্যকর প্রচেষ্টা বলে প্রগতিশীলতার নামে নাসিকা কুঞ্চন করে উড়িয়ে দিলেও চলবে না। সামন্ত-তান্ত্রিক মোগল বাদশাহের এই বিরোধ ভারতীয় প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক কোনো শক্তির বিরুদ্ধে ঘটেনি। তাঁর বিরোধ ঘটেছিল পৃথিবীর সব থেকে শক্তিশালী ঔপনিবেশিক প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে—যেমন ঘটেছিল পরবর্তীকালে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আফগান আমির আমানুল্লা খাঁনের এবং মুসোলিনীর ফাসিস্ট সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আবিসিনিয়ার সম্রাট হাইলী সেলাসীর। এই

১। কে' : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ২য়, পৃঃ ৩০

বিরোধের ফলে যখন বাহাদুর শাহ (এবং সঙ্গে সঙ্গে ঝান্সীর রানী লক্ষ্মীবাঈ, অযোধ্যার বেগম হজরত মহল প্রভৃতিও) জনসাধারণের পাশে এসে বিদ্রোহের পতাকা উঁচু করে তুলে ধরলেন, তখন তাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিজস্ব দাবিগুলি বৃহত্তর জাতীয় দাবির সঙ্গে মিশে এক হয়ে গেল।

বাহাদুর শাহর সঙ্গে ইংরেজের এই বিরোধ ১৮৫৬ ও ১৮৫৭ সালের প্রথম দিকে তীব্রতর হয়ে উঠল। এই কারণে বাহাদুর শাহ ও বেগম জিন্নৎ মহলের ইংরেজের প্রতি তিক্ততা দিনের পর দিন বেড়েই যাচ্ছিল। এই প্রকার তিক্ত মনোভাব নিয়ে বাহাদুর শাহ যে ইংরেজের বিরুদ্ধে কোনো কোনো বিদেশী শক্তির সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবেন ও বিক্ষুব্ধ সিপাহী প্রতিনিধিদের সহিত যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করবেন তা খুবই সম্ভব ছিল। কিন্তু এ সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য সঠিক কোনো তথ্য এখনও আবিষ্কার হয়নি।[১]

বাহাদুর শাহর বিচারের সময় তাঁর সেক্রেটারী মুকুন্দ্‌লাল বলেন যে, "বিদ্রোহ শুরু হবার দু' বৎসর পূর্বে বৃটিশ সরকারের প্রতি বাহাদুর শাহ খুবই অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েন।··· বাহাদুর শাহর ভূতপূর্ব মন্ত্রী মেহবুব আলি এই সময় টাকা দিয়ে সিদ্দী কুম্বার নামক একজন আবিসিনীয়কে পারস্যে দৌত্যকার্যে পাঠিয়েছিলেন। দিল্লী ও মিরাট বিদ্রোহের কিছুকাল পূর্বে বাহাদুর শাহর নিজস্ব কামরায় সিপাহী বাহিনীর মধ্যে যে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ছিল তাই হয়ে উঠেছিল সব সময়ের আলোচ্য বিষয়। প্রাসাদের বাইরেও বাদশাহ পরিবারের লোকেরা এ বিষয়ে খোলাখুলি ভাবেই আলোচনা করতেন।"[২]

ঠিক এই সময়েই জনসাধারণের পুঞ্জীভূত অসন্তোষ দিল্লী, লক্ষ্নৌ ও উত্তর ভারতের সর্বস্থানে নানাভাবে প্রকাশ পেতে লাগল। অন্যান্য স্থানের মতো দিল্লীর ভারতীয় সংবাদপত্রগুলিতে ইংরেজ-বিরোধী সত্যমিথ্যা নানা প্রকারের সংবাদ প্রচার শুরু হল। সাধারণতঃ এই প্রচারকার্যের মূল সূত্র এই ছিল যে, ভারতে ইংরেজ শাসনের একশত বৎসর শেষ হতে চলেছে ও তাদের মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে; সারা ভারতবর্ষে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সময় এসে গিয়েছে; পারস্যের শাহ, তুর্কীর অটোমান সম্রাট, রুশিয়ার জার, আফগান আমির দোস্ত মহম্মদ সকলেই ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, ইত্যাদি গুজবগুলি সংবাদপত্র মারফত চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। কে' এর তাৎপর্য বুঝতে পেরে

১। কে'-র মতে, বাহাদুর শাহ যে রুশ দেশেও দূত পাঠিয়েছিলেন তা সন্দেহ করবার কারণ আছে। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ২য়, পৃঃ ৪০।

২। মণ্টোগোমারি মার্টিন: "ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার", ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৬৯।

ঠিকই বলেছেন যে, এই সব গুজবের মূলে কোনো সত্য থাকুক বা নাই থাকুক, এ সব কথাগুলি যে লোকে বিশ্বাস করে আশান্বিত ও আনন্দিত হয়ে বিদ্রোহের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল সেটাই হচ্ছে অর্থপূর্ণ।

এই সব ঘটনা থেকে পুনরায় এই কথাটাই ভালভাবে প্রমাণ হয় যে, ১৮৫৭-র অভ্যুত্থান কেবলমাত্র সিপাহীদের বিদ্রোহের ফলেই ঘটেনি; মে মাসে মিরাট বিদ্রোহের অনেক পূর্ব থেকেই ভারতের সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যে এই বিদ্রোহের প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল। তাই ১১ই মে তারিখে যখন বিদ্রোহী সিপাহীরা মিরাট থেকে দিল্লী এসে পৌঁছল, সঙ্গে সঙ্গে তারা দিল্লীর জনসাধারণের সমর্থন ও সহযোগিতা তো পেলই, বাহাদুর শাহকেও দলে টানতে তাদের বিশেষ কোনো বেগ পেতে হল না। বাহাদুর শাহর বিচারের সময় তাঁর কয়েকজন শুভাকাঙ্ক্ষী তাঁকে বাঁচাবার জন্য তাঁদের সাক্ষ্যতে বলেছিলেন যে, বাহাদুর শাহ স্বেচ্ছায় বিদ্রোহে যোগ দেননি, সিপাহীদের বলপ্রয়োগ ও ভীতি প্রদর্শনের ফলেই তিনি বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন, তিনি বিদ্রোহের সময় ইংরেজের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করবার চেষ্টা করেছিলেন, সিপাহীরা জোর করে তাঁকে দিয়ে সব কিছু করিয়ে নিত, ইত্যাদি। এ সব কথাই সম্পূর্ণ মিথ্যা, এবং আদালতও এই সব উক্তির কোনো মূল্য দেয়নি। আদালতের নিকট যেসব নথিপত্র ও অন্যান্য প্রমাণ ছিল, তাতে বাহাদুর শাহর 'অপরাধ' সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না। বস্তুতঃ, বাহাদুর শাহ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে স্বেচ্ছায় ও স্বদেশানুরক্তির বশেই বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিলেন।

কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে মোগল বাদশাহ বাহাদুর শাহকে বাদশাহ বলে ঘোষণা করা বিদ্রোহীদের পক্ষে খুবই ভুল হয়েছিল; কারণ, তাঁদের মতে, এর ফলে শিখ, রাজপুত ও মারাঠাদের মতো যারা মোগলদের চিরকালের শত্রু (?) তাদের বিদ্রোহের বিরুদ্ধে ঠেলে দিল।[১] এই মতবাদও একেবারেই যুক্তিসঙ্গত নয়। বাহাদুর শাহকে সম্রাট বলে ঘোষণা করার প্রকৃত তাৎপর্য অন্ততঃ একজন ঐতিহাসিক বুঝতে পেরেছিলেন। জাস্টিন ম্যাকার্থী বলেছেন যে, বাহাদুর শাহকে সম্রাট বলে ঘোষণা করার ফলে "বিদ্রোহীরা এক মুহূর্তের মধ্যে একজন নেতা, একটি পতাকা, এবং একটি আদর্শ পেল, এবং তার ফলে যা ছিল কেবলমাত্র সিপাহীদের একটা সামরিক বিদ্রোহ—এক নিমেষে সেটা একটা বৈপ্লবিক যুদ্ধে পরিণত হয়ে গেল। বিভিন্ন দল ও সম্প্রদায়ভুক্ত সব বিদ্রোহীদের নিকট একমাত্র বাহাদুর শাহই একটা গ্রহণযোগ্য ও দৃশ্যমান নায়কত্ব দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।...

১। ফরেষ্ট: "হিষ্ট্রি অব ইণ্ডিয়ান মিউটিনি," ৩য় খণ্ড, ভূমিকা, XXV.

বিদ্রোহীরা অজ্ঞাতসারে ইতিহাসের একটা অতি সংকটপূর্ণ মুহূর্তকে এই ভাবে তাদের আয়ত্তাধীনে আনতে সক্ষম হয়েছিল এবং এইভাবে একটা সামরিক বিদ্রোহকে ধর্মীয় ও জাতীয় যুদ্ধে রূপান্তরিত করতে পেরেছিল।"[১]

ভারতের তদানীন্তন সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থায় বাহাদুর শাহকে বিদ্রোহী ভারতের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত করা যে সিপাহীদের পক্ষে সব থেকে শ্রেষ্ঠ বৈপ্লবিক কৌশল হয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বাহাদুর শাহকে ভারতের সম্রাট বলে ঘোষণা করে বিদ্রোহীরা মধ্যযুগীয় স্বেচ্ছাচারী মোগল রাজত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল, এ কথা ভাবলে খুবই ভুল করা হবে। বরং বিদ্রোহীরা যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে একটা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের (constitutional monarchy) দিকে অগ্রসর হচ্ছিল সে বিষয়ে প্রমাণের কোনো অভাব নেই।

বাহাদুর শাহ বিদ্রোহে যোগ দেবার দু' এক মাসের মধ্যেই সারা উত্তর ভারতে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ল। বাংলা দেশ থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত সিপাহী বাহিনীগুলি একটার পর একটা বিদ্রোহ করে বাহাদুর শাহর পতাকাতলে সমবেত হতে লাগল, বহুস্থানে জনসাধারণই অগ্রণী হয়ে ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটাল। নিমেষের মধ্যে ভারতের একটা বিশাল অংশ থেকে বিদেশী শাসন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, এবং জাতিধর্ম নির্বিশেষে, হিন্দু মুসলমান সকলেই বাহাদুর শাহকে তাদের সর্বাধিনায়ক বলে স্বীকার করে নিল। এমন কি নানা সাহেব পর্যন্ত যেদিন বিদ্রোহ করে পেশোয়াশাহী পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য ফতোয়া জারি করলেন, সেদিন তাঁকেও বাহাদুর শাহর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নিতে হয়েছিল। সিপাহীরা ভারতের যেখানেই বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করেছে, সেখানেই তারা ধ্বনি তুলেছে: 'দিল্লী চলো, দিল্লী চলো'। তারা জানত, তারা বুঝতে পেরেছিল, বিদ্রোহী ভারতের, অবিনশ্বর ভারতের, পূর্বের একতাবদ্ধ স্বাধীন ভারতের কেন্দ্রস্থল হচ্ছে দিল্লী। তাই তারা বুঝতে পারল—বাহাদুর শাহর পতাকাতলে সমবেত হয়ে দিল্লীকে রক্ষা করাই হিন্দু মুসলমান সকল বিদ্রোহীরই প্রধান কর্তব্য।

১৮৫৭ সালের অবস্থায় বাহাদুর শাহর বিদ্রোহে যোগ দেবার বৈপ্লবিক তাৎপর্য,[২] আজকালকার নব্যযুগীয় আলোকপ্রাপ্ত কয়েকজন ভারতীয় পণ্ডিত না

১। জাষ্টিন ম্যাকার্থী: সর্ট হিষ্ট্রি অব আওয়ার ওন টাইমস্",—১৯২৩-এর সংস্করণ, পৃঃ ১৭২।

২। দু' একজন চিন্তাশীল বাঙ্গালী লেখক এদিকে আমাদের দৃষ্টি পূর্বেই আকর্ষণ করেছেন। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল এ বিষয়ে লিখেছেন: "দিল্লীর বাদশাহের কর্তৃত্ব স্বীকৃতির মধ্যে একটি নিখিল ভারতীয় আদর্শের নির্দেশ পাওয়া যেতে পারে।'—"মুক্তির সন্ধানে ভারত," পৃঃ ৭৬।

বুঝতে পারলেও, লর্ড ক্যানিং, জন লরেন্স প্রভৃতি ইংরেজ-ভারতের কর্ণধাররা কিন্তু তা ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন। বাহাদুর শাহকে বিদ্রোহী ভারতের সম্রাট বলে ঘোষণা করা সম্বন্ধে কে' বলেছেন যে, "এই বৈপ্লবিক ঘটনার প্রচণ্ড রাজনৈতিক তাৎপর্য একজন নির্বোধের পক্ষেও বোঝা কঠিন নয়, এবং সব থেকে বড় আশাবাদীও তাকে উপেক্ষা করতে পারে না।"[১] লর্ড ক্যানিং ও জন লরেন্স স্পষ্টই দেখতে পেলেন যে, দিল্লীর মোগল প্রাসাদ বিদ্রোহীদের দখলে চলে যাবার জন্য ও বাহাদুর শাহর বিদ্রোহের নায়কত্ব গ্রহণ করার ফলে বিদ্রোহীদের ইজ্জত ও প্রতিপত্তি সারা ভারতের মানুষের কাছে অনেক বেড়ে গেল। বাহাদুর শাহর নামটাই বিদ্রোহীদের পক্ষে শক্তির স্তম্ভ হয়ে দাঁড়াল। বস্তুতঃ এই ঘটনা বিদ্রোহীদের সর্ববৃহৎ প্রাথমিক বিজয় ও ইংরেজের সব থেকে বড় পরাজয়। এইরূপ বৈপ্লবিক সম্ভাবনাপূর্ণ অবস্থায় এখন থেকে বিদ্রোহী পক্ষের সব থেকে বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াল—ভারতব্যাপী এই গণবিদ্রোহকে পরিচালনা করবার জন্য একটা শক্তিশালী নেতৃত্ব গঠন করা, যার উপরেই সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করবে তাদের চূড়ান্ত বিজয় অথবা চূড়ান্ত পরাজয়।

১। কে' : "হিষ্ট্রি অব সিপয় ওয়ার ইন ইণ্ডিয়া," (২য়, পৃঃ ১)। এই সময় 'এডিনবোরো রিভিউতে' একজন ইংরেজ লিখেছিলেন—"যদি এটাই ঠিক হয় যে, বিদ্রোহীরা তাদের এই সব চাল ও কৌশল পূর্ব থেকেই ঠিক করে রেখেছিল, তা হলে তাদের এই চালটাই (বাহাদুর শাহকে সম্রাট বলে ঘোষণা করা) সব থেকে ভাল হয়েছিল।"— বল্ : "হিষ্ট্রি অব দি ইণ্ডিয়ান মিউটিনি," ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৮।

দিল্লীর দুর্গ

অতি প্রাচীনকাল থেকেই দিল্লী সভ্যতা বিস্তারের একটি প্রধান কেন্দ্রস্থল বলে গণ্য হয়ে এসেছে। এই দিল্লী ইন্দ্রপ্রস্থ নামে মহাভারতের অবিস্মরণীয় গৌরবময় যুগ থেকে রাজপুত শৌর্য ও দেশপ্রেমের এবং মোগলের গৌরব ও সমৃদ্ধির অবিনশ্বর ঐতিহ্য বহন করে আসছে। সুদূর কালের ধারায় এই দিল্লী থেকেই মহাভারত-বর্ষকে চিরকাল একীকরণের চেষ্টা হয়েছে। এদিক থেকে দিল্লীর ভৌগোলিক কেন্দ্রীয় অবস্থানটিও লক্ষণীয়। দিল্লী কলকাতা থেকে ৯৫০ মাইল, বম্বে থেকে ৯৬০ মাইল, মাদ্রাজ থেকে ১,১০০ মাইল, করাচী থেকে ৯৪০ মাইল, পেশোয়ার থেকে ৬০০ মাইল, শ্রীনগর থেকে ৫০০ মাইল।

হিন্দু, পাঠান ও মোগল রাজবংশের রাজধানী এই দিল্লী শহর তার সুদীর্ঘ ইতিহাসে অনেকবার স্থান পরিবর্তন করেছে। বর্তমান দিল্লী (নয়া দিল্লী নয়—নয়াদিল্লী স্থাপিত হয়েছিল ১৯১১ সালে) সম্রাট সাহজাহান কর্তৃক যমুনা নদীর তীরে ১৬৩১ সালে স্থাপিত হয়। স্থাপয়িতার নামানুসারে এই শহরকে সাহজাহানা-বাদও বলা হত। এই বিশাল শহর, তার দুর্গ-প্রাসাদ, জুম্মা মসজিদ, শহরের প্রাচীর ইত্যাদি নির্মাণ করতে ১০ বৎসর লেগেছিল এবং ব্যয় হয়েছিল এক কোটি টাকা। টেভারনিয়ের, বারনিয়ের, মানুচী, ফারগুসন প্রভৃতি ইউরোপীয় পর্যটকরা, যাঁরা এই শহর প্রথমাবস্থায় দেখেছিলেন, তাঁরা সকলেই দিল্লীর ঐশ্বর্যে ও সৌন্দর্যে চমৎকৃত হয়েছিলেন।

যমুনার পশ্চিম তীরে অবস্থিত এক মাইল পরিধি বিশিষ্ট সাহজাহানের প্রাসাদ প্রকৃতপক্ষে লাল বালুকা-প্রস্তর দিয়ে নির্মিত একটি বিশাল মজবুত দুর্গ; এই কারণে এই প্রাসাদ লালকেল্লা নামেও পরিচিত। এই প্রাসাদের পার্শ্বেই আর একটি শক্তিশালী দুর্গ—সেলিমগড় অবস্থিত, যার শক্তিশালী কামানগুলির পাল্লা

ছিল যমুনা নদীর উভয় দিকে এক মাইল পর্যন্ত। সাত মাইল পরিধি ব্যাপী একটি সুদৃঢ় প্রাচীর ও গভীর পরিখা দ্বারা সাহজাহান এই শহর ও প্রাসাদ বেষ্টিত করেছিলেন। কোনো স্থানেই এই প্রাচীরের উচ্চতা ২৪ ফিটের কম ছিল না এবং অনেক স্থানে এর উচ্চতা ৬০ ফিট পর্যন্তও ছিল এবং এর বিস্তার ছিল যথেষ্ট। প্রাচীর সংলগ্ন কতকগুলি শক্তিশালী বুরুজও ছিল। এই প্রাচীরে সাতটি সুবৃহৎ গেট ছিল, যার মধ্যে দিল্লী গেট প্রাসাদ থেকে আর কাশ্মীর গেট ক্যানটনমেন্ট থেকে সব চেয়ে কাছে। প্রাসাদের সম্মুখেই শহরের মধ্যস্থলে দিল্লীর বিখ্যাত জুম্মা মসজিদ অবস্থিত। সাহজাহান এমন ভাবেই দিল্লী নির্মাণ করেছিলেন যে, এই শহর সারা ভারতে অন্যতম সুদৃঢ় দুর্গে পরিণত হয়েছিল। অনেকের মতে ভরতপুরের দুর্গই ছিল ভারতের সব থেকে শক্তিশালী দুর্গ; আবার কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে এই দিল্লীর দুর্গই ছিল ভরতপুরের দুর্গ থেকে অধিকতর শক্তিশালী।[১] বিদ্রোহকালীন ইংরেজরা যখন দলবল নিয়ে দিল্লী অবরোধ শুরু করল, তখন এই বিশাল নগরীর মাত্র উত্তর দিক ও খানিকটা মাত্র উত্তর-পশ্চিম অংশ অর্থাৎ কাশ্মীর গেট হতে লাহোর গেট পর্যন্ত অবরোধ করতে সমর্থ হয়েছিল; আর বাদ বাকি অংশ, অর্থাৎ সাত ভাগের ছয় ভাগ সম্পূর্ণভাবে বিদ্রোহীদের অধীনে ছিল এবং প্রাচীরের পূর্ব, দক্ষিণ ও পূর্ব-পশ্চিমের গেটগুলি দিয়ে বিদ্রোহীদের স্বাধীনভাবে যাতায়াতের কোনো অসুবিধাই ছিল না।

দিল্লীর প্রাচীরের প্রত্যেকটি গেট বুরুজ ও ছোট ছোট দুর্গের দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। এ ছাড়া প্রাচীরের বাইরে চারদিক ঘিরে একটি সুপ্রশস্ত ও ২৪ ফিট গভীর পরিখা ছিল। শুধু তাই নয়—প্রাচীরের বহির্ভাগে এক-তৃতীয়াংশ স্থান জুড়ে ছিল একটি গ্লাসীস্ (ঢালু অংশ), যার ফলে কামানের গোলা চালিয়েও প্রাচীরের নিম্নভাগে ছিদ্র করে শহরে ঢোকার পথ তৈরী করে নেওয়া শত্রুর পক্ষে প্রায় অসম্ভব ছিল। প্রত্যেকটি বুরুজে ১০টি থেকে ১৪টি পর্যন্ত কামান রাখবার ব্যবস্থা ছিল। বিদ্রোহের সময়ে এই প্রাচীর দু'শ' থেকে আড়াইশ' বৎসরের পুরানো হয়ে গেলেও, তার মূল্য ও তার শক্তি এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয়নি।

দিল্লী শহর ও এই প্রাচীর নির্মাণ করা ব্যতীত সাহজাহান আর একটি মহৎ কাজ করেছিলেন। যমুনা নদী যেখানে পাহাড় থেকে নেমে আসছে, সেখান থেকে বিশুদ্ধ পানীয় জল দিল্লীর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের লোকদের সরবরাহ করবার জন্য আলি মর্দন খাঁর খাল নামে ১২০ মাইল দীর্ঘ একটি খাল কাটিয়েছিলেন। এই খাল দিল্লী শহরের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আবার যমুনায় গিয়ে মিশেছিল।

১। বল্‌: "হিষ্ট্রি অব দি ইণ্ডিয়ান মিউটিনি", ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫২৩।

এই খালকেই ১৮২০ সালে পুনর্বার খনন করা হয় ও তার নাম রাখা হয় পশ্চিম যমুনা ক্যানাল।

এই সব দিকগুলি বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে, দিল্লীর রাজনৈতিক গুরুত্ব যতখানি, তার সামরিক গুরুত্বও তার চাইতে কোনো অংশে কম নয়। এইরূপ একটি একাধারে সুসজ্জিত শক্তিশালী দুর্গ ও রাজনৈতিক কেন্দ্র বিদ্রোহীদের হস্তগত হওয়া ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্যের অস্তিত্বের পক্ষে কতখানি বিপজ্জনক তা ইংরেজ শাসকদের বুঝতে এক মুহূর্ত বিলম্ব হয়নি।

১১ই মে তারিখে দিল্লীতে বিদ্রোহের দিনে বিদ্রোহীরা যখন পোস্ট অফিস আক্রমণ করছিল, তখন একটি কর্মচারী কোনো মতে শেষ মুহূর্তে আম্বালা ক্যানটনমেণ্টে এই মর্মে একটি টেলিগ্রাম পাঠাতে সমর্থ হয়েছিল: "মিরাট থেকে বিদ্রোহীরা এসে গিয়েছে। তারা ইংরেজদের হত্যা করছে, শহর লুটপাট করছে। আর সময় নেই। বিদায়।" এই টেলিগ্রাম আবার তৎক্ষণাৎ সিমলা ও লাহোরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। দু' এক দিনের মধ্যে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ বিদ্রোহ সম্বন্ধে আরও যে সব খবর পেল তাতে তাদের মনে আর কোনো সংশয় রইল না যে, এ বিদ্রোহ মুষ্টিমেয় কয়েকজন সিপাহীদের বিদ্রোহ নয়, কিম্বা শুধু মাত্র একটা স্থানীয় বিদ্রোহও নয়; সে ধরনের বিদ্রোহ তারা পূর্বে কিছু কিছু দেখেছে। এই সব খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের উচ্চ স্থানীয় বৃটিশ শাসকরা বুঝতে পারল যে, এটা হচ্ছে বিদেশী শাসনকে সমূলে ধ্বংস করবার জন্য একটা জাতীয় বিদ্রোহ, সুতরাং তাদের সম্মুখে এখন প্রধান সমস্যা হল—কি ভাবে বিদ্রোহের এই প্রচেষ্টাকে দাবিয়ে দিয়ে পুনরায় ভারতবর্ষকে জয় করা যায়। কিন্তু এইবার ভারতকে পুনরায় জয় করতে হলে, তাদের সর্বপ্রথম প্রয়োজন দিল্লীর সুরক্ষিত শক্তিশালী দুর্গকে ধূলিসাৎ করে দেওয়া,—যে দিল্লী এই ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে এক মুহূর্তের মধ্যে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের কেন্দ্রস্থল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইংরেজ সরকারের কমাণ্ডার-ইন-চীফ এনসন্ এই সময় তাঁর স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য সিমলায় বিশুদ্ধ শীতল বায়ু সেবন করছিলেন। মিরাট ও দিল্লীর বিদ্রোহের খবর পাওয়া মাত্রই ঐ অঞ্চলে অবস্থিত ১ম, ২য়, ও ৭৫শ ইংরেজ বাহিনী তিনটিকে তৎক্ষণাৎ তিনি আম্বালা অভিমুখে যাত্রা করতে আদেশ দিলেন। ফিরোজপুর, জলন্ধর, ফিলুর প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিগুলিতে যাতে সব রকম নিরাপত্তা ও আত্মরক্ষার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়, তার হুকুমও চলে গেল। ডেরায় অবস্থিত সিরমুর বাহিনীর গুর্খাদের এবং রুরকির স্যাপার্স ও মাইনার্সদের মিরাটে পাঠিয়ে দেওয়া হল। সিমলার উত্তরে জুটোগে

অবস্থিত নাসিরী বাহিনীর গুর্খাদের বলা হল ফিলুর গিয়ে সেখান থেকে সীজ-ট্রেন (অবরোধ কামান) সঙ্গে নিয়ে আম্বালায় পৌঁছতে। এই হুকুমের বিরুদ্ধে কি ভাবে নাসিরী গুর্খারা বিদ্রোহ করেছিল তা অন্যত্র বর্ণনা করা হবে।

এনসন্ ১৫ই মে তারিখে আম্বালায় এসে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই পাঞ্জাবের শাসনকর্তা জন লরেন্স তাঁকে বলে পাঠালেন যে, দিল্লীর কাজটা এক্ষনি 'সংক্ষেপে' সেরে ফেলতে হবে। অবশ্য এই অত্যধিক আগ্রহের জন্য লরেন্সকে দোষ দেওয়া যায় না। বিদ্রোহী-দিল্লীর গূঢ়ার্থ ইংরেজ শাসকদের মধ্যে বোধ করি তিনিই সব থেকে বেশী বুঝতে পেরেছিলেন। তিনিই সকলকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে, বিদ্রোহী-দিল্লীর এক একটি দিনের অস্তিত্বের অর্থ হচ্ছে প্রতিদিন ভারত সাম্রাজ্যের এক একটা অংশের বিদ্রোহের পক্ষে যোগ দেওয়া এবং প্রতিদিন বিদ্রোহী সিপাহীদের বিভিন্ন স্থান হতে দিল্লীতে আগমনের সুযোগ বাড়ানো ও দিল্লীর প্রতিরোধ শক্তিকে অজেয় করে তোলা; বিদ্রোহী-দিল্লীর অস্তিত্বকে যতদিন থাকতে দেওয়া হবে, ততদিন পর্যন্ত সংক্রামক ব্যাধির মতো পাঞ্জাব ও সীমান্তের বারুদ স্তূপে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়বার সম্ভাবনা থেকেই যাবে। লর্ড ক্যানিংও এই একই মত প্রকাশ করলেন এবং দিল্লীর ব্যাপারটাকে সংক্ষেপে সেরে ফেলতে ও একটা 'ভয়ঙ্কর উদাহরণ' স্থাপন করতে বললেন ('Dispose speedily of Delhi, and make a terrible example')।

কিন্তু জেনারেল এনসন্ ও অন্যান্য সামরিক নেতারা দিল্লী পুনরাধিকার করার রাজনৈতিক জরুরী প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করলেন না; সামরিকভাবে তা সম্ভব কি না সেই প্রশ্নের উপরই তাঁরা বেশী জোর দিলেন। দিল্লী জয় করা রাজনৈতিকভাবে যত জরুরীই হোক না কেন, উপযুক্ত সামরিক সাজসরঞ্জাম যোগাড় না করে এত বড় একটা বিপজ্জনক কাজে তাঁরা হাত দেন কি করে? তাই এনসন্ প্রত্যুত্তরে লরেন্সকে জানালেন:

"বড় বড় কামানগুলি যদি দাঁড় করানো যায়, তা হলে তা দিয়ে দিল্লীর দেওয়াল ভেঙে হয়ত চুরমার করে দেওয়া যায়। হয়ত এই ভাবে শহরে ঢুকবার একটা পথ প্রস্তুত করা যেতে পারে। এতে হয়ত আমরা খুব বাধা পাব না। কিন্তু এত বড় একটা শহরে, যেখানে এতগুলি সরু সরু রাস্তা ও যার অসংখ্য সশস্ত্র অধিবাসীরা প্রত্যেকটি অলিগলির সঙ্গে পরিচিত, সেখানে আমরা মাত্র অল্প কয়েকজন লোক ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যে পড়ব।"[১]

১। ফরেষ্ট: "ষ্টেট পেপার্স", ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৪।

মিরাট বাহিনীর কমাণ্ডার জেনারেল উইলসনও এই একই মত দিলেন। তিনি বললেন ২,৫০০ বিদ্রোহী সিপাহীর সঙ্গে যুদ্ধ করা, আর একটা সশস্ত্র জনতার সঙ্গে যুদ্ধ করা এক রকম ব্যাপার নয়। উইলসনও বেশ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, তাঁদের কেবলমাত্র একটা সামরিক যুদ্ধই করতে হবে না, তাঁদের সম্মুখীন হতে হবে একটা গণযুদ্ধের বিরুদ্ধে, একটা বৈপ্লবিক যুদ্ধের বিরুদ্ধে, সে যুদ্ধে হয় জিততে হবে, নয় মরতে হবে।

কিন্তু বীরপুঙ্গব লরেন্স এসব কোনো যুক্তিতেই কর্ণপাত করতে চাইলেন না। তিনি এনসন্‌কে লিখলেন: "আমি এখনও বিশ্বাস করি যে দিল্লীতে আমাদের কেউ কোনো রকম বাধা দেবে না। আমার ধারণা যে আমাদের সৈন্যদের অগ্রসর হতে দেখেই বিদ্রোহীরা হয় পালিয়ে যাবে, নতুবা জনসাধারণই বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে আমাদের জন্য দরজা খুলে দেবে।"[১] লরেন্স আরও লিখলেন যে, সাধারণ ভারতীয়রা ইংরেজের বিরোধী নয়; এই সব গণ্ডগোলের মূলে রয়েছে মুষ্টিমেয় কয়েকজন সিপাহী যারা কয়েকজন চক্রান্তকারীর দ্বারা বিপথে চালিত হয়েছে। লরেন্স আবার কমাণ্ডার-ইন-চীফকে এই বলে উদ্বুদ্ধ করবার চেষ্টা করলেন:

"ভারতের সমগ্র ইতিহাসের কথা চিন্তা করে দেখুন। ··· যখন আমরা তেজস্বিতার সঙ্গে কাজ করেছি, আমরা কি কখনও অকৃতকার্য হয়েছি? আর ভীরুতার দ্বারা যেখানে চালিত হয়েছি, সেখানে কি আমরা সফল হয়েছি? ক্লাইভ তাঁর অফিসারদের পরামর্শ উপেক্ষা করে মাত্র ১,২০০ লোক নিয়ে যুদ্ধ করে ৪০,০০০ লোককে পরাজিত করে বাংলা দেশ জয় করেছিলেন।"[২]

সাম্রাজ্যবাদী বীরপুরুষ লরেন্সের 'ভারতের সমগ্র ইতিহাসের' গভীর পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। শুধুমাত্র এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, পলাশীর যুদ্ধে ক্লাইভের সঙ্গে ৩,০০০ সুসজ্জিত ও সুশৃঙ্খল সৈন্য ছিল—১,২০০ নয়, আর নবাব সিরাজউদ্দৌল্লার দিকে ছিল—৪০,০০০ নয়—২০,০০০, যাদের মাত্র ক্ষুদ্র একটা ভগ্নাংশ বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে লড়েছিল, আর বেশীর ভাগই বিশ্বাসঘাতকদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে একটা সংকট মুহূর্তে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছিল। দিল্লীর পরিস্থিতি সম্পূর্ণ অন্যরূপ ছিল। দিল্লীতে ইংরেজের নিকট প্রশ্ন হল—একটা বিশ্বাসঘাতক সৈন্য বাহিনীর সম্মুখীন হওয়া নয়, একটা শক্তিশালী সুসজ্জিত বিশাল দুর্ভেদ্য দুর্গের সম্মুখে স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ও বিদেশী শত্রুর হাত থেকে মাতৃভূমিকে

১। "পাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্ডস্", ৭ম খণ্ড, ১ম ভাগ, পৃঃ ৫১।
২। ঐ, পৃঃ ৫৫।

মুক্ত করবার জন্য একদল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বিদ্রোহী সিপাহী ও সশস্ত্র জনসাধারণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। দিল্লীর এই অবস্থা যে এতটুকু অতিরঞ্জিত ছিল না, তা চার মাস ধরে প্রতিটি দিন ও প্রতিটি পদে পদে ইংরেজরা খুব ভালভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছিল।

মিরাট বিদ্রোহের ৮ দিন পর, ১৮ই মে তারিখে, ব্রিগেডিয়ার উইলসনের নেতৃত্বে ঐ শহর থেকে প্রথম বৃটিশ বাহিনী দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করল। আম্বালা থেকে আর একটি ইংরেজ বাহিনী ২৩শে মে একই গন্তব্য স্থলে চলল। স্থির হল, এই দুটি বাহিনী পানিপথে মিলিত হয়ে এক সঙ্গে দিল্লীর দিকে অগ্রসর হবে।

আম্বালা থেকে দিল্লীর ১০ মাইল উত্তরে আলিপুর পর্যন্ত, গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের এই অংশটুকু সামরিক গুরুত্বের দিক থেকে প্রথম স্থান অধিকার করেছিল। কারণ এইটাই ছিল পাঞ্জাব থেকে দিল্লী পর্যন্ত ইংরেজ সৈন্যদের চলাচল করবার ও অস্ত্রশস্ত্র খাদ্যদ্রব্য পাঠাবার প্রধান রাস্তা। দিল্লী জয় করতে হলে এই রাস্তার দু' ধারে বিদ্রোহী ভাবাপন্ন জনসাধারণকে দাবিয়ে রেখে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতেই হবে। কিন্তু এই কাজের জন্য ইংরেজ সরকারের তখন সামর্থ্য ছিল না—তাদের যা কিছু লোকবল সবই দিল্লীর বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে নিয়োগ করতে হচ্ছে। ইংরেজের পরম সৌভাগ্য যে এইরূপ সংকটের সময়, যখন সমস্ত উত্তর ভারত তাদের হস্তচ্যুত হবার উপক্রম হয়েছে, পাতিয়ালা, ঝিন্দ ও নাভার শিখ রাজারা ও কর্নালের নবাব এই গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে বিদ্রোহ দমন ও গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড মুক্ত রাখবার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। দিল্লী ও মিরাটের বিদ্রোহের সঙ্গে সঙ্গেই কর্নালের জনসাধারণ ইংরেজ-ধ্বংসের কাজ শুরু করে দিয়েছিল; এই অবস্থা চলতে থাকলে মিরাটি বাহিনীর পক্ষে আম্বালা বহিনীর সঙ্গে মিলিত হওয়া কঠিন হয়ে পড়ত এবং দিল্লীর বিরুদ্ধে অভিযানও এত শীঘ্র সম্ভব হত না। কে' তাই আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে লিখেছেন যে—"আমাদের পক্ষে খুব সৌভাগ্যের বিষয় যে এই সন্ধিক্ষণে কর্নালের নবাব, যিনি এই অঞ্চলের একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক ও প্রতিপত্তিশালী বড় জমিদার, তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়ে আমাদের দিকে যোগ দিলেন।"[১]

শতদ্রু ও যমুনার মধ্যবর্তী সামরিক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে পাতিয়ালার রাজাই ছিলেন প্রধান; তার পরেই কাপুরতলা, নাভা ও ঝিন্দ। ফরেস্ট বলেছেন:

"পাতিয়ালা রাজ্যের মধ্য দিয়েই গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড গিয়েছে, সে রাস্তা পাঞ্জাবকে ভারতের সঙ্গে যুক্ত করেছে। আমাদের এই যাতায়াতের রাস্তাটিকে

১। কে': "হিষ্ট্রি অব সিপয় ওয়ার ইন ইণ্ডিয়া", ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৬৩।

পাতিয়ালার মহারাজা অনায়াসেই বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারতেন। এবং খালসা সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত শক্তিশালী পরিবারগুলির মধ্যে অন্যতম নেতা হিসাবে, তিনি সমগ্র শিখ জাতিকে আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে পারতেন। সুতরাং আম্বালাতে যখন মিরাট ও দিল্লীর হত্যাকাণ্ডের খবর পৌছল, মহারাজা কোন দিকে যাবেন এই ভেবে আমরা খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলাম।"[১]

বস্তুতঃ, এ বিষয়ে ইংরেজদের উৎকণ্ঠার বিশেষ কোনো গভীর কারণ ছিল না। এই সমস্ত শিখ রাজারা, যারা সব সময় মহারাজা রণজিৎ সিংহের বিরুদ্ধে ইংরেজকে সাহায্য করেছিল, যারা ১৮৪৫ ও ১৮৪৯ সালের উভয় শিখ যুদ্ধের সময়ই নিজের বিরুদ্ধে ইংরেজের দিকে লড়েছিল, ১৮৫৭ সালেও নিজেদের স্বার্থবশে স্বতঃ-প্রণোদিত হয়ে তাদের বিদেশী প্রভুদের পাশে এসে দাঁড়াল। দিল্লীর বিদ্রোহের ৩ দিনের মধ্যে পাতিয়ালার মহারাজা এক হাজার শিখ সৈন্য ও কতকগুলি কামান নিয়ে নিজে সশরীরে থানেশ্বর রক্ষা করবার জন্য উপস্থিত হলেন; অন্যান্য শিখ রাজারাও পিছিয়ে থাকলেন না।[২]

১। ফরেষ্ট: "ষ্টেট পেপার্স", ১ম, পৃঃ ৩৫।

২। "পাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্ডস্", ৭ম খণ্ড, ১ম ভাগ, পৃঃ ৩৬।
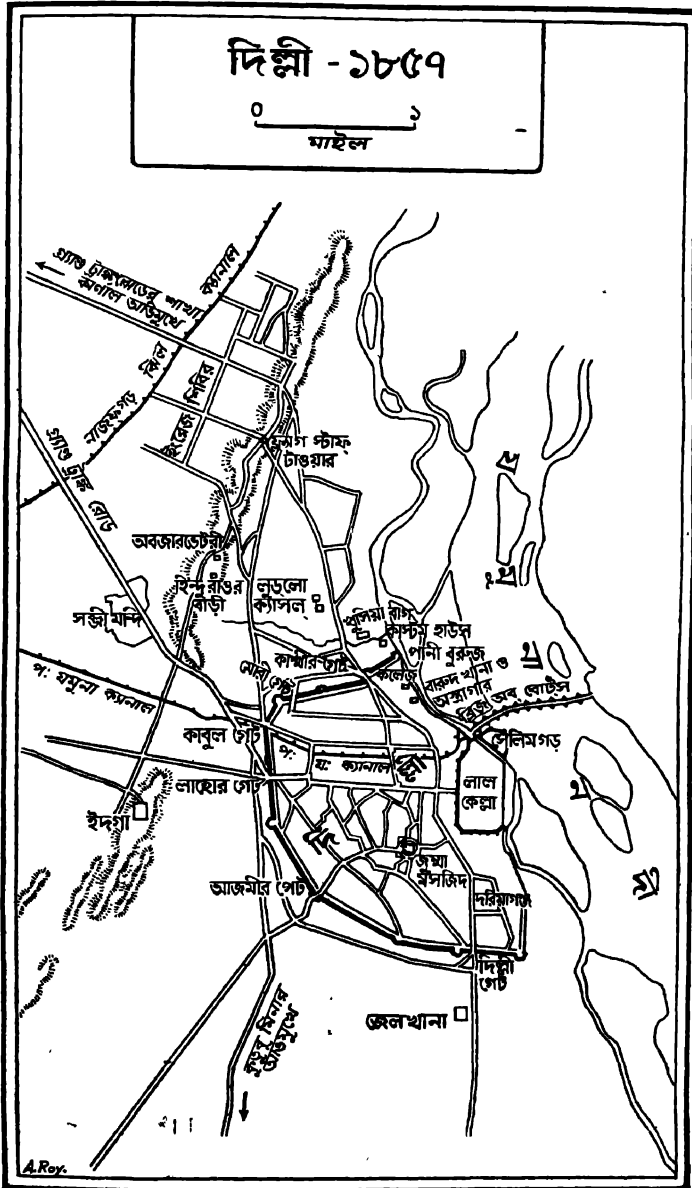
রাজধানী দিল্লীকে কেন্দ্র করে বিদ্রোহীদের ব্যূহ রচনা

দিল্লী অবরোধ

৩০শে মে তারিখে মিরাট বাহিনী দিল্লী হতে ১৫ মাইল পূর্বে হিন্দন নদীর তীরে অবস্থিত গাজী-উদ্দিন নগরে (বর্তমান গাজীযাবাদ) এসে পৌছল। অর্থাৎ মাত্র এই ২০ মাইল আসতে লাগল তাদের ১৩ দিন। বস্তুতঃ মিরাট-দিল্লীর রাস্তার দু' ধারে সকল স্থানেই জনসাধারণ বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল ; কোথায়ও বৃটিশ রাজত্বের কোনো চিহ্নমাত্র ছিল না। দিল্লীর বিদ্রোহীরা যদি মিরাট বাহিনীর এই অভিযানের মর্মার্থ সত্বর বুঝতে পারত, তা হলে ইংরেজের এই প্রচেষ্টাকে তারা অঙ্কুরেই নষ্ট করে দিতে পারত। গ্রামবাসীরা, যদিও তাদের বিশেষ কোনো অস্ত্রশস্ত্র ছিল না, তবু ইংরেজ বাহিনীকে পদে পদে বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল। এই গ্রামবাসীদের সাহায্যে মাত্র অল্প কয়েকজন বিদ্রোহী সিপাহীর পক্ষে গেরিলা-কৌশল অনুসরণ করে ইংরেজ বাহিনীকে অচল করে দেওয়া হয়ত সম্ভব হত।

কিন্তু বাহাদুর শাহ মিরাট বাহিনীর যাত্রার কথা শোনামাত্রই এর গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিলেন এবং পথিমধ্যে ইংরেজদের আক্রমণ করবার জন্য সিপাহীদের তাগিদ দিচ্ছিলেন। সিপাহীরা যে কোনো কারণেই হোক তাতে বিশেষ আগ্রহ দেখায়নি।[১] যাই হোক, গাজী-উদ্দিন নগরের নিকট যখন শত্রুবাহিনী এসে গেল, তখন সিপাহীরা দিল্লী থেকে বার হয়ে হিন্দন নদীর লৌহ-সেতুর ধারে একটা টিলার উপর তাদের কামান বসিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল। ইংরেজরা যাতে নদী পার না হতে পারে তার জন্য বিদ্রোহীরা লৌহ-সেতুটাকে ধ্বংস করে দিতে

১। "বাদশাহ বারংবার বিদ্রোহীদের মিরাট বাহিনীকে আক্রমণ করতে বলেছিলেন, কিন্তু তারা একটা না একটা কারণ দেখিয়ে শুধু বিলম্বই করতে লাগল।"—(মেটকাফ সম্পাদিত —"টু নেটিভ ন্যারেটিভস্", পৃঃ ৬২)।

চেয়েছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে ইংরেজরা সেতু দখল করে ফেলেছে। এই সেতুর ধারে উভয় পক্ষ থেকে ভয়ঙ্কর ভাবে কামানের যুদ্ধ শুরু হল, এবং অপরাহ্নে হল হাতাহাতি যুদ্ধ। এই যুদ্ধ চলল যতক্ষণ পর্যন্ত না উভয় পক্ষ সম্পূর্ণভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। বিকাল ৪টার সময় বিদ্রোহীরা তাদের কামান ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দিল্লী অভিমুখে ফিরে চলল। সারা বিদ্রোহের সময়ই দেখা গিয়েছে যে বিদ্রোহীরা অনেক ক্ষেত্রেই এই ফিরে আসার আত্মঘাতী নীতি অবলম্বন করেছে।

হিন্দনের যুদ্ধ শত্রুর সঙ্গে বিদ্রোহীদের প্রথম সংঘর্ষ। এই যুদ্ধে একজন সিপাহী যে বীরত্ব ও আত্মোৎসর্গের পরিচয় দিয়েছিলেন, যে রকমের উদাহরণ আরও অনেক সিপাহী ও জনসাধারণ মহাবিদ্রোহের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখিয়ে গিয়েছেন, সে কথা একজন বিদেশী ঐতিহাসিক এই ভাবে বর্ণনা করেছেন:

"আমাদের ক্ষতি খুবই সামান্য হত, যদি আমাদের গোলাবারুদের একটা গাড়িতে বিস্ফোরণ না হত; এই ঘটনা যুদ্ধের আকস্মিকতার ফলে ঘটেনি, ঘটেছিল একজন বিদ্রোহীর দৃঢ় সঙ্কল্পিত আত্মঘাতী কাজের ফলে। যে মুহূর্তে এণ্ড্রুজ একদল লোক নিয়ে উক্ত গাড়ির কামানটি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে উদ্যত হয়েছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে ১১শ বিদ্রোহী বাহিনীর একজন সিপাহী সুবিবেচিতভাবেই বারুদের মধ্যে গুলী ছুঁড়ে মারল। এই বিস্ফোরণের ফলে সিপাহীর জীবন নষ্ট হল, কিন্তু এণ্ড্রুজ ও তাঁর কয়েকজন সহচরও মারা গেলেন, এবং আরও কয়েকজনকে হাঁসপাতালে নিয়ে যেতে হল। এই ঘটনা আমাদের এই শিক্ষা দিল যে, বিদ্রোহীদের মধ্যে এমন অনেক সাহসী ও মরিয়া লোক আছে যারা জাতীয় আদর্শের জন্য মৃত্যুবরণ করতে একমুহূর্ত ইতস্ততঃ করবে না। এই রকম বীরত্বের উদাহরণগুলিই এই বিদ্রোহের ইতিহাসকে উজ্জ্বল করে রেখেছে এবং নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, এই ধরনের আরও অনেক উদাহরণ আছে, যা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়নি।"[১]

রজনীকান্ত গুপ্ত তাঁর 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাসে' এই কাহিনী বর্ণনা করে আক্ষেপের সঙ্গে বলে গেছেন—"জাতীয় জীবন ও স্বাধীনতায় অনুপ্রাণিত হইলে, বীরপুরুষ কিরূপে আপনার সাহসের পরিচয় দিতে পারে, তাহা এই সিপাহীদের বিবরণে বুঝা যায়। ইউরোপ হইলে এই সকল বীরপুরুষদের বীরত্ব কীর্তি ঘোষিত হইত। সকলেই আজ পর্যন্ত সাধারণের সমক্ষে জীবন্তভাবে বিচরণ করিত। কিন্তু এই হতভাগ্য দেশে ইহাদের নাম পর্যন্ত ইতিহাসে পাওয়া

১। কে': "হিষ্ট্রি অব সিপয় ওয়ার ইন ইণ্ডিয়া"—২য়, পৃঃ ১৮৪-৮৫।

যায় না। অনন্তকালের অভিঘাতে, অতীত স্মৃতির সন্তাড়নে সমস্তই নির্মূল হইয়া গিয়াছে।"—(৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪৫)।

পরদিন সকালে বিদ্রোহীরা আবার দিল্লী থেকে বের হয়ে এল এবং দ্বিপ্রহরে যখন সূর্যের তেজ খুব প্রখর হয়ে উঠেছে, তখন আবার সেতুর একমাইল দূরে সেই টিলার উপর থেকে কামান দাগতে শুরু করল। ভয়ঙ্কর রৌদ্রের উত্তাপ ইংরেজদের পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। তারই মধ্যে দু' ঘণ্টা ব্যাপী দু'পক্ষের সমানে কামান যুদ্ধ চলল। ইংরেজ ঐতিহাসিক কে' বলেন :

"আমাদের সৈন্যদের তৃষ্ণা অসহণীয় হয়ে উঠেছিল। তাদের অনেকে সর্দি-গর্মিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ল, আর অনেকে ক্লান্তিতে নিঃশেষিত হয়ে ভূমিতে লুটিয়ে পড়তে লাগল।"[১]

কিন্তু এই অবস্থায়, যখন ইংরেজদের লড়বার শক্তি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, ঠিক সেই সময় বিদ্রোহীরা নিশ্চিত বিজয়ের সম্ভাবনাকে ধুলোয় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আবার পূর্বদিনের মত যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে দিল্লী অভিমুখে ফিরে চলল। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, অধ্যবসায়সম্পন্ন উপযুক্ত নেতৃত্বের অধীনে বিদ্রোহীরা ব্রিগেডিয়ার উইলসনের বাহিনীকে ধ্বংস করে ফেলতে পারত—এ কথা যে একেবারেই অত্যুক্তি নয় তা কে'-র কথাতেই বোঝা যায়। তিনি বলেন :

"বিদ্রোহীরা দিল্লী থেকে এসে যদি আমাদের একবার আক্রমণ করত, তা হলে আমাদের সৈন্যরা, যারা ঐদিনকার যুদ্ধে এতই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, তারা শত্রুর আর একটা আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারত কি না তা খুবই সন্দেহের বিষয়। কিন্তু ১লা জুন শত্রুর দিক থেকে কোনো আক্রমণই দেখা গেল না, উপরন্তু মেজর রীডের অধীনে ৫০০ গুর্খা আমাদের ক্যাম্পে এসে হাজির হল।"[২]

স্বভাবতঃই ইংরেজরা হিন্দনের যুদ্ধকে নিজেদেরই জয় বলে গণ্য করল, এবং মিরাট ও দিল্লীর অপমানজনক পরাজয়ের পর তাদের মানসিক অবস্থার (morale) দিক থেকে এইরূপ জয়ের খুবই প্রয়োজন ছিল।[৩]

হিন্দনের যুদ্ধে বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব করেছিলেন শাহজাদা আবু বকর। যুদ্ধ সম্বন্ধে যার কোনো প্রকার ধারণাই ছিল না, সেই শাহজাদারই কৃতিত্ব সম্বন্ধে একজন প্রত্যক্ষদর্শীর এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় :

১। কে' : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ২য়, পৃঃ ১৮৬।

২। ঐ, পৃঃ ১৮৭।

৩। ফরেষ্টের মতে হিন্দনের যুদ্ধ সিপাহীদের "ক্রমবর্ধমান অহঙ্কারকে খর্ব করে দিল।" —"হিষ্ট্রি অব দি ইণ্ডিয়ান মিউটিনি", ১ম, পৃঃ ৭৬।

"সেনাপতি আবু বকর হিন্দন নদীর ধারে সেতুর নিকটেই একটা বাড়ির ছাদের উপর উঠে যুদ্ধ দেখতে লাগলেন। মাঝে মাঝে তিনি তাঁর গোলন্দাজদের বলে পাঠাতে লাগলেন যে, তাদের কামানের গোলা শত্রু বাহিনীতে কি ভয়ঙ্কর ধ্বংসের সৃষ্টি করছে। তিনি সেতুর নিকটে একটি কামান স্থাপন করে ইংরেজদের সঙ্গে গোলাগুলী বিনিময় করছিলেন। কিছুক্ষণ পরেই ইংরেজের একটি গোলা এসে তাঁর কামানের নিকট ফাটল ও তাঁর গোলন্দাজকে ধুলোতে ভর্তি করে দিল। জীবনে এই প্রথম গোলার বিস্ফোরণের অভিজ্ঞতা লাভ করে সেনাপতি তাড়াতাড়ি ছাদের উপর থেকে নেমে পড়লেন এবং ঘোড়ায় চড়ে তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে দৌড়তে শুরু করলেন, সিপাহীদের চীৎকারে কোনোরূপ কর্ণপাত করলেন না। তার পরে সিপাহীরাও ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল।"[১]

দিল্লীর যুদ্ধে বারবার দেখা যাবে যে, অনেক চেষ্টা করেও সিপাহীরা নিজেদের যোগ্য নেতৃত্ব সংগঠন করতে পারেনি এবং নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি করে বারবার তারা এই সব অযোগ্য শাহজাদাদেরই শরণাপন্ন হয়েছে।

ইতিমধ্যে ইংরেজ বাহিনীর প্রধান অংশ আম্বালা থেকে যাত্রা করে ৫ই জুন দিল্লীর ১০ মাইল উত্তরে আলিপুর এসে পৌছল। ২৬শে মার্চ কর্নালে জেনারেল এন্‌সনের মৃত্যু হওয়ায় জেনারেল বারনার্ড ইংরেজ বাহিনীর কমাণ্ডার নিযুক্ত হলেন। ক্রাইমিয়ার সেবাস্তপোলের যুদ্ধে বারনার্ড খুব নাম করেছিলেন। আলিপুরে এসে বারনার্ড মিরাট বাহিনী ও অবরোধ-কামানের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। মিরাট বাহিনী হিন্দনের যুদ্ধের পর বাঘপথে যমুনা নদী পার হয়ে ৭ই জুন বারনার্ডের বাহিনীর সঙ্গে আলিপুরে এসে মিলিত হল। এবং ঠিক এই সময়েই ২৮টি বিভিন্ন ধরনের অবরোধ-কামানও এসে পৌছল। এখন ইংরেজ বাহিনীর শক্তি হল ২,৪০০ পদাতিক ও ৬০০ অশ্বারোহী[২]; অর্থাৎ, বিদ্রোহীদের এই সময়কার সংখ্যার (২,৫০০) চাইতে বেশী। এই ইংরেজ বাহিনীতে ৫০০ গুর্খা ও কিছু পাঠানও ছিল। ইংরেজ বাহিনী ৭ই জুন মধ্যরাত্রে আবার যাত্রা শুরু করল এবং পরদিন প্রত্যুষে দেখতে পেল যে দিল্লীর ৫।৬ মাইল উত্তরে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ধারে বদলী-কি-সরাই নামে একটি গ্রামে বিদ্রোহীরা ইংরেজ বাহিনীর অগ্রগতি রোধ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। এখানে ছিল পুরাতন মোগল

১। মেটকাফ সম্পাদিত : "টু নেটিভ ন্যারেটিভস্", পৃঃ ৩২।

২। অ্যাসিস্‌টেন্ট এডজুটাণ্ট জেনারেল নর্মানের "ন্যারেটিভ অব দি ক্যাম্পেইন অব এইটিন ফিফটি সেভেন্ (দিল্লী)"—ফরেষ্ট : "ষ্টেট পেপার্স", ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৩৫।

ওমরাহদের বড় বড় দেওয়াল দিয়ে ঘেরা কতকগুলি বৃহৎ বাড়ি; শত্রুকে বাধা দেবার পক্ষে উপযুক্ত স্থান।

এইবার সিপাহীরা আর একজন শাহজাদা, মির্জা খিজির খানের, সেনাপতিত্বে[১] অনেকগুলি কামান এনে বদলীতে বসিয়েছিল এবং এর উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করেছিল। দু' দিক থেকে তুমুল গোলাবর্ষণ শুরু হল এবং "ইংরেজরা তাদের জায়গায় টিকে থাকতে পারবে কি না কিছুক্ষণের জন্য সে বিষয়ে সন্দেহ হল।"[২] জেনারেল বারনার্ডের নেতৃত্বে ইংরেজ গোলন্দাজরা সিপাহীদের যখন ব্যস্ত করে রাখছিল ঠিক সেই সময় ইংরেজ অশ্বারোহীরা ব্রিগেডিয়ার হোপ গ্র্যান্টের নেতৃত্বে ক্যানাল পার হয়ে বিদ্রোহীদের পার্শ্বদিক আক্রমণ করল। তারপর চলল হাতাহাতি যুদ্ধ—"যার মধ্যে বিদ্রোহীরা তাদের কামানগুলিকে দৃঢ় ভাবেই রক্ষা করেছিল। তারা ভালভাবেই দেখিয়েছিল যে, তাদের মধ্যে অনেক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোক আছে। তাদের অনেকেই খুব সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের বেয়নেট দিয়ে হত্যা না করা হয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের কামানগুলি ছেড়ে দেয়নি।"[৩]

কিন্তু সিপাহীদের অতুলনীয় বীরত্ব ও সাহস সত্ত্বেও অনুপযুক্ত নেতৃত্বের জন্য বদলী-কি-সরাই-এর যুদ্ধে বিদ্রোহীরা পরাজিত হল। বদলীর যুদ্ধের গুরুত্ব বুঝতে পেরে দিল্লীর জনসাধারণ তার ফলাফল উদ্বিগ্নচিত্তে লক্ষ্য করছিল। তারা ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিল যে, ইংরেজদের যদি বদলীতে রুখতে না পারা যায়, তা হলে দিল্লী শহরের অবস্থা খুবই সংকটজনক হয়ে পড়বে। বদলীতে সিপাহীরা এবার খুব ভালভাবে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল, সুতরাং তাদেরই বিজয় হবে বলে তারা খুব আশা করেছিল। কিন্তু যখন তারা সিপাহীদের নতমস্তকে ফিরে আসতে দেখল, "তখন তারা তাদের কাপুরুষ বলে গালাগালি দিতে শুরু করল; আর সিপাহীরাও উল্টে অশ্বারোহী সিপাহীদের এই বলে অভিযুক্ত করল যে, তারা

১। মেটকাফ সম্পাদিত, "টু নেটিভ ন্যারেটিভস্", পৃঃ ৬৩।

২। কে': পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ২য়, পৃঃ ১৯১; নর্মান তাঁর 'ন্যারেটিভ'-এ লিখেছেন যে, প্রত্যুষে আমরা যেই মুহূর্তে কামান দাগতে শুরু করলাম, ঠিক সেই সঙ্গে সঙ্গে শত্রুরাও উত্তর দিতে আরম্ভ করল। "শত্রুপক্ষের গোলা আমাদের অবস্থা খুবই শোচনীয় করে তুলল। আমাদের বড় কামানগুলি টানবার জন্য যে বদলগুলি ছিল গাড়োয়ানরা সেগুলি নিয়ে পালিয়ে গেল; আমাদের একটা বারুদের গাড়িতে বিস্ফোরণ হল; আমাদের লোকরা দ্রুত মরতে লাগল! আমাদের অফিসার ষ্টাফও শত্রুদের ভাল লক্ষ্য জুগিয়েছিল; দুজন তো মারাই গেলেন।"—(ফরেষ্ট: "ষ্টেট পেপার্স", ১ম, পৃঃ ৪৩৫।

৩। কে': পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ২য়, পৃঃ ১৯২।

এত তাড়াতাড়ি দিল্লীতে ফিরে এল কেন ?”[১] এর থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, সিপাহীদের পদাতিক, অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ এই বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে পরস্পরের সহযোগিতার অভাব ছিল। নেতৃত্ব যেখানে এত দুর্বল সেখানে কার্যকরী সহযোগিতা (co-ordination) সংগঠন করাও খুব কঠিন। হিন্দনের যুদ্ধ থেকে সিপাহীরা কোনো শিক্ষাই গ্রহণ করেনি। হোপ গ্র্যাণ্ট যখন অশ্বারোহীদের নিয়ে বিদ্রোহী গোলন্দাজদের পার্শ্ব ও পশ্চাৎভাগ আক্রমণ করলেন, তখন তাদের প্রতিরোধ করার জন্য বদলীতে বিদ্রোহীদের কোনো অশ্বারোহী বাহিনী উপস্থিত ছিল না। গোলন্দাজদের উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করে হয়ত অশ্বারোহীদের দিল্লীতে ফিরে যাবার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। শুধু মাত্র কামানের গোলা দিয়ে যে শত্রুকে ধ্বংস করা যায় না এই চিন্তাটা বোধ হয় বিদ্রোহী সেনাপতির মস্তিষ্কে প্রবেশ করেনি। বিদ্রোহীদের পার্শ্ব ও পশ্চাৎভাগ আক্রমণ করার জন্য হোপ গ্র্যাণ্টের অশ্বারোহীদের একটা অসমতল ছোট রাস্তা দিয়ে আসতে হয়েছিল, যা অশ্বারোহীদের চলাচলের পক্ষে খুবই অসুবিধাজনক, সুতরাং এই সময়ে তাদের প্রতিরোধ করা খুব কঠিন হত না। কিন্তু ঘটনাস্থলে অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীর অভাবে বিদ্রোহীরা এই সুযোগ গ্রহণ করতে পারল না। হোপ গ্র্যাণ্টের এই দুঃসাহসী কৌশলই বদলী যুদ্ধের ভাগ্য নির্ণয় করল। সর্বশেষে, বিদ্রোহীরা যখন বদলীর যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে দিল্লীতে ফিরে যাচ্ছিল, তখন এই ইংরেজ অশ্বারোহীরাই বিদ্রোহীদের যথেষ্ট ক্ষতি করে সিপাহীদের ভাল ভাল ১৩টি কামান ও অনেক সাজসরঞ্জাম হস্তগত করল।

গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড বদলী থেকে শহরতলি সবজিমণ্ডী হয়ে দিল্লীতে প্রবেশ করেছে। সবজিমণ্ডী থেকে আবার একটা শাখা দিল্লীর রীজের (টিলা) পাশ দিয়ে সোজা ক্যানটনমেণ্টে চলে গিয়েছে—যে ক্যানটনমেণ্ট থেকে এক মাস পূর্বে ইংরেজদের রাত্রের অন্ধকারে কোনো রকমে পালাতে হয়েছিল। বদলীতে ইংরেজ বাহিনী দু' ভাগে বিভক্ত হয়ে এক ভাগ চলে গেল বারনার্ডের নেতৃত্বে ক্যানটনমেণ্টের দিকে, আর এক দল থাকল সবজিমণ্ডীতে উইলসনের নেতৃত্বে।

এটা অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, বিদ্রোহীরা ক্যানটনমেণ্ট রক্ষা করার জন্য কোনো প্রকার ব্যবস্থাই করেনি। হয়ত তারা ভাবতেই পারেনি যে, ইংরেজরা এত তাড়াতাড়ি দিল্লী আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হতে পারবে। যাই হোক, এক রকম বিনা বাধাতেই ইংরেজরা ক্যানটনমেণ্ট অধিকার করল, যদিও বিদ্রোহীরা শহর থেকে কামান দেগে তাদের বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল। এই ভাবে,

১। মেটকাফ সম্পাদিত : "টু নেটিভ ন্যারেটিভস্", পৃঃ ১১৮।

শহরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাবার জন্য এই 'সর্বোৎকৃষ্ট ঘাঁটিটি', বলা যেতে পারে, ইংরেজকে এক রকম উপহারই দেওয়া হল।

উইলসনও সবজিমণ্ডীতে বিশেষ বাধা পেলেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি হিন্দুরাও-এর বাড়ির নিকট পৌছলেন। হিন্দুরাও-এর বাড়ি দিল্লীর টিলার দক্ষিণাংশে ও শহরের মোরী বুরুজ হতে ১,২০০ গজ পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। বস্তুতঃ, এই বাড়িই ছিল ক্যানটনমেণ্ট ও টিলার চাবিকাঠি, কাজেই দিল্লীর যুদ্ধে এর সামরিক মূল্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অল্প সংখ্যক সিপাহী এই বাড়ি দখল করেছিল। প্রথমতঃ, ইংরেজ সৈন্যরা অনেক চেষ্টা করেও যখন এই সিপাহীদের বিতাড়িত করতে পারল না ও বেলা ১টার সময় যখন তারা খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়ল, তখন মেজর রীডের অধীনে সিরমুর গুর্খাদের—যারা গত ১৬ ঘণ্টা ধরে অনবরত যুদ্ধ করে আসছিল, হুকুম দেওয়া হল ঐ বাড়ি আক্রমণ করতে। মাস খানেক পূর্বে জুটোগে গুর্খাদের বিদ্রোহের ফলে, ইংরেজরা এই সিরমুর বাহিনীর গুর্খাদেরও উপর খুব ভরসা করতে পারছিল না। ইংরেজ অফিসারদের অনেকেরই এই সব গুর্খাদের রাজভক্তি সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। গুর্খাদের হিন্দুরাও-এর বাড়ি আক্রমণ করার মুহূর্ত থেকে প্রত্যেক ইংরেজের চোখই এই দিকে নিবদ্ধ ছিল, কারণ এই আক্রমণের ফলাফলেই বোঝা যাবে গুর্খারা সত্যই রাজভক্ত কি না। এবং আরও একটি কথা এই যে, ইংরেজরা ভাল করেই জানত যে, এই সমস্ত গুর্খা ও অন্যান্য 'নেটিভদের' রাজভক্তির উপরই ভারতে তাদের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ নির্ভর করছে। যাই হোক, গুর্খারা হিংস্র জানোয়ারের মত সিপাহীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সিপাহীরাও মরিয়া হয়ে পাল্টা আক্রমণ করল। এই ভাবে ৪ ঘণ্টা ধরে হাতাহাতি লড়াই চলল। মুষ্টিমেয় সিপাহীর মধ্যে সকলেই প্রায় নিহত হল। গুর্খাদেরও অনেকেরই প্রাণ গেল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হিন্দুরাও-এর বাড়ি তারা দখল করল—যে হিন্দুরাও-এর বাড়ির উপরই সমস্ত ইংরেজ শিবিরের নিরাপত্তা নির্ভর করছিল এবং সেই বাড়িই দিল্লীর যুদ্ধে এখন থেকে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করল।

সিরমুর গুর্খারা এই ভাবে তাদের ভাইদের হত্যা করে বিদেশী প্রভুদের নিকট তাদের রাজভক্তি প্রমাণ করল। ইংরেজরা তাদের গলা ভেঙে না যাওয়া পর্যন্ত চেঁচামেচি করে, জড়িয়ে ধরে, গুর্খাদের খুব আপ্যায়িত করল। ইংরেজ অফিসাররা গুর্খাদের এইরূপ 'মহৎ ও বীরত্বপূর্ণ' ব্যবহারে এতই চমৎকৃত হলেন যে, হিন্দুরাও-এর বাড়ি রক্ষা করবার 'সম্মান' এই গুর্খাদেরই দেওয়া হল। ক্রমশঃ অবজারভেটরি, ফ্লাগ স্টাফ টাওয়ার প্রভৃতি অন্যান্য বিপজ্জনক ঘাঁটিগুলির রক্ষার ভারও গুর্খাদের উপর ন্যস্ত করা হল। পেশোয়ারের একজন মার্কামারা দাগী

অপরাধী জান ফিসান খানের নেতৃত্বে যে সমস্ত পাঠান ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে এসেছিল তারাও এই প্রকার 'মহৎ ও বীরত্বপূর্ণ' কাজের জন্য অনুরূপ 'সম্মান' লাভ করল।

ক্যানটনমেণ্ট দখল করার একদিন পর, পাঠানদের নিয়ে গঠিত 'গাইড কোর' এবং আরও কিছু গুর্খাসমেত প্রায় ১,০০০ সৈন্য ইংরেজের শিবিরে এসে উপস্থিত হল। একজন ইংরেজ লেখক বলেছেন যে—

"গুর্খাদের সঙ্গে ও তাদের পাশে পাশে, এই গাইড বাহিনী তাদের খ্যাতি অনুসারে শত্রুর সম্মুখে একটা লৌহ বেষ্টনী গড়ে তুলল। গাইডদের আগমনে সামরিক ভাবে আমাদের যেমন লাভ হল, রাজনৈতিক দিক থেকেও আমরা সেই রকম লাভবান হলাম। কারণ, পাঞ্জাবের এই শ্রেষ্ঠ বাহিনীটি আমাদের হয়ে যুদ্ধ করছে, এই ঘটনাটাই পাঞ্জাবীদের মধ্যে আমাদের ইজ্জত বাড়িয়ে দিল।"[১]

বাস্তবিক পক্ষে এর একটা নৈতিক দিকও আছে। বিদ্রোহীরা, যারা চেয়েছিল ইংরেজের সঙ্গে লড়ে নিজেদের মাতৃভূমিকে বিদেশী শত্রুর কবল থেকে মুক্ত করতে, যারা চেয়েছিল বিদেশী দস্যুদের লুণ্ঠন থেকে নিজেদের দেশের মানুষকে বাঁচাতে, তারা যখন দেখল যে একদল বিপথগামী ভাড়াটিয়া ভারতীয় সব সময়ই ইংরেজের দিকে লড়ছে ও ইংরেজদের প্রত্যেকটি সংকটের সময় বিদ্রোহীদের আক্রমণের প্রচণ্ডতাকে এই ভাড়াটিয়া ভারতীয়রাই মাথা পেতে নিয়ে বারবার বিদেশী শত্রুদের নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করছে (এবং এখন থেকে প্রতিটি যুদ্ধেই সর্বত্র এই বৈশিষ্ট্যটিই দেখা যাবে)—তখন এই অবস্থাটাই সংগ্রামী বিদ্রোহীদের নিকট সব থেকে বেশী পীড়াদায়ক হয়ে দাঁড়াল ও তাদের মনে একটা ব্যর্থতা ও হতাশার সৃষ্টি করল।

দিল্লী হতে বিতাড়িত হবার প্রায় এক মাস পর ৭ই জুন তারিখে ইংরেজরা দিল্লীর টিলা ও ক্যানটনমেণ্ট অধিকার করে বসল। ইংরেজের পতাকা, বিদ্রোহী পতাকার সামনাসামনি তাকে চ্যালেঞ্জ করে, আবার দিল্লীর টিলার উপর সগর্বে উড়তে শুরু করল। এই টিলা শহরের সমতলভূমি হতে ৫০।৬০ ফিট উঁচু; ৪ মাইল উত্তর-পশ্চিমে যমুনা নদীর তীরে শুরু হয়ে হিন্দুরাও-এর বাড়ির কিছুটা দক্ষিণে হঠাৎ যেখানে শেষ হয়ে গিয়েছে, সে স্থানটা শহরের উত্তর-পশ্চিমে কাবুল গেটের খুবই সন্নিকট। টিলার পশ্চাৎভাগ দিয়ে চলে গিয়েছে পশ্চিম যমুনা ক্যানাল। প্রচুর বৃষ্টি হওয়ার ফলে ঐ বৎসর এমন কি জুন মাসেও, যখন সাধারণতঃ তার জল প্রায় শুকিয়ে যায়, ক্যানাল বিশুদ্ধ পানীয় জলে ভর্তি ছিল। এই ক্যানাল আর টিলার

১। গিবন : "দি লয়েল্‌স্‌ অব দি পাঞ্জাব", পৃঃ ২৭৩।

মাঝখানে অবস্থিত ছিল ক্যানটনমেণ্ট। টিলা ইংরেজের হস্তগত হওয়ার ফলে ক্যানটনমেণ্ট ও ক্যানাল রক্ষা করা তাদের পক্ষে খুবই সহজ হল, এবং দিল্লী আক্রমণ করবার এই শ্রেষ্ঠ ঘাঁটিতে একটা স্বাভাবিক নিরাপত্তাও পেল। উপরন্তু, এই টিলা ক্যানটনমেণ্টর সঙ্গে পাঞ্জাবের চলাচলের পথটাও ইংরেজ বাহিনীর জন্য নিরাপদ করে রাখল।

বস্তুতপক্ষে কোনো আক্রমণকারী বাহিনী এইরূপ প্রকৃতির দ্বারা সুরক্ষিত ও সুবিধাজনক একটি ঘাঁটি এর পূর্বে হস্তগত করতে পারেনি। ফ্রেড রবার্টস্ (পরবর্তীকালে ফিল্ড মার্শাল আর্ল রবার্টস্) ক্যানটনমেণ্ট থেকে তাঁর পিতাকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন :

"এই জায়গাটিতে আমাদের অবস্থান প্রকৃতির দ্বারাই যারপর নাই নিরাপদ হয়েছে। ··· ভগবান স্বয়ং সর্বপ্রকারে আমাদের সহায়ক হয়েছেন। প্রথম থেকেই আবহাওয়া ভালই যাচ্ছে এবং এই ক্যানটনমেণ্টে সৈন্যদের যে রকম ভাল স্বাস্থ্য দেখা যাচ্ছে, তা আর কোথাও দেখা যায় না। মাঝে মাঝে কলেরা দেখা দেয় বটে, কিন্তু এত বড় একটা ক্যাম্পে যেখানে এতগুলি সৈন্যের বাস, সেখানে সব সময়ই তা আশঙ্কা করা যেতে পারে। আমাদের বাম দিক ও সম্মুখ দিক যমুনা নদীর দ্বারা রক্ষিত হচ্ছে, আর একটা বড় ঝিল, যেটা দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে চলে গিয়েছে। বৎসরের এই সময়টায় ও দিক দিয়ে মাইলের পর মাইল পার হওয়া অসম্ভব, যার ফলে আমাদের দক্ষিণ দিকে শত্রুর কোনো আকস্মিক আক্রমণের ভয় নেই ; সুতরাং আমাদের শিবিরের তিন দিক পাহারা দেবার জন্য মাত্র কয়েকজন অশ্বারোহীই যথেষ্ট। এই জন্য শত্রুর অকস্মাৎ আক্রমণের বিরুদ্ধে আমাদের সম্মুখ ভাগ রক্ষা করার ব্যাপারে আমরা সমস্ত বাহিনী নিয়োগ করতে সমর্থ হচ্ছি। কিন্তু শত্রুর আক্রমণ যখনই হয়, প্রায় তখনই প্রত্যেকটি সৈন্যকেই এই কাজে লাগতে হয়।"[১]

ইংরেজ বাহিনীর প্রধান ইঞ্জিনিয়ার কর্নেল বেইর্ড স্মিথ্ তাঁর অসমাপ্ত 'স্মৃতি কাহিনী'তে লিখেছিলেন : "আমাদের স্বপক্ষে অনেকগুলি আশ্চর্য রকমের দৈব ঘটনা থেকে মনে হয় যে ভগবান ইংরেজদের প্রতি বিশেষ ভাবে সদয় হয়েছিলেন। এইগুলির মধ্যে একটি হল এই যে, বিদ্রোহের আগের বৎসরে এত অধিক পরিমাণে বৃষ্টি হয়েছিল যে, একশ' বর্গমাইল পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চলটাই আকণ্ঠ জলে পূর্ণ হয়েছিল। ··· এই পবিত্র ও সুস্বাদু জল যে আমাদের স্বাস্থ্য ও আরামের পক্ষে কতখানি মূল্যবান ছিল সে সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত করে না বললেও চলে। এই জল না পেলে, দু' মাইল দূর থেকে যমুনার জল নিয়ে আসতে হত, নতুবা নির্ভর

১। "লেটার্স রিটন্ ডিউরিং দি ইণ্ডিয়ান মিউটিনি", পৃঃ ৩৪।

করতে হত ক্যানটনমেণ্টের কুয়োর লোনা জলের উপর। ... এই ঝিল সামরিক-ভাবে আমাদের আত্মরক্ষার ব্যাপারে যেমন অত্যাবশ্যক হয়েছিল, তেমনই আমাদের শিবিরের স্বাস্থ্য ও আরামেরও ব্যবস্থা করেছিল।"[১]

ক্যানটনমেণ্ট ও টিলার মত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দুটি, যা সহজেই কামানের সাহায্যে রক্ষা করা যেত এবং যার উপর দিল্লীর ভাগ্য নির্ভর করছিল, তাকে যেমন ভাবে প্রায় বিনা যুদ্ধেই বিদ্রোহীরা শত্রুকে ছেড়ে দিল, তা থেকেই বোঝা যায় যে তাদের নেতৃত্ব তখনও কতখানি দুর্বল ও অদূরদর্শী ছিল। হিন্দন ও বদলী-কি-সরাই-এর লড়াইতে এবং ক্যানটনমেণ্ট ও টিলা পরিত্যাগ করে বিদ্রোহীরা যে মারাত্মক ভুল করল, তা অনেক প্রায়শ্চিত্ত করেও তারা আর সংশোধন করতে পারেনি।

টিলার সম্মুখেই একটি ত্রিকোণ ক্ষেত্র, যার এক ধারে ছিল দিল্লী শহরের উত্তর দেওয়াল, সে দিকটা ছিল প্রায় এক মাইল ব্যাপী চওড়া, আর এক ধারে যমুনা। এই ত্রিকোণ ক্ষেত্র জুড়ে ছিল অনেকগুলি পুরাতন বাড়ি; দিল্লী শহর আক্রমণের জন্যই হোক, আর রক্ষা করার জন্যই হোক এই বাড়িগুলির সামরিক গুরুত্ব অনেক। এর মধ্যে হিন্দুরাও-এর বাড়িই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। উনবিংশ শতাব্দির প্রথম দিকে একজন মারাঠা সর্দার এই প্রকাণ্ড মজবুত বাড়িটি তৈরী করেছিলেন। বাড়ির চারদিকে মস্ত বড় একটা বাগান এবং শহরেও ক্যানটনমেণ্টে যাবার জন্য দু' দিকেই ভাল রাস্তা। তা ছাড়া, এই বাড়ির সংলগ্ন কতকগুলি বহির্বাটিও ছিল। হিন্দুরাও-এর বাড়িকে একটা ছোট খাট দুর্গ বললেও অত্যুক্তি হয় না। এই বাড়ি দখল করেই ইংরেজরা এটাকে তাদের সব থেকে শক্তিশালী আত্মরক্ষার ঘাঁটি তৈরি করে নিল। সেখানে গুর্খাদের মোতায়েন করে তিনটি শক্তিশালী আত্মরক্ষা-কামানের ঘাঁটি প্রস্তুত করল—একটি স্বামীর মন্দিরে, দ্বিতীয়টি ক্রোজ নেস্টে ও তৃতীয়টি সবজিমণ্ডীর সঙ্কীর্ণ গিরি সঙ্কটের উপর, সেখান দিয়ে পশ্চিম যমুনা ক্যানাল ও গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড অতিক্রম করেছে। এই ঘাঁটিগুলির পরস্পরের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য একটি পরিখাও খনন করা হল। বিদ্রোহীরা জানত যে, হিন্দুরাও-এর বাড়ি পুনর্দখল করতে পারলে ইংরেজদের ক্যানটনমেণ্ট থেকে বিতাড়ন করা খুব কঠিন কাজ হবে না। এইজন্য তারা তিন মাসের মধ্যে ২৬ বার ঐ বাড়ি আক্রমণ করেছিল, এবং তার মধ্যে একবারের আক্রমণ চলেছিল একটা সম্পূর্ণ দিন ও রাত্রি ধরে। তা ছাড়া, মোরী বুরুজ থেকেও সর্বদাই এই বাড়ির উপর কামানের গোলা ছোঁড়া হত। এটা মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, দিল্লী যুদ্ধের শেষে

১। কে' : "হিষ্ট্রি অব সিপয় ওয়ার ইন ইণ্ডিয়া", ২য়, পৃঃ ৫১৫।

১,০০০ গুর্খা সিপাহীর মধ্যে ৫০ জনও প্রাণ নিয়ে তাদের দেশে ফিরে যেতে পারেনি। ১৪ই সেপ্টেম্বর যেদিন ইংরেজ বাহিনী বিদ্রোহী-দিল্লীকে শেষ আঘাত হানবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ল, সেই ভয়ঙ্কর পরীক্ষার দিন ১০০ জন গুর্খাকেও সক্ষম অবস্থায় এই কাজের জন্য পাওয়া যায়নি। এই বাড়ির উত্তরে টিলার উপর অবস্থিত রাজপুত জ্যোতির্বিৎ রাজা জয়পাল সিংহ নির্মিত পর্যবেক্ষণাগারটিও (observatory) হিন্দুরাও-এর বাড়ি রক্ষার কাজে ইংরেজদের যথেষ্ট সাহায্য করেছিল।

হিন্দুরাও-এর বাড়ির আরও কিছুটা উত্তরে অবস্থিত ছিল ফ্লাগস্টাফ টাওয়ার —একটি মজবুত গোলাকৃতি দোতালা বাড়ি—টিলা ও যমুনার মধ্যবর্তী ত্রিকোণ জায়গাটাকে পর্যবেক্ষণ করার পক্ষে উৎকৃষ্ট স্থান। এই টাওয়ারের একেবারে সামনাসামনি, প্রায় আধ মাইল দূরে ছিল মেটকাফ হাউস,—কাশ্মীর গেট থেকে প্রায় ১ মাইল উত্তরে যমুনা নদীর তীরে মস্তবড় এক বাগানের মাঝখানে একটা বিরাট বাড়ি। এই বাড়িটা বিদ্রোহীরা কোনো সময়েই দখল করার চেষ্টা করেনি। সুতরাং এখানেও ইংরেজদের একটা ঘাঁটি তৈরি করে নিতে বেগ পেতে হল না। মেটকাফ হাউস হতে দিল্লী দেওয়ালের মধ্যবর্তী স্থানে ছিল খুসিয়াবাগ, দিল্লীর সম্রাটদের গ্রীষ্মাবকাশ যাপনের জন্য একটা পুরাতন প্রাসাদ। তারপর, কাশ্মীর গেটের ১,০০০ গজ উত্তরে ছিল লুডলো ক্যাসল নামে একটি নতুন বাড়ি; সুতরাং কাশ্মীর গেট রক্ষা করবার জন্য অথবা আক্রমণ করবার জন্য এই বাড়ির সামরিক প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক। সর্বশেষে, টিলার থেকে শুরু হয়ে একটি নালা লুডলো ক্যাসল ও খুসিয়াবাগের নীচ দিয়ে চলে গিয়েছিল যমুনা পর্যন্ত। দিল্লীর যুদ্ধে এই নালাটিরও সামরিক গুরুত্ব কম ছিল না। দিল্লী হতে উত্তর-পশ্চিমে, যমুনা থেকে দেড় মাইল দূরে অবস্থিত সবজিমণ্ডীতে ছিল দেওয়াল দিয়ে ঘেরা অনেকগুলি পুরাতন বাড়ি, বন জঙ্গলে, বড় বড় গাছপালা ও জলাভূমিতে পরিপূর্ণ। হিন্দুরাও-এর বাড়ির ঠিক দক্ষিণে অবস্থিত বলে, এই খানে তিন মাস ধরে অনবরত যুদ্ধ হয়েছে। সবজিমণ্ডী ও শহরের মধ্যে আরও কয়েকটি শহরতলি ছিল—কিশেনগঞ্জ, পাহাড়ীপুর ও তালেবর। এই স্থানগুলি ইংরেজদের আক্রমণ করার পক্ষে বিদ্রোহীদের নিরাপদ গমনাগমনের পথ ছিল। এই হল দিল্লী যুদ্ধের সামরিক পটভূমি।

বিদ্রোহী দিল্লীর অভ্যন্তরে : (১) গৃহশত্রু

১১ই মে তারিখে দিল্লী থেকে ইংরেজরা বিতাড়িত হবার পর শহরের ভিতর কি কি ঘটনা ঘটল? লালকেল্লার উপর আবার যখন ভারতের স্বাধীন পতাকা উড়তে লাগল, তখন বাদশাহের দরবারের সম্ভ্রান্ত শ্রেণী ও শাহজাদারা, শহরের ধনী ও বণিক সম্প্রদায়, জনসাধারণ ও সিপাহীরা, এই সব বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের মধ্যে কি রকম প্রতিক্রিয়া শুরু হল? অশীতিপর বৃদ্ধ বাদশাহ বাহাদুর শাহর কাঁধের উপর এই রকমের একটা বিরাট গুরুদায়িত্ব যখন চেপে বসল, তখন তিনিই বা কি ভাবে এই বৈপ্লবিক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন? সিপাহী, জনসাধারণ ও ধনীদের মধ্যে কি রকমের সম্বন্ধ স্থাপিত হল? এবং সর্বোপরি সিপাহীরা কি ভাবে তাদের চূড়ান্ত পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল?—এই প্রশ্নগুলি কেবলমাত্র কৌতূহল নিবারণের জন্যই নয়; ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের চরিত্র সম্বন্ধে সম্যক্ উপলব্ধি করতে হলে এই প্রশ্নগুলির সদুত্তর খোঁজ করা নিতান্ত প্রয়োজন।

কিন্তু বিদ্রোহকালীন দিল্লীর আভ্যন্তরীণ ঘটনাবলী সম্বন্ধে পর্যাপ্ত পরিমাণে তথ্য না থাকাতে এই কাজটি খুবই কঠিন। ১৮৫৭-র গণবিদ্রোহের অনুরূপ গণ-অভ্যুত্থানগুলি সম্বন্ধে (যেমন আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম, ফরাসী বিপ্লব, প্যারি কমিউন, রুশ বিপ্লব, চীন বিপ্লব ইত্যাদি) কোনো রকম তথ্যেরই অভাব নেই। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ '৫৭-র বিদ্রোহ সম্বন্ধে যা কিছু প্রকাশিত হয়েছে, তা প্রায় সবই সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ইংরেজদের দ্বারা লিখিত। তাতে অনেক প্রকার তথ্য ও অনেক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা লিপিবদ্ধ থাকলেও, তাদের এই 'মিউটিনি সাহিত্য' সর্বোতভাবে স্বভাবতই অসম্পূর্ণ এবং ভুল ব্যাখ্যায় পরিপূর্ণ। যেসব ভারতীয় এই বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, অথবা দিল্লী, লক্ষ্নৌ প্রভৃতি স্থানে বাস করছিলেন, তাঁদের কেউই এ বিষয়ে কোনো ইতিহাস কিম্বা স্মৃতি-কাহিনী

লিখে যাননি, কিংবা লিখে থাকলেও তা প্রকাশিত হয়নি। তবে একটা বিচিত্র উৎসের উপর নির্ভর করলে বিদ্রোহী দিল্লীর অভ্যন্তরে কি ঘটছিল সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা সম্ভব হয়। এই অদ্ভুত উৎসটি হল মইন-উদ্দিন হাসান খান, মুন্সী জীবনলাল,[১] রজ্জব আলি প্রভৃতি ইংরেজের গুপ্তচর, গোলাম ও উচ্ছিষ্ট-ভোগীদের দিনপঞ্জী, গুপ্ত রিপোর্ট, সংবাদ সরবরাহমূলক চিঠি ইত্যাদি। এই সব রিপোর্ট ও চিঠির তথ্যগুলি ইংরেজ প্রভুরা মোটামুটি সঠিক বলেই গণ্য করত।

এই রকম একটি দিনপঞ্জী বাহাদুর শাহর বিচারের সময়েও সাক্ষ্য হিসাবে আদালতে পেশ করা হয়েছিল। এই দিনপঞ্জীতে আমরা দেখতে পাই যে, ১২ই মে তারিখে বাহাদুর শাহ মইন-উদ্দিন হাসান খানকে দিল্লীর প্রধান কোতোয়ালের পদে নিযুক্ত করে তাকে কোতোয়ালিতে বাস করবার হুকুম করলেন ও তার অধীনে এক রেজিমেণ্ট সিপাহী দিয়ে তাঁকে শহরে লুটপাট বন্ধ করে শান্তি স্থাপন করতে বললেন। মইন-উদ্দিন লুটপাট বন্ধ করতে না পেরে বাদশাহকে রিপোর্ট করল। বাদশাহ তখন সব সুবাদারদের ডেকে তাদের হুকুম করলেন—দিল্লী গেটে ও প্রাসাদের গেটে এক-এক রেজিমেণ্ট এবং আজমীর, লাহোর, কাশ্মীর, ফরাসখানা গেটে এক-এক কোম্পানি করে সিপাহী মোতায়েন করা হোক। বাদশাহ তাঁদের এই কথাটা জানালেন যে, দিল্লীর অধিবাসীদের লুণ্ঠিত হওয়া তিনি দেখতে চান না এবং তাঁদের হুকুম করলেন যে, এ লুণ্ঠন থামাতেই হবে।

যে কোনো সরকারই হোক, বিশেষ করে যে সরকার বিদেশী শত্রুর সঙ্গে জীবনমরণের সংগ্রামে লিপ্ত, সেখানে পুলিসের প্রধান কর্মকর্তার পদ যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সুতরাং বিদ্রোহী-দিল্লীর প্রথম কোতোয়াল মইন-উদ্দিন কি চরিত্রের লোক তা এখন বিচার করে দেখা যাক। তিনি ছিলেন দিল্লীর কোনো একজন নবাবের পুত্র, সুতরাং মোগল দরবারে তাঁর অবাধ যাতায়াত ছিল। নবাবপুত্র হওয়া সত্ত্বেও ইংরেজের কেরানীর চাকুরী নিতে তাঁর সম্মানে বাধেনি। কিন্তু শীঘ্রই তার 'মেধার' বলে দিল্লীর রেসিডেণ্ট স্যার

১। মইন-উদ্দিন, জীবনলালের মতই, দিল্লীর দৈনন্দিন পরিস্থিতি সম্বন্ধে নিজেই একটি দিনপঞ্জী লিখেছিল। সি. টি. মেটকাফ ১৮৯৮ সালে "টু নেটিভ ন্যারেটিভস্ অব দি মিউটিনি ইন দিল্লী" নাম দিয়ে ঐ দিনপঞ্জীর ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। জীবনলাল বিদ্রোহের পূর্বে ইংরেজের চাকুরী করত ও চার্লস মেটকাফের অধীনে হিসাব-রক্ষকের কাজে উন্নীত হয়েছিল। এই সূত্রে বাদশাহের দরবারে তারও খুব ঘন ঘন যাতায়াত ছিল। সুতরাং এই দুজনই ভেতর থেকে অন্তর্ঘাতী কার্যের জন্য ও ইংরেজ প্রভুদের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ সরবরাহের কাজের জন্য ছিল খুবই উপযুক্ত।

চার্লস্ মেটকাফের সহায়কের পদে উন্নীত হয়। এ হেন ব্যক্তিটিই বিদ্রোহের পর প্রধান কোতোয়ালের পদে নিযুক্ত হল। মইন-উদ্দিনের কীর্তিকাহিনী সম্বন্ধে সে নিজেই তার দিনপঞ্জীতে যা লিপিবদ্ধ করে গিয়েছে তার থেকেই বোঝা যায় যে, সিপাহীরা রাজনৈতিক সংগঠনের দিক থেকে কতখানি অনভিজ্ঞ ও অক্ষম ছিল।

"১৪ই মে : গেটের কাছে ভলান্টিয়ার পদাতিক বাহিনীর একটা কোম্পানিকে দেখতে পেলাম। আমি যেন একজন খুব প্রতিপত্তিশালী লোক এই ভান করে, তাদের সুবাদারকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম—তারা তাদের বেতন পেয়েছে কি না? ··· তখনও তাদের কোনো অফিসার নিযুক্ত হয়নি ও তারা বেতন পায়নি। আমি তাদের এই বলে বাদশাহকে অনুরোধ করতে বললাম যে, আমাকে যেন ঐ পদে নিযুক্ত করা হয়। আমি তাদের আমার নাম বললাম ও তাদের বেতন দিতে প্রতিশ্রুত হলাম। তারা সানন্দে রাজী হল। ··· এই বাহিনীর উপর আধিপত্য স্থাপন করবার জন্য আমি আমার নিজের পকেট থেকে তাদের মধ্যে নিজে ৫,০০০৲ টাকা বিতরণ করলাম। সেই রাত্রেই এই বাহিনীর সঙ্গে বাস করবার জন্য আমি চলে গেলাম।"[১]

পরদিন, কাশ্মীর গেটের দুজন সিপাহী, যারা এই বিশ্বাসঘাতকটিকে চিনত, তারা মইন-উদ্দিনকে অনুসরণ করতে লাগল। নিজের কোম্পানিতে ফিরে গিয়ে মইন-উদ্দিন ওই দুটি সিপাহীর বিরুদ্ধে এই বলে অভিযোগ করল যে, এই সিপাহী দুটি তাকে সেলাম দেয়নি। "তখন দু' পক্ষে কথা কাটাকাটি শুরু হল; কাশ্মীর গেটের সিপাহীরা তখন খোলাখুলি ভাবেই বলল যে, আমি না কি কয়েকজন ইংরেজকে লুকিয়ে রেখেছি। আমার লোকেরা তাদের খুব গালাগালি করল; কিছুক্ষণ পর সিপাহী দুজন চলে গেল। আমি তখনই স্যার থিওফিলাসকে (মেটকাফকে) খবর পাঠালাম যে, পরিস্থিতি মোটেই ভালর দিকে যাচ্ছে না। ·· স্যার থিওফিলাসের নিরাপত্তার জন্য আমার খুব ভাবনা হল, কারণ তাঁকে যে ধরে দিতে পারবে তাকে ১০,০০০৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে, এই মর্মে বাদশাহ এক ফতোয়া জারী করেছেন।"[২] তারপর মইন-উদ্দিন লিখেছে—কি ভাবে বিদ্রোহী বাহিনীর 'কর্নেল'-এর পদে সুরক্ষিত হয়ে সে মেটকাফ ও আরও কয়েকজন উচ্চপদস্থ ইংরেজকে (যাদের সে নিজে লুকিয়ে রেখেছিল) দিল্লী থেকে পালাবার ব্যবস্থা করে দিল।

বিদ্রোহের প্রথম থেকেই দিল্লীর বিদ্রোহীরা বুঝতে পেরেছিল যে, দরবারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েকজন সম্ভ্রান্ত লোক কেবলমাত্র নিজেদের স্বার্থের বশেই ইংরেজদের

১। মেটকাফ সম্পাদিত: "টু নেটিভ ন্যারেটিভস্", পৃঃ ৫৫-৫৬। ২। ঐ, পৃঃ ৫৬-৫৭।

সাহায্য করছিল। তাই তারা তাদের গোপনে অনুসরণ করবার চেষ্টা করছিল।[১] কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বিশ্বাসঘাতকদের সঠিক ভাবে জেনেও নিজেদের সাংগঠনিক দুর্বলতার জন্য এই সব গৃহশত্রুদের বিরুদ্ধে তারা কোনো কার্যকরী পন্থা অবলম্বন করতে পারছিল না। বাদশাহের উজীর নবাব মেহবুব আলি খান, তাঁর শ্বশুর (জিন্নৎ মহলের পিতা) মির্জা এলাহী বক্স প্রভৃতি লোকগুলির প্রতি প্রথম থেকেই সিপাহীরা অত্যন্ত সন্দিহান ছিল। সিপাহীরা যে এই সব বিশ্বাস-ঘাতকদের ঠিকই সন্দেহ করেছিল এবং এই লোকগুলি যে প্রথম থেকেই শত্রুর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে ইংরেজের পক্ষে কাজ করছিল, সে সম্বন্ধে এই সব দিনপঞ্জী ও রিপোর্টগুলিতে প্রচুর উল্লেখ রয়েছে। এরা যে ইংরেজকে আশ্রয় দিয়ে, তাদের পলায়নের ব্যবস্থা করে দিয়ে ও আরও নানা উপায়ে তাদের ব্যক্তিগতভাবেই উপকার করছিল তাই নয়, তারা ইংরেজ কর্তৃপক্ষের নিকট বারবার অনুরোধ করছিল এই বলে যে, বিদ্রোহীরা তাদের সংগঠনকে সবল করে গড়ে তুলবার এবং বিদ্রোহীদের সঙ্গে বাদশাহের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হবার আগেই যেন তারা দিল্লী আক্রমণ করে।[২] (খুব সম্ভব, এই ধরনের রিপোর্টের উপর নির্ভর করেই কমাণ্ডার-ইন-চীফ এনসন্‌কে তৎক্ষণাৎ দিল্লী আক্রমণ করতে বলা হয়েছিল এবং সগর্বে লেখা হয়েছিল যে, যে-মুহূর্তে দিল্লীবাসীরা প্রাচীরের অভ্যন্তরে ডজন খানেক সাদা মুখ দেখতে পাবে, সেই মুহূর্তে তারা আত্মসমর্পণ করবে ও সিপাহীরা ঊর্ধ্ব-শ্বাসে পালাবে।)

একটি দিনপঞ্জীতে নিম্নলিখিত ঘটনাটির উল্লেখ রয়েছে: "বিদ্রোহী সিপাহীরা তাদের অফিসারদের নিয়ে দরবারে গিয়েছিল ও সেখানে তারা একটি চিঠি দেখিয়েছিল। সে চিঠিটি তারা দিল্লী গেটে ধরে ফেলে। এই চিঠিতে হাকিম আশানুল্লা ও নবাব মেহবুব আলির শীলমোহর আঁকা ছিল। এই চিঠিতে তারা ইংরেজদের তক্ষুনি দিল্লীতে এসে শহর দখল করে জওয়ান বখ্‌তকে সিংহাসনে

১। ১২ই মে তারিখে পলাতক ইংরেজদের লুকিয়ে রাখার সন্দেহে সিপাহীরা নবাব হামিদ আলি খানের বাড়ি ঘেরাও করে। হামিদ আলি এই অভিযোগ অস্বীকার করাতে তাঁকে যখন সিপাহীরা টেনে বাদশাহের দরবারে নিয়ে গেল, তখন উজীর মেহবুব আলি তাঁকে ছেড়ে দিতে বলল। সিপাহীরা জানালে, "হামিদ আলির বাড়ি তল্লাস করে যদি কোনো ইংরেজকে না পাওয়া যায় তবেই তারা তাঁকে ছেড়ে দেবে। আর যদি তাঁর বাড়িতে ইংরেজ পাওয়া যায় তা হলে হামিদ আলিকে তারা যা খুশি তা করবে।" —(মেটকাফ সম্পাদিত: "টু নেটিভ ন্যারেটিভস্", পৃঃ ৮৫)।

২। ঐ, পৃঃ ৯২।

বসাতে বলেছিল এবং ইংরেজরা এলেই বিদ্রোহীদের ধরে তাদের হাতে তুলে দিতে বলেছিল।"[১] অবশ্য প্রকাশ্য দরবারে অভিযুক্ত হয়ে ঐ সম্মানীয় ব্যক্তিদ্বয় চিঠির বিষয় সব অস্বীকার করে, এবং পবিত্র কোরান স্পর্শ করে বলে যে, ঐ চিঠি তাদের দ্বারা লিখিত হয়নি। কিন্তু সিপাহীরা তাদের কথা কিছুতেই বিশ্বাস করেনি। তারা আরও অভিযোগ করেছিল যে, ইংরেজ বন্দীদের এখনও জীবন্ত রাখা হয়েছে এই জন্য যে, ইংরেজরা এসে পৌছলে তাদের প্রত্যর্পণ করা হবে। তারপর সিপাহীরা, বাহাদুর শাহ যে ৫২ জন ইংরেজ বন্দীকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, তাদের প্রাসাদ থেকে বের করে নিয়ে হত্যা করেছিল।

মে ও জুন মাসে প্রায় প্রতিদিনই সিপাহীরা এই ভাবে কোনো-না-কোনো বিশ্বাসঘাতক সম্ভ্রান্ত লোকের বিরুদ্ধে বাদশাহের নিকট অভিযোগ করছিল। ২৬শে মে তারিখে আবার আশান্নুল্লার বিরুদ্ধে অভিযোগ হল (ইতিমধ্যে মইন-উদ্দিনের স্থানে আশান্নুল্লাকে দিল্লীর কোতোয়াল নিযুক্ত করা হয়েছে) যে, সে ইসলামগড় বুরুজের কামানগুলির মধ্যে বালি, সুরকি ও পাথর ঢুকিয়ে রেখেছে। সিপাহীরা এইবার এতই ক্ষিপ্ত হল যে, আশান্নুল্লা ও মেহবুব আলিকে মেরে ফেলতে উদ্যত হয়েছিল। সিপাহীরা আরও অভিযোগ করল যে, এই দুই ব্যক্তি চক্রান্ত করছিল—কি করে সিপাহীদের দিল্লীর বাইরে ইংরেজের সঙ্গে লড়বার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া যায়, যাতে করে তারা ধ্বংস হতে পারে। ২৭শে মে তারিখে সিপাহীরা আবার দেখতে পেল কতকগুলি কামানকে নষ্ট করে দেবার চেষ্টা হয়েছে। "এর ফলে খুব উত্তেজনার সৃষ্টি হল ও সকলেই বলতে লাগল যে, শহরে ইংরেজদের অনেক শক্তিশালী বন্ধু আছে।"[২]

এইবার সিপাহীরা মেহবুব আলি ও আশান্নুল্লাকে গ্রেপ্তার করে তাদেরই বাড়িতে আটক করে রাখল এবং তাদের বাহাদুর শাহর সঙ্গেও দেখা করা বন্ধ করে দিলে। ২৯শে মে তারিখে তাদের খুব প্রহার করা হল। কয়েকদিন পর বিচারের জন্য তাদের দরবারে নিয়ে যাওয়া হল। এই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি দুটি আবার কোরান স্পর্শ করে বলল যে, তারা এই সব কাজ করেনি, অথবা ইংরেজদের সঙ্গে কোনো চিঠি লেখালেখিও করেনি—যে চিঠি ধরা পড়েছে সে চিঠি তারা লেখেনি, তাতে তাদের নাম জাল করা হয়েছে। এরপর এই বিশ্বাসঘাতক দুটিকে আবার বাহাদুর শাহর কথায় ছেড়ে দেওয়া হল। ১৪ই জুন মেহবুব আলির স্বাভাবিক

১। মণ্টোগোমারি মার্টিন: "ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার", ৩য়, পৃঃ ১৭৬-৭৭।

২। মেটকাফ সম্পাদিত: "টু নেটিভ ন্যারেটিভস্", পৃঃ ১০৩-৪।

ভাবে মৃত্যু হয়।[১] পাতিয়ালার রাজার ভাই রাজা অজিত সিং বিদ্রোহের সময় দিল্লীতে বাস করছিলেন। একদিন সিপাহীরা তাকে গ্রেপ্তার করে দরবারে নিয়ে এসে বাদশাহের নিকট হাজির করল। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, তিনি তাঁর ভাই ইংরেজ-বন্ধু পাতিয়ালার রাজার কাছে চিঠি পাঠাচ্ছিলেন। বাদশাহ বললেন যে, অজিত সিংহ তাঁর ভাইয়ের কাজের জন্য দায়ী নন। সুতরাং বাদশাহ তাঁকেও ছেড়ে দিতে হুকুম করলেন।[২]

সম্ভ্রান্তবংশীয় বিশ্বাসঘাতকদের কিছু না করতে পারলেও, অন্যান্য অপরাধীদের সম্বন্ধে সিপাহীরা কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল। ইংরেজদের সঙ্গে চিঠি বিনিময় করার সময় যখন আলিপুরের থানাদার ধরা পড়ল, তখন তাকে সঙ্গে সঙ্গে কোতোয়ালিতে এনে গুলী করে মারা হল ও তার মৃতদেহ জনসমক্ষে একটা গাছে ঝুলিয়ে রাখা হল।[৩] পাঁচজন কসাই যখন ইংরেজ শিবিরে মাংস-পাঠাচ্ছিল, তখন তাদের গলা কেটে ফেলা হয়েছিল এবং আরও যারা এই রকম কাজে ধরা পড়েছিল, তাদেরও এইরূপ শাস্তি দেওয়া হয়।[৪] ইংরেজকে সংবাদ সরববাহ করার সময় পিয়ামল নামক একজন ধনী মাড়োয়ারী ব্যবসাদারও সিপাহীদের হাতে ধরা পড়ে।[৫]

কিন্তু বারবার এত সহজে নিষ্কৃতি পাওয়ার ফলে এই সব সম্ভ্রান্তবংশীয় বিশ্বাসঘাতকদের সাহস অনেক বেড়ে গেল ও কয়েকদিনের জন্য দরবারে তারা এতই শক্তিশালী হয়ে উঠল যে, বেসামরিক লোকের পক্ষে তাদের বিরুদ্ধে কোনো রকম অভিযোগ করা, সে অভিযোগ যতই যুক্তিসঙ্গত হোক না কেন, খুবই বিপদ্জনক হয়ে উঠল। দিল্লীর সরাইগুলির তত্ত্বাবধায়ক আলি খান ও খোদাবক্স ২৫শে জুন দরবারে অভিযোগ করলেন যে, লুটপাট করার জন্য যেসব দুশ্চরিত্রদের হাতে হাতে ধরা হয়েছিল তাদের আশানুল্লা ঘুষ নিয়ে ছেড়ে দিচ্ছে, এবং যাতে শহরে শান্তি ও নিরাপত্তা স্থাপিত হয় ও ব্যবসাবাণিজ্য আবার শুরু হয় তার জন্য সুব্যবস্থার দাবি করলেন। কিন্তু আশানুল্লার শাস্তির পরিবর্তে, তাকে অপবাদ দেবার জন্য ঐ অভিযোগকারী দুজনকে দিল্লী থেকে বহিষ্কারের হুকুম দিতে দরবার বাহাদুর শাহকে বাধ্য করল।[৬]

এইরূপ অরাজক অবস্থায় দিল্লীর জনসাধারণ যে খুবই হতাশ হয়ে পড়বে তাতে আর আশ্চর্য কি? জীবনলাল তার দিনপঞ্জীতে লিখেছে: "শহরে

১। মেটকাফ সম্পাদিত: "টু নেটিভ ন্যারেটিভস", পৃঃ ১০৪-৭। ২। ঐ, পৃঃ ১১৯। ৩। ঐ, পৃঃ ১১। ৪। ঐ, পৃঃ ১৪৩। ৫। ঐ, পৃঃ ১১৭। ৬। ঐ, পৃঃ ১২৭।

এইরূপ অবস্থা দেখে জনসাধারণ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল ও নিজেদের বিপন্ন বোধ করতে লাগল। একধারে যেমন শহরের বাইরে ও ভিতরে ভারতবাসীদের মধ্যেই অনেক শত্রু রয়েছে, অন্যধারে তেমনি ক্রোধমত্ত ইংরেজের উদ্যত আক্রমণের করাল ছায়া।"[১]

জুলাই মাসের শেষ দিকে ও আগস্ট মাসের প্রথমে দিল্লীর আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি এতই খারাপ হয়ে উঠল যে, ৪ঠা আগস্ট একদল সিপাহী-অফিসারদের প্রতিনিধি বাদশাহের নিকট গিয়ে পুনরায় অভিযোগ করলেন যে, এখনও আশানুল্লা ইংরেজদের কাছ থেকে আদেশ-নির্দেশ পাচ্ছে। পূর্বের মতো এবারও বাহাদুর শাহ এই অভিযোগে কোনো কর্ণপাত করলেন না।[২] এই ঘটনার মাত্র ৩ দিন পরে বেগম সমরুর বাড়িতে অবস্থিত বারুদখানায় বিস্ফোরণ ঘটল, যার ফলে ৪৯৪ জন মারা গিয়েছিল ও মাত্র ১৩ জনের প্রাণ বেঁচেছিল। সিপাহীরা এই দুষ্কার্যের জন্য আশানুল্লা ও নবাব হাসান আলি খানকে সন্দেহ করল ও তাদের ধরবার জন্য প্রাসাদে গেল। বিশ্বাসঘাতক দুজন তখন প্রাসাদের উপাসনা ঘরে লুকিয়ে রইল। এবার কিন্তু সিপাহীরা এত সহজে ছেড়ে দিতে চাইল না। রাত্রে তারা আবার প্রাসাদ ঘেরাও করে বাদশাহের নিকট দাবি করল যে, আশানুল্লাকে তাদের হাতে সমর্পণ করতে হবে। কয়েক ঘণ্টা ধরে বাদশাহ সিপাহীদের এই দাবি অগ্রাহ্য করলেন, কিন্তু অবশেষে তিনি তাদের সমর্পণ কবতে বাধ্য হলেন। শহরে আরও অনেক সম্ভ্রান্ত লোককে গ্রেপ্তার করা হল। এই ব্যক্তিদের মধ্যে একজন হল মুন্সী জীবনলাল স্বয়ং।[৩] স্বভাবতই শহরে খুব একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হল। বিশেষ

১। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১২২।

২। ঐ, পৃঃ ১৮০। সিপাহীদের এই প্রকার অভিযোগ যে একেবারেই অসত্য ছিল না, সে সম্বন্ধে গুপ্তচর জীবনলাল নিজেই লিখেছে যে, ৪ঠা আগষ্ট স্যার জন মেটকাফের নিকট থেকে সে এক চিঠি পেয়েছিল। সে চিঠিতে তিনি তাকে আশ্বস্ত করে লিখেছিলেন যে, ইংরেজরা শীঘ্রই দিল্লী দখল করবে।—ঐ, পৃঃ ১৮২।

৩। ঐ, পৃঃ ১৮৫-৮৬। গৌরীশঙ্কর নামক আর একজন ইংরেজের গুপ্তচর দিল্লীর ঐদিনকার ঘটনা সম্বন্ধে তার প্রভুদের কাছে নিম্নলিখিত সংবাদ পাঠিয়েছিল: "সিপাহীরা গতকাল হাকিম আশানুল্লার বাড়ি লুট করে তাতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। হাকিম লালকেল্লায় বন্দী হয়ে আছেন। তাদের হাতে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হোক বলে সিপাহীরা দাবি করল, এবং যদি তা না করা হয় তা হলে বাদশাহকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে মেরে ফেলা হবে বলে তারা ভয় দেখাল। শেষ পর্যন্ত বাদশাহ হাকিমকে সিপাহীদের হাতে সমর্পণ করতে বাধ্য হলেন, কিন্তু তাদের তিনি বললেন যে, যদি হাকিমের কোনো অনিষ্ট হয় তা হলে তিনিও আর বাঁচবেন না। ... জিন্নৎ মহলও সন্দেহের পাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছেন। ... একদল প্রহরী তাঁর বাড়ি পাহারা দিচ্ছে, তা নইলে তা লুট হয়ে যাবে। কোনো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আজ দরবারে যাননি। কাউকেই শহরের বাইরে যেতে দেওয়া হচ্ছে না।"—("পাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্ডস্", ৮ম খণ্ড, ১ম ভাগ, পৃঃ ৩০৪)।

করে দরবারের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের, ধনী, ব্যবসায়ী, ও আরও অনেকের বাড়ির দরজা খোলা হল না এবং এই সব লোক ভয়ে বাড়ি ছেড়ে বের হল না। এমন কি জিন্নৎ মহলকেও সিপাহীরা সন্দেহ করতে শুরু করল ও তাঁর বাড়িতেও পাহারা বসাল। বাহাদুর শাহ নিজেও আশানুল্লার জন্য এত ভয় পেয়েছিলেন যে, তাঁর তিন ছেলে মেহদী, খিজির ও আবদুল্লাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন—যে কোনো উপায়েই হোক আশানুল্লার জীবন বাঁচাতে হবে। বাদশাহ সিপাহীদের ভয় দেখিয়েছিলেন যে, যদি তারা আশানুল্লাকে হত্যা করে তা হলে তিনি নিজে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করবেন।

আশানুল্লার বাড়ি তল্লাসী করে সিপাহীরা ইংরেজ শিবির থেকে লিখিত একটি চিঠি পেয়েছিল।[১] অনেক নবাব, সম্ভ্রান্ত ও ধনীদের বাড়িও সিপাহীরা তল্লাসী করেছিল। প্রায় ৫০ জন সিপাহী যখন নবাব সদর-উদ্দিন খানের বাড়ি তল্লাসী করতে যায়, সেখানে ৭০ জন সশস্ত্র লোক তাদের বাধা দিয়েছিল এবং সেই বাধা পেয়ে সিপাহীরা ফিরে যায়। এই ভাবে যখন শাহজাদা আবদুল্লা ২০০ লোক নিয়ে আমিনুদ্দিন ও জিয়াউদ্দিনের বাড়িতে যান তখন তারা আরও অনেক বেশী লোক নিয়ে বাধা দিয়েছিল। এই লোক দুটির নিজস্ব সশস্ত্র বাহিনী ছিল।[২] এই দিনও বিদ্রোহীদের যে কোনো সঠিক পরিকল্পনা ছিল না, তা নিম্নলিখিত ঘটনা থেকে বেশ ভাল ভাবেই বোঝা যায়।

শাহজাদা আবুবকর অনেকগুলি মহাজন ও সন্দেহজনক লোককে গ্রেপ্তার করেছিলেন এবং এদের মধ্যে ৩০ জনের বিচার করলেন শাহজাদা মির্জা মোগল; তাদের মধ্যে মুন্সী জীবনলালও ছিল একজন। আর মির্জা এলাহী বক্স, নিজে একজন প্রধান আসামী হওয়ার পরিবর্তে, হলেন এই সব অভিযুক্তদের উকিল। এলাহী বক্সের যুক্তি শুনে দুর্বলচিত্ত মির্জা মোগল তাদের সকলকেই খালাস করে দিলেন।[৩] যখন দরবারে শাহজাদা খিজির সুলতান প্রস্তাব করলেন যে, সমস্ত সন্দেহজনক লোকগুলিকে ও ইংরেজের গুপ্তচরগুলিকে গ্রেপ্তার করে বন্ধ করে রাখা হোক, তখন তাঁর প্রস্তাব অগ্রাহ্য হল।[৪]

১০ই আগস্ট তারিখে হাকিম আশানুল্লাকে ছেড়ে দেওয়া হল এই শর্তে যে, সে শুধু মাত্র হাকিমী ব্যবসা করবে ও অন্য কোনো কাজে থাকবে না। বাদশাহের অনুরোধে মির্জা মোগল, খিজির খাঁ ও আবদুল্লা আশানুল্লাকে তার বাড়িতে পৌঁছে

১। "পাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্ডস্", ৮ম খণ্ড, ১ম ভাগ, পৃঃ ৩১৬।
২। মেটকাফ সম্পাদিত : "টু নেটিভ ন্যারেটিভস্", পৃঃ ১৯১।
৩। ঐ, পৃঃ ১৮৮-৮৯। ৪। ঐ, পৃঃ ১৯২।

দিয়ে এলেন। যে সমস্ত শ্রমিক বারুদখানায় প্রাণ হারিয়েছিল, বাহাদুর শাহ তাদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দিতে রাজী হলেন।[১]

উপরের ঘটনাগুলো থেকে দেখা যাচ্ছে যে, জেনে শুনেও বাহাদুর শাহ বার-বার মেহবুব আলি, এলাহী বক্স, আশামুল্লা প্রভৃতি বিশ্বাসঘাতকদের রক্ষা করবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করছিলেন। বাহাদুর শাহ নিজে যে তাদের হীন চক্রান্তে অংশ গ্রহণ করেছিলেন সে সম্বন্ধে সঠিক কোনো প্রমাণ নেই। বরং এটাই দেখা যায় যে, বাহাদুর শাহর শুভাকাঙ্ক্ষীরা যখন দু'একবার তাঁকে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব করে ইংরেজের নিকট চিঠি লিখতে পরামর্শ দিয়েছিল, তখন তিনি তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করেছিলেন। এই সব বিশ্বাসঘাতকগুলিই ছিল তাঁর আজীবনের সহচর, এবং এই দুর্বলতাবশতঃ বৃদ্ধ বয়সে তাদের ত্যাগ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। অন্য ধারে সিপাহীরাও, তাদের নিজেদের ক্ষমতাসম্পন্ন একটা কোর্ট থাকা সত্ত্বেও, এই সব বিশ্বাসঘাতকদের সম্বন্ধে সময় মতো কোনো কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেনি। তাদের এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে এবং বাহাদুর শাহর আশ্রয়ে থেকে এই সব দুর্বৃত্তরা তাদের অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে পেরেছিল।

১। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১৯৩ ; "পাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্ডস্", ৮ম খণ্ড, ১ম, পৃঃ ৩৫২

বিদ্রোহী দিল্লীর অভ্যন্তরেঃ (২) ধনী—মহাজন

১১ই মে তারিখে যেদিন দিল্লীতে সিপাহীরা ও জনসাধারণ ইংরেজদের হত্যা করল ও তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিল, স্বভাবতঃই সেদিন ধনী, মহাজন, ব্যবসাদার ও দোকানদারদের মধ্যে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছিল। তারপর দিন, ১২ই তারিখেও শহরের কোনো দোকান খোলা হল না। ফলে, কেবলমাত্র ২,৫০০ সিপাহীই নয়, শহরবাসীরাও কোনো প্রকার খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য জিনিস কিনতে পেল না। ঐ দিন কিছু দোকানপাট লুট হয়েছিল, তবে সিপাহীরা তাতে অংশ গ্রহণ করেছিল কি না সে সম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছু বলা যায় না। বিদ্রোহের সময় প্রায় সর্বত্রই দেখা গিয়েছে যে, সাধারণতঃ সিপাহীরা সাধারণ মানুষের দোকান ও বাড়িঘর লুটপাটের বিরোধী ছিল। এ কথা সত্য যে, তারা অনেক ক্ষেত্রে ইংরেজ সরকারের ধনাগার লুণ্ঠন করেছে, কিন্তু ব্যক্তিগত লাভের জন্য তারা তা করেনি; এই লুটের অর্থ তারা সমষ্টিগতভাবে বিদ্রোহের কাজেই লাগিয়েছিল। ১১ই মে তারিখে দিল্লীতে দেখা গিয়েছিল যে, উন্মত্ত হয়ে প্রতিশোধ নেবার জন্য তারা ইংরেজ নিধন করতে ও তাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিতেই ব্যস্ত ছিল। লুটপাট যারা করেছিল তারা শহরের গুণ্ডা, বদমাশ, দুশ্চরিত্রের দল। সর্ব দেশে, সর্ব সময়ে ১১ই-১২ই মে তারিখের ন্যায় দিল্লীর পরিস্থিতি এই দুশ্চরিত্রদের সুবর্ণসুযোগ করে দেয়। কঠিন হাতে সত্বর এদের দমন না করতে পারলে তারা যে কোনো গণবিদ্রোহকে সহজেই বিপন্ন করে তুলতে পারে।

১২ই মে তারিখে সিপাহীরা প্রথম বাদশাহের দরবারে অংশ গ্রহণ করল ও তিনটি সিদ্ধান্ত তারা গ্রহণ করলঃ শহরে লুটপাট দমন করতে হবে ও শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হবে; দোকানপাট সব খোলার ব্যবস্থা করতে হবে; সিপাহীদের রেশনের বন্দোবস্ত করতে হবে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে,

বিদ্রোহের দু' এক দিন পরেই বাহাদুর শাহ কোতোয়ালকে সিপাহীদের সাহায্যে তৎক্ষণাৎ লুটপাট দমন করতে হুকুম করেছিলেন। এ ছাড়াও, সঙ্গে সঙ্গে "বাদশাহ মির্জা মোগলকে একদল সিপাহী নিয়ে লুটপাট থামাবার জন্য হুকুম করলেন। সেই অনুসারে শাহজাদা হাতী চড়ে কোতোয়ালিতে গেলেন ও টমটম দিয়ে শহরে ঘোষণা করে দিলেন যে, যারাই লুট করবে তাদের ধরে নাক কান কেটে দেওয়া হবে এবং যদি কোনো দোকানদার তার দোকান না খোলে, অথবা সিপাহীদের খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ না করে, তা হলে তাকে বন্দী করা হবে ও তাকে জরিমানা দিতে হবে।"[১]

কিন্তু এ সব করার পরও শহরের দোকানপাট খুলল না, তখন সিপাহীদের অনুরোধে বাহাদুর শাহ স্বয়ং হাতীতে চড়ে দু' দল সিপাহী নিয়ে ও জওয়ান বখ্‌তকে সঙ্গে নিয়ে চাঁদনী চকে গেলেন ও দোকানদারদের দোকান খুলতে ও সিপাহীদের নিকট জিনিসপত্র বিক্রি করতে বললেন।[২] বাদশাহের এই প্রকার অনুরোধের পরও যখন দেখা গেল যে, অনেক বড় বড় দোকানদার তাদের দোকান খুলল না, তখন তিনি আবার সিপাহীদের অনুরোধে দ্বিতীয়বার শহরে গেলেন ও পুনরায় দোকানদারদের দোকান খুলে ব্যবসাবাণিজ্য শুরু করতে বললেন।[৩] সঙ্গে সঙ্গে লুণ্ঠনকারীদের বিরুদ্ধে কতকগুলি কঠোর ব্যবস্থাও অবলম্বন করা হল। কাহী খান, সরফরাজ খান ও আরও কতকগুলি কুখ্যাত গুণ্ডাকে বন্দী করে রাখা হল, আর যারা লুটপাট করতে গিয়ে ধরা পড়েছিল তাদেরও খুব কঠিন শাস্তি দেওয়া হল।[৪] এ সব ছাড়াও, বাহাদুর শাহ আর একটি কাজ করলেন। তিনি শহরের প্রধান ব্যবসাদার ও মহাজনদের তাঁর দরবারে ডেকে পাঠালেন ও তাদের বললেন খাদ্যশস্যের দাম ধার্য করে দিতে, দোকান খুলতে ও যাতে সিপাহীরা তাদের রেশন পায় তার ব্যবস্থা করতে।[৫]

১। মণ্টোগোমারি মার্টিন: "ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার", ৩য়, পৃঃ ২৭৩-৭৪ ২। ঐ, পৃঃ ২৭৪।

৩। মেটকাফ সম্পাদিত: "টু নেটিভ ন্যারেটিভস্", পৃঃ ৮৭।

৪। এম. মার্টিন: "ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার", ৩য়, পৃঃ ১৭৪। যখন সংবাদ পাওয়া গেল যে, সবজিমণ্ডীতে, তালেবরে ও ক্যানটনমেণ্টে গুণ্ডারা দোকানপাঠ লুট করছে, বাহাদুর শাহর হুকুমে মির্জা আবু বকর তৎক্ষণাৎ একদল অশ্বারোহী নিয়ে ঐ গুণ্ডাদের গ্রামে গিয়ে সমস্ত গ্রামটিকে জ্বালিয়ে দিলেন। (ঐ, পৃঃ ১৭৪)। আর একটি উদাহরণ: "দুজন তাঁতী সিপাহী পোশাক পরে নাগরিকদের লুটপাট করছিল। তাদের ধরা হল। লাহোর গেটের দোকানদাররা থানাদারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল যে, সে তাদের কাছে থেকে ১০০০৲ টাকা ঘুষ দাবি করেছে; এই টাকা না দিলে সে সকলকে বন্দী করবে বলে ভয় দেখিয়েছে। থানাদারকে গ্রেপ্তার করা হল।"—(ঐ, পৃঃ ১৭৭)।

৫। ঐ, পৃঃ ১৭৪।

বাহাদুর শাহ ও সিপাহীদের এত চেষ্টা সত্ত্বেও বিশেষ কোনো ফল হল না। শহরের প্রধান প্রধান মহাজন ও ব্যবসাদাররা, যারা ইংরেজের রাজত্বে প্রচুর ধন-সম্পদের মালিক হয়ে উঠেছিল, তারা বিদ্রোহী সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ ও শত্রুতা শুরু করে দিল। অন্যান্য দোকানদাররাও যাতে তাদের নিজেদের দোকান না খোলে তার জন্যও তারা সচেষ্ট হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহী সিপাহীদের সম্বন্ধে নানাপ্রকার বীভৎস গুজব ছড়িয়ে জনসাধারণকে তাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলবার চেষ্টা করল। স্বভাবতঃই সিপাহীরাও এই সব কারণে মহাজন ও দোকানদারদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হতে লাগল। ১৪ই মে সিপাহী-অফিসাররা দরবারে মিলিত হয়ে বাহাদুর শাহকে জানালেন যে, সিপাহীদের জন্য যদি অবিলম্বে রেশনের কোনো ব্যবস্থা না করা হয়, তা হলে তাদের শহর লুট করতে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। তখনই বাহাদুর শাহ সিপাহীদের খাদ্যদ্রব্যের ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্যে নবাব মেহবুব আলি ও আশানুল্লাকে হুকুম করলেন।[১] বাদশাহ আবার মহাজনদের দরবারে ডেকে পাঠালেন ও সিপাহীদের সংকল্পের কথা বলে তাদের বললেন যে, হয় তাদের এবার দোকান খুলতে হবে, তা নইলে যেন তারা সিপাহীদের দ্বারা লুটপাটের জন্য তৈরী থাকে। এবার আশ্চর্য রকমের ফল হল ; কয়েক মিনিটের মধ্যে দিল্লীর সমস্ত দোকান খুলে গেল ও শহরের জীবনযাত্রা একেবারে স্বাভাবিক অবস্থায় এসে গেল।

কিন্তু একটি সমস্যার সমাধান হল তো সঙ্গে সঙ্গে আর একটি আরও গুরুতর সমস্যার আবির্ভাব হল। দোকানপাট খোলা হল বটে, কিন্তু সিপাহীরা খাদ্যদ্রব্য কিনবে কি করে? বাদশাহের নিজের কোনো ধনাগার কিম্বা সঞ্চিত ধন ছিল না যার থেকে সিপাহীদের তিনি বেতন দিতে পারতেন। রাজস্ব আদায় করে ধনাগার পুনর্গঠন করা—তা সময়সাপেক্ষ। কিন্তু সিপাহীদের খেয়ে পরে বেঁচে থাকা, এই ন্যূনতম চাহিদা মেটানোও যে আশু কর্তব্য। এই সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় ছিল ধনী মহাজনদের নিকট থেকে অর্থ সংগ্রহ করা। বিদ্রোহীদের একটা সংকটপূর্ণ সময়ে এইরূপ দাবি মোটেই অসঙ্গত হয়নি।

দরবার কর্তৃক এই প্রস্তাব গৃহীত হবার সঙ্গে সঙ্গে দিল্লীর লক্ষপতিরা এর প্রতিবাদ জানাতে শুরু করল ও তার থেকে রেহাই পাবার জন্য নানাপ্রকার অজুহাত দেখাতে লাগল। জীবনলাল তার দিনপঞ্জীতে লিখেছেন যে, ১৮ই মে তারিখে "কয়েকজন মহাজন মেহবুব আলির নিকট গিয়ে জানাল, তারা কোনো অর্থ দিতে পারবে না, কারণ তারা একেবারে নিঃস্ব হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তাদের

১। মেটকাফ সম্পাদিত : "টু নেটিভ ন্যারেটিভস্", পৃঃ ৯৯।

সাবধান করে দেওয়া হল যে, তারা যদি সিপাহীদের তহবিলে নিজে থেকে টাকা না দেয়, তা হলে সিপাহীরাই জোর করে তাদের টাকা কেড়ে নেবে।"[১] মহাজনরা এর পর বাদশাহের সঙ্গে দেখা করল, কিন্তু তাতেও কোনো ফল হল না। শেষ পর্যন্ত তারা টাকা দিতে বাধ্য হল। ২১শে মে তারিখে "বাদশাহের চেষ্টার ফলে নবনিযুক্ত অফিসাররা সিপাহীদের বেতন দেবার জন্য মহাজনদের কাছ থেকে ১ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করতে সক্ষম হল।"[২]

কিন্তু এই সামান্য অর্থে সিপাহীদের ন্যায্য দাবির একটা ভগ্নাংশও মেটানো সম্ভবপর হল না। একটা সাময়িক প্রতিকার হিসাবে বাহাদুর শাহ প্রস্তাব করলেন যে, অশ্বারোহীদের প্রত্যেককে ৯ টাকা ও পদাতিকদের ৭ টাকা করে দেওয়া হোক। কিন্তু এই নিয়ে সিপাহীদের মধ্যেই এবার বিবাদ শুরু হয়ে গেল। মিরাটের অশ্বারোহীরা ৩০ টাকা দাবি করল, আর দিল্লীর পদাতিকরা ৭ টাকা হিসেবে নিতে রাজী হল।[৩]

এই ভাবে জুন মাস এসে গেল, কিন্তু বিদ্রোহী সরকারের অর্থনৈতিক সমস্যার কোনো সমাধানই হল না। মহাজন ও ধনীরা তাদের অসহযোগ পুরো মাত্রায় চালিয়ে যেতে লাগল। ১লা জুন "বাদশাহের ধনাগারে ৩ লক্ষ টাকা দেবার জন্য গিরবার সিংহ ও গিরধারী লাল নামক দু' জন মহাজনের উপর হুকুম হল। না দিলে তাদের সমস্ত সম্পত্তি তো বাজেয়াপ্ত করা হবেই, অন্য শাস্তিও দেওয়া হবে। তার ফলে মহাজন দুটি ২ লাখ ও কয়েক হাজার টাকা দিল।"[৪]

এই বিষয়ে সিপাহীরা আরও দাবি করল যে, অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করবার জন্য কেবলমাত্র মহাজনদের কাছ থেকেই টাকা আদায় করলে হবে না, দিল্লীর দরবারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নবাব ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকেও টাকা আদায় করতে হবে। নবাব আমিন-উদ্দিন আহম্মদ খান ও নবাব জিয়াউদ্দিন আহম্মদ খানের নিকট টাকা চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু তারা যখন টাকা দিতে অস্বীকার করল, বাহাদুর শাহ তখন তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাই অবলম্বন করলেন না।[৫]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই সব ব্যক্তিরা ইংরেজের সঙ্গে চিঠিপত্রের বিনিময় করছিল ও তাদের বাড়ি পাহারা দেবার জন্য তাদের নিজস্ব সশস্ত্র বাহিনীও ছিল।

১। মেটকাফ সম্পাদিত : "টু নেটিভস ন্যারেটিভস্", পৃ ১০৫। ২। ঐ, পৃঃ ৯৯।
৩। ঐ, পৃঃ ১০৫। ৪। ঐ, পৃঃ ১১১। ৫। ঐ, পৃঃ ৬৬।

অনেক সময় এইসব সন্দেহজনক ধনীদের সম্পত্তি লুট হত ও তাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হত। "এই রকম পাইকারী ধ্বংসের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য ধনীদের একটা সভা হল। সেখানে একটা কমিটি করে ঠিক হল যে, এক একটা বাহিনীকে মাসিক কিছু টাকা দিয়ে তাদের উপর শান্তিরক্ষার ভার দেওয়া হবে। এই পরিকল্পনা সফল হল এবং কিছুকালের জন্য এইসব ব্যক্তিরা নিরাপদে বাস করতে লাগল। কিন্তু যেসব শাহজাদাদের এইসব বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত করা হয়েছিল, তাঁরা দ্রুত এই চুক্তির বিরুদ্ধে আপত্তি জানালেন এবং উক্ত কমিটির লোকদের ডেকে জরিমানা আদায় করলেন ও তাদের বন্দী করে রাখলেন।"[১]

ইত্যবসরে জুন মাসের মাঝামাঝি হতে ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে নতুন বিদ্রোহী বাহিনীগুলি দিল্লীতে এসে পৌঁছতে লাগল। তার ফলে সিপাহীদের সংখ্যা শহরে খুব বেড়ে যেতে লাগল। প্রথমতঃ, ১২ই জুন আলিগড় থেকে ও ১৪ই জুন ঝান্সী থেকে দুটি ছোট বাহিনী এসে পৌঁছল। তারপর ১৯শে জুন মধ্য ভারতের নাসিরাবাদ থেকে এল একটি বড় বাহিনী, ও ২২শে তারিখে জলন্ধর বাহিনী। এইসব সিপাহীদের আগমনের ফলে বিদ্রোহীদের শক্তি একধারে যেমন বর্ধিত হল, অন্যধারে তেমনি দিল্লীর বিদ্রোহী সরকারের অর্থনৈতিক সমস্যা খুবই জটিল হয়ে উঠল এবং তার সঙ্গে আরও অনেক রকম সমস্যার আবির্ভাব হল।

এইভাবে ২রা জুলাই যখন বখ্‌ত খানের নেতৃত্বে শক্তিশালী বেরিলি বাহিনী দিল্লীতে পৌঁছল তখন সকলেই মনে করেছিল যে, এখন থেকে হয়ত শহরের অবস্থা ভাল হতে থাকবে। বখ্‌ত খানের আসার সঙ্গে সঙ্গে বাহাদুর শাহ ও সিপাহী-দরবার (Military Court) তাঁর হাতে সমস্ত ক্ষমতা তুলে দিয়েছিলেন। বখ্‌ত খান প্রথমেই শহরের মহাজন, ধনী, নবাব ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে শহরের পরিস্থিতি আলোচনা করবার জন্য তাদের একটা সভায় ডেকে পাঠালেন। কিন্তু সভায় আসার পরিবর্তে তারা বাদশাহের দরবারে গিয়ে নালিশ করল যে, বখ্‌ত খান তাদের তাঁর নিজের বাড়িতে ডেকেছেন এবং এই অনুরোধ তিনি চিঠির দ্বারা না জানিয়ে পুলিসের দ্বারা হুকুম করে পাঠিয়েছেন, এতে তারা খুব অপমানিত ও লাঞ্ছিত বোধ করছে।[২] এই ঘটনা থেকে বেশ বোঝা গেল যে, বখ্‌ত খানের সঙ্গেও তারা অসহযোগ চালিয়ে যেতে দৃঢ়সংকল্প হয়েছে। যাই হোক, বখ্‌ত খান ১৪ জন হিন্দু ও ১৪ জন মুসলমানকে নিয়ে একটি স্থায়ী কমিটি গঠন করলেন,

১। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৫৯। ২। ঐ, পৃঃ ১৩৬।

যার কাজ হল কার কত টাকা দিতে হবে সেটা ধার্য করা ও সেই টাকা আদায় করা।[১] সঙ্গে সঙ্গে বখ্‌ত খান নিকটের বিদ্রোহী জেলাগুলিতে লোক পাঠিয়ে রাজস্ব আদায়ের জন্যও চেষ্টা করতে লাগলেন। যেমন, হাসান আলি খানকে পাঠালেন জাজরের রাজার নিকট থেকে তিন লাখ টাকা বাকি রাজস্ব আদায় করবার জন্য।[২] বখ্‌ত খান ঋণ সংগ্রহ করারও চেষ্টা করলেন।[৩]

কিন্তু এত চেষ্টার পরও বিদ্রোহী সরকার জুলাই ও আগস্ট মাসের মধ্যে অর্থনৈতিক সমস্যার কোনোই সমাধান করতে পারলেন না। আগস্ট মাসে দরবার থেকে ঘোষণা করা হল যে, দিল্লীর প্রতিটি গৃহস্বামীকে তিন মাসের ট্যাক্স অগ্রিম দিতে হবে, এবং যদি কেউ তা দিতে অস্বীকার করে, তা হলে তার গুরুতর শাস্তি হবে। কিন্তু এরূপ প্রচেষ্টায় মূল সমস্যার কোনো প্রতিকারই হল না, বরং অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা আরও বেড়ে গেল। বিদ্রোহী সরকারের এইরূপ দুর্বলতার প্রধান কারণ হল, সিপাহীরা ও বিদ্রোহী জনসাধারণ তাদের সর্বাত্মক কর্তৃত্ব স্থাপন করতে সক্ষম হয়নি, এবং কতকগুলি বিশ্বাসঘাতক সামন্ত ও উচ্ছৃঙ্খল শাহজাদাদের দ্বারা গঠিত বাদশাহের দরবারেরও এই কঠিন কাজটি সম্পাদন করার মতো কোনো যোগ্যতা ছিল না।

বস্তুতঃ, শাহজাদাদের যথেচ্ছাচার দিল্লীর এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিকে আরও বিপদ্‌জনক করে তুলল। তাদের বিরুদ্ধে বলপূর্বক টাকা আদায় করার ও নানা-প্রকারের অত্যাচারের অভিযোগ দিনের পর দিন বেড়েই যাচ্ছিল। ৫ই জুলাই, বাদশাহের এক পুত্রবধূ ইমানী বেগম বাদশাহের নিকট অভিযোগ করলেন যে, পূর্বরাত্রে আবু বকর মাতাল অবস্থায় কয়েকজন ঘোড়সওয়ার নিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে; তারপর আবু বকর তাঁর বাড়ি লুট করেছিল। বাদশাহ শুনে খুব রাগান্বিত হলেন ও আবুকে গ্রেপ্তার করার হুকুম দিলেন। সেই সঙ্গে "বাহাদুর শাহ অফিসারদের জানিয়ে দিলেন যে, যদি শাহজাদারা কোনো প্রকার অত্যাচার করে তা হলে তাদের সাধারণ লোকের মতো গণ্য করতে হবে।"[৪] বাদশাহ আর একটি হুকুমের দ্বারা তৎক্ষণাৎ তাকে সিপাহী বাহিনীর পদ থেকে বরখাস্ত

১। "পাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্ডস", ৭ম খণ্ড, ১ম, পৃঃ ৩১৬।

২। মেটকাফ সম্পাদিত: "টু নেটিভ ন্যারেটিভস্‌", পৃঃ ১৭২।

৩। শহরের দুজন অন্যতম বড় মহাজন, রামজীমল ও জীতমলকে বখ্‌ত খান ৫ লাখ টাকা ধনাগারে ঋণ দিতে বললেন। জীবনলালকেও এই ভাবে ২৫,০০০৲ টাকা দিতে বলা হয়। (ঐ, পৃঃ ১৭২-৭৩)

৪। ঐ, পৃঃ ১৩৯।

করে দিলেন।[১] পরদিন ৬ই জুলাই তারিখে তিনি প্রকাশ্য দরবারে মির্জা আবদুল্লা ও আরও কয়েকজন শাহজাদাকে তাদের দুর্ব্যবহারের জন্য ভৎর্সনা করলেন এবং "তারা যে টাকা মহাজনদের নিকট থেকে জোরপূর্বক আদায় করেছে, তাদের সেই টাকা ধনাগারে দিতে আদেশ করলেন; অন্যথা তাদের বৃত্তি বন্ধ করে দেওয়া হবে।"[২]

১৭ই আগস্ট তারিখে বখ্‌ত খান আবার বাদশাহের নিকট অভিযোগ করলেন যে, শাহজাদারা সিপাহীদের বেতন দেবার অজুহাতে আবার মহাজনদের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করছে, কিন্তু সিপাহীরা সে টাকার কিছুই পায়নি। বাহাদুর শাহ বখ্‌ত খানকে সব টাকা দিয়ে দেওয়ার জন্য খিজির সুলতানকে হুকুম করলেন এবং আরও বললেন যে, ভবিষ্যতে কোনো টাকা আদায় হলে নাগরিকদের সামনে সেই টাকা বখ্‌ত খানকে দিয়ে দিতে হবে।[৩] কয়েকদিন পর স্বর্ণকাররা দরবারে অভিযোগ করল যে, খিজির সুলতান তাদের কাছ থেকে জোর করে টাকা আদায় করেছে।[৪]

কিন্তু শাহজাদারাও ছেড়ে দেবার পাত্র ছিলেন না। তাঁরা বখ্‌ত খানের বিরুদ্ধে চারদিকে রটাতে শুরু করলেন যে, তিনি ইংরেজদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছেন। এই প্রকার গুজব রটানোর পক্ষে শাহজাদাদের একটা সুবিধা এই ছিল যে, বখ্‌ত খান তখন পর্যন্ত ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কোনো রকম কৃতিত্বই দেখাতে পারেননি। যাই হোক, বখ্‌ত খান দরবারে কোরান সাক্ষী করে শপথ করে বললেন যে, এ অভিযোগ সর্বৈব মিথ্যা। বাহাদুর শাহ এই প্রকার কুৎসা রটনা করার জন্য খুব দুঃখ প্রকাশ করলেন।[৫]

আবার আগস্ট মাস শেষ হতে চলল, কিন্তু সিপাহীরা তাদের বেতন পেল না, ২৫শে তারিখে অফিসারদের একটি প্রতিনিধিদল বাদশাহের সঙ্গে দেখা করে সিপাহীদের বেতন দাবি করলেন। "বাদশাহ তাঁর নিজের ঘরে গেলেন ও সমস্ত অলঙ্কার এনে তাঁদের দিলেন। কিন্তু অফিসাররা তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন ও বললেন: "রাজ-অলঙ্কার আমরা গ্রহণ করতে পারি না, কিন্তু আমরা এই দেখে আশ্বস্ত হলাম যে, আপনি আপনার জীবন ও সম্পত্তি দিয়ে আমাদের বাঁচাতে প্রস্তুত আছেন।"[৬] সিপাহীদের অর্থনৈতিক সংকটের জন্য তারা কোনোদিনই বাহাদুর শাহকে ব্যক্তিগতভাবে দোষারোপ করেনি।

১। মেটকাফ সম্পাদিত: "টু নেটিভ ন্যারেটিভস", পৃ: ১৩৭। ২। ঐ, পৃ: ১৪০।
৩। ঐ, পৃ: ১৯৭। ৪। ঐ, পৃ: ২০৯।
৫। ঐ, পৃ: ২০৫। ৬। ঐ, পৃ: ২০৭।

বিদ্রোহীদের অর্থনৈতিক সমস্যার জন্য তারা নিজেরাও কম দায়ী ছিল না। দিল্লী আসার পূর্বে অনেক ক্ষেত্রেই ইংরেজের ধনাগার তারা হস্তগত করতে পেরেছিল। প্রথম দিকে যেসব বিদ্রোহীদল দিল্লীতে এসেছিল তারা তাদের এই অর্থ বাদশাহের হাতে তুলে দিয়েছিল, যদিও তার পরিমাণ বেশী ছিল না। কিন্তু জুলাই মাসে বেরিলি বাহিনীর আসার সঙ্গে সঙ্গে এই নিয়ম বন্ধ হয়ে গেল। এই বাহিনী যখন বেরিলিতে বিদ্রোহ করে, তখন ঐ শহরের ধনাগার দখল করে প্রচুর অর্থ তারা সংগ্রহ করেছিল এবং তার থেকে প্রত্যেক সিপাহীকে ছয় মাসের বেতন অগ্রিম দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তারপর যা থাকল, তার পরিমাণও কম নয়, তা তারা দিল্লীতে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল, কিন্তু তা বাহাদুর শাহর হাতে তুলে দেওয়ার পরিবর্তে নিজেদের কাছেই রেখে দিল। জাজর নবাবের উকিল, কাশীপ্রসাদ তখন দিল্লীতে ছিলেন। তিনি ইংরেজের নিকট এক রিপোর্টে লিখেছেন : "বিদ্রোহী সিপাহীরা যেসব অর্থ নিয়ে এসেছিল তা তারা বাদশাহকে দিয়ে দেয়, কিন্তু তিন সপ্তাহের মধ্যেই তা খরচ হয়ে যায়। বাদশাহ এই টাকা আলাদা করে রেখেছিলেন এবং কেবলমাত্র সিপাহীদের জন্য ও যুদ্ধের গোলা বারুদের জন্যই খরচ করেছিলেন। তিনি নিজের জন্য এই টাকা খরচ করেননি ; তাঁর নিজের প্রয়োজনের জন্য শহরের মহাজনদের কাছ থেকে ধার করেছিলেন। ··· বেরিলি বাহিনীর আগমনের পর থেকে বাদশাহকে আর কোনো বাহিনী টাকা দেয়নি। বেরিলি বাহিনী তাদের সিপাহীদের ছয় মাসের বেতন দিয়ে দিয়েছিল, আর বাকিটা তারা নিজেরাই রেখে দিয়েছিল। পরে যেসব বাহিনী এসেছিল, তারা এই উদাহরণ অনুসরণ করেছিল।"[১]

এর পরে যেসব বিদ্রোহী বাহিনী দিল্লীতে এসেছিল তারাও বেরিলি বাহিনীর পন্থা অনুসরণ করতে লাগল। এই অর্থ তারা কি ভাবে খরচ করেছিল সে সম্বন্ধে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু এটা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, এই রকম খামখেয়ালী ব্যবস্থা সিপাহী বাহিনীগুলির পরস্পরের মধ্যে অনৈক্য ও ঝগড়াঝাঁটির একটা প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়াল। রাজদরবারের লোকদের সিপাহীরা বিশ্বাস করতে পারেনি ও সেই কারণে তারা তাদের হাতে টাকা তুলে দেয়নি— এ কথাটা বোঝা যেতে পারে। কিন্তু নিজেদের সিপাহী-কোর্টকে তারা কেন এই টাকা দিল না তা বোঝা খুবই কঠিন। বস্তুতঃ যে পরিমাণ অর্থ সিপাহীদের নিজেদের নিকট ছিল ও যে পরিমাণ টাকা দিল্লীর ধনীদের কাছ থেকে তারা আদায় করতে পেরেছিল, তা যদি সব একত্রিত করা হত ও সিপাহী-কোর্টের তত্ত্বাবধানে

১। "রেকর্ডস্ অব দি ইনটেলিজেন্স ডিপার্টমেণ্ট", ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৯।

পরিচালিত হত, তা হলে তাদের এই সঙ্কট দেখা দিত না এবং যুদ্ধের কাজ তারা ভালভাবেই চালিয়ে যেতে পারত। সিপাহীদের এই ব্যর্থতাই তাদের পরাজয়ের একটি কারণ হয়ে দাঁড়াল।

চূড়ান্ত অব্যবস্থার ফলে আগস্ট মাসের শেষ দিন সিপাহীরা আবার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল ও জানিয়ে দিল যে, তারা যদি দু' একদিনের মধ্যে তাদের বেতন না পায় তা হলে তারা শহরের সব ধনীদের লুট করবে। এই সংকট সমাধান করবার জন্য একটা বিশিষ্ট দরবারে ৫০০ ধনী, মহাজন, নবাব ও অফিসাররা সমবেত হলেন। আশানুল্লা, জিয়াউদ্দিন, আমিন-উদ্দিন সকলেই উপস্থিত ছিলেন। মহাজনরা ও স্বর্ণকাররা অভিযোগ করল যে, মির্জা মোগল ও মির্জা খিজির সুলতান তাদের কাছ থেকে কয়েক লক্ষ টাকা আদায় করেছে। কিন্তু শাহজাদারা বললেন যে, তাঁরা মাত্র ৪০,০০০৲ টাকা আদায় করেছেন। দু' পক্ষে খুব কথা কাটাকাটি হতে লাগল। অফিসাররা বললেন যে, যদি এই টাকা সিপাহীদের না দেওয়া হয় তা হলে তারা শাহজাদাদের বন্দী করবেন। অফিসাররা আরও বললেন যে, সিপাহী-দের এক্ষুনি বেতনের ব্যবস্থা না করলে কেউ তাদের শহর লুট করা বন্ধ করতে পারবে না। তখন বাদশাহ বললেন, "লুট করবার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। আমার হাতী, ঘোড়া, সোনা, রূপা যা কিছু আছে সব বিক্রি করে সিপাহীদের বেতন দিয়ে দেব। যদি আমি তা না দেই, তা হলে তোমরা সকলে দিল্লী ত্যাগ করে চলে যেতে পার, বিশেষ করে আমি যখন তোমাদের এখানে আসতে বলিনি। যদি তোমরা শহর লুট কর, তা হলে তার আগে আমাকে হত্যা করতে হবে। তারপর তোমরা যা খুশি করতে পার।"[১] এই বলে বাদশাহ তাঁর নিজের শয়নঘরে চলে গেলেন।

অফিসাররা তখন মির্জা এলাহী বক্স, আশানুল্লা, সৈয়দ আলি খানকে ঘেরাও করল। ৬টা পর্যন্ত উত্তেজিত ভাবে তর্কাতর্কি চলল। তারপর ঠিক হল যে, একদিনের মধ্যে সিপাহীদের বেতনের অর্ধেক টাকা দিয়ে দেওয়া হবে, আর বাকি অর্ধেক বেগম জিন্নৎ মহল নিজে ১৫ দিনের মধ্যে শোধ করে দেবেন। এই বন্দোবস্তের ফলে যে তিনটি বাহিনী শহর লুট করবার জন্য বাইরে আদেশের অপেক্ষা করছিল, তারা তাদের শিবিরে ফিরে গেল। কোনো শাহজাদাকে যেন প্রাসাদে ঢুকতে দেওয়া না হয়, এই হুকুম দিয়ে তিনটি কোম্পানিকে পাহারায় বসিয়ে অফিসাররাও চলে গেলেন।

১। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২১৫-১৬।

পরদিন দরবার হিসেব করে দেখল যে, প্রতি মাসে সিপাহীদের জন্য ৫ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকার প্রয়োজন।[১] প্রতিশ্রুত দিনে সিপাহীদের এই ভাবে কিছু কিছু করে দেওয়া হল—রিসালদার ১২ টাকা, সুবাদার ৪ টাকা, জমাদার ৩ টাকা ও সিপাহী ২ টাকা।[২] বাদশাহ তারপর এলাহী বক্স, আশামুল্লা, মির্জা মোগল, সৈয়দ আমির আলি খানের সঙ্গে পরামর্শ করে একটা নামের তালিকা তৈরি করলেন ; ঠিক হল এই সব ব্যক্তিদের কাছ থেকে ৪ লক্ষ টাকা তোলা হবে।[৩] বাদশাহ ঐ দিন শহরে ঢাক পিটিয়ে এক ঘোষণা-পত্রের দ্বারা দিল্লীর অধিবাসীদের জানালেন যে, শাহজাদাদের যেন আর কেউ কোনো রকম অর্থ না দেয় ; কিন্তু সিপাহীদের কোর্ট যে টাকা দাবি করবে তা দিতেই হবে।[৪] বাহাদুর শাহর নিজের কোনো অর্থ ছিল না, কিন্তু তাঁর সব অলঙ্কার তিনি শেষ পর্যন্ত দিয়ে দিলেন। তার সমস্ত রূপার দ্রব্য সংগ্রহ করে টাকশালে টাকা তৈরি করবার জন্য পাঠিয়ে দিলেন।[৫] এই সব ব্যবস্থা অবলম্বন করার ফলে সিপাহীরা পরের দিন ইংরেজদের আক্রমণ করতে রাজী হল।

পূর্বের মতো এবারও ধনীদের অনেকে টাকা দিতে অস্বীকার করল। কিন্তু এইবার সিপাহীরাও তাদের সহজে নিষ্কৃতি দিতে রাজী হল না। সৈয়দ আলি খান, দেওয়ান মুকুন্দ্‌লাল, বদরউদ্দিন খান, হাকিম আবদুল হক, নবাব কুলি খান প্রভৃতি যারা সিপাহীদের কোর্টের হুকুম অমান্য করল তাদের গ্রেপ্তার করে প্রাসাদের গার্ড-রুমে বন্দী করে রাখা হল যতক্ষণ পযন্ত না তারা টাকা দিতে রাজী হল।[৬] বিশেষ করে যারা ইংরেজের রাজত্বে অনেক টাকা করেছে তাদের বিরুদ্ধে সিপাহী-কোর্ট এবার খুবই কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করল। তোরাব আলি নামক ইংরেজের গুপ্তচর তাদের এক চিঠিতে জানাল : "মুন্সী আগা জান ও ও মুন্সী সাদাত আলি (যারা উভয়েই ইংরেজদের মুন্সী ছিল) গত চারদিন থেকে খুব কড়া বন্দীতে আছে। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা টাকা না দিচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের কিছু খেতে দেওয়া হবে না। ··· সিপাহী-কোর্ট গতকাল সিদ্ধান্ত করেছে যে, যেসব লোক ইংরেজ শাসনের অধীনে ধনী হয়েছে ও যারা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দিতে রাজী হচ্ছে না, তাদের বাড়ি লুট করা হবে।"[৭]

১। মেটকাফ সম্পাদিত : "টু নেটিভ ন্যারেটিভস্", পৃঃ ২১৬।
২। ঐ, পৃঃ ২১৭। ৩। ঐ, পৃঃ ২১৮।
৪। "পাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্ডস্", ৭ম খণ্ড, ১ম, পৃঃ ৭। ৫। ঐ, পৃঃ ৩৪।
৬। মেটকাফ সম্পাদিত : "টু নেটিভ ন্যারেটিভস্", পৃঃ ২২৫।
৭। "পাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্ডস্", ৮ম খণ্ড, ১ম, পৃঃ ৪৪৩।

উপরোক্ত ঘটনাবলী থেকে একটি বিষয় খুবই পরিষ্কার ভাবে প্রতীয়মান হয় যে, সিপাহী ও জনসাধারণ আর ধনী, মহাজন ও আভিজাতদের মধ্যে চার মাসব্যাপী যে অন্তর্দ্বন্দ্ব চলেছিল, তাতে সিপাহী ও জনসাধারণই শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হল। এই প্রকার বৈপ্লবিক বিজয়ের পর তারা যদি নিজেদের ঘর গুছিয়ে নেবার জন্য অন্ততঃ কিছুদিনও সময় পেত, তা হলে ভারতের ভবিষ্যৎ ইতিহাস হয়ত অন্য রকম হতে পারত। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, সিপাহী-কোর্ট বিজয়ী হল অত্যধিক দেরি করে। এবং তারা এই বিজয়কে দৃঢ়ভাবে সংগঠন করবার পূর্বেই দিল্লীর প্রাচীরের উপর ইংরেজের কামান থেকে গোলা এসে পড়ল।

বিদ্রোহী দিল্লীর অভ্যন্তরে : (৩) সিপাহী-কোর্ট

বাহাদুর শাহকে বাদশাহ বলে ঘোষণা করে সিপাহীরা যে মধ্যযুগীয় সামন্ত-তান্ত্রিক মোগল বাদশাহী পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চায়নি, তা তাদের পরবর্তী কার্য-কলাপেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সিপাহীরা ও জনসাধারণ তাদের গণতান্ত্রিক দাবি সম্বন্ধে একেবারেই অচেতন ছিল—এ কথা স্বতঃসিদ্ধ ভাবে ধরে নেওয়ার কোনো কারণই নেই। দিল্লীকে মুক্ত করে ও বাহাদুর শাহকে সম্রাট বলে ঘোষণা করে সিপাহীরা সঙ্গে সঙ্গে দাবি করল যে, প্রতিদিন দরবার বসাতে হবে, সেখানে সিপাহীদের প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকবেন। জীবনলাল তার দিনপঞ্জীতে লিখে গিয়েছে : "১২ই মে থেকে সিপাহীরা প্রাসাদের অফিসগুলি দখল করেছে এবং দেওয়ান-ই-খাসে তাদের পাহারা বসিয়েছে। তারা দাবি করেছে যে, প্রতিদিন দরবার বসাতে হবে ও সেখানে তাদের প্রতিনিধি থাকবে। বাহাদুর শাহর শাসন-কার্য পরিচালনা করার জন্য যেসব লোক থাকত, তাদের জায়গায় তারা নিজেদের লোক নিয়োগ করেছে।"[১] এর থেকে এ কথাটাই স্পষ্ট বোঝা যায় যে, সিপাহী ও জনসাধারণের মনে একটা আইনসঙ্গত রাজতন্ত্র স্থাপনের আশা বা পরিকল্পনা ছিল। এইরূপ গণতান্ত্রিক পরিকল্পনা ও চেতনা যতই অপরিপক্ক হোক না কেন, কিম্বা অঙ্কুরেই থাকুক না কেন, তাকে অস্বীকার করার উপায় নেই।

কিন্তু ওখানেই সিপাহীরা থেমে যায়নি। তারা আরও এগিয়ে চলল। যে পরোয়ানার দ্বারা সিপাহীরা বাহাদুর শাহকে ভারতের সম্রাট বলে ঘোষণা করেছিল, সেই একই পরোয়ানার দ্বারা তারা আরও প্রচার করল যে, সিপাহীরা যে সামরিক কোর্ট স্থাপন করেছে সেটাই হবে নতুন শাসনযন্ত্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতাশালী অঙ্গ।[২]

১। মেটকাফ সম্পাদিত : "টু নেটিভ ন্যারেটিভস্", পৃঃ ৬০৬১।

২। সতীন্দ্র সিংহ : "পলিটিকাল অরগানিজেশন অব দি ইণ্ডিয়ান মিউটিনিয়াস",—ইণ্ডিয়ান জার্নাল অব পলিটিকাল সায়েন্স, জানুয়ারি-মার্চ, ১৯৪৭।

এই সিপাহী-দরবারকে সকলে সাধারণতঃ 'কোর্ট' বলত। প্রথম দিকে এই কোর্টের সভ্য ছিল ১০ জন। ৬ জন সিপাহীদের প্রতিনিধি ও ৪ জন বেসামরিক দপ্তরগুলির প্রতিনিধি। সিপাহীদের ৬ জন প্রতিনিধির মধ্যে সামরিক বিভাগের ৩টি শাখা—পদাতিক, অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ—প্রত্যেকটি থেকে ২ জন করে নির্বাচিত হলেন। সিপাহীদের মধ্যে যাঁরা 'বুদ্ধিমান, বিজ্ঞ, উপযুক্ত ও অভিজ্ঞ' তাঁদের মধ্যে থেকেই তাঁরাই অধিক ভোটের দ্বারা নির্বাচিত হলেন। বেসামরিক বিভাগগুলির প্রতিনিধিরাও তাদের স্ব স্ব বিভাগের দ্বারা এই ভাবে নির্বাচিত হলেন।

কোর্টের এই দশজন প্রতিনিধির মধ্যে একজনকে সভাপতি (সদর-ই-জলসা) ও আর একজনকে সহ-সভাপতি (নাইব-ই-জলসা) অধিকাংশ ভোটের দ্বারা নির্বাচিত করা হল। আর অবশিষ্ট প্রতিনিধিদের উপর তাদের নিজ নিজ বিভাগের দায়িত্ব থাকল। আবার, প্রত্যেক প্রতিনিধিকে সাহায্য করবার জন্য ৪ জন নিয়ে এক-একটি কমিটি হল। কোর্টের প্রতিনিধিদের মতো এই ৪ জনও একই ভাবে নির্বাচিত হলেন। প্রত্যেকটি কমিটি তার প্রয়োজন অনুসারে যত জন খুশি সম্পাদক বা সেক্রেটারি নিয়োগ করতে পারত। একটি কমিটিতে সংখ্যাধিক ভোটে কোনো প্রস্তাব পাস হলে, তাকে কোর্টের নিকট অনুমোদনের জন্য পাঠানো হত।[১]

কোর্টের যে কোনো অধিবেশনে বাদশাহের উপস্থিত থাকার অধিকার ছিল। বাদশাহের বিনা স্বাক্ষরে কোর্টের কোনো প্রস্তাবই কার্যকরী হতে পারত না। বাদশাহ কোনো প্রস্তাবে আপত্তি জানালে, কোর্টকে সেই প্রস্তাব পুনর্বিবেচনা করতে হত। বস্তুতঃ, অন্যান্য দেশের নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের ন্যায় এ ক্ষেত্রেও বাহাদুর শাহকে রাষ্ট্রের নায়ক বলেই স্বীকার করে নেওয়া হল, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কোর্টের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে ধরে নেওয়া হত এবং সচরাচর কোর্টের প্রস্তাবে বিনা প্রতিবাদে বাদশাহ তাঁর সীলমোহর বসিয়ে দিতেন। স্যার জর্জ ক্যাম্পবেল দিল্লীর বিদ্রোহী সরকারের সংগঠন সম্বন্ধে লিখেছিলেন: "এটাকে একটা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের মতো বলেই মনে হয়। বাদশাহ বাদশাহই থাকলেন, তাঁকে বাদশাহের মতই সম্মান করা হত, যেমন আইনসঙ্গত রাজাকেও করা হয়। পার্লামেন্টের পরিবর্তে ছিল সিপাহীদের একটা পরিষদ, যার হাতেই ছিল সমস্ত ক্ষমতা। ইংল্যাণ্ডের রাজা যেমন সৈন্য বাহিনীর প্রধান সেনানায়ক, বাদশাহ তাও ছিলেন না। সব দরখাস্ত বাদশাহের নামেই করা হত, কিন্তু বাদশাহ এই সব দরখাস্তগুলিকে স্বাক্ষর করে পাঠিয়ে দিতেন ঐ কোর্টের নিকট, যেটা

১। বাণ্ডল্ নং ৫৭ ফোলিও নং ৫৩৯-৪১ (উর্দু), রুল নং ৩ ও ১১। এই প্রকারের তথ্যগুলি সতীন্দ্র সিংহের পূর্বোক্ত প্রবন্ধ (এই বইয়ের ১৩১ পৃঃ দ্রষ্টব্য) থেকে নেওয়া হয়েছে।

গঠিত হয়েছিল কয়েকজন কর্নেল, ব্রিগেড-মেজর ও সেক্রেটারিকে নিয়ে। এঁরা হচ্ছেন সেই সব সিপাহী যাঁরা নিজেদের কাজে খুব দক্ষতা দেখিয়েছিলেন।"[১]

কোর্টের দু' রকমের অধিবেশন হত। তার সাধারণ অধিবেশন বসত প্রতিদিন লালকেল্লায় ৫ ঘণ্টার জন্য। তা ছাড়া জরুরী অধিবেশন বসত মাঝে মাঝে বিশেষ কাজের জন্য।—(সতীন্দ্র সিংহের প্রবন্ধ—বাণ্ডল্ ৫৭, ফোলিও নং ৫৩৯-৪১, রুল নং ৩ ও ১১, উর্দু)। কোর্টের দায়িত্ব ছিল সমষ্টিগত। কোনো সভ্যের অনুপস্থিতিতে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে তা ঐ অনুপস্থিত সভ্যের দপ্তরেও প্রযোজ্য হত। সমস্ত ব্যাপারই অধিকাংশ ভোটের দ্বারাই স্থির হত। —(ঐ, রুল নং ৮, ৯, ১০)।

উপরোক্ত পরোয়ানাতে এটাও ঘোষণা করা হয়েছিল যে, যদি কোনো সভ্য সভাপতির অনুমতি ছাড়া গুপ্ত তথ্য প্রকাশ করে দেন, তা হলে কোর্টের সভ্যপদ থেকে তাঁকে বরখাস্ত করা হবে, কিম্বা তাঁরা কেউ যদি রাষ্ট্রকে ঠকান অথবা কোনো ব্যক্তির প্রতি বা সমষ্টির প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখান, তা হলে তাঁকে ঐ একই শাস্তিভোগ করতে হবে। —(ঐ, রুল নং ৪, ৬, ৮)। এই আইনটি যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। আত্মীয়-তোষণ, সাম্প্রদায়িকতা ও দুর্নীতি যাতে প্রশ্রয় না পায়, তার জন্যই এই আইন। বাস্তবিক পক্ষে, যদিও সিপাহী নেতাদের মধ্যে নানা প্রকারের মতভেদ ও তীব্র কলহ বিদ্যমান ছিল, তা সত্ত্বেও সে কলহ সাম্প্রদায়িকতার স্তরে কোনো দিনই নেমে আসেনি। ইংরেজের গুপ্তচর ও তাদের উচ্ছিষ্টভোগীরা নানা প্রকার উস্কানি দিয়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়ে দিয়ে বিদ্রোহীদের সংগ্রামী ঐক্যকে ভেঙে দেবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছে, কিন্তু তাদের সে চেষ্টা সব সময়ই ব্যর্থ হয়েছে। এই কারণেই বিদ্রোহীরা হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বিদ্রোহের জাতীয় চরিত্র প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বজায় রাখতে পেরেছিল।

৮ই আগস্ট তারিখের একটা পরোয়ানায় দেখা যায় যে, শহরের সুশাসনের ব্যবস্থা, সৈন্য বিভাগে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ, সৈন্য বিভাগের কর্মক্ষমতা বর্ধিত করা, সরকারী পদগুলির উন্নততর বণ্টন, মহাজনদের কাছ থেকে ঋণ সংগ্রহ, —এই সব সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য কোর্টের একটি বিশিষ্ট সভা ডাকা হয়েছিল। —(ঐ—বাণ্ডল্ ৫৭, ফোলিও নং ২৮৪, উর্দু, ৮।৮।১৮৫৭)। এই সব ছাড়াও, সিপাহী বাহিনীর শৃঙ্খলা, দুর্নীতি, লুণ্ঠন ও ক্ষমতার অপব্যবহার ইত্যাদি সম্বন্ধে কোর্ট অনেক আদেশপত্র প্রচার করেছিল।

১। জর্জ ক্যাম্পবেল: "মেময়াস অব মাই ইণ্ডিয়ান কেরিয়ার", ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৩৬।

সিপাহীদের এই কোর্টই ছিল বিদ্রোহী সরকারের সর্বোচ্চ আদালত; সুতরাং তারই উপর ছিল শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার চরম দায়িত্ব। এই কোর্টই বিচারালয় স্থাপন করত, বিচারক নিয়োগ করত ও বিচারপদ্ধতি নির্ণয় করে দিত। যে কোনো বিষয়ে সিপাহী-কোর্টের নিকট সকলেরই পুনর্বিচারের জন্য দাবি করার অধিকার ছিল। অর্থনৈতিক বিষয়েও এই কোর্টই ছিল সর্বশক্তিমান। রাজস্ব আদায় করা ও রাজস্ব-আদায়কারী নিয়োগ করার অধিকার একমাত্র কোর্টেরই ছিল। ট্যাক্সের বোঝা যাতে গরীবদের উপর না পড়ে ধনীদের উপরই পড়ে, এই ছিল কোর্টের নীতি। কোর্ট ছাড়া আর কারও সরকারের জন্য ঋণ সংগ্রহ করার ক্ষমতা ছিল না। কেউ ঋণ দিতে অস্বীকার করলে কোর্ট ছাড়া আর কারও তাকে বন্দী করবার ক্ষমতা ছিল না। খিজির খান ও অন্যান্য শাহজাদারা যখন ব্যক্তিগতভাবে ঋণ সংগ্রহ করেছিলেন, তখন কোর্ট দৃঢ়ভাবে বাদশাহের নিকট প্রতিবাদ জানায়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই অভিযোগের ফলে বাহাদুর শাহ প্রকাশ্য দরবারে কি ভাবে সমস্ত শাহজাদাদের ভৎর্সন করেছিলেন ও তাঁদের সমস্ত ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করেছিলেন। যখন মির্জা মোগল ও আবু বকর রাজস্ব আদায় করবার জন্য বাদশাহের নিকট অনুমতি চেয়েছিলেন, তিনি সে অনুমতি দিতে অস্বীকার করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে, 'একমাত্র সিপাহী-কোর্টেরই এই অনুমতি দেওয়ার ক্ষমতা আছে। যেসব চোরা-কারবারী, মুনাফাখোর জনসাধারণকে লুণ্ঠন করে অত্যধিক মুনাফা করবার চেষ্টা করত, তাদের বিরুদ্ধেও কোর্ট কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল এবং সব পণ্যদ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করে দিয়ে জনসাধারণের কষ্টের লাঘব করার যথেষ্ট চেষ্টা করেছিল।[১]

সিপাহী-কোর্টের সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে যে সিদ্ধান্ত সব থেকে বৈপ্লবিক হয়েছিল তা হচ্ছে কৃষকদের জমির ব্যবস্থা সম্বন্ধে। ১০ই আগস্ট তারিখে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে কোর্ট স্থির করে যে, জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করে তার পরিবর্তে যারা জমি চাষ করে, তাদেরই মালিকানার অধিকার দিতে হবে। এই একটিমাত্র প্রস্তাবেই প্রমাণিত হয় যে, ১৮৫৭ সালের জাতীয় বিদ্রোহ মূলতঃ ইংরেজ-বিরোধী বিদ্রোহ হলেও এটা একটা সামন্ততন্ত্র-বিরোধী গণঅভ্যুত্থানেরও সূচনা করে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, বিদ্রোহী সিপাহীরা অধিকাংশই কৃষক শ্রেণী থেকে এসেছিল। সুতরাং কৃষক শ্রেণীর জমি-সমস্যা সম্বন্ধে তারা যে খুবই সচেতন ছিল, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই। দিল্লীর চতুষ্পার্শ্বে ও অন্যান্য বিদ্রোহী অঞ্চলে বিদ্রোহের প্রথম থেকেই কৃষকরা কি ভাবে ইংরেজ-সৃষ্ট সর্বসত্ব-ভোগী

১। এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত সতীন্দ্র সিংহের প্রবন্ধে বাণ্ডল্ নং ১১৯, ১৫৩, ১২৯-র উল্লেখ দ্রষ্টব্য।

জমিদারদের উৎখাত করে জমি দখল করছিল তার উদাহরণ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। বিদ্রোহীদের এই সমস্ত বিপ্লবাত্মক কার্যকলাপ ও প্রচেষ্টাকে উপেক্ষা করে জনসাধারণের এই মহাবিদ্রোহকে যেসব পণ্ডিতেরা কয়েকজন মধ্যযুগীয় রাজা-বাদশাহের সামন্ততন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার একটা শেষ প্রয়াস বলে ব্যাখ্যা করার ব্যর্থ চেষ্টা করেন, তাঁরা এ বিষয়ে নিজেদেরই অজ্ঞতা ও আত্মম্ভরিতার পরিচয় দিয়ে থাকেন। দু'একজন রাজা-বাদশাহের সামন্ততন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা ভারতের তখনকার অবস্থায় থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তা থেকেও প্রবলতর শক্তি ছিল ভারতের জনসাধারণের গণতান্ত্রিক চেতনার উন্মেষ। জনসাধারণের এই গণতান্ত্রিক চেতনাই তার প্রভাব বিস্তার করেছিল এই সামরিক কোর্টের ভিতর দিয়ে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই চূড়ান্ত ক্ষমতাসম্পন্ন সিপাহী-কোর্ট বিদ্রোহের একেবারে প্রথম দিকে ১২ই মে তারিখে স্থাপিত হয়েছিল। আমরা এও লক্ষ্য করেছি যে, সিপাহী নেতাদের অনভিজ্ঞতা ও অক্ষমতার দরুন এই কোর্ট যেসব জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল তার কোনোটারই সমাধান করতে পারেনি। সমস্ত মে ও জুন মাসব্যাপী বিদ্রোহী সরকারের অর্থনৈতিক সংকট খারাপ থেকে অধিকতর খারাপ হল; দিল্লীর শাসনকার্যে শৃঙ্খলা স্থাপিত হল না; অরাজকতার উৎস শাহজাদাদের সম্বন্ধে ও বিশ্বাসঘাতক সম্ভ্রান্তদের বিরুদ্ধে কোনো কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হল না এবং সিপাহীদের পক্ষে সব থেকে বড় দুর্ভাগ্য যে, ইংরেজ আক্রমণকারীদের তারা অনেক চেষ্টা করেও একটা যুদ্ধেও পরাস্ত করতে পারল না। এই সব কারণে জনসাধারণের সমক্ষে সিপাহী-কোর্টের ইজ্জতহানি হওয়াই স্বাভাবিক।

জুন মাসের শেষ দিক থেকে কোর্ট যখন খুব একটা সংকটময় অবস্থার ভিতর দিয়ে যাচ্ছে, তখন শক্তিশালী বেরিলি বাহিনীর নেতৃত্বে জেনারেল বখ্‌ত খান ২রা জুলাই তারিখে দিল্লীতে পৌঁছলেন। সেই দিনই বাহাদুর শাহ কোর্টের সম্মতি-ক্রমে বখ্‌ত খানকে সমগ্র সিপাহী বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করে তাঁর হাতে চূড়ান্ত ক্ষমতা অর্পণ করলেন। স্বভাবতঃই এর ফলে সিপাহী-কোর্টের শক্তি আবার বেড়ে গেল। শাহজাদারা ও সম্ভ্রান্তরা, যাঁরা তখনও পর্যন্ত অনেকখানি ক্ষমতা ভোগ করছিলেন, বাহাদুর শাহর এই কাজ খুব পছন্দ করলেন না। ৬ই জুলাই বখ্‌ত খান মহম্মদ কুলী খানকে দিল্লীর ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে আশানুল্লা কোতোয়াল হিসাবে তার ক্ষমতা খর্ব হয়ে যাবে বলে বাদশাহের নিকট অভিযোগ করল। —(মেটকাফ সম্পাদিত: 'টু নেটিভ ন্যারেটিভস্', পৃঃ ১৪৩)। শাহজাদা মির্জা মোগল এতদিন পর্যন্ত দিল্লীর বিদ্রোহী বাহিনীর

কমাণ্ডার-ইন-চীফ ছিলেন। ৭ই জুলাই তিনি বাহাদুর শাহর নিকট অভিযোগ করলেন, "বখ্‌ত খানের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত প্রতিদিনই বিনা বাধায় ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই হচ্ছিল। তাঁর আসার পরেও কয়েকটা যুদ্ধ হয়েছে। আজ যখন শত্রুকে আক্রমণ করার জন্য আমি আমার সৈন্যদের নিয়ে শহরের বাইরে যাই, তখন জেনারেল বখ্‌ত খান বাধা দেন ও আমার বাহিনীকে অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখেন। তিনি জানতে চেয়েছিলেন, কার হুকুমে সিপাহীরা শহর থেকে বেরিয়ে এসেছে, এবং বলেছিলেন, তাঁর বিনা অনুমতিতে তারা আর এক পদও অগ্রসর হতে পারবে না। তারপর তিনি সিপাহীদের ফিরে যেতে বাধ্য করলেন।"[১]

এই প্রকার বাধা সত্ত্বেও বখ্‌ত খান ও সিপাহী-কোর্টের ক্ষমতা দিনের পর দিন বেড়ে যেতে লাগল। অবশ্য শাহজাদারা মহাজনদের কাছ থেকে জোর করে টাকা সংগ্রহ করে যেতে লাগলেন, কিন্তু তাঁরা জানতেন যে, এটা বেআইনী এবং তার জন্য তাঁদের অনেক সময় শাস্তিও ভোগ করতে হত। অবশেষে ১৯শে আগস্ট বাহাদুর শাহ কোর্টের এই ক্ষমতা একটা নতুন ফরমানের দ্বারা একেবারে পাকাপোক্ত করে দিলেন।[২] এই ফরমানে বাদশাহ পুনরায় ঘোষণা করলেন যে, এই সিপাহী-কোর্টই রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ শক্তিশালী সংগঠন ; তার হাতেই শাসন-যন্ত্র চালাবার, শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার, রাজস্ব আদায় ও ঋণ সংগ্রহ এবং যুদ্ধ পরিচালনা করার চূড়ান্ত ক্ষমতা। এই ফরমানে বাদশাহ আরও ঘোষণা করলেন, "কোর্টের কার্যে শাহজাদারা কিম্বা অন্য কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।"

এর থেকে দেখা যায় যে, দিল্লীতে সিপাহী ও সামন্ততান্ত্রিক শক্তির মধ্যে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব কিছুকাল ধরে চলেছিল, তাতে সিপাহীদের সংগঠন 'কোর্টই' তার চূড়ান্ত আধিপত্য স্থাপন করতে শেষ পর্যন্ত সমর্থ হয়েছিল। বাদশাহের উপরোক্ত ফরমান ঘোষিত হবার পর সিপাহীদের দিল্লীতে আর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী রইল না। এখন থেকে তাদের সব থেকে বড় কাজ হল নিজেদের ক্ষমতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে বিদেশী শত্রুকে পরাজিত করা। সেই চরম অগ্নিপরীক্ষায় সিপাহীরা যে সফলতা লাভ করতে পারেনি, তার জন্য তথাকথিত সামন্ততান্ত্রিক নেতৃত্ব দায়ী নয়। তাদের বিফলতার সর্বপ্রধান কারণ হল যে, তারা এই ইতিহাস-নির্ধারিত বিরাট কাজটির জন্য তখনও যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। শ্রেণীগত বিচারে সিপাহীরা ছিল এইরূপ বৈপ্লবিক কার্য সমাধানের জন্য তখনও অপরিণত।

দিল্লীতে নতুন নতুন বিদ্রোহী বাহিনীর আগমনের ফলে, সিপাহী-কোর্টের

১। সতীন্দ্র সিংহের পূর্বোক্ত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

২। ঐ, বাণ্ডল্‌ নং ১৫৩, ফোলিও নং ২২, ১৯।৮।১৮৫৭।

সংগঠনে স্বভাবতঃই অনেকটা পরিবর্তন হয়েছিল। নতুন বাহিনীগুলির প্রতিনিধি-দেরও কোর্টের সভ্য করে নেওয়া হল, যার ফলে কোর্টের আয়তন অনেক বেড়ে গেল। তোরাব আলি নামক ইংরেজের একজন গুপ্তচরের চিঠিতে—('পাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্ডস্', ৭ম খণ্ড, ২য় ভাগ, পৃঃ ৮) দেখা যায় যে, ১লা সেপ্টেম্বরে সিপাহী-কোর্ট নিম্নলিখিত ভাবে গঠিত ছিল :

জেনারেল ঘাউস মহম্মদ খান		নিমখ ব্রিগেড
ব্রিগেডিয়ার হীরা সিং		„ „
জেনারেল বখ্ত খান		বেরিলি ব্রিগেড
রেসালদার মহম্মদ সুফি		৮ম সামযিক অশ্বারোহী
রেসালদার হিয়াৎ খান		২৪শ „ „
সুবাদার কাদির বক্স		স্যাপার্স এণ্ড মাইনার্স
„ সুখো		৭২শ পদাতিক বাহিনী
„ হরদৎ		৯ম „ „
সুবাদার	নাম অজ্ঞাত	১১শ „ „
সুবাদার	নাম অজ্ঞাত	৫৪শ „ „
সুবাদার	নাম অজ্ঞাত	হরিয়ানা ব্যাটালিয়ান

এই সব বাহিনীর আগমনের পূর্বে যেসব বাহিনী উপস্থিত ছিল, তাদের ৫ জন প্রতিনিধি এই কোর্টের সভ্য ছিলেন। তা ছাড়া আরও সভ্য ছিলেন—আলোয়ারের মৌলভী ফজল হক্, বেরিলির মৌলভী সরফরাজ আলি ও ফ্লুলের মৌলভী ইমদাদ আলি। শেষোক্ত দু'জন মৌলভী সব সময়ই বাদশাহের পাশে দরবারে উপস্থিত থাকতেন।—('পাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্ডস্', ৭ম খণ্ড, ২য় ভাগ, পৃঃ ৯)। জনসাধারণের উপরও তাঁদের বেশ প্রভাব ছিল। আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি যে, আশাসুল্লা, এলাহী বক্স প্রভৃতি দরবারের পুরাতন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা দরবার থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। তাদের স্থানে এই সব মৌলভীরাই হলেন বাহাদুর শাহর প্রধান পরামর্শদাতা। জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসাবেই এই সব মৌলভীদের কোর্টের সভ্য করে নেওয়া হয়েছিল। এর আগে কোর্ট ছিল কেবলমাত্র সিপাহীদের নিয়ে গঠিত। পরে বেসামরিক প্রতিনিধিদেরও এর সভ্য করে নেওয়ার ফলে, কোর্ট সিপাহী ও জনসাধারণ উভয়েরই সংগঠনে পরিণত হয়েছিল। এই ভাবে, বিদ্রোহী দিল্লীতে একাধারে যেমন মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক শক্তিগুলি সংকুচিত হতে থাকল, অন্যধারে তেমনি গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি সম্প্রসারিত হতে লাগল।

বিদ্রোহী দিল্লীর অভ্যন্তরেঃ (৪) জনসাধারণ

১১ই মে তারিখে দিল্লীতে মিরাটের বিদ্রোহী সিপাহীদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে কি ভাবে জনসাধারণেরও অভ্যুত্থান হয়েছিল তা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এর দু'দিন পরে ১৩ই মে তারিখে "কোতোয়াল সকলকে জানিয়ে দিলেন যে, যেসব লোক বাদশাহের জন্য যুদ্ধ করতে প্রস্তুত, তারা যেন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে উপস্থিত হয়।"[১] এই আহ্বানের উত্তরে যে প্রচুর লোক ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে যোগদান করেছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

বিদ্রোহ শুরু হবার দু'একদিন পরেই কি ভাবে ইংরেজের গুপ্তচর মইন-উদ্দিন হাসান খান এইরূপ একটি ভলান্টিয়ার বাহিনীর কমাণ্ডার হল, তা পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে।

পুনরায় ২রা জুলাইতে যেদিন জেনারেল বখ্‌ত খান কমাণ্ডার-ইন-চীফ নিযুক্ত হলেন সেই দিনই তিনি ঘোষণা করলেন, "দিল্লীর প্রত্যেকটি নাগরিককে অস্ত্র ধারণ করতে হবে। প্রত্যেক বাড়ির মালিক ও দোকানদারকেও অস্ত্র রাখতে হবে। যাদের কোনো অস্ত্র নেই, তাদের এখুনি কোতোয়ালিতে যেতে হবে, সেখানে তাদের বিনা পয়সায় অস্ত্র দেওয়া হবে। দিল্লীতে যেন কাউকেও বিনা অস্ত্রে না দেখা যায়।" দিল্লীর নাগরিকরা ছাড়াও বহু লোক বিভিন্ন বিদ্রোহী অঞ্চল থেকে এসে শহরের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল।[২] ২৪শে জুন জীবনলাল তার ডায়েরিতে লিখেছিল, "৪০০ জেহাদী গুরগাঁও এবং অন্যান্য জেলা থেকে এসে পৌঁছেছে ও বাদশাহের সঙ্গে দেখা করেছে।"[৩]

১। মণ্টোগোমারি মার্টিন: "ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার," ৩য়, পৃঃ ১৭৪।

২। মেটকাফ সম্পাদিত: "টু নেটিভ ন্যারেটিভস্", পৃঃ ৬০।

৩। ঐ, পৃঃ ১২৭।

তারপর, বাহাদুর শাহর আবেদনের উত্তরেও অনেক স্থানীয় রাজা-নবাবরাও দিল্লীর যুদ্ধে যোগ দেবার জন্য কিছু কিছু লোক পাঠিয়েছিলেন। এই সব স্বেচ্ছা-সেবকরা যে প্রায়ই ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াইতে যোগ দিত এবং অনেক ক্ষেত্রে তারা যে সিপাহীদের থেকে বেশী সাহস ও ধৈর্যের পরিচয় দিত, তার উদাহরণের অভাব নেই। ইংরেজের গুপ্তচর গৌরীশঙ্কর ২রা সেপ্টেম্বরে তার রিপোর্টে লিখেছিল: "গত রাত্রে শহর ব্রিগেডের ভলান্টিয়ার কামানের ব্যাটারী পাহারা দিচ্ছিল। মধ্য রাত্রে পাহারা-বদলের সময় নিমখ ব্রিগেডের সিপাহীরা পাহারার কাজে হাজির হলে শহর ব্রিগেডের লোকেরা এই সব 'পলাতকদের' স্থান ছেড়ে দিতে রাজী হয়নি।"[১]

দিল্লীর ও আশেপাশের সহস্র সহস্র লোক এই ভাবে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে খুব উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিলেও, এই সব স্বেচ্ছাসেবকদের যথোপযুক্ত সামরিক শিক্ষা দেবার জন্য বিশেষ কোনো উপযুক্ত ব্যবস্থা ছিল না, তাদের অস্ত্রশস্ত্রও বিশেষ কিছু ছিল না এবং তাদের সুযোগ্য নেতৃত্বেরও যথেষ্টই অভাব ছিল। জীবনলাল তার দিনপঞ্জীতে লিখেছে: "কয়েকজন অশ্বারোহী সেনা-বাহিনীতে যোগ দিতে চেয়েছিল; বাদশাহ তাদের বললেন যে, তাদের বেতন দেবার মত অর্থ তাঁর নেই। কয়েকজন নিরস্ত্র সিপাহী বন্দুকের জন্য দরখাস্ত করেছিল। বাদশাহ উত্তর দিলেন যে, তাদের দেবার জন্য তাঁর কাছে সঞ্চিত কোনো অস্ত্র নেই।"—(মেটকাফ সম্পাদিত: 'টু নেটিভ ন্যারেটিভস্', পৃঃ ১৫৭)।

এই সব স্বেচ্ছাসেবকদের সংখ্যা যে সিপাহীদের থেকে অনেক বেশী ছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ইংরেজের একজন গুপ্তচরের মতে ১৮ই জুন দিল্লীতে সমগ্র বিদ্রোহী বাহিনীর সংখ্যা ছিল ১৩,০০০ পদাতিক ও ১,৩০০ অশ্বারোহী—('পাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্ডস্', ৭ম খণ্ড, ২য় ভাগ, পৃঃ ১৫৫)। কিন্তু পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, দিল্লীতে এই সময় যেসব বিদ্রোহী সিপাহী ছিল, তাদের সংখ্যা ছিল মাত্র ২,৫০০। তা হলে দেখা যাচ্ছে যে, স্বেচ্ছাসেবক সৈনিকদের সংখ্যা ছিল প্রায় ১২,০০০ অর্থাৎ সিপাহীদের চাইতে প্রায় ৫ গুণ বেশী। এবং একথাও নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে উৎসাহ পেলে আরও অনেক লোক ভলান্টিয়ার বাহিনীতে যোগ দেবার জন্য প্রস্তুত ছিল। এই ঘটনা থেকে পুনরায় প্রমাণ হয় যে, ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ মূলতঃ জনসাধারণেরই বিদ্রোহ ছিল। উপযুক্ত সামরিক শিক্ষা, শক্তিমান নেতৃত্ব ও যথেষ্ট অস্ত্রশস্ত্র পেলে নাগরিকদের এই ভলান্টিয়ার বাহিনী যে একটা অপরাজেয় শক্তিতে পরিণত হতে

১। "পাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্ডস্", ৭ম খণ্ড, পৃঃ ১৬।

পারত, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু দুঃখের বিষয় সিপাহীদের সাংগঠনিক দুর্বলতা ও তাদের অন্তর্বিরোধ সংক্রামক ব্যাধির মতো বিস্তার লাভ করে এই বিরাট সেচ্ছাসেবক বাহিনীকেও দুর্বল করে ফেলল। এই স্বেচ্ছাসেবকদের নিজস্ব কোনো রাজনৈতিক বা অন্য কোনো প্রকার সংগঠন না থাকাতে তাদের সিপাহীদের উপরই নির্ভর করে থাকতে হত। আবার, সিপাহীদের রাজনৈতিক চেতনা অনগ্রসর অবস্থায় থাকার জন্য তারাও জনসাধারণের সামরিক শক্তির তাৎপর্য উপলব্ধি করে তাকে বিদ্রোহকে সফল করার কাজে লাগাতে পারেনি।

স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, ভারতের অন্যান্য বিদ্রোহী অঞ্চলে মহিলারা যেরূপ নানা কাজে অগ্রসর হয়ে এসেছিলেন ও অনেক স্থলে অস্ত্র ধারণ করে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, দিল্লীতেও তার কোনো রকম ব্যতিক্রম হয়নি। জীবনলাল ২০শে জুলাইতে তার ডায়েরিতে লিখেছিল: "সম্প্রতি ইংরেজের সঙ্গে যে যুদ্ধ হয়ে গেল, তাতে একজন স্ত্রীলোক সিপাহীর পোশাক পরে খুব সাহসিক ভাবে কাজ করেছিলেন; এমন কি যখন সিপাহীরা সব যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে চলে গিয়েছিল, তখনও তিনি সেখানে অবস্থান করেছিলেন এবং কতিপয় ইংরেজ সৈন্যের সঙ্গে একা লড়ে তাদের কয়েকজনকে বধ করেছিলেন।"[১]

এই স্থায়ী ভলান্টিয়ার বাহিনী ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিশিষ্ট কার্যের জন্য আরও নতুন স্বেচ্ছাসেবকের আহ্বান জানান হত। যেমন ১২ই আগস্ট "সমস্ত শহরে ঢোল পিটিয়ে ঘোষণা করা হল যে, ঐ দিন রাত্রে বাদশাহ স্বয়ং ইংরেজের উপর আক্রমণ পরিচালনা করবেন ও তাদের একেবারে ধ্বংস করবেন। সব নাগরিককে অস্ত্র ধারণ করতে ও অগণিত সংখ্যার জোরে সমগ্র ইংরেজ বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করবার জন্য আহ্বান জানানো হল। এই কাজের জন্য হিন্দু ও মুসলমান সকলকেই শপথ গ্রহণ করতে বলা হল। এই আহ্বানের ফলে ১০,০০০ মুসলমান কাশ্মীর গেটে সমবেত হয়েছিল।"[২]

আগস্ট মাসের শেষে ও সেপ্টেম্বরের প্রথমে যতই শহরের উপর ইংরেজের আক্রমণ ঘনীভূত হয়ে আসতে লাগল ততই এই আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য সিপাহী ও নাগরিকদের উদ্বুদ্ধ করবার চেষ্টা চলতে লাগল। ২৮শে আগস্ট তোরাব আলি দিল্লী থেকে তার প্রভুদের জানাল: "মৌলভী ফজল হকের দিল্লীতে আসা অবধি ইংরেজ বাহিনীর বিরুদ্ধে নাগরিক ও সিপাহীদের উত্তেজিত

১। মেটকাফ সম্পাদিত: "টু নেটিভ ন্যারেটিভস্", পৃঃ ১৫৮।

২। ঐ, পৃঃ ২২৯।

করে তোলবার কাজে তাঁকে ব্যবহার করা হচ্ছে। তিনি বলে বেড়াচ্ছেন যে, তিনি আগ্রা গেজেটে পড়েছেন, ইংরেজরা দিল্লী শহরকে ধূলিসাৎ করতে ও শহরের প্রত্যেকটি নাগরিককে হত্যা করতে প্রস্তুত হচ্ছে।"[১]

তিন মাস ধরে ইংরেজের সঙ্গে অনবরত যুদ্ধ করার ফলে প্রচুর সংখ্যক সিপাহী হতাহত হয়েছিল। এই কারণেও দিল্লীর আত্মরক্ষার জন্য ভলান্টিয়ারের প্রয়োজনীয়তা ক্রমশঃ বেড়েই গিয়েছিল। কতকটা এইরূপ অভিযানের ফলে ও কতকটা সিপাহী-কোর্টের সাংগঠনিক উন্নতির ফলে সেপ্টেম্বরের প্রথম দিন হতে হাজার হাজার নাগরিক ও সিপাহী ইংরেজের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত লড়বার জন্য শপথ গ্রহণ করতে লাগল। প্রতিদিন তাদের প্যারেড হতে থাকল ও অন্যান্য প্রস্তুতিও চলতে লাগল। নাগরিক ও সিপাহীদের উৎসাহ ও দৃঢ়তা অনেক বেড়ে গেল। যেসব বিশ্বাসঘাতক ভলান্টিয়ার বাহিনীতে প্রবেশ করে অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছিল তাদের অনেকের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা হল। ২৮শ পদাতিক ভলান্টিয়ার বাহিনীর লোকেরা তাদের কমাণ্ডাণ্টকে ধরে বাদশাহের কাছে নিয়ে হাজির হল ও ইংরেজের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করার জন্য তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। (মেটকাফ সম্পাদিত: 'টু নেটিভ ন্যারেটিভস্', পৃঃ ২২)।

এই প্রকার আন্দোলন ও অভিযানের ফলে দিল্লীর জনসাধারণের মধ্যে যে আবার নতুন করে একটা বৈপ্লবিক চেতনা ও উৎসাহ দেখা দিয়েছিল তা নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে। ইংরেজের শেষ আক্রমণের দু' দিন পূর্বে, ১২ই সেপ্টেম্বর, ইংরেজের এক গুপ্তচর তাদের লিখেছিল, "গতকালের যুদ্ধে দিল্লীর নাগরিকরা অংশ গ্রহণ করেছিল এবং থানেশ্বর জিলার হাব্রীর মৌলভী নওয়াজিস আলি ২,০০০ লোক নিয়ে লড়েছিলেন। সিপাহীরা ইংরেজের আক্রমণ প্রতিরোধ করবার জন্য শহীদের মত মৃত্যুবরণ করবে বলে শপথ গ্রহণ করেছে। সৈন্যবাহিনী থেকে পলাতকদের ধরে এনে তাদের সকলের সামনে অপমান করা হচ্ছে।··· শহর-বাসীরা শুনতে পাচ্ছে যে, ইংরেজরা মুসলমানদের নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করছে কিন্তু হিন্দুদের ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। এই কারণে মুসলমানরা যুদ্ধ করতে বদ্ধ পরিকর। এই ধরনের রিপোর্টের প্রতিবাদ হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। তা না হলে বিদ্রোহ আরও ছড়িয়ে পড়বে।"[২]

দিল্লী থেকে ১১ই সেপ্টেম্বরের এই রকম আর একটি রিপোর্টে দেখা যায়, "কতিপয় শিখ অশ্বারোহী বাদশাহের নিকট এসেছিল ও বলেছিল যে, তারা ১২টি

১। "পাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্ডস্," ৭ম খণ্ড, ২য়, পৃঃ ৪৪৩।

২। ঐ, ৭ম খণ্ড, ২য়, পৃঃ ৩৩-৩৪।

কামান দখল করেছে। তারা বাদশাহকে অনুরোধ করল যে, তাঁর নিজস্ব বডি গার্ড বুশেরা বাহিনীকে তাদের সঙ্গে আবার যাবার অনুমতি দিতে হবে। তাতে বাদশাহ জানালেন যে, তাদের ইচ্ছে থাকলে তারা যেতে পারে। এই শিখরাই তাদের একবার যুদ্ধে নিয়ে গিয়েছিল, যার ফলে তাদের অনেকেই মারা গিয়েছে। তা সত্ত্বেও বুশেরা বাহিনী শিখদের সঙ্গে আবার গেল। আজ অশ্বারোহীদের প্রচুর লোক হত ও আহত হয়েছে। কিন্তু এই যে এত উৎসাহ দেখানো হচ্ছে তার জন্য বিদ্রোহীরা সকলেই খুব সন্তুষ্ট। সকলেই বলাবলি করছে যে, যদি এই রকম তেজের সঙ্গে প্রথম থেকেই যুদ্ধ করা হত, তা হলে এতদিন ধরে লড়ার প্রয়োজন হত না এবং অনেক আগেই ইংরেজ-শাসনের শেষ চিহ্নটুকু ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে যেত।"[১]

১২ই সেপ্টেম্বরে জীবনলালের ডায়েরিতেও লেখা আছে যে, শহরে সিপাহী ও জনসাধারণের মধ্যে খুবই একটা আত্মবিশ্বাস ও উদ্দীপনা দেখা যাচ্ছে—"বিদ্রোহী বাহিনীগুলির সকলেই শেষ পর্যন্ত লড়বার জন্য প্রস্তুত। এখন আর কেউই বাহিনী ত্যাগ করে চলে যাচ্ছে না।"[২]

তারপর যখন ১৪ই সেপ্টেম্বর ইংরেজের শেষ আক্রমণ শুরু হল "তখন বাস্তবিকই দেখা গেল যে, যেসব বিদ্রোহীরা দিল্লী রক্ষা করার জন্য লড়ছিল তাদের বেশীর ভাগই হল ধর্মোন্মত্ত জেহাদী ও শহরের জনসাধারণ।"[৩]

এর পর থেকে ইংরেজকে দিল্লীর প্রতিটি ইঞ্চি জমির জন্য লড়তে হয়েছে। ঐতিহাসিক ফরেস্ট লিখেছেন যে, যেদিন ইংরেজরা চাঁদনী চক আক্রমণ করল সেদিন দিল্লীর নাগরিক ও সিপাহীদের প্রচণ্ড প্রতিরোধের ফলে "ইংরেজরা দলে দলে ভূতলশায়ী হতে লাগল এবং আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা অর্থাৎ জুম্মা মসজিদ দখল করা অসম্ভব হয়ে পড়ল। অবশেষে আমরা পিছু হটতে বাধ্য হলাম ও গীর্জায় রক্ষিত বাহিনীর মধ্যে আশ্রয় নিতে হল।"[৪]

ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা দাবি করে থাকে—শিখরা না কি সকলেই বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ছিল। এই উক্তি সত্য কি মিথ্যা তা অন্যত্র আলোচিত হবে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, দিল্লীর যুদ্ধে অনেক বিদ্রোহী শিখ স্বেচ্ছাসেবক যে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়েছিল, তা উপরের ঘটনা থেকেই পরিষ্কার হয়ে যায়।

১। "পাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্ডস্", ৭ম খণ্ড, ২য়, পৃঃ ৫৫
২। ঐ, পৃঃ ৫৬।
৩। কুপার: "ক্রাইসিস্ ইন দি পাঞ্জাব", পৃঃ ২০০।
৪। ফরেষ্ট: "ষ্টেট পেপার্স", ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৭৭।

পাতিয়ালা, নাভা, ঝিন্দ ও কাপুরতলার রাজাদের বাহিনীর শিখ সৈন্যরা ইংরেজের পক্ষে লড়তে বাধ্য হয়েছিল, কিন্তু তারা এই হীন অবস্থাটাকে সানন্দে স্বীকার করে নেয়নি। ১লা জুন দিল্লীর দরবারে বিশ্বস্তসূত্রে খবর এসেছিল যে, "পাতিয়ালার রাজার সমস্ত সৈন্য ইংরেজবিরোধী। যে সময় ভারতবাসীরা তাদের ধর্মরক্ষা করার জন্য লড়ছিল তখন ইংরেজের পক্ষে যাবার জন্য মহারাজাকে এই সব সৈন্যরা খোলা-খুলিভাবে ভর্ৎসনা করেছিল।"[১] এই সংবাদ যে সম্পূর্ণ অতিরঞ্জিত ছিল না তারও প্রমাণ পাওয়া যেত যখন মাঝে মাঝে এই সব রাজাদের অধীনস্থও অন্যান্য শিখ সৈন্যরা সুযোগ পেলেই দলত্যাগ করে দিল্লীতে এসে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিত। জীবনলাল এ সম্পর্কে তার ডায়েরিতে ২৯শে জুলাই তারিখে লিখেছে, "পাতিয়ালার রাজার বাহিনীর কতিপয় শিখ সৈন্য ইংরেজ শিবির ত্যাগ করে দরবারে এসে উপস্থিত হয়েছে এবং রিপোর্ট করেছে যে, ইংরেজদের অনেক কামান থাকলেও কামানগুলি টানবার জন্য তাদের ঘোড়ার খুবই অভাব।"[২]

এই সব শিখরা দিল্লীর ভলান্টিয়ার বাহিনীতে যোগ দিয়ে সব সময়ই ইংরেজের বিরুদ্ধে খুবই বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। ৫ই আগস্ট দেখা যায় যে, "কয়েকজন শিখপ্রতিনিধি বাদশাহের নিকট একটি আবেদন করেন। তাঁদের অভিযোগ ছিল যে, তাঁরা যখন ইংরেজদের শিবির আক্রমণ করতেন, তখন পুরবিয়া সিপাহীদের নিকট থেকে কোনো সহযোগিতা না পেয়ে, তাঁদের বারবার ফিরে আসতে হয়। সুতরাং তাঁরা বাদশাহের নিকট আবেদন জানালেন যে, দিল্লীর অন্যান্য বাহিনী-গুলির মত শুধু শিখদের নিয়েই একটা স্বতন্ত্র বাহিনী গঠন করা হোক এবং তাদের হাতে দুটি কামান ছেড়ে দেওয়া হোক, তা হলে ইংরেজদের তারা কিছুটা সফলতার সঙ্গে আক্রমণ করতে পারবে।"[৩] কয়েক দিন পরে পৃথক ভাবে এই শিখ বাহিনী গঠন করা হয়েছিল।

বিদ্রোহের প্রথম থেকেই দেখা যায় যে, বিদ্রোহীরা হিন্দু-মুসলমানের সংগ্রামী ঐক্য বজায় রাখবার জন্য সর্বদাই সচেষ্ট ছিল। ইংরেজরাও জানত যে, এই ঐক্য ভাঙতে পারলে তাদের কাজ সহজ হয়ে পড়বে—তাই তারা তাদের গুপ্তচরদের মারফত ও আরও বিভিন্ন উপায়ে হিন্দু-মুসলমানের বিবাদ ঘটাবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। হিন্দু-মুসলমানের এই ঐক্যকে সুদৃঢ় করার আবশ্যকতা যে কতখানি বাহাদুর শাহ নিজেও তা খুব ভাল ভাবেই হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন। তাই

১। মেটকাফ সম্পাদিত : "টু নেটিভ ন্যারেটিভস্", পৃঃ ১১০।

২। ঐ, পৃঃ ১৭২।

৩। ঐ, পৃঃ ১৮৩।

তিনি ৯ই জুলাই তারিখে ঢোল পিঠিয়ে সারা শহরে ঘোষণা করে দিলেন—দিল্লীতে আর গো-হত্যা হতে পারবে না। যদি কাউকে গো-হত্যা করতে দেখা যায় তা হলে তাকে কামানের মুখে উড়িয়ে দেওয়া হবে।[১]

বেরিলিতে যেদিন বিদ্রোহ হয় ও খান বাহাদুর খান বিদ্রোহী সরকারের শাসন-ভার গ্রহণ করেন, সেদিন তিনিও গো-হত্যা বন্ধ করার জন্য অনুরূপ ঘোষণা করেছিলেন। তখনকার পরিস্থিতিতে গো-হত্যা নিবারণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে এইরূপ ঘোষণায় হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণ খুশীই হয়েছিল।

কিন্তু ইংরেজের গুপ্তচররা এতে সন্তুষ্ট হয়নি। আশানুল্লা, রজব আলি প্রভৃতি ধর্মান্ধদের উস্কানি দিতে লাগল যাতে বকর-ঈদের দিন প্রকাশ্য ভাবে গো-হত্যা করা হয়। রজব আলি তার বিদেশী প্রভুদের গদগদ ভাবে জানাল, "মুসলমান ধর্মান্ধরা অত্যধিক বিক্ষুব্ধ হয়েছে ও তারা প্রতিজ্ঞা করেছে যে, বকর-ঈদের দিন প্রকাশ্য রাজপথে তারা গো-হত্যা করবে। যদি তখন হিন্দু সিপাহীরা বাধা দিতে আসে তা হলে তারা হিন্দুদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করবে ও হয় তাদের জয় করবে, নয়ত ধর্মের জন্য শহীদের মত প্রাণ দেবে। ··· ঈদের দিন হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে লড়াই হওয়ার খুবই সম্ভাবনা ছিল।"[২]

কিন্তু বাহাদুর শাহ অনেক বিষয়ে যেমন দৃঢ়তা দেখিয়েছিলেন, এ বিষয়েও তিনি তেমনি কারও কাছে মাথা নিচু করলেন না। ১৮ই জুলাই আবার তিনি ঘোষণা করে দিল্লীতে সকলকে জানালেন যে, বকর-ঈদের দিনও কেউ গরু কোরবানি করতে পারবে না। তা ছাড়া "বাদশাহ জেনারেল বখ্‌ত খান ও অন্যান্য অফিসারদের হুকুম করলেন যে, তাঁরা যেন ঈদের দিন কোনো গরু কোরবানি করতে না দেন এবং যদি কোনো মুসলমান গরু কোরবানি করে তা হলে তাকে কামানের মুখে উড়িয়ে দিয়ে হত্যা করতে হবে। হাকিম আশানুল্লা এই আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে বললেন যে, তিনি মৌলভীদের সঙ্গে আলোচনা করবেন। এর ফলে বাদশাহ এতই ক্রুদ্ধ হয়ে পড়লেন যে, তিনি দরবার বন্ধ করে তাঁর শয়ন কক্ষে চলে গেলেন।"[৩]

হিন্দু-মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ভেদাভেদ, সন্দেহ ও মনোমালিন্য সৃষ্টি করবার জন্য ইংরেজরা আরও যেসব উপায় অবলম্বন করেছিল, তার মধ্যে একটি হল নানাপ্রকার সত্য মিথ্যা মিশিয়ে বিভিন্ন ধরনের গুজব প্রচার করা। এই ভাবে

১। মেটকাফ সম্পাদিত : "টু নেটিভ ন্যারেটিভস্", পৃঃ ১৪৪।

২। "পাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্ডস্". ৮ম খণ্ড, ১ম, পৃঃ ২৮০।

৩। মেটকাফ সম্পাদিত : "টু নেটিভ ন্যারেটিভস্", পৃঃ ১৭০।

দিল্লীতে জুলাই মাসে প্রচার হল যে, ইংরেজরা আগ্রায় সমস্ত মুসলমানদের কামানের মুখে উড়িয়ে দিয়েছে এবং দিল্লীতেও তারা ঠিক এই করবে।[১]

দিল্লীতে আরও প্রচার হল যে, আগ্রার জুৎসীপ্রসাদ, উত্তর ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী মহাজন, যিনি লক্ষ লক্ষ টাকা ইংরেজ সরকারকে ঋণ দিয়েছিলেন, তিনি আগ্রার ছোট লাটের কাছে এই বলে আবেদন করেছেন যে, যেহেতু হিন্দুরা সাধারণতঃ রাজভক্ত সুতরাং তাদের শাস্তি দেওয়া অন্যায় হবে। এই সব গুজবে যে কোনো ফল হয়নি তা বলা চলে না। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, যদিও দিল্লীতে অন্যান্য স্থানের মত হিন্দু জনসাধারণ ইংরেজের বিপক্ষে ছিল এবং অধিকাংশ স্থলে হিন্দু সিপাহী ও হিন্দু কৃষকরাই ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়ছিল, তবুও বানিয়া, মহাজন, ধনী, দোকানদার প্রভৃতি লোকেদের মধ্যে হিন্দুরাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ, এবং এই শ্রেণীর লোকেরা যে বিদ্রোহী দিল্লী-সরকারের সঙ্গে ভালভাবে সহযোগিতা করছিল না, তা সকলেই দেখতে পাচ্ছিল।

দিল্লীতে ইংরেজের শেষ আক্রমণের একদিন পূর্বে চারদিকে আবার রটে গেল, ইংরেজরা সমস্ত মুসলমানদের হত্যা করবে, কিন্তু হিন্দুদের স্পর্শও করবে না। স্বভাবতঃই কিছু মুসলমান এই সব হিন্দুদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। "সমস্ত দিন মুসলমানরা হিন্দুদের গালাগালি করল এবং তাদের খুন করবে বলে ভয় দেখাল। বাদশাহ তাদের শান্ত করার চেষ্টা করলেন ··· এবং তিনি ঘোষণা করলেন যে, পরদিন তিনি নিজে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত বাহিনীকে ইংরেজের বিরুদ্ধে পরিচালনা করবেন।"[২]

ইংরেজের বিভেদ সৃষ্টির প্রচেষ্টা আবার ব্যর্থ হল এবং দিল্লীর চূড়ান্ত যুদ্ধে হিন্দু-মুসলমান সিপাহী ও জনসাধারণ একই সূত্রে মিলিত হয়ে বিপুল মহিমায় শত্রুর সম্মুখীন হল।

১। মেটকাফ সম্পাদিত : "টু নেটিভ ন্যারেটিভস্", পৃঃ ১৬২।

২। ঐ, পৃঃ ২১৩।

ইংরেজের দিল্লী আক্রমণ

নতুন সৈন্যদল এসে পৌঁছবার পর ১৫ই আগস্ট ইংরেজ শিবিরের শক্তি ছিল ৯,৬৫৭। ১লা সেপ্টেম্বরে তাদের শক্তি হল :[১]

বৃটিশ পদাতিক—	৩,২৪১
'নেটিভ' পদাতিক (শিখ, গুর্খা, পাঠান, বালুচী)—	৩,৬৬৬
কাশ্মীর কন্টিন্‌জেণ্ট (ডোগরা রাজপুত)—	২,০০০
পাতিয়ালা, নাভা ও ঝিন্দ বাহিনী (শিখ)—	১,০০০
	৯,৯০৭

এই ১০,০০০ সৈন্যের মধ্যে মাত্র এক-তৃতীয়াংশ ছিল ইংরেজ, আর বাদবাকি দুই-তৃতীয়াংশই ছিল ভারতীয়। ৬ই সেপ্টেম্বর আরও কিছু নতুন সৈন্য এসে পৌঁছল। তাতে ইংরেজ শিবিরের মোট সৈন্যসংখ্যা হল ১১,৭২৫। তা ছাড়া "দিল্লী অধিকারের কৃতিত্ব নেবার জন্য" নাভার রাজা স্বয়ং সশরীরে উপস্থিত হলেন।[২]

সীজ-ট্রেনের ৩০টি অবরোধ-কামান এসে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজরা তাদের কাজ শুরু করে দিল। এত ত্বরান্বিত করার অবশ্য বিশেষ কতকগুলি কারণ ছিল। প্রথম কারণ হল যে, ইংরেজ সৈন্যরা এই অত্যধিক পরিশ্রম সহ্য করতে পারছিল না—তাদের মধ্যে অনেকেই পীড়িত হয়ে পড়ছিল, কিম্বা অসুখের ভান করছিল। ইংরেজ নায়করা এই জন্য খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। রবার্টস্‌ শিবির থেকে লিখলেন, "আমি হিসেব করে দেখছি যে, ১০ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে আমরা দিল্লীর অভ্যন্তরে পৌঁছব, ... বিলম্ব করলেই আমাদের সর্বনাশ হবে। এখন থেকেই আমাদের লোকরা পীড়িত হতে শুরু করেছে।"[৩]

১। "পাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্ডস্‌", ৭ম খণ্ড, ২য় ভাগ, পৃঃ ১৪।

২। ফরেষ্ট : "ষ্টেট পেপার্স", ১ম, পৃঃ ৪৬৬।

৩। রবার্টস্‌ : "লেটার্স", পৃঃ ৪৬।

দ্বিতীয় কারণটি আরও গুরুতর। ভারতীয় ভাড়াটিয়া সিপাহীদের রাজভক্তি সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়ার ইংরেজদের যথেষ্ট কারণ ছিল। এই সময় রবার্টস্ আর একটি চিঠিতে লিখেছিলেন: "আমাদের সঙ্গে যেসব ভারতীয় সৈন্য আছে, তারা মনে করে মৃত সিপাহীদের কাছ থেকে তারা অনেক টাকা লুট করতে পারবে; আমাদের লুট করার সুযোগ আর নেই বলে তারা এখন ঠিক করেছে যে, কিছু না পাওয়া থেকে 'প্যাণ্ডি'দের লুঠ করাই ভাল; তাই তাদের আমাদের পাশে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু বিলম্ব করলেই আমাদের সর্বনাশ হবে। এদের কয়েকজনকে সেদিন বিশ্বাসঘাতকার জন্য শাস্তি দেওয়া হয়েছে, তাদের মধ্যে ছিল বারুদখানার সঙ্গে সংযুক্ত কয়েকজন নেটিভ গোলন্দাজ। ইউরোপীয়ানের অভাবে আমরা এদের নিযুক্ত করতে বাধ্য হচ্ছি, কিন্তু তারা যে রাজভক্ত থাকবে, তা একেবারেই ভাবা যায় না, এবং তারা আমাদের যে পরিমাণ ক্ষতি করতে পারে, তা চিন্তা করলে ভয় হয়।"[১]

তারপর, একজন গুপ্তচর ১১ই সেপ্টেম্বর দিল্লী থেকে লিখেছিল: "বিদ্রোহী শিখরা খুব ভাল ভাবেই লড়েছিল, হিন্দুস্থানীদের থেকে অনেক ভাল। এমন একটা দিনও যায় না, যেদিন কিছু না কিছু শিখ ইংরেজ শিবির ত্যাগ করে এদিকে এসে যোগ দেয় ও সেখানকার সমস্ত খবর সরবরাহ করে। শহরের আফগান গাজীরা রোজ বেরিয়ে চলে যায় এবং নির্ভীক ভাবে ইংরেজ শিবিরের আফগানদের সঙ্গে মেলামেশা করে এবং সব রকমের সংবাদ সংগ্রহ করে নিয়ে আসে।"[২]

সত্বর দিল্লী অক্রমণ করার আর একটি কারণ ছিল দিল্লীর আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খল অবস্থা। এই জন্য ইংরেজ নায়করা সত্যই ভেবেছিলেন যে, "শহরের মধ্যে প্রথম ইংরেজ বাহিনী ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্রোহীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাতে শুরু করবে।"[৩] কিন্তু বিদ্রোহীদের সাংগঠনিক বিশৃঙ্খলা ইংরেজদের অক্রমণের পক্ষে যতই অনুকূল হোক না কেন, তারা যে সিপাহীদের রণশীলতা সম্বন্ধে আবার একটা মস্ত বড় ভুল করল, তা তারা কয়েকদিনের মধ্যেই বুঝতে পেরেছিল।

বস্তুতঃ, আসন্ন ইংরেজের আক্রমণকে প্রতিরোধ করবার জন্য বিদ্রোহীরা শেষ মুহূর্তে খুব তৎপর হয়ে উঠল। একজন গুপ্তচরের ২রা সেপ্টেম্বরের রিপোর্টে জানা যায়, "গতকাল সন্ধ্যার সময় নিমথ, বেরিলি ও নাসিরাবাদ বাহিনীর অফিসাররা জেনারেল বখ্‌ত খানের গৃহে মিলিত হয়েছিলেন। তাঁদের তলোয়ার মাঝখানে

১। রবার্টস্: "লেটার্স", পৃঃ ৫২।

২। "পাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্ডস্", ৭ম খণ্ড, ২য় ভাগ, পৃঃ ৫৪।

৩। ঐ, পৃঃ ১৫।

রেখে তাঁরা প্রত্যেকে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, তাঁরা জীবনমৃত্যু পণ করে মিলিত ভাবে লড়বেন।"[১] ৮ই তারিখের দরবারে অফিসারদের নিয়ে একটা কমিটি গঠিত হল এবং শহর রক্ষা করার জন্য কতকগুলি ব্যবস্থাও অবলম্বন করা হল।

বিদ্রোহীরা যে কতখানি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে ইংরেজের আক্রমণকে প্রতিরোধ করবার জন্য দাঁড়িয়েছিল, তা ইংরেজের দুটি গুপ্তচরের চিঠিতেই পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়। ১০ই সেপ্টেম্বর ফতে মহম্মদের বিবরণীতে আছে :

"হুকুম মতো আমি গতকাল সন্ধ্যার সময় ফোর্ট ও শহরের অন্যান্য স্থান দেখে এসেছি। ফোর্টে, লাহোর গেটে ও দিল্লী গেটে দেখতে পেলাম যে, পাহারাদাররা আগের থেকে অনেক বেশী শক্তিশালী, এবং আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য সব ব্যবস্থাই অবলম্বন করা হয়েছে। প্রত্যেক গেটেই একটা করে বড় কামান দাঁড় করানো হয়েছে। দেওয়ান-ই-আমেও চারটি কামান আছে। সেলিমগড়ের দুর্গ খুব ভালভাবেই সজ্জিত হয়েছে এবং তার চারধারেই কামান দাঁড় করানো হয়েছে। লাহোর গেট থেকে কাশ্মীর গেট পর্যন্ত প্রচুর সিপাহী মোতায়েন করা হয়েছে এবং প্রধান রাস্তাগুলির ধারে প্রত্যেকটি বাড়িতে উপর থেকে নীচ পর্যন্ত সিপাহীতে ভর্তি। অশ্বারোহীরা ব্যাঙ্ক, লালদিঘি ও আটা কারখানায় জমায়েত হয়েছে। তাদের আর একটা বড় দল রয়েছে দিল্লী গেটের নিকট বাদশাহী মসজিদে। আরও অনেকে শহরের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। প্রত্যেক গেটেই একটা করে কামান প্রস্তুত আছে, আর কাশ্মীর গেটে আছে ৪টা। শহরের চারধারে বুরুজগুলিতেও কামান দাঁড় করানো হয়েছে। দেওয়ালের চতুর্দিকে আগের থেকে অনেক বেশী পাহারাদার বসানো হয়েছে ও তারা বেশী করে পাহারা দিচ্ছে। ধর্মোন্মত্তরা এক সঙ্গে জড়ো হয়েছে ও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে।"[২]

দ্বিতীয় চিঠিখানা গৌরীশঙ্করের, এবং ঐ ১০ তারিখেই লেখা :

"শহরের প্রত্যেকটি গেট—সবসুদ্ধ ১৩টি—মোটামুটি ভাবে সুসজ্জিত হয়েছে, বিশেষ করে কাশ্মীর, কাবুল, লাহোর ও আজমীর গেট। ··· গতকাল যখন আক্রমণ আশা করা গিয়েছিল, কোতোয়ালির কাছে লাহোর গেটে যাবার রাস্তার উপর দুটি শক্তিশালী কামান প্রস্তুত করা হয়েছিল এবং আর একটি কামান দাঁড় করানো হয়েছিল লালা হর নারায়ণের বাড়ির ছাদের উপর। কাশ্মীর ও লাহোর গেটের মাঝামাঝি চৌরাস্তার মুখে ব্যারিকেড্ তৈরি করা হয়েছে এবং সেখানে কামানের একটা ব্যাটারি প্রস্তুত করার চেষ্টা হচ্ছে। শাহবুরুজের পিছনে

১। "পাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্ডস্", ৭ম খণ্ড, ২য়, পৃঃ ১৭।

২। ঐ, পৃঃ ৫২

বিদ্রোহীরা বালির বস্তা দিয়ে একটা ব্রেস্টওয়ার্ক তৈরি করেছে এবং এই ভাবে দেওয়ালের প্রত্যেকটি গর্ত তারা মেরামত করছে। ফোর্টে দুটি বাহিনী আছে। কর্নেল স্কিনারের বাড়িতে ৯ম ও ২০শ বাহিনী মোতায়েন; কাবুল গেট আর পানি গেটের মাঝে রয়েছে ১৬শ বাহিনী। গীর্জায় রয়েছে আগ্রার পুলিস ব্যাটেলিয়ান; কাছারিতে ৩৮শ বাহিনী, লাহোর গেটে ৫ম বাহিনী; সীতারাম বাজার ও জঙ্গলী মহল্লা থেকে তুর্কম্যান গেট পর্যন্ত রয়েছে ৩য়, ৬১শ ও ৩৬শ বাহিনী; আর দিল্লী গেটের নিকট বাজারে রয়েছে ৭৪শ বাহিনী। দরিয়াগঞ্জে রাখা হয়েছে ৫টি বাহিনী—১৫শ, ৩০শ ও নাসিরাবাদের তিনটি বাহিনী। দরিয়াগঞ্জে আরও আছে ৪র্থ ও ৯ম সাময়িক এবং ৬ষ্ঠ ও ৭ম রেগুলার অশ্বারোহী দল, এবং সৈয়দউদ্দিন খানের লোকেরা। বেগম সমরুর বাগানে রয়েছে ৩য় অশ্বারোহী এবং আরও অনেকে। শহরের সব সেতুগুলি ভাল অবস্থাতেই আছে।"[১]

এই স্থানে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন। এই সময় বাহাদুর শাহ পুনরায় ভারতীয় রাজাদের বিদ্রোহে যোগ দেবার জন্য আহ্বান জানিয়ে কতকগুলি চিঠি লিখেছিলেন। জীবনলালের ডায়েরিতে দেখা যায় যে, "৪ঠা সেপ্টেম্বর বাদশাহের স্বাক্ষরিত চিঠি জয়পুর, যোধপুর, বিকানীর ও আলোয়ারের রাজাদের পাঠানো হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে, বাদশাহ ইংরেজদের নিশ্চিহ্ন করতে চান ও তাঁর সৈন্যের প্রয়োজন। কিন্তু যেহেতু এই বিদ্রোহ সংগঠন ও পরিচালন করবার মত কোনো ব্যক্তি তাঁর নেই, সেহেতু তিনি একটা দেশীয় রাজ্যের সংসদ (Confederation of States) গঠন করতে ইচ্ছা করেন। এবং তিনি এখন যেসব রাজার নিকট এই চিঠি পাঠাচ্ছেন তাঁরা যদি এই কাজের জন্য একত্রিত হন, তাহলে তিনি তাঁদের হাতে সমস্ত ক্ষমতা তুলে দিতে প্রস্তুত আছেন।"[২]

বাহাদুর শাহর নিকট থেকে রাজাদের কাছে এরূপ চিঠি এই প্রথম নয়। বিদ্রোহের প্রথম থেকেই তিনি অনেক রাজাকেই বিদ্রোহে যোগ দেবার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। 'টু নেটিভ ন্যারেটিভস্'-এ উল্লিখিত জীবনলাল তার ডায়েরিতে ১৪ই মে, অর্থাৎ দিল্লীর বিদ্রোহের ৩ দিন পরে লিখেছিল: "জয়পুর, যোধপুর ও বিকানীরের রাজাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, বাদশাহের সমর্থনে তাঁরা যেন স্বয়ং দরবারে উপস্থিত হন কিম্বা সৈন্য পাঠিয়ে দেন।" বাদশাহ যে এরূপ আদেশ বিদ্রোহের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অনেক রাজার নিকট পাঠিয়ে-

১। **"পাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্ডস" ৭ম খণ্ড, ২য়, পৃঃ ৫৩-৫৪।**

২। **মেটকাফ সম্পাদিত: "টু নেটিভ ন্যারেটিভস্", পৃঃ ২১৯-২০।**

ছিলেন তা বাহাদুর শাহর বিচারের সময় আশানুল্লা এবং আরও কয়েকজনের সাক্ষ্যতেও জানা যায়।

কিন্তু ৪ঠা সেপ্টেম্বরের চিঠিতে যে প্রস্তাবটি নতুন, সেটি হচ্ছে একটা ভারতীয় রাজ্যের সংসদ (Confederation of States) সংগঠনের প্রস্তাব। এইরূপ একটা সন্ধিক্ষণে এইরূপ একটা তাৎপর্যপূর্ণ প্রস্তাব যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সমস্ত রাজ্যগুলিতেই তখন জনসাধারণের মধ্যে বিদ্রোহ ধূমায়মান। গোয়ালিয়র, ইন্দোর ও মধ্যভারতের অনেক রাজ্যের অধিবাসীরা বিদ্রোহে যোগ দিয়ে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করছে। এটাও অবিদিত নয় যে, প্রত্যেক রাজ্যের দরবারেই একটা অংশ ছিল যাঁরা সবাই ইংরেজবিরোধী ছিলেন এবং তাঁরা বিদ্রোহে যোগ দিতে খুবই উৎসুক ছিলেন। এই সময় যখন বিদ্রোহ চারদিকে প্রসারলাভ করছে, অনেক রাজাদেরও মন তখন ইংরেজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে উঠেছে। বাতাস কোন দিকে বইছে এটাই তাঁরা লক্ষ্য করে যাচ্ছেন। বিশেষ করে রাজপুত রাজারা তখনও পর্যন্ত শিখ রাজাদের মতো সমস্ত শক্তি নিয়ে ইংরেজের সাহায্যের জন্য অগ্রসর হয়ে আসেননি। যদি সেপ্টেম্বর মাসেই বিদ্রোহী দিল্লীর পতন না হত, যদি আরও কয়েকমাস দিল্লীতে বিদ্রোহীরা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারত, তা হলে বাহাদুর শাহর উক্ত প্রস্তাবের ফলাফল কি হত বলা যায় না।

বাহাদুর শাহ ৪ঠা সেপ্টেম্বর যে একখানা চিঠি পাঠিয়েছিলেন তা কেউই অস্বীকার করেন না, কিন্তু সঠিক চিঠিখানা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠেছে। সাভারকারের বইতে ('ইণ্ডিয়ান ওয়ার অব ইণ্ডিপেণ্ডেন্স'—ফিনিক্স পাবলিকেশনস্, বম্বে, পৃঃ ৩৩৪) এবং সুন্দরলালের 'ভারত মে আংরেজী রাজ' (২য় খণ্ড, পৃঃ ১৫১৩-১৪) গ্রন্থে যে চিঠিখানা পাওয়া যায়, তার উৎপত্তি স্থান (source) সম্বন্ধে মতদ্বৈধ থাকলেও, জীবনলালের উক্তির সঙ্গে এই চিঠিখানার যে সামঞ্জস্য আছে তাতে কোনো সন্দেহই নেই। চিঠিখানা হল এই:

"যে কোনো উপায়েই হোক ফিরিঙ্গীদের হিন্দুস্থান থেকে বিতাড়িত করাই হচ্ছে আমার একান্ত ইচ্ছা। সমগ্র হিন্দুস্থান স্বাধীন হোক এই আমার আন্তরিক বাসনা। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে বৈপ্লবিক যুদ্ধ আজ চলেছে, তা কখনই সাফল্য লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না এই বিদ্রোহকে পরিচালিত করবার জন্য একজন সুযোগ্য লোক অগ্রসর হয়ে আসছেন, যিনি এই আন্দোলনের গুরু দায়িত্ব বহন করতে সক্ষম ও যিনি জাতির বিভিন্ন শক্তিগুলিকে সংগঠিত ও কেন্দ্রীভূত করে দেশের সকল লোককে নিজের নেতৃত্বে একতাবদ্ধ করতে পারবেন।

ইংরেজদের বিতাড়িত করবার পর ভারতবর্ষকে শাসন করবার আমার নিজের কোনো ইচ্ছা নেই এবং আমার ব্যক্তিগত ক্ষমতা বিস্তার করবারও কোনো বাসনা নেই। আপনারা দেশের রাজন্যবর্গ যদি শত্রুকে দেশ থেকে বহিষ্কার করবার জন্য যুদ্ধে নামতে প্রস্তুত হন, তা হলে আমি আমার সার্বভৌম ক্ষমতা একটা সংঘবদ্ধ রাজন্যবর্গের হাতে (কন্‌ফেডারেসী অব ইণ্ডিয়ান প্রিন্সেস্)—যাঁরা এই কার্যের জন্য নির্বাচিত হবেন—তুলে দিতে প্রস্তুত আছি।"

৭ই সেপ্টেম্বর অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজরা তাদের প্রথম কামানের ব্যাটারি প্রস্তুত করতে শুরু করল। মোরী বুরুজের মাত্র ৫০০ গজ দূরে এই ব্যাটারি তৈরি করা খুবই শক্ত কাজ ছিল। তা ছাড়া, এক রাত্রের মধ্যেই এর প্রস্তুতি শেষ করা প্রয়োজন ছিল, কারণ দিনের আলোতে বিদ্রোহীরা দেখতে পেলেই মোরী বুরুজের কামান দিয়ে ইংরেজদের এই প্রচেষ্টা পণ্ড করে দেবে, এই ভয় ছিল। এই ব্যাটারি দাঁড় করাবার জন্য খুব শক্ত পাথুরে জমির ভেতর দিয়ে একটা পরিখা খনন করে তার মধ্যে অনেকগুলি লোককে কাজ করতে হয়েছিল ও উট দিয়ে বড় বড় কাঠের থাম ও বালির বস্তা আনতে হয়েছিল। কাজের শব্দে আকৃষ্ট হয়ে মোরী বুরুজের লোকেরা রাত্রে একবার অন্ধকারে কতকগুলি গোলা ছুঁড়ে মেরেছিল, তাতে ইংরেজ পক্ষের কিছু লোকও মারা গিয়েছিল। এ সম্পর্কে মেডলী তাঁর 'এ ইয়ার্স ক্যাম্পেনিং ইন ইণ্ডিয়া' (পৃঃ ৭৫) বইতে বলে গেছেন, "আমাদের কাজ শুরু হবার পর হঠাৎ মোরী বুরুজ থেকে সশব্দে কতকগুলি গোলা এসে আমাদের কর্মক্ষেত্রে পড়ল ও কয়েকজনকে ধরাশায়ী করে ফেলল। কতক্ষণ পরে আবার এইরকম কতকগুলি স্থির-লক্ষ্য গোলা এসে পুনরায় কয়েকজনকে অক্ষম করে দিল। অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, 'প্যাণ্ডি'রা জানত না যে, তাদের গোলার লক্ষ্য কি চমৎকার নির্ভুল এবং মনে হল, আমরা যে কাজে ব্যস্ত আছি সে সম্বন্ধে তারা কিছুই জানে না, কেবল তারা গোলা ছুঁড়েই সন্তুষ্ট।" ইংরেজরা তাদের কাজে এই একবার মাত্র বাধা পেয়েছিল। ব্যাটারির কাজ শেষ হতে না হতে যখন ভোর হয়ে এল, তখন বিদ্রোহীরা ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আক্রমণ শুরু করল। "কেবলমাত্র মোরী বুরুজ থেকেই যে আক্রমণ আসছিল তা নয়, আমাদের পরিখার সামনেই বিদ্রোহীরা খাদ কেটে কতকগুলি ছোট কামান নিয়ে এসে আমাদের উপর অনবরত গোলাগুলী চালিয়ে খুবই বাধা দিচ্ছিল। অশ্বারোহীরাও বেরিয়ে এসেছিল। ··· আমাদের ৭০ জন লোক পরিখার ভেতর মারা গেল। ··· বিদ্রোহীরা বীরদর্পে তাদের কামানগুলি রক্ষা করছিল। ··· মোরী বুরুজ যেন আস্তে আস্তে নিঃশব্দ হয়ে গেল ; কিন্তু তা মাত্র কিছু সময়ের জন্য, কারণ ৪ দিন পর, ১২ই তারিখে, চার্লস্ রীড

তাঁর ডায়েরিতে লিখেছিলেন : 'আমরা এখনও ছিদ্র করতেই ব্যস্ত ; মোরী এখনও নিঃশব্দ হয়নি, যদিও আমরা তাকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছি। এদের চাইতে সাহসী গোলন্দাজ আমি আমার জীবনে আর কখনও দেখিনি। তারা শেষ পর্যন্ত লড়বে এবং প্রত্যেকটি গোলন্দাজ তার কামানের পাশে দাঁড়িয়ে মরবে'।"[১]

কিন্তু তাদের এই আক্রমণের কোনো সুনির্ধারিত পরিকল্পনাও ছিল না, দৃঢ় প্রতিজ্ঞাও ছিল না। মধ্যাহ্নের মধ্যে অনেক ক্ষতি স্বীকার করেও ইংরেজরা তাদের প্রথম ব্যাটারি সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত করে ফেলল। এই ব্যাটারি ৪টি ৯ পাউণ্ডার ও ২টি ২৪ পাউণ্ডার শক্তিশালী হাউইটজার কামান দিয়ে তৈরী হয়ে ২টি শাখায় ভাগ হয়ে গেল—একটি হল মোরী বুরুজের কামানগুলিকে ধ্বংস করার জন্য, আর একটি হল কাশ্মীর গেট দিয়ে বিদ্রোহীরা যাতে সদলবলে বেরিয়ে এসে আক্রমণ না করতে পারে তা বন্ধ করার জন্য।

ব্যাটারি প্রস্তুত করেই ইংরেজরা তার শক্তিশালী কামানের গোলা দিয়ে মোরী বুরুজকে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে অকর্মণ্য করে দিল। দিল্লী রক্ষার জন্য মোরী বুরুজ ছিল অতি গুরুত্বপূর্ণ ও অন্যতম চাবিকাঠি। তা ছাড়া, এই ব্যাটারি ইংরেজদের আরও একটা মহা উপকার সাধন করল। বিদ্রোহীরা ভেবেছিল যে, দেওয়ালের পশ্চিম অংশেই ইংরেজরা আক্রমণ করবে, এই ভ্রান্ত ধারণাও এইরকম একটা সংকটপূর্ণ সন্ধিক্ষণে বিদ্রোহীদের কম ক্ষতির কারণ হয়নি। যে মুহূর্তে বিদ্রোহীরা শত্রুকে তাদের একেবারে নাকের সম্মুখে ব্যাটারি প্রস্তুত করতে সুযোগ দিল এবং উপরন্তু নিজেরাও প্রতারিত হল, সেই মুহূর্ত থেকে তারা প্রারম্ভিক সুযোগ (initiative) থেকে বঞ্চিত হয়ে দিল্লীর শেষ যুদ্ধে পরাজিত হতে শুরু করল। বৃটিশ বাহিনীর প্রধান ইঞ্জিনিয়ার বেইর্ড স্মিথ বলেছিলেন, "এই প্রথম ব্যাটারিটি হল দিল্লীর সমগ্র অবস্থানের চাবিকাঠি ; এর সফলতার উপরই নির্ভর করছিল আক্রমণকারীদের শহরের প্রবেশ পথ। এবং এর কার্যকারিতার উপরই প্রত্যক্ষভাবে নির্ভর করছিল আমাদের অন্যান্য ব্যাটারিগুলির নির্মাণ ও অগ্রগতি।" বস্তুতঃ এই সংরক্ষণকারী ব্যাটারিটি কার্যকরী হবার পর উত্তর প্রাচীরের সম্মুখে অন্যান্য ব্যাটারিগুলি নির্মাণ করা ইংরেজদের পক্ষে আপেক্ষিক ভাবে সহজ হয়েছিল।

শুধু বিদ্রোহীদেরই নয়, ইংরেজ শিবিরেও সকলেরই ধারণা ছিল যে, শহর পশ্চিম দিকের প্রাচীর দিয়ে আক্রান্ত হবে, কারণ তখন পর্যন্ত ইংরেজদের সব প্রধান ব্যাটারিগুলি ঐ ধারেই বসানো হয়েছিল। উর্ধ্বতন ৩।৪ ব্যক্তি ছাড়া আর কেউই জানতেন না যে, উত্তর দিক থেকেই আক্রমণ হবে। এইদিকে ইংরেজরা প্রায়

১। এ, সি, টাইলর : "লাইফ অব জেনারেল স্যার আলেক্স টাইলর", পৃঃ ২৯৬-৯৭।

তিনধারে সুরক্ষিত। এদিকে আর একটি সুবিধা ছিল এই যে, প্রাচীর থেকে চাঁদনী চক ও প্রাসাদ পর্যন্ত সব স্থানটাই প্রায় মুক্ত, যার জন্য প্রাচীর ভেদ করার পরই আক্রমণকারীদের শহরের সঙ্কীর্ণ রাস্তার মধ্যে পড়তে হবে না এবং খোলা জায়গায় সৈন্য সমাবেশের জন্য প্রচুর স্থান পাবে। উপরন্তু, বিদ্রোহীরা ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে পশ্চিম ধারেই সতর্কতা অবলম্বন করেছিল এবং উত্তর ধারে তাদের সতর্কতা শিথিল ছিল।

উত্তর প্রাচীরে তিনটি শক্তিশালী বুরুজ—পানী বুরুজ, কাশ্মীর বুরুজ ও মোরী বুরুজ। এই ধারের প্রাচীর ২৪ ফিট উঁচু ও ১২ ফিট চওড়া। প্রাচীরের বাইরে ১৬ ফিট গভীর ও ২০ ফিট বিস্তৃত একটা পরিখা। তা ছাড়া প্রাচীরকে রক্ষা করার জন্য ছিল ৮ ফিট পর্যন্ত ঢালু একটা গ্ল্যাসিস্।

উত্তর প্রাচীর আক্রমণ করতে হলে ইংরেজের সর্বপ্রথম প্রয়োজন লুডলো ক্যাসল্ অধিকার করা। জুন মাসে ইংরেজরা যখন ক্যানটনমেণ্ট ও টিলা অধিকার করে, সেই সময় তারা লুডলো ক্যাসল্ এবং মেটকাফ হাউসও দখল করেছিল। পরে বিদ্রোহীরা ইংরেজদের তাড়িয়ে লুডলো ক্যাসল্ অধিকার করে, কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক মেটকাফ হাউস ইংরেজদের হাতেই থেকে যায়। যদি বিদ্রোহীরা মেটকাফ হাউসও দখল করে থাকত, তা হলে ইংরেজের পক্ষে এই সময় লুডলো ক্যাসল্ আক্রমণ করা বা দখল করা খুবই কঠিন হত। যতক্ষণ পর্যন্ত লুডলো ক্যাসল্ বিদ্রোহীদের হাতে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের পক্ষে টিলা থেকে যমুনা পর্যন্ত দুই বর্গমাইল জায়গার উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা সম্ভব হবে, এবং এই অবস্থায় ইংরেজের পক্ষে তাদের আক্রমণ-পরিকল্পনা কার্যকরী করাও সম্ভব হবে না।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, দিল্লীর প্রাচীরের গ্ল্যাসিস্ এমন ভাবে নির্মাণ করা হয়েছিল, যাতে কামানের গোলা নীচের দিকে লক্ষ্য করলে তাতে কোনো ফলই হবে না, আবার উপরের দিকে লক্ষ্য করলে তাতে উপরের অংশ ভাঙলেও তার-দ্বারা শহরে প্রবেশ-পথ তৈরি করা যাবে না। ইংরেজ নায়করা তাই আর একটা উপায় অবলম্বন করলেন ; সেটা হল, বুরুজের পাশে দেওয়ালের নীচে ছিদ্র তৈরি করে শহরে প্রবেশ করা। তা করতে হলে ইংরেজদের তিনটি কাজ করা প্রয়োজন : (১) ছিদ্রকারী ব্যাটারি (Breaching Battery) বুরুজের একেবারে সামনা-সামনি বসাতে হবে , (২) তাকে প্রাচীরের খুব নিকটেই বসাতে হবে যাতে করে গোলাগুলী প্রাচীর বিদীর্ণ করতে সক্ষম হয় এবং (৩) কামান আর প্রাচীরের মাঝখানে কোনো প্রকার বাধা থাকবে না।

এই পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য প্রথমেই ইংরেজদের প্রয়োজন লুডলো ক্যাসল্ অধিকার করা। এই বাড়ি কাশ্মীর গেট থেকে ৭৫০ গজ সম্মুখে ও হিন্দুরাও-এর বাড়ি থেকে সোজা ১০০০ গজ দক্ষিণে। একদল সিপাহীর উপর এই বাড়ি রক্ষা করার ও পাহারা দেবার দায়িত্ব ছিল। কিন্তু অন্যান্য সিপাহীদের মতো এদের শৃঙ্খলা খুব শিথিল হয়ে পড়েছিল। ইংরেজরা ফ্ল্যাগস্টাফ টাওয়ার থেকে দেখতে পেত যে, পাহারা বদলের সময় পুরাতন পাহারাদারদের স্থানে নতুন পাহারাদারদের স্থান গ্রহণ করতে অনেক সময় লাগত। বিদ্রোহীদের এই শিথিলতার সুযোগ নিয়ে তারা সমস্ত অঞ্চলটা যে ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করে গিয়েছে, সিপাহীরা তার কিছুই টের পায়নি। তা ছাড়া, যে নালাটা টিলা থেকে শুরু হয়ে উত্তর প্রাচীর ও লুডলো ক্যাসলের মাঝখান দিয়ে যমুনায় গিয়ে পড়েছে, সেই নালা সম্বন্ধেও বিদ্রোহীরা খুবই উদাসীন ছিল। এই অরক্ষিত ও উপেক্ষিত নালা ইংরেজের নিকট ভগবান প্রদত্ত বলেই মনে হয়েছিল। তার আশ্রয় না পেলে তাদের পক্ষে লুডলো ক্যাসেল্ অধিকার করা ও তারপর প্রাচীরের উত্তর ধারে ছিদ্রকারী কামানের ব্যাটারিগুলি নির্মাণ করা খুবই কঠিন হত। এই নালার সাহায্য ব্যতীত ইংরেজরা ব্যাটারি নির্মাণ করবার জন্য সাজসরঞ্জাম এত কম ক্ষতিতে বিদ্রোহীদের অজ্ঞাতে যথাস্থানে নিয়ে যেতে পারত না এবং উত্তর প্রাচীরে আক্রমণের পরিকল্পনাও শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত গোপনীয় রাখতে পারত না।

উত্তর প্রাচীর আক্রমণের এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে ইংরেজ নায়কদেরই যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। জেনারেল উইলসন লিখেছিলেন: "এই আক্রমণের ফলাফল নির্ভর করবে পাশা খেলার মতো সম্পূর্ণভাবে দৈবের উপর। কিন্তু এই অবস্থার মধ্যে আমি এই প্রকার জুয়া খেলতে প্রস্তুত আছি, বিশেষ করে আমি নিজে যখন এর চাইতে ভাল কোনো পরিকল্পনা দিতে পারছি না।"[১] ইংরেজ নায়করা জানতেন যে, তাদের এই পরিকল্পনার সফলতা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছিল বিদ্রোহীদের অসতর্কতার উপর। উত্তর দিক থেকেই আক্রমণ হবে, বিদ্রোহীরা যদি এটা বুঝে ফেলে ও সতর্ক হয়ে পড়ে, তা হলে তার ফলে ইংরেজদের যে ক্ষতি হবে, তারপর তাদের পক্ষে আক্রমণ করা আর সহজ হবে না।

৮ই সেপ্টেম্বর প্রত্যুষে ব্রিগেডিয়ার সাওয়ার্সের অধীনে ইংরেজরা ফ্ল্যাগস্টাফ টাওয়ার থেকে বেরিয়ে এসে লুডলো ক্যাসল্ হঠাৎ আক্রমণ করল। বিদ্রোহীরা এই আক্রমণের জন্য একেবারে প্রস্তুত ছিল না। ঘুম ভাঙার পর ঘটনাটা যখন তারা বুঝতে পারল, তখন শত্রুকে তারা একবার শেষ হাতাহাতি যুদ্ধে চ্যালেঞ্জ

১। কে' ও ম্যালিসন: "দি হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়ান মিউটিনি", ৪র্থ, পৃঃ ৪।
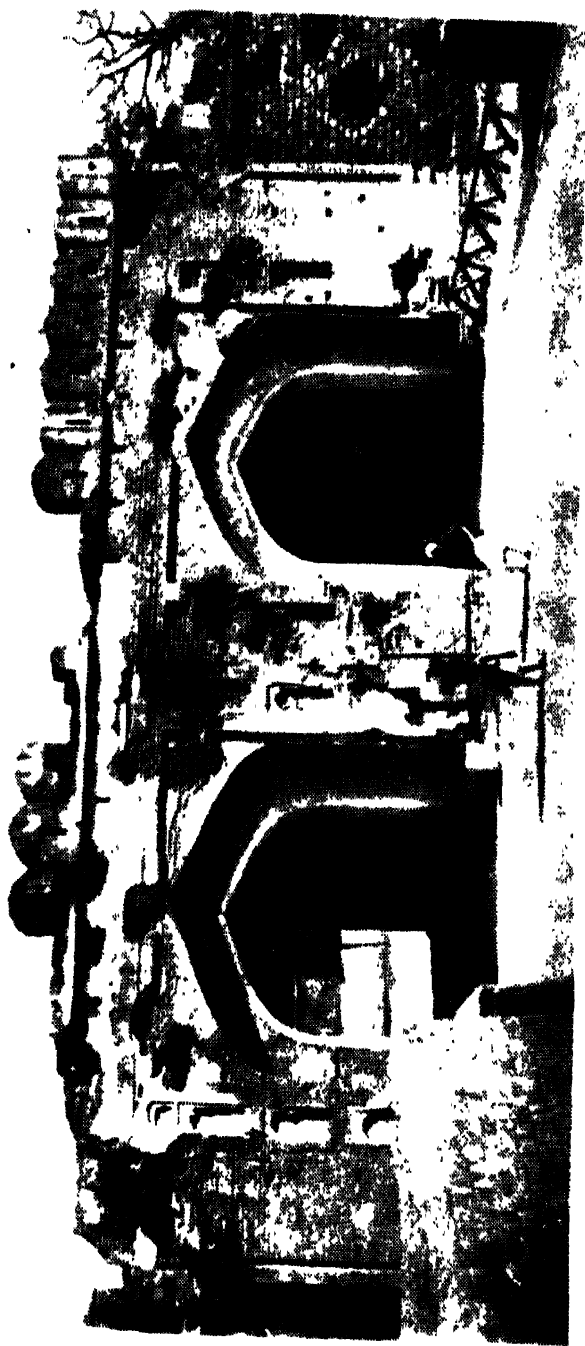
(DELHI) CASHMERE GATE

।। দিল্লীর কাশ্মীর গেট ।

করল এবং সকলেই তাতে প্রাণ বিসর্জন দিল। ইংরেজরা লুডলো ক্যাসল্ ও খুসিয়া বাগ দখল করল। কে' বলে গেছেন, "কিন্তু এই জয় তাদের অত্যধিক মূল্য দিয়ে কিনতে হয়েছিল।" তাদের প্রচুর হতাহতের মধ্যে ছিলেন স্বয়ং ব্রিগেডিয়ার সাওয়ার্স।

লুডলো ক্যাসল্ দখল করার সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজেরা 'বৃচিং' (ছিদ্রকারী) ব্যাটারি নির্মাণের কাজে লেগে গেল। তাদের দ্বিতীয় ব্যাটারি কাশ্মীর বুরুজ থেকে ৫০০ গজ দূরে লুডলো ক্যাসলের ঠিক সামনের প্রাচীরে প্রধান ছিদ্র তৈরি করার উদ্দেশ্যে ৯ই ও ১০ই সমস্ত দিনরাত কাজ করার পর সফল হল এবং ১০ই তারিখ থেকেই এখান থেকে প্রাচীরে গোলাবর্ষণ হতে লাগল। তৃতীয় ব্যাটারি নির্মিত হল কাস্টমস্ হাউসের প্রাঙ্গণে পানী বুরুজ থেকে মাত্র ১৮০ গজ দূরে। এ স্থানটি সম্পর্কে মেডলী তাঁর 'এ ইয়ার্স ক্যাম্পেনিং ইন ইণ্ডিয়া' (পৃঃ ২৫৮) বইতে বলে গেছেন: "কাস্টমস্ হাউস পানী বুরুজ থেকে মাত্র ১৬০ গজ দূরে একটা বড় বাড়ি এবং শত্রুরা তাদের অবহেলার জন্য এই বাড়িটা ভেঙেও ফেলেনি কিম্বা দখলও করেনি। আমরা তখনই বাড়িটা অধিকার করলাম। ··· কিন্তু মাত্র ১৬০ গজ দূরে যেখানে শত্রুরা দেওয়ালের পাশে বন্দুক নিয়ে জমায়েত হচ্ছে ও যেখান থেকে তারা আমাদের অনায়াসে গুলী করতে পারে, সে রকম একটা জায়গায় ব্যাটারি নির্মাণ করা অনেক সাহস ও দক্ষতার প্রয়োজন। ··· 'প্যাণ্ডি'রা অবশ্য জানত না যে, আমরা কি কাজ করছি, তবে তারা দেখতে পেয়েছিল যে, আমরা ওখানে একটা কিছু করছি, এবং সমস্ত রাত ধরে তারা এমনভাবে গোলাগুলী বর্ষণ করতে লাগল যে, কর্মরত লোকদের মধ্যে ৩০ জন হতাহত হল। এই সব লোকরা ছিল নিরস্ত্র নেটিভ পাইওনিয়ার্স, সৈন্য নয়। নেটিভদের নীরব অথচ ভয়হীন এই কাজের মধ্যে যখন তাদের সহকর্মীরা গোলার আঘাতে একের পর এক পড়ে যেতে লাগল, তখন তাদের জন্য কয়েক ফোঁটা অশ্রু বিসর্জন করে ভূপতিত বন্ধুদের ভালভাবে শুইয়ে দিয়ে তারা আবার পূর্বের মতো কাজে হাত লাগাত।" আর চতুর্থ ব্যাটারি তৈরি করা হল ২য় ও ৩য় ব্যাটারির মাঝামাঝি খুসিয়াবাগের পশ্চিমে। এই চতুর্থ ব্যাটারির কাজ হল কাশ্মীর বুরুজের পাশে প্রধান প্রবেশ-পথ তৈরি করার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় ব্যাটারিকে সাহায্য করা।

দ্বিতীয় ব্যাটারিও ১ম ব্যাটারির মতো, দুই অংশে তৈরী হয়েছিল। তার দক্ষিণ অংশে বসানো হয়েছিল ৭টি খুব শক্তিশালী ও সর্ববৃহৎ হাউইটজার ও ২টি ১৮ পাউণ্ডার কামান আর তা বাম পার্শ্বে একটি পরিখা দিয়ে সংযুক্ত; ২০০গজ দূরে দাঁড় করানো হয়েছিল ৯টি ২৪ পাউণ্ডার কামান। ৩য় ব্যাটারিতে ছিল ৬টি ১৮ পাউণ্ডার

এবং ৪র্থটিতে ছিল ১০টি ভারী মর্টার কামান। ১১ই তারিখের মধ্যেই সমস্ত ব্যাটারির সব সুদ্ধ ৪০টি কামান একসঙ্গে ১৪ তারিখ পর্যন্ত, অর্থাৎ ৭২ ঘণ্টা ধরে অনবরত উত্তর প্রাচীরে গোলাবর্ষণ করে যেতে লাগল।

বলা বাহুল্য যে, বিদ্রোহীরা এই দৃশ্য নিষ্ক্রিয় ভাবে দেখে যাচ্ছিল না। ফিল্ড মার্শাল লর্ড রবার্টস্ 'ফর্টি ওয়ান ইয়ার্স ইন ইণ্ডিয়া' (১ম খণ্ড, পৃঃ ২২০-২১) গ্রন্থে লিখেছিলেন: "সঠিক লক্ষ্য নিয়ে শত্রুরাও আমাদের উপর গোলা ফেলছিল।... আক্রমণের দিন, ১৪ তারিখ পর্যন্ত আমরা এক মিনিটের জন্যও আমাদের ব্যাটারি ছেড়ে যাইনি। সমানে গোলা বর্ষণের দ্বারা দিনরাত আচ্ছন্ন করে ফেলা হল। অবশ্য সবই আমাদেরই ইচ্ছামত হচ্ছিল না। যে তিনটা বুরুজে আমরা গোলা ছুঁড়ছিলাম, তার থেকে কামান দাগতে না পেরে বিদ্রোহীরা কতকগুলি কামান খোলা জায়গায় নিয়ে এল ও সেখান থেকে আমাদের ব্যাটারির উপর গোলা-বর্ষণ করতে লাগল। তাদের মার্টেলো টাওয়ার থেকে তারা রকেটও ছুঁড়তে লাগল এবং প্রাচীরের বাইরে পরিখা থেকে ও দেওয়ালের উপর থেকে অনবরত বন্দুক চালাতে লাগল। এমন কোনো অংশ ছিল না যেখানে তাদের কামানের গোলা এসে পড়েনি।... আমাদের ক্ষতি প্রচুর হয়েছে। ৭ই থেকে ১৫ই সেপ্টেম্বরে ৩২৭ জন অফিসার ও সৈন্য হতাহত হয়েছিল।" নর্মানও তাঁর 'ন্যারেটিভে' অনুরূপ বর্ণনা দিয়েছেন (ফরেস্ট: 'স্টেট পেপার্স,' ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৬৯-৭০)। মেডলী —যিনি ব্যাটারি তৈরির কাজে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁর বইতে লিখেছেন: "আরও বিপদের কারণ হল এই যে, শত্রুরা আমাদের দক্ষিণ পার্শ্বের প্রান্তে একটা ব্যাটারি নির্মাণ করেছিল। সেখানে আমাদের টিলার কামানের গোলা গিয়ে পৌঁছত না এবং সেখান থেকে শত্রুরা আমাদের ১নং ও ২নং ব্যাটারির উপর মারাত্মক ভাবে গোলা বর্ষণ করতে লাগল।"

যাই হোক, ইংরেজদের এই সব কার্যকলাপ দেখে বিদ্রোহীরাও একেবারে শেষ মুহূর্তে খুবই তৎপর হয়ে উঠল এবং শত্রুদের 'বৃচিং' (ছিদ্রকারী) ব্যাটারিগুলির অবস্থা খুবই বিপদ্‌জনক করে তুলল। ইঞ্জিনিয়ার টাইলর, যিনি ব্যাটারিগুলির নির্মাণে ব্যস্ত ছিলেন, লিখেছিলেন: "পরের দিন—রবিবার ১৩ই তারিখ— আমাদের ২নং ও ৩নং ব্যাটারি থেকে প্রচণ্ড ভাবে গোলা বর্ষিত হতে লাগল। ইহার উত্তরে শত্রুরাও আমাদের ব্যাটারির উপর আগের থেকে আরও অনেক বেশী করে গোলা ফেলতে লাগল। আমাদের প্রচুর হতাহত হতে লাগল এবং আমাদের গোলন্দাজরা খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়ল। আমরা অনেক অপ্রীতিকর সম্ভাবনার ভয় করতে লাগলাম। শত্রুরা দেওয়ালের পাশে যে কামান দাঁড় করাতে ব্যস্ত

ছিল তা আমরা জানতাম ; সেখান থেকে হয়ত তারা আমাদের উপর গোলা বর্ষণ শুরু করবে। যদি তারা তাই করতে আরম্ভ করে দেয় তা হলে আমাদের ব্যাটারিগুলি রক্ষা করা খুবই মুশকিল হয়ে পড়বে। আমরা তাই আশা করছিলাম যে, সন্ধ্যার মধ্যেই প্রাচীরে ছিদ্র করা সম্ভব হবে এবং পরদিন সকালে আমরা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারব।"[১]

৭ই থেকে ১৪ই সেপ্টেম্বর—এই চূড়ান্ত মীমাংসার সপ্তাহটা ছিল উভয় পক্ষেরই সময়ের বিরুদ্ধে একটা প্রচণ্ড প্রতিযোগিতা। যে মুহূর্তে বিদ্রোহীরা বুঝতে পেরেছিল যে, উত্তরের প্রাচীর দিয়েই ইংরেজ বাহিনীর আক্রমণ হবে, সেই মুহূর্ত থেকে তারাও তাদের শক্তিশালী কামানগুলি দিয়ে প্রাচীরের পাশে ব্যাটারি নির্মাণের চেষ্টা করেছিল। তারা যদি এই কাজের জন্য আরও দু' একটা দিন সময় পেত, তা হলে "তারা অতি সহজেই আমাদের সব থেকে শক্তিশালী ব্যাটারিকেও গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেলতে পারত এবং আমাদের প্রাচীর ছিদ্র করার আশাকেও বিলীন করে দিতে পারত।"[২]

মেডলীও তাঁর 'এ ইয়ার্স ক্যাম্পেনিং ইন ইণ্ডিয়া'তে এ সম্পর্কে লিখেছেন : "বিদ্রোহীরা এত তাড়াতাড়ি প্রায় প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল যে, যদি আমাদের পরবর্তী আক্রমণ আরও ৪৮ ঘণ্টা দেরি করে শুরু হত, তা হলে আমাদের আর একেবারেই আক্রমণ করা হত না, বরং আমাদের ব্যাটারি থেকে বিতাড়িত হতে হত অথবা আমাদের সকলকেই গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যেতে হত।"

কিন্তু বিদ্রোহীরা সময়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হেরে গেল। ৭২ ঘণ্টা ধরে অনবরত কামানের গোলা বর্ষণ করে ১৪ই সেপ্টেম্বর ইংরেজরা দিল্লীর অভেদ্য প্রাচীর বিদীর্ণ করে ফেলল এবং বিদ্রোহীরা এত বীরত্ব ও আত্মত্যাগ সত্ত্বেও সুপরিচালিত সংগঠনের অভাবে শত্রুকে ঠেকিয়ে রাখতে পারল না।

১। এ. সি. টাইলর : "লাইফ অব জেনারেল স্যার আলেক্স টাইলর", পৃঃ ৩০৮।
২। ঐ, পৃঃ ২৫১।

ভাগ্য-পরিবর্তন

আগস্ট মাসে সিপাহী নেতাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব খুবই তীব্র হয়ে উঠল। ৪ঠা তারিখের দরবারে বাহাদুর শাহ তাঁদের খুব ভর্ৎসনা করলেন। দরবারে উপস্থিত ১৫০ জন অফিসার সবাই খুব বিচলিত হলেন। বাদশাহকে তাঁরা আশ্বাস দিলেন এবং তাঁদের আশীর্বাদ করতে অনুরোধ করলেন। তারপর একে একে তাঁরা বাদশাহের সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন এবং বাদশাহও তাঁদের প্রত্যেকের মাথায় হাত রেখে বললেন: "শীঘ্র যাও, টিলা জয় কর।"[১] পরের দিন সিপাহীদের এক সাধারণ প্যারেডে তাদের ৩ ভাগে ভাগ করে ৩ জন জেনারেল—মির্জা মোগল, ঘাউস মোহাম্মদ ও বখ্‌ত খানের অধীনে দেওয়া হয়।

কিন্তু এতেও দিল্লীর আভ্যন্তরীণ অবস্থার বিশেষ উন্নতি হল না। বখ্‌ত খান ও বেরিলি বাহিনীর সঙ্গে সিরধারা সিং ও নিমখ বাহিনীর বিবাদ দিনের পর দিন তীব্রতর হয়ে উঠল।[২] শাহজাদারা এই কলহে ইন্ধন যোগাতে লাগলেন এবং মির্জা মোগলের সঙ্গে নিমখ ও নাসিরাবাদ বাহিনীর ঘনিষ্ঠতা খুব বেড়ে উঠল। বিদ্রোহীদের অর্থনৈতিক সংকট এই বিবাদকে আরও ঘনীভূত করে তুলল। প্রত্যেকে পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ শুরু করে দিল। পুনরায় মিথ্যা গুজব রটতে লাগল যে, বখ্‌ত খান একজন ইংরেজের গুপ্তচর। এই গুজব রটানোর ব্যাপারে ইংরেজদের দিক থেকেও চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। ২০শে আগস্ট একজন শিখ বন্দীকে দরবারে ধরে আনা হল। "সে বলল যে, জেনারেল বখ্‌ত খান ইংরেজের সঙ্গে গোপনে চিঠি লেখালেখি করছেন। ··· বাদশাহ বললেন যে, লোকটা (শিখ বন্দীকে লক্ষ্য করে—লেখক) একটা গুপ্তচর, বিদ্রোহী বাহিনীর মধ্যে ঝগড়া বাধাবার উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে।"[৩]

১। মেটকাফ সম্পাদিত: "টু নেটিভ ন্যারেটিভস্‌", পৃঃ ১৮১।

২। "পাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্ডস", ৮ম খণ্ড, ১ম, পৃঃ ৩০৩।

৩। মেটকাফ সম্পাদিত: "টু নেটিভ ন্যারেটিভস্‌", পৃঃ ২০১।

ইংরেজের একজন গুপ্তচর এই সময়কার অবস্থা বর্ণনা করে লিখেছিল: "সমগ্র সিপাহী বাহিনী খুব নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছে। রাজস্ব আদায় করবার জন্য জেনারেল বখ্ত খান কয়েকজন লোক পাঠিয়েছিলেন। অন্যান্য জেনারেলরা এতে হিংসা-পরায়ণ হয়ে বাদশাহের নিকট আবেদন করলেন যে, সমস্ত সিপাহী নেতার মত ছাড়া কাউকে রাজস্ব আদায়ের ভার দেওয়ার প্রথা বন্ধ করতে হবে। এর ফলে খুব ঝগড়া হচ্ছে। দৈনন্দিন ঝগড়াঝাঁটি ও রেষারেষির অন্ত নেই। ২০ দিন হয়ে গেল সিপাহীরা কোনো বেতন পায়নি। সিপাহীরা খুব গণ্ডগোল শুরু করেছে ও তাদের অনেকেই দল ত্যাগ করবে বলছে। ৬ই তারিখে কুমন্দ খান ১,০০০ লোক নিয়ে দিল্লীতে এসেছেন।"[১]

এই অন্তর্বিরোধের অবস্থায় ইংরেজের দালালরা ও গুপ্তচররা তাদের অন্তর্ঘাতী কাজের এক মহা সুযোগ পেয়ে গেল। ৪ঠা আগস্ট একটা বড় অগ্নিকাণ্ডে অনেক বাড়িঘর পুড়ে গেল ও অনেকের জীবন নষ্ট হল এবং শহরে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হল। তারপরই, ৭ই তারিখে বারুদের কারখানায় বিস্ফোরণের ফলে ৪০০ কর্মীর মৃত্যু হল।[২] কিন্তু জীবনলালের মতে মৃতের সংখ্যা ছিল ৪৯৪ এবং প্রাণ রক্ষা হয়েছিল মাত্র ১৩ জনের। হড্‌সনের নিকট থেকে রজ্জব আলির মারফত এক চিঠি পাবার পর হাকিম আশানুল্লা খানই যে বেগম সমরুর বাড়িতে বারুদের কারখানা উড়িয়ে দিয়েছিল, সে কথা কুপার তাঁর বইতে উল্লেখ করার পর লিখেছেন: "এই নিপুণ কাজটির ফলে শত্রুদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ খুব বেড়ে গিয়েছে। ··· তাদের শক্তি, সঙ্ঘবদ্ধতা ও ঐক্যবোধ একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। বিভিন্ন সভাপতির নেতৃত্বে ভিন্ন ভিন্ন কাউন্সিলের অনবরত সভা হচ্ছে।"[৩]

বারুদখানার বিস্ফোরণ যে বিদ্রোহীদের পক্ষে একটা গুরুতর আঘাত স্বরূপ তাতে সন্দেহ নেই। কিছুকাল পূর্ব থেকেই বিদ্রোহীদের গোলাবারুদের যথেষ্ট ঘাটতি পড়ছিল। বারুদ তৈরি করবার জন্য দিল্লীতে সোরার অভাব ছিল না, কিন্তু গন্ধক অতি দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছিল। এই অবস্থায় উৎকৃষ্ট বারুদ তৈরী হওয়া অসম্ভব ছিল, আর নিকৃষ্ট ধরনের বারুদ যা'ও বা তৈরী হচ্ছিল তা প্রতিদিনকার প্রয়োজন মেটাতে পারত না। এই সময় রজ্জব আলি তার মনিবদের জানিয়েছিল, "শীঘ্রই যেটুকু গন্ধক আছে তাও ফুরিয়ে যাবে; তারপর যে খারাপ বারুদ

১। "পাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্ডস" ৮ম, ১ম, পৃঃ ৩১৫।

২। ঐ, ৮ম, ১ম, পৃঃ ৩১৫।

৩। "ক্রাইমস ইন দি পাঞ্জাব", পৃঃ ২০৬-৭।

তৈরী হচ্ছে তাও আর হবে না।"[১] ইনটেলিজেন্স বিভাগের কর্মকর্তা মুইর ২১শে আগস্ট তারিখে জেনারেল হ্যাভলককে লিখেছিলেন: "বিদ্রোহীদের কিষেনগঞ্জে মর্টার কামান আছে, কিন্তু তাদের মর্টার কামানের গোলাগুলি হাউইটজার কামানের গোলার মতো অত ভাল নয়। লক্ষ্য তাদের ঠিকই হয়, কিন্তু তাদের গোলাগুলি ফাটে না। আমার মনে হয় এর কারণ হচ্ছে—তারা যে বারুদ তৈরি করছে, তা নিকৃষ্ট ধরনের।"[২]

কিন্তু বিদ্রোহীদের যত দুর্বলতাই থাকুক, তাদের কর্মতৎপরতার অভাব ছিল না। বেগম সমরুর বাড়ি ধ্বংস হয়ে যাবার পর, তারা দরিয়াগঞ্জে হাসান আলি খানের বাড়িতে পুনরায় বারুদের কারখানা স্থাপন করল। শহরে যা কিছু গন্ধক ছিল সব সংগ্রহ করার চেষ্টা হল এবং অন্যান্য স্থান থেকেও সংগ্রহ করার জন্য লোক পাঠানো হল। একজন গুপ্তচর লিখল: "সমস্ত দোকান থেকেই গন্ধক সংগ্রহ করা হচ্ছে। মহম্মদ জাকারীয়ার কাছ থেকে খবর পেয়ে দেবীদাসের দোকান থেকে ৩৫ মণ গন্ধক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।"[৩]

এইভাবে বিদ্রোহীদের চেষ্টার ফলে বারুদ-সমস্যার অনেকখানি সমাধান হল। গৌরীশঙ্করের ২৯শে আগস্টের চিঠিতে জানা যায় যে, "বারুদখানার কাজ ঠিক-ভাবেই চলছে। সেখানে ৫০ মণ বারুদ প্রতিদিন তৈরী হচ্ছে এবং এই পরিমাণই বিদ্রোহীদের প্রতিদিনকার প্রয়োজন।"[৪]

বিদ্রোহীরা যখন আত্মকলহে নিমজ্জিত, ইংরেজরা তখন যথাসাধ্য চেষ্টা করে তাদের শেষ সম্বল সংগ্রহ করে দিল্লী দুর্গ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হল। ৭ই আগস্ট তারিখে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নিকলসন নূতন-গঠিত 'মুভেব্‌ল্ কলামের' অগ্রগামী অংশকে সঙ্গে নিয়ে দিল্লী শিবিরে এসে পৌছলেন। তার ৭ দিন পর ১৪ই আগস্ট 'মুভেব্‌ল্ কলামের' সমগ্র অংশটাই এসে গেল। এই নতুন বাহিনী বাছাই করা লোকদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল। এর মধ্যে ছিল ইংরেজ, পাঠান, শিখ ও বালুচী। আর ছিল রণজিৎ সিংহের খালসা বাহিনীর কয়েকজন পুরাতন শিখ-সৈন্য, যারা মাত্র ৮ বৎসর পূর্বে সোব্রাওন ও চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধে ইংরেজ শিবিরে নির্মম ভাবে গোলাবর্ষণ করে শত্রুর মনে এক ভয়ানক আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু সে পূর্বতন শত্রুকে আজ তারা ভুলে গেল। ভুলে গেল তাদের জাতীয়

১। "পাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্ডস্‌", ৮ম খণ্ড, ১ম, পৃঃ ৩১৭।

২। "রেকর্ডস্‌ অব দি ইনটেলিজেন্স ডিপার্টমেন্ট", ২য়, পৃঃ ১৩৫।

৩। "পাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্ডস্‌", ৮ম খণ্ড, ১ম, পৃঃ ৩৫২।

৪। ঐ, ৭ম, ২য়, পৃঃ ২।

আত্মসম্মান ও গর্বের কথা। দিল্লীর ঐশ্বর্যের অবাধ লুণ্ঠন ও ইংরেজের আরও অনেক রকমের প্রতিশ্রুতিতে প্রলুব্ধ হয়ে তারা দিল্লীর দুর্গ চুরমার করে দেবার জন্য রাজধানীর বহিরঙ্গনে এসে উপস্থিত হল।

কিন্তু নতুন বাহিনী এসে গেলেও, তখনও তাদের ৩০টি কামানের 'সীজ-ট্রেন' অনেক পিছনে পড়ে ছিল। "এই সীজ-ট্রেন ১০ই আগস্ট ফিরোজপুর থেকে যাত্রা করে রোটক-দিল্লীর কঠিন রাস্তা দিয়ে আসছিল। এই সীজ-ট্রেনটা ছিল ৮ মাইল ব্যাপী দীর্ঘ একটা লাইন; প্রথমে ছিল হাউইটজার, মর্টার প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের কামান, যা অনেকগুলি হাতীতে টেনে আনছিল; তার পরেই ছিল সর্ব-প্রকারের গোলাগুলী ও সাজসরঞ্জামে ভর্তি প্রচুর গরুর গাড়ি।"[১] এই সীজ-ট্রেন না পৌছানো পর্যন্ত ইংরেজ বাহিনীর পক্ষে দিল্লী আক্রমণ করা সম্ভব ছিল না। তাই ইংরেজের এই সীজ-ট্রেন আক্রমণ করে দিল্লীকে রক্ষা করবার এইটাই ছিল বিদ্রোহীর পক্ষে শেষ সুযোগ।

ফিরোজপুর থেকে সীজ-ট্রেনের যাত্রার খবর পেয়ে ১২ই আগস্ট সকালে "সিপাহী-অফিসারদের একটি সাধারণ সভা বসেছিল। এক ঘটি জলের মধ্যে প্রত্যেকে একটু করে নুন দিয়ে দিল অর্থাৎ তারা জানিয়ে দিল যে, যদি তারা তাদের শপথ ভঙ্গ করে তা হলে লবণ যেমন করে জলে গলে গেল ঠিক সেই ভাবে তারাও যেন শূন্যে বিলীন হয়ে যায়।··· যুদ্ধ থেকে জীবিত অবস্থায় কেউ আর ফিরে আসবে না—তাকে হয় যুদ্ধে মরতে হবে, না হয় তাকে জয়ী হতে হবে।"[২]

তখনও বিদ্রোহীদের অনুকূলে অনেকগুলি দিক ছিল। তাদের মধ্যে একটি হল এই যে, বৃটিশ শিবিরে যেসব শিখ সৈন্য ছিল তাদের অনেকেই তাদের অবস্থার জন্য খুব সুখী ছিল না এবং তারা কিছুটা দোদুল্যমান অবস্থায় ছিল। একজন বিশ্বাসঘাতক দিল্লী থেকে তার প্রভুদের জানাল: "ইংরেজ শিবিরের শিখ-অফিসারদের কাছ থেকে দিল্লীতে শিখ-বিদ্রোহীদের কাছে একটা চিঠি এসেছে; তাতে তাঁরা লিখেছেন যে, তাঁদের মন দিল্লীর বাদশাহের দিকেই আছে। যদি শিখরা পৃথক ভাবে আক্রমণ করে, তা হলে ইংরেজ শিবিরের শিখরা তাদের দিকে চলে আসবে। ঐ শিবির থেকে প্রায় ১২৫ জন ও অন্যান্য স্থান থেকে ১০০ জন অশ্বারোহী বিদ্রোহীদের পক্ষে যোগ দিয়েছে।"[৩]

১। কর্নেল বুর্শিয়ার: "এইট মান্থ্‌স ক্যাম্পেইনিং ডিউরিং দি মিউটিনি", পৃঃ ৪৬-৪৭।

২। "পাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্ডস্‌", ৭ম খণ্ড, ১ম, পৃঃ ৩৯৪।

৩। ঐ, ৮ম খণ্ড, ১ম, পৃঃ ৩৮৩।

ঠিক এই সময়েই দিল্লীর চারপাশে বিদ্রোহীদের কার্যকলাপ অনেক বেড়ে গিয়েছিল। ১৯শে আগস্ট প্রায় ২,০০০ রংঘুর হিসার শহর আক্রমণ করে।[১] এই বিদ্রোহী রংঘুরদের দমন করবার জন্য ইংরেজ শিবির থেকে হড্‌সনকে পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু তিনি রোটক ছাড়িয়ে আর যেতে পারলেন না। সেখানে রংঘুরদের নেতা বাবর শাহর সঙ্গে তাঁকে যুদ্ধ করতে হয়েছিল। তিনি রোটক দখল করতে পারলেন না। ২২শে তারিখে তাঁকে শিবিরে ফিরে যেতে হল।

ইংরেজরা তাদের গুপ্তচরদের মারফত যেসব তথ্য সংগ্রহ করেছিল তাতে দেখা যায় যে, ১৪ই আগস্ট দিল্লীতে বিদ্রোহী সিপাহীদের শক্তি ছিল: ৪,৪২০ পদাতিক, ৩৫৯০ অশ্বারোহী ও ৩০টি কামান।[২] এই তথ্যগুলি ভাল ভাবে পরীক্ষা করে পাঞ্জাবের দেশীয় রাজ্যগুলির কমিশনার জি. সি. বারনেস্ রিপোর্ট করেছিলেন: "মোটামুটি দিল্লীতে বিদ্রোহী সিপাহীদের সংখ্যা ৪,০০০ অশ্বারোহী ও ১২,০০০ পদাতিক ধরা যেতে পারে। আর বাদবাকি, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবক দলের বিশৃঙ্খল ১,০০০ অশ্বারোহী ও ৩,০০০ পদাতিক—যারা একেবারেই ধর্তব্যের মধ্যে নয়। বিদ্রোহীদের সংখ্যার এতই উঠা-নামা হচ্ছে যে, তাদের শক্তির সঠিক হিসেব দেওয়া অসম্ভব, কিন্তু উপরোক্ত সংখ্যাটাই প্রায় ঠিক, যদিও বেশী করে ধরা হয়েছে।"[৩] কিন্তু নর্মানের মতে: "বিদ্রোহীদের সংখ্যা ছিল খুব কম করে ৩০,০০০; আর তাদের কামান ছিল অসংখ্য এবং গোলা বারুদ অফুরন্ত।"[৪] নর্মান যে অত্যধিক বাড়িয়ে বলেছেন তাতে সন্দেহ নেই। আগস্ট মাসের মাঝামাঝি দিল্লীতে বিদ্রোহী যোদ্ধাদের সংখ্যা ১৫ হাজার থেকে ২০ হাজারের বেশী ছিল না।

অন্য ধারে নতুন সেনাবাহিনী ইংরেজ শিবিরে পৌঁছবার পর ১৫ই আগস্ট তারিখে ইংরেজদের শক্তি হয়ে দাঁড়াল নিম্নরূপ:[৫]

	বৃটিশ	ভারতীয়
গোলন্দাজ	৫৪৮	৪৭৭ (শিখ)
স্যাপার্স এণ্ড মাইনার্স		৬৭৩ (শিখ)
অশ্বারোহী	৪৮৫	৭৬৯
পদাতিক	২,৭০৩	২,৪৬৭
	৩,৭৩৬	৪,৩৮৬=৮,১২২
১৫ই আগস্টে শিবিরে রোগীদের সংখ্যা:		১,৫৩৫
		মোট সংখ্যা—৯,৬৫৭

১। "পাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্ডস্", ৮ম খণ্ড, ১ম, পৃঃ ৪২৯। ২। ঐ, ৮ম খণ্ড, ১ম, পৃঃ ৪২৯-৪২।
৩। ঐ, ৮ম খণ্ড, ১ম, পৃঃ ৪৩২। ৪। ফরেষ্ট: "ষ্টেট পেপার্স," ১ম, পৃঃ ৪৪৯।
৫। ঐ, ১ম, পৃঃ ৪৬৩।

উপরের সংখ্যাগুলি থেকে দুটো বিষয় খুব স্পষ্টভাবে দেখা যায়। প্রথমতঃ, সিপাহীদের সংখ্যা ইংরেজদের থেকে খুব মারাত্মক রকমের বেশী ছিল না। বেশীর ভাগ ইংরেজ লেখকই দিল্লীতে সিপাহীদের সংখ্যা ৪।৫ গুণ বেশী করে দেখিয়েছে; তা অবশ্যই অতিরঞ্জিত। বস্তুতঃ সিপাহীদের সংখ্যা ইংরেজদের তুলনায় দ্বিগুণও ছিল না। সরকারী তথ্য থেকে দেখা যায় যে, সিপাহীরা সংখ্যায় সামান্যই বেশী ছিল। দ্বিতীয়তঃ, ইংরেজ শিবিরের সৈন্যদের মধ্যে অর্ধেকের বেশী ছিল ভারতীয় ভাড়াটিয়া সিপাহী—ঔপনিবেশিক শাসনের একটি বিষময় অনিবার্য সৃষ্টি! এশিয়াবাসীদেরই এশিয়াবাসীদের বিরুদ্ধে লড়তে হবে—এ নীতি শুধুমাত্র বর্তমান সাম্রাজ্যবাদীদেরই নীতি নয়—এ নীতি কার্যে পরিণত করবার কৌশল অনেকদিন পূর্বেই ইংরেজদের ভালভাবেই জানা ছিল।

২৫শে আগস্ট প্রায় ৫,০০০ বিদ্রোহী ১৫টি কামান নিয়ে লাহোর গেট দিয়ে বেরিয়ে এসে নজফ্‌গড় দখল করল। তাদের পক্ষে যে এটা একটা কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্য তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মৌসুমী বৃষ্টির জন্য এই সমস্ত এলাকাটা তখন জল আর কাদায় ভর্তি হয়ে ছিল; রাস্তা দিয়েও চলাচল করবার উপায় ছিল না। কিন্তু এতসব বাধা সত্ত্বেও বিদ্রোহীরা নিজেরা তো জল-কাদা পার হলই, এমন কি তারা ১৫টি কামান ও গোলাবারুদ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে সমর্থ হল। তাবপর নজফ্‌গড়ে এসে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের দু' ধারে দুটি স্থান অধিকার করে বসল। এই রাস্তাই ইংরেজদের সীজ-ট্রেনের যাবার রাস্তা।

কিন্তু এ সম্বন্ধে লক্ষ্য করার বিষয় হল এই যে, বেরিলি বাহিনী ও নিমখ বাহিনী একত্রিতভাবে এই অভিযানে অংশ গ্রহণ করেনি। পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ না রেখেই তারা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে যাত্রা করেছিল এবং নজফ্‌গড়েও ভিন্ন ভিন্ন স্থান দখল করেছিল। জীবনলালের মতে, জেনারেল বখ্‌ত খান নজফ্‌গড়ে পৌছবার পর নিমখ বাহিনীর সেনানায়কদের ওখানে থামতে বলেছিলেন ও শত্রুকে এক সঙ্গে আক্রমণ করবার জন্য প্রস্তাবও করেছিলেন। নিমখ বাহিনীর নেতারা তাতে কর্ণপাত না করে এগিয়ে গেলেন ও পৃথকভাবে একটা অগ্রবর্তী স্থান দখল করলেন। এই সময় ইংরেজরা হঠাৎ কতকগুলি শক্তিশালী কামান নিয়ে নিমখ বাহিনীকে দু' ধার থেকে আক্রমণ করল। বিদ্রোহীদের ক্ষতি হয়েছিল খুবই—১,০০০ জন হতাহত ও ১২টি কামান খোয়া গিয়েছিল।[১]

এই ঘটনাই যদি সত্য হয়, তা হলে বখ্‌ত খানের কার্যক্রম একেবারেই সমর্থনযোগ্য নয়। নিমখ বাহিনী যখন ইংরেজদের সঙ্গে এককভাবে যুদ্ধে ব্যস্ত,

---

১। মেটকাফ সম্পাদিত: "টু নেটিভ ন্যারেটিভস্‌", পৃঃ ২০৮।

তখন যদি বখ্‌ত খান সদলবলে শত্রুকে আক্রমণ করতেন, তা হলে বিদ্রোহীদের এইরূপ শোচনীয় পরাজয় হত না, বরং তাদের জিতবারই সম্ভাবনা ছিল।

এ দিকে বৃটিশ শিবির থেকে জেনারেল নিকলসন ২,৫০০ সৈন্য ও ১৬টি কামান নিয়ে বিদ্রোহীদের বাধা দেবার জন্য বেরিয়ে এলেন। তিনি দেখতে পেলেন যে, জেনারেল শিরধারা সিং আর কর্নেল হীরা সিং-এর অধীনে নিমথ বাহিনী একটা অগ্রবর্তী ঘাঁটি অধিকার করে আছে। তিনি তাদের প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ করলেন। নিমথ বাহিনীও হটবার পাত্র নয়। তারা মরিয়া হয়ে ইংরেজদের প্রতি-আক্রমণ করল। সন্ধ্যা পর্যন্ত সমস্ত দিন ধরে ভয়ানকভাবে যুদ্ধ চলল। এই সমস্ত সময়টা ধরে নিমথ বাহিনী যখন এককভাবে বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে যাচ্ছিল, তখন বখ্‌ত খান ও বেরিলি বাহিনী চুপ করে এই লড়াই দেখছিল—যেন এটা একটা মস্ত বড় তামাশা! দিন শেষ হবার পূর্বেই বখ্‌ত খান, ৪ঠা জুলাই আলিপুরে যা করেছিলেন, এবারও সেই রকম একটি গুলীও না ছুঁড়ে তাঁর বাহিনী নিয়ে দিল্লী ফিরে গেলেন! বলা বাহুল্য, নিমথ বাহিনীও পরাজিত হয়ে সন্ধ্যার পর শহরে আশ্রয় নিল।

প্রতিদ্বন্দ্বী সেনানায়কদের মধ্যে এই রকম বিশ্বাসঘাতকতার উদাহরণ পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল নয়। যেমন, ইউরোপে সাত-বৎসরের (১৭৫৬-১৭৬৩) যুদ্ধের সময় সামন্ততান্ত্রিক ফরাসী দেশ যখন দ্রুত অধোগতির দিকে যাচ্ছিল, তখন ফরাসী জেনারেলদের আত্মঘাতী ব্যবহার তাদের দেশের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর হয়েছিল। সেই সময় ভিলিং হাউসেনের যুদ্ধে ফরাসী জেনারেল ব্রগ্‌লি শত্রুকে আক্রমণ করলেন। কিন্তু আর একজন ফরাসী জেনারেল সুবিস, যাঁর কথা ছিল ব্রগ্‌লিকে সাহায্য করা এবং যিনি নিকটেই ছিলেন, তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীকে সাহায্য করার জন্য এক পা-ও অগ্রসর হলেন না। এর ফলে ব্রগ্‌লির পরাজয় হল।—(প্লেখানভ: 'রোল অব দি ইন্‌ডিভিজুয়াল ইন হিস্ট্রি', পৃঃ ২৯)।

যাই হোক এ পর্যন্ত যা লড়াই হয়েছে তার মধ্যে নজফ্‌গড়ের পরাজয় বিদ্রোহীদের একটা সব থেকে বড় পরাজয়। কিন্তু এ পরাজয় যেমন নিরর্থক, তেমনই সিপাহী নায়কদের নির্বুদ্ধিতা ও সংকীর্ণ মনোভাবেরই পরিচায়ক। নিমথ বাহিনীর সিপাহীরা যারপরনাই বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল এবং তারা যদি তাদের বেরিলি বাহিনীর কমরেডদের কাছ থেকে কিছু সাহায্য পেত তা হলে তাদের জিতবার খুবই সম্ভাবনা ছিল। কে' লিখেছেন: "সিপাহীরা দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে প্রতিরোধে মেতে উঠেছিল। আমাদের লোকেরা যেরূপ বীরত্ব দেখিয়েছে, তারাও তার চাইতে কিছু কম যায়নি। সিপাহীরা ভালভাবেই যুদ্ধ করছিল ও

বীরের মতই মরছিল। শেষ পর্যন্ত এটা একটা রক্তাক্ত হাতাহাতি যুদ্ধে পরিণত হল। ··· কিন্তু আমাদের অবস্থাটা খুব আশাপ্রদ ছিল না। আমাদের তাঁবু, খাদ্য ও অন্যান্য সাজসরঞ্জাম কিছুই তখনও এসে পৌছায়নি। আমাদের সৈন্যরা ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত ও সিক্ত অবস্থায় বিনা আহারে জলা জমির উপর সব রকমের কষ্ট স্বীকার করে রাত্রি যাপন করতে বাধ্য হল। ··· আমাদের অবসাদগ্রস্ত সৈন্যদের সেই রাত্রিতে অথবা পরের দিন সকালে কোনো শত্রুর সম্মুখীন হতে হয়নি।"[১]

ইংরেজ ঐতিহাসিকের এই বিবৃতি থেকেই বোঝা যায় যে, বখ্‌ত খান যদি ইংরেজদের ঐ রাত্রে কিম্বা তার পরদিনও আক্রমণ করতেন, তা হলে শুধু নজফ্‌গড়ের যুদ্ধের ফলাফলই নয়, সমস্ত ভারতের পরবর্তী ইতিহাসই অন্যরকম হতে পারত।

এখানে আরও উল্লেখযোগ্য যে, নজফ্‌গড়ে বৃটিশ বাহিনীতে যারা যুদ্ধ করেছিল তারা বেশীর ভাগই ছিল পাঠান, শিখ ও বালুচী। বলা বাহুল্য, হতাহতের সংখ্যাও তাদের মধ্যেই বেশী হয়েছিল। এই যুদ্ধে একজন সুদক্ষ বৃটিশ অফিসার, লুম্‌স্‌ডেনও নিহত হন। নিমখ ব্রিগেডের ৩টি বাহিনীর সর্বসমেত ৫০০ কি ৬০০ সিপাহী জীবিত অবস্থায় ফিরতে পেরেছিল, আর বাদবাকি প্রায় ১৫০০ লোক প্রাণ দিয়েছিল। এই হতাহতের সংখ্যা থেকেই প্রমাণ হয়, বিদ্রোহীরা কি সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করে নিজেদের জীবন বিসর্জন দিয়েছিল। এই যুদ্ধে আর একটি দ্রষ্টব্য বিষয় এই যে, এই অঞ্চলের নঙ্গলী গ্রামের গ্রামবাসীরা সিপাহীদের পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করেছিল ও তাদের সব রকমে সাহায্য করেছিল।[২]

নজফ্‌গড়ের পরাজয় যে দিল্লীর নাগরিকদের খুবই অভিভূত করে ফেলেছিল তাতে সন্দেহ নেই। একজন গুপ্তচরের চিঠিতে জানা যায় যে, নিমখ বাহিনীর এরূপ শোচনীয় পরাজয়ের জন্য শহরবাসীরা অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়ে এবং সিপাহীরাও খুব ভগ্নোৎসাহ হয়ে পড়ছে। কিন্তু বখ্‌ত খানের বাহিনী এখনও আশান্বিত এবং তারা খুব গর্ব করে বেড়াচ্ছে।[৩]

বাহাদুর শাহও যে খুব মর্মাহত হয়েছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এক দূতের মারফত তিনি বখ্‌ত খানকে জানিয়েছিলেন যে, এইভাবে যুদ্ধক্ষেত্র

১। কে' : "হিষ্ট্রি অফ সিপয় ওয়ার ইন ইণ্ডিয়া", ২য়, পৃঃ ৩৫৪-৫৬।

২। "পাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্ডস্‌", ৮ম খণ্ড, ১ম, পৃঃ ৪৪১।

৩। ঐ

থেকে পালিয়ে এসে তিনি নিমকহারামির কাজ করেছেন। বাদশাহ তাঁকে প্রাসাদে প্রবেশ করতে নিষেধ করলেন[১]।

২৮শে আগস্ট তারিখে দিল্লী থেকে গুপ্তচর গৌরীশঙ্কর নিম্নলিখিত চিঠিখানা লিখেছিল: "নিমখ বাহিনীর লোকেরা তাদের কামানগুলির জন্য অশ্রুপাত করছে। তারা বলছে—এই কামানগুলির মতো কামান আর কোথাও নেই। এর গোলায় আগুন লাগাবার সঙ্গে সঙ্গেই শত্রুরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। রৌদ্রতেই হোক আর বৃষ্টিতেই হোক, সেগুলি সব সময়েই ভাল কাজ দিত। ১,০০০ অতি উৎকৃষ্ট গোলাও ছিল; এখন আর তার একটাও নেই। ··· বাদশাহ বখ্‌ত খানের উপর খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছেন এবং নিমখ বাহিনীকে সময় মতো সাহায্য না দিয়ে বখ্‌ত খান তাকে ধ্বংস করেছে, এই বলে অভিযোগ করেছেন। বখ্‌ত খানকে আর মুখ দেখাতে হবে না, সকলেই তাকে গালাগালি দিচ্ছে। বখ্‌ত খান দ্বিতীয়বার নজফ্‌গড়ে যাবার চিন্তা করছেন। নজফ্‌গড়ের জমিদাররা তাঁকে সমস্ত রকমের সাহায্য দিতে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে এবং পানিপথ ও শোনপথেরও অনেক জমিদার তাঁকে সাহায্য করতে প্রস্তুত। বাহাদুরগড়ের নেতা বাহাদুর আলি শাহ সমস্ত অঞ্চলটাকে ক্ষেপিয়ে তুলছেন ও বখ্‌ত খানকে খবর পাঠিয়েছেন যে, সমগ্র অঞ্চলটাই তাঁর পক্ষে আছে। কয়েকজন শিখকে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন পাঞ্জাবে গিয়ে মাঞ্জা অঞ্চলের শিখদের বিদ্রোহে প্রণোদিত করে। অস্থায়ী অশ্বারোহী বাহিনীর অনেকেই যারা হরিয়ানা জিলা থেকে এসেছে, তারা ঐ অঞ্চলটাকে বিদ্রোহীদের দিকে টেনে আনবার জন্য দিল্লী থেকে রওয়ানা হয়েছে। রোটক জেলায় সানসী গ্রামে একটা বড় রংঘুর বিদ্রোহীদের দল জমায়েত হয়েছে ··· হরিয়ানা জেলার তোসান নামক গ্রামে আর একদল বিদ্রোহী জমায়েত হয়েছে ··· গ্রামের লোকদের এই সব বিদ্রোহগুলি সিপাহীদের বিদ্রোহের চাইতেও অনেক বেশী ভয়ের কারণ।"[২]

দেখা যাচ্ছে, নজফ্‌গড়ের পরাজয় সত্ত্বেও বিদ্রোহী গ্রামবাসীরা একেবারেই নিরুৎসাহ হয়ে পড়েনি। তখনও সবল নেতৃত্ব দিয়ে যুদ্ধের ভাগ্য-পরিবর্তন করে দেওয়া বখ্‌ত খানের পক্ষে অসম্ভব হত না।

১। মেটকাফ সম্পাদিত: "টু নেটিভ ন্যারেটিভস্", পৃঃ ২০৯।
২। "পাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্ডস্" ৮ম খণ্ড, ১ম, পৃঃ ৪৪৩-৪৪।

দিল্লীর পতন

১৪ই সেপ্টেম্বর সূর্যোদয়ের পূর্ব থেকেই ইংরেজরা তাদের ব্যাটারিগুলি থেকে উত্তর প্রাচীরে ও বুরুজে অবিরাম গোলাবর্ষণ শুরু করল, যাতে করে বিদ্রোহীরা ছিদ্রের নিকট প্রতিরোধ করবার জন্য জমায়েত হতে না পারে। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কামানের গর্জন এক নিমেষে থেমে গেল এবং ব্রিগেডিয়ার নিকলসনের হুকুমে ৬,৫০০ সৈন্য এক সঙ্গে শহরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এদের মধ্যে মাত্র ২,০০০ ছিল ইংরেজ, আর বাদবাকি দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশী ছিল ভাড়াটিয়া ভারতীয়। আক্রমণকারীরা ৫টি কলামে বিভক্ত হয়ে এক সঙ্গে ৫ দিক থেকে আক্রমণ করেছিল ঃ[১]

প্রথম কলাম—১,০০০ জন নিকলসনের নেতৃত্বে কাশ্মীর বুরুজে ;

দ্বিতীয় কলাম—৮৫০ জন ব্রিগেডিয়ার জোন্‌সের নেতৃত্বে পানী বুরুজে ;

তৃতীয় কলাম—৯৫০ জন কর্নেল ক্যাম্পবেলের নেতৃত্বে কাশ্মীর গেটে ;

চতুর্থ কলাম—৮৬০ জন মেজর রীডের নেতৃত্বে কিষেনগঞ্জের মধ্য দিয়ে লাহোর অথবা কাবুল গেটে। কাশ্মীর-মহারাজার ১,২০০ ডোগরাও এই আক্রমণে যোগ দিয়েছিল।

পঞ্চম কলাম—১,৫০০ জন ব্রিগেডিয়ার লংফিল্ডের নেতৃত্বে প্রয়োজন মতো যে কোনো স্থানে।

৭২ ঘণ্টা ধরে অবিরাম গোলাবর্ষণের পরও শহরের বিদ্রোহীরা নিরুৎসাহ হয়ে পড়েনি। তারা আরও মরিয়া হয়ে প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত হল। যে মুহূর্তে আক্রমণের হুকুম দেওয়া হল, সেই মুহূর্ত থেকে ইংরেজদের প্রতিটি ইঞ্চি জমির জন্য লড়তে হয়েছিল। বিদ্রোহীরা ইংরেজদের দেখে পৃষ্ঠ প্রদর্শন তো করলই না—যা

১। ফরেষ্ট ঃ "ষ্টেট পেপার্স," ১ম, পৃঃ ৪৭১-৭২।

তারা করবে বলে অনেক ইংরেজ-নায়ক ভবিষ্যৎ-বাণী করেছিলেন—বরং তাদের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে তারা শত্রুকে ধ্বংস করবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে দাঁড়াল। ফরেস্ট এ সম্বন্ধে লিখেছেন: "প্রথম কলামের সম্মুখ দিকের সৈন্যদের দেখবামাত্র বিদ্রোহীরা চারদিকে গুলীর ঝড় বইয়ে দিল এবং অফিসার ও সৈন্যরা গ্ল্যাসিসের ধারে সমানে ভূতলশায়ী হতে লাগল।"[১]

কাশ্মীর গেটে বিদ্রোহীদের প্রতিরোধের ফলে বারবার আক্রমণকারীদের ব্যর্থ হতে হল। তারপর অন্য আর কোনো উপায় না দেখে ইংরেজরা বারুদে আগুন লাগিয়ে গেট ধ্বংস করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত করল। লেফটেনান্ট স্যালকড্ ও হোম ৪ জন ইংরেজ ও ১০ জন শিখের সঙ্গে কতকগুলি বারুদের বস্তা নিয়ে গিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দিল। কাশ্মীর গেট চূর্ণবিচূর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গে তারাও সকলে হতাহত হল। এই ভাবে প্রথম কলাম কাশ্মীর গেটে প্রবেশ করতে সক্ষম হল। দ্বিতীয় কলামও কাবুল গেট দিয়ে শহরে প্রবেশ করল। কিন্তু লাহোর গেটের কাছে রাস্তা এত সরু যে পাশাপাশি দুজন লোকেরও যাওয়া কঠিন এবং এখানে বিদ্রোহীদের প্রতিরোধও খুব প্রবল। এখানে নিকলসন মারাত্মকভাবে জখম হলেন এবং এই আঘাতের ফলেই কিছুদিন পরে তাঁর মৃত্যু হল। তা ছাড়া আরও ৯ জন ইংরেজ অফিসার ও অনেক লোক মারা গেল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে দ্বিতীয় কলামকে কাবুল গেট থেকে ফিরে যেতে হল। তৃতীয় কলাম জুম্মা মসজিদের দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টা করল, কিন্তু তাদেরও গীর্জায় ফিরে যেতে হল।

এদিকে চতুর্থ কলাম নিয়ে যখন মেজর রীড আক্রমণে যাচ্ছিলেন, তখন সবজি-মণ্ডীতেই বিদ্রোহীরা তাঁকে তীব্রভাবে প্রতি-আক্রমণ করল, যার ফলে রীডের বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করাই শ্রেয় মনে করল। এরকম যে ঘটবে, ইংরেজ-নায়করা তা কল্পনাও করেননি। কিছুক্ষণ হাতাহাতি যুদ্ধের পর রীড আহত হয়ে পড়েন। "তাঁর আহত অবস্থার জন্য গুর্খাদের অগ্রগতি বন্ধ হয়ে গেল।"[২] কাশ্মীরের ডোগরারা এই সুযোগে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে একেবারে চম্পট দিল। তারা তাদের কামানগুলিও সঙ্গে নিয়ে গেল না। তাদের পুনর্গঠন করে আবার রণাঙ্গনে পাঠাবার অনেক ব্যর্থ চেষ্টা হয়েছিল। বস্তুতঃ মহারাজা গোলাব সিং-প্রেরিত এই ডোগরারা ইংরেজের লাভের জন্য সিপাহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে খুব আগ্রহান্বিত ছিল না। কাশ্মীরের মহারাজা তাদের একরকম জোর করেই পাঠিয়েছিলেন।

১। ফরেষ্ট: "হিষ্ট্রি অফ দি ইণ্ডিয়ান মিউটিনি", ১ম, পৃঃ ১৩৬।

২। ফরেষ্ট: "ষ্টেট পেপার্স", ১ম, পৃঃ ৪৭৩।
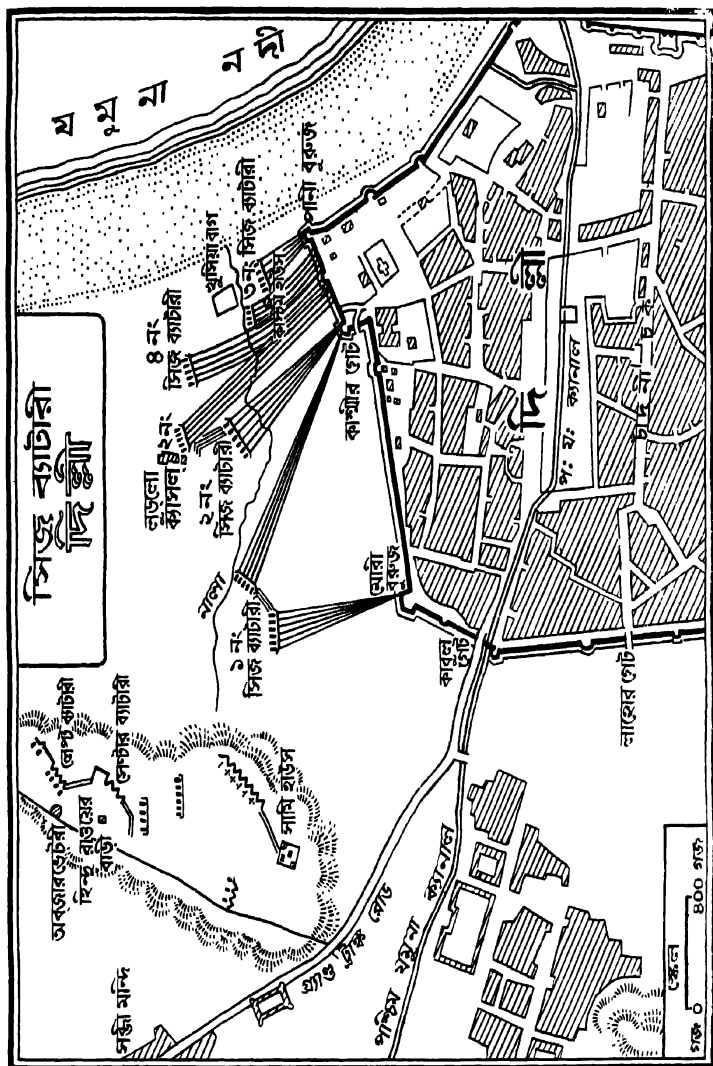
বিদ্রোহী দিল্লীর উপর ইংরেজের সর্বশেষ আক্রমণ

এই কাশ্মীর-রাজ গোলাব সিং সম্পর্কে ঐতিহাসিক গিবন এক পরিচয় রেখে গেছেন : "নির্ভুল স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বলে গোলাব সিং তাঁর নিজের স্বার্থ খুব ভাল-ভাবেই বুঝতে পারতেন—এ বিষয়ে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। মৃত্যুর পূর্বে তিনি স্থির করেছিলেন যে, তাঁর 'সমস্ত টাকাই' ইংরেজ ঘোড়ার পক্ষে বাজী রাখবেন।"[১] রণজিৎ সিং-এর দরবারের সব থেকে শক্তিশালী রাজা গোলাব সিং প্রথম শিখ যুদ্ধের সময় লাহোর দরবারের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে ইংরেজের কাছ থেকে পুরস্কার-স্বরূপ এক কোটি টাকার বদলে ১৮৪৬ সালে পেয়েছিলেন কাশ্মীর রাজ্য। এক ধারে প্রজাদের প্রতি তিনি ছিলেন যেমন নির্দয়, অন্য ধারে তেমনি তাঁর ইংরেজের প্রতি আনুগত্যের ও উদারতার অন্ত ছিল না। বিদ্রোহের সময় ইংরেজকে সাহায্য করার এত আগ্রহের কারণ ছিল এই যে, তিনি তাঁর 'নির্ভুল স্বাভাবিক প্রবৃত্তি'র দ্বারা ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর রক্ষক ইংরেজরা ভারত থেকে বহিষ্কৃত হলে, তাঁকেও তল্পিতল্পা গুটিয়ে তাদের সঙ্গেই যেতে হবে।

কিষেনগঞ্জে সিপাহীদের আক্রমণের ফলে ইংরেজ-শিবিরের অবস্থা খুবই সংকটজনক হয়ে পড়েছিল। "একটা সময়ে শত্রুরা তাদের বিজয়ে উৎফুল্ল হয়ে, লাহোর গেট থেকে অধিক সংখ্যায় চতুর্থ কলামকে ভীষণভাবে আক্রমণ করতে লাগল। আমাদের ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে তারা যে আমাদের অরক্ষিত শিবিরে প্রবেশ করতে পারে, কিম্বা আমাদের আক্রমণরত সৈন্যদের পশ্চাৎ থেকে আক্রমণ করতে পারে এই বিপদের সম্ভাবনা ছিল।"[২] যে হিন্দুরাও-এর বাড়ি ভিত্তি করে ইংরেজরা তাদের সমগ্র আত্মরক্ষার ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল, সেই বাড়িও বিদ্রোহীরা প্রায় দখল করে ফেলেছিল, "এবং আমাদের পক্ষে তা নিশ্চয়ই সর্বনাশের কারণ হত যদি-না একটা আকস্মিক ঘটনা ঘটত।"[৩]

এই আকস্মিক ঘটনা হল বৃটিশ শিবিরে ব্রিগেডিয়ার হোপ গ্র্যান্টের অধীনে একদল অশ্বারোহীর উপস্থিতি। দিল্লী শহরের মতো একটা সুরক্ষিত দুর্গ আক্রমণ করবার জন্য প্রয়োজন ছিল গোলন্দাজ, পদাতিক ও ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি। এ রকম আক্রমণে অশ্বারোহীদের বিশেষ কোনো কাজই নেই, কাজেই এই সব ইংরেজ অশ্বারোহীরা শিবিরের মধ্যেই অবস্থান করছিল। বিদ্রোহীরা যখন চতুর্থ কলামকে হারিয়ে দিয়ে ইংরেজ-শিবিরের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, সেই সময় হোপ গ্র্যান্ট তাঁর অশ্বারোহীদের নিয়ে শিবির রক্ষা করলেন। "এই অশ্বারোহীদের

১। গিবন : "দি লরেন্সেস্ অব দি পাঞ্জাব", পৃঃ ২৯৮।

২। ফরেষ্ট : "হিষ্ট্রি অব দি ইণ্ডিয়ান মিউটিনি", ১ম, পৃঃ ১৪১।

৩। কে' : "হিষ্ট্রি অব দি সিপয় ওয়ার ইন ইণ্ডিয়া", ৩য়, পৃঃ ৫১১।

উপস্থিতিই আমাদের বাঁচিয়ে ছিল ও শত্রুর দ্বারা আমাদের পশ্চাৎ ভাগ আক্রমণের চেষ্টা ব্যর্থ করে দিল।"[১]

কাশ্মীর ও পানী বুরুজের পাশে পরিখা-প্রাচীর ভেদ করে ও অনেকক্ষণ ধরে হাতাহাতি যুদ্ধের পর ইংরেজদের প্রথম ও দ্বিতীয় কলাম শহরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু তারপর তারা এতই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল যে, তাদের আর নড়বার চড়বার ক্ষমতা ছিল না। কে' লিখেছেন: "যারা এই দিনকার রক্তাক্ত যুদ্ধের পর বেঁচে ছিল, ... তারা এতই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল যে, তাদের একেবারে অক্ষম করে দিয়েছিল। শহরের অভ্যন্তরে অগ্রসর হবার মতো একটা বিপদ্জনক কাজের জন্য তারা আর সমর্থ ছিল না।"[২]

প্রথম দিনকার যুদ্ধের ফলাফল বিচারকালে শিবিরের ইংরেজ-নায়করা মোটেই খুশী হয়নি। যেটুকু সামান্য জমি তারা দখল করতে পেরেছিল, তার জন্য তাদের মূল্য দিতে হয়েছিল অনেক। ফরেস্ট বলেছেন: "আক্রমণকারী কলামগুলির ৪ জন নায়কের মধ্যে তিনজনই অক্ষম হয়ে পড়লেন। এক ১ম বেঙ্গল ফুজিলিয়ার্স'রাই (ইংরেজ বাহিনী) তাদের ৯জন অফিসারকে হারাল। আর ইঞ্জিনিয়ারদের ১৭ জন অফিসারের মধ্যে একজন মৃত আর আটজন গুরুতরভাবে আহত হলেন।"[৩]

১৪ই সেপ্টেম্বরের যুদ্ধে ইংরেজ-পক্ষের হতাহতের সংখ্যা ছিল ৬৬ জন অফিসার ও ১,১৭৮ জন সৈন্য, অর্থাৎ যারা সেদিন যুদ্ধে নেমেছিল তার এক-তৃতীয়াংশ।[৪] ফরেস্টের মতে ৭ই থেকে ২০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দিল্লীতে "বিদ্রোহীদের ১৫০০ জনের মৃত্যু হয়েছিল এবং যাদের তারা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল তাদের মধ্যে প্রচুর লোক আহত হয়েছিল।"

এইদিনকার যুদ্ধের আংশিক সফলতামাত্র দেখে জেনারেল উইলসন অত্যধিক ভগ্নোৎসাহ হয়ে পড়লেন। যখন তিনি তাঁর স্টাফকে সঙ্গে নিয়ে, ম্যাপ হাতে করে ঘোড়ায় চড়ে শহরে এলেন এবং সব ঘটনা জানতে পারলেন, তখন তাঁর প্রথম প্রতিক্রিয়া হল এই যে, তাঁর অবশিষ্ট বাহিনীকে সম্পূর্ণ ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবার একমাত্র উপায় হচ্ছে তাদের পুনরায় টিলার পিছনে সুরক্ষিত স্থানে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া।"[৫]

১। কে': পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৬১৫।
২। ঐ, পৃঃ ৬১৬।
৩। "ফরেষ্ট: 'হিষ্ট্রি অব দি ইণ্ডিয়ান মিউটিনি"—১ম পৃঃ ১৪৬।
৪। ফরেষ্ট: "ষ্টেট পেপার্স' ৫ম, পৃঃ ৪৭৩।
৫। কে': 'হিষ্ট্রি অব দি সিপয় ওয়ার"—৩য়, পৃঃ ৬১৭।

উইলসন ইংরেজ বাহিনীকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবারই প্রায় সিদ্ধান্ত করে ফেলেছিলেন, কিন্তু তাঁর কয়েকজন অফিসার—বিশেষ করে প্রধান ইঞ্জিনিয়ার বেইর্ড স্মিথ্—বোঝালেন যে, যেটুকু জয় করা হয়েছে, অনেক বিপদ থাকা সত্ত্বেও তা আঁকড়ে ধরে থাকাই বাঞ্ছনীয়।

পরের দিন, ১৫ই সেপ্টেম্বর। সেদিনটা ছিল ইংরেজদের পক্ষে একটা অত্যন্ত 'শোচনীয় শূন্য দিবস'। ইংরেজ বাহিনীর প্রত্যেকটি সিপাহীকে—সে ইংরেজই হোক আর ভারতীয়ই হোক—প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে, তাকে দিল্লী লুণ্ঠনের অবাধ সুযোগ দেওয়া হবে। দিল্লীর ঐশ্বর্য, তার সোনা, রূপা, হীরা, মণি, মুক্তা, মূল্যবান রেশম, পশম, কার্পেট ইত্যাদি সর্বজনবিদিত। যুদ্ধের 'পুরস্কার'-স্বরূপ এসবই তাদের হয়ে যাবে! যদিও প্রথম দিন তারা শহরের মাত্র সামান্য একটু অংশ দখল করেছে, তবুও এই রকম লুণ্ঠনের লোভ ও সুরার আকর্ষণ তাদের উন্মাদ করে তুলল। ১৫ই সেপ্টেম্বর দিল্লীতে ইংরেজ বাহিনীর সৈন্যদের কীর্তি কাহিনীর সুন্দর একটি বর্ণনা কে' দিয়ে গেছেন :

"একটি কালো কিম্বা সবুজ রঙের বিয়ার অথবা ব্রাণ্ডি অথবা মদের বোতল একটি হীরার হারের চাইতেও মূল্যবান ছিল। শত্রুরা এটা ভালভাবেই জানত এবং তাদের জাতীয় ধূর্ততার সঙ্গে তারা ইচ্ছে করেই প্রচুর পরিমাণে এই উত্তেজক পানীয়টি লুণ্ঠনকারীদের হাতের নিকট রেখে গিয়েছিল। ইউরোপীয়রা (অর্থাৎ ইংরেজরা) তাদের লোভ কোনো প্রকারে সংবরণ করবার চেষ্টা না করে এই তরল মূল্যবান বস্তুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বিদ্রোহীরা চতুরভাবে যে ফাঁদ পেতে গিয়েছিল, তাতে যদি আমরা ধরা পড়তাম তা হলে আমাদের যে কি বিষম বিপদ হত, তা বলা কঠিন। কিন্তু পরম দয়ালু ভগবান, যিনি এতবার তাদের (বিদ্রোহীদের) বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করে দিয়েছেন, তাদের পরিকল্পনাকে বানচাল করেছেন এবং তাদের বিজয়কে পরাজয়ে পরিণত করেছেন, তিনি আর একবার তাদের মতলবকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দিলেন। কিষেনগঞ্জের শহরতলি তখনও তাদের অধিকারে ; লাহোর বুরুজ এবং শহরের আরও অনেকগুলি শক্তিশালী কেন্দ্রে তারা তখনও দলবদ্ধ ; আর আমাদের টিলার শিবির মাত্র মুষ্টিমেয় সৈন্য দ্বারা রক্ষিত এবং তাদের মধ্যে আবার অনেকেই অসুস্থ। ঠিক এ রকম অবস্থায় বিদ্রোহী-নেতৃত্বের একটা সাধারণ সুপরিকল্পিত আঘাতই আমাদের সমগ্র বাহিনীকে অভিভূত করে ফেলতে পারত এবং মোগল বাদশাহ বিজয়গর্বে দাঁড়িয়ে থাকতে পারতেন। এই শোচনীয় ১৫ই সেপ্টেম্বরে একটা বিরাট ঘন মেঘ আমাদের মাথার উপর ঝুলছিল। এটা ছিল আমাদের সব থেকে ঘোরতর বিপদের দিন

এই মহাসমরের এই দিনটাতেই প্রথম বারের জন্য ও শেষবারের জন্য ইংরেজদের ভবিষ্যৎ দোদুল্যমান হয়ে পড়েছিল এবং ভাগ্যলক্ষ্মী কার প্রতি প্রসন্ন হবেন সে সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ-বাণী করা কোনো মহাপুরুষেরও সাধ্য ছিল না।"[১]

শুধু জেনারেল উইলসনের মতেই নয়, আরও অনেক ইংরেজ অফিসারের মতে তাদের প্রথম দিনকার অভিযান "বড় একটা কিছু সাফল্য লাভ করেনি।" রবার্টস্ একটা চিঠিতে লিখেছিলেন: "আমাদের প্রত্যেকটি কলাম পশ্চাৎপদ হতে বাধ্য হয়েছিল। ... অফিসারদের মধ্যে নর্ম্যান, জন্‌সন্ এবং আরও দু' একজন ছাড়া আর কেউই কোনো প্রকার কাজের জন্য উপযুক্ত ছিলেন না। সব পুরাতন অফিসাররাই একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলেন। আরও বিপদ্‌জনক ব্যাপার হল এই যে, মতলব করে কি না আমি বলতে পারি না, তবে শহরের সব মদের দোকানগুলি খোলা রাখা হয়েছিল এবং আমাদের লোকরা একেবারে মাতাল হয়ে গিয়েছিল। নেশার ঝোঁকে তারা তাদের বাহিনী খুঁজেই পাচ্ছিল না এবং বিগত ৫।৬ দিনের কঠিন কাজ যেন সকলকে নিঃশেষ করে দিয়েছিল।"[২]

১৪ই সেপ্টেম্বরের আক্রমণের পর ইংরেজ-বাহিনী একটা অত্যন্ত সংকটজনক অবস্থার মধ্যে পড়ল। তাদের অত্যধিক সংখ্যক তো হতাহত হলই, তা ছাড়া যারা জীবিত রইল তারাও অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তাদের অবস্থা আরও খারাপ হল, যখন তারা একেবারে মাতাল হয়ে চেতনা হারিয়ে 'পশুর মত গড়াগড়ি দিতে লাগল'। ঐদিনকার যুদ্ধে বিদ্রোহীদেরও কম ক্ষতি হয়নি। কিন্তু তা হলেও তাদের লোকবলের অভাব ছিল না; তাদের রণ-ক্ষমতা ও নৈতিক বল বিনষ্ট হয়নি; শত্রুকে প্রতিরোধ করার আকাঙ্ক্ষা তখনও তাদের প্রবল। উপযুক্ত নেতৃত্বের পক্ষে এই সুবর্ণসুযোগ গ্রহণ করে দিল্লীর যুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয় শত্রুর হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া তখনও, এই শেষ মুহূর্তেও, সম্ভব ছিল। কিন্তু সিপাহী-নেতারা এই অপূর্ব সুযোগ গ্রহণে সমর্থ হলেন না। বৈপ্লবিক দুঃসাহসিকতা ও অনুভূতি তাঁদের মধ্যে ছিল না। তাঁদের মানসিক কাঠামো ও চেতনাশক্তি সামন্ততান্ত্রিক যুগের সীমানা পার হয়ে বেশী দূর অগ্রসর হয়নি। তাই যেটাকে সুবর্ণসুযোগ বলে ধরে নিয়ে প্রতি-আক্রমণের জন্য যেখানে তাঁদের সর্বশক্তি নিয়োগ করা উচিত ছিল, সেখানে তাঁরা সেই ১৪ই সেপ্টেম্বরের যুদ্ধকে পরাজয় বলেই মেনে নিলেন। তাঁরা যখন দেখলেন যে, ইংরেজরা দিল্লীর সুদৃঢ় প্রাচীর ভেদ করে শহরে প্রবেশ করতে সমর্থ হয়েছে, তখন এটাকে তাঁরা নিজেদের পরাজয় বলে

১। কে' ঃ পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৬১৯-২০।

২। "লেটার্স", পৃঃ ৬৪।

ধরে নিয়ে দিল্লী ত্যাগ করে অন্যত্র গিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়াই স্থির করলেন। কে'-র কথায়ঃ ভগবান যে ইংরেজের প্রতি প্রসন্নই ছিলেন, তা কে আর অস্বীকার করতে পারে?

১৫ই সেপ্টেম্বর যখন বৃটিশ বাহিনীর মাতাল সৈন্যরা রাস্তায় ও নর্দমায় গড়াগড়ি দিচ্ছিল, বিদ্রোহীরা তখন কিষেনগঞ্জ পরিত্যাগ করে ফিরে এল। সেইদিন সন্ধ্যার সময় উইলসন একটি বিশিষ্ট দল গঠন করে সমস্ত মদ নষ্ট করে ফেললেন। পরের দিন ১৬ই তারিখে স্বয়ং জেনারেল উইলসনের তত্ত্বাবধানে আবার পূর্বের মতো রক্তাক্ত যুদ্ধ শুরু হল। এই দিনকার যুদ্ধ সম্বন্ধে উইলসন সন্ধ্যার সময় তাঁর রিপোর্টে লিখলেনঃ

"আজ সকালে আমরা ম্যাগাজিন দখল করতে পেরেছি। ··· এর ফলে কিছুটা আমরা অগ্রসর হয়েছি, কিন্তু আমাদের কাজ ভয়ানক মন্থর গতিতে চলেছে; এক এক ইঞ্চি করে আমাদের অগ্রসর হতে হচ্ছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের বাহিনীর একটা বড় অংশের উপর, জম্মু সৈন্যদের বাদ দিয়েও, আমি বিশ্বাস রাখতে পারছি না। আমার যেটা সব চাইতে বেশী চিন্তার কারণ—শত্রুর চাইতেও বেশী, সেটা হচ্ছে যে, প্রচুর পরিমাণে মদ আমাদের ইউরোপীয় (!) ও নেটিভ সৈন্যদের হাতে পড়ছে, যা পান করে তারা পশু হয়ে পড়ে ও নিজেদের কর্তব্য পালনে অক্ষম হয়। আমাকে সেগুলি ধ্বংস করবার সময়ও দেয় না। আমি দিনের পর দিন অধিকতর দুর্বল হয়ে পড়ছি; শরীর ও মন দুইই নিঃশেষ হয়ে আসছে। ··· আমি আর চলতে ফিরতে পর্যন্ত পারছি না এবং দু' এক দিনের মধ্যে আমাকে সম্পূর্ণ শয্যাশায়ী হতে হবে। ··· আমাদের সামনে এখনও একটা দীর্ঘ ও কঠিন সংগ্রাম অপেক্ষা করছে। আশা করি আমি যেন এটার শেষ দেখতে পারি।"[১]

জেনারেল উইলসনের অবশ্য এতখানি ভীত হবার কোনো কারণ ছিল না। ১৪ই তারিখের পর বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব বলে আর কিছু রইল না এবং সুসংগঠিত প্রতি-আক্রমণেরও কোনো সম্ভাবনা রইল না। কিন্তু নেতৃত্বের অক্ষমতা সত্ত্বেও তখনও বিদ্রোহীদের মধ্যে নির্ভীক লোকের অভাব ছিল না, যারা—ঐতিহাসিক কে'র মতে—উন্মাদও নয়, ধর্মান্ধও নয়; যারা সাহসী ও দিল্লীর বাদশাহের অনুগত প্রজা এবং যারা তখনও মরিয়া হয়ে শত্রুকে বাধা দিয়ে যাচ্ছিল। ১৬ই তারিখে বারনেস্ সরকারের নিকট দিল্লী থেকে টেলিগ্রামে সংবাদ পাঠালেনঃ "বিদ্রোহীরা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়েছে এবং বাড়ির ছাদ থেকে যুদ্ধ করছে"।[২]

১। কে': "হিষ্ট্রি অব দি সিপয় ওয়ার ইন ইণ্ডিয়া", ৩য়, পৃঃ ৬২২।

২। "পাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্ডস," ৭ম খণ্ড, ২য়, পৃঃ ৫৭।

বাহাদুর শাহর বিচারের সময় তাঁর ভূতপূর্ব সেক্রেটারি মুকুন্দ্‌লালের সাক্ষ্যে জানা যায়, "১৬ই তারিখে বাদশাহ্ ফিরিঙ্গীদের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য বিদ্রোহীদের উৎসাহিত করবার উদ্দেশ্যে প্রাসাদের গেট থেকে ৪০০ গজ দূরে খান আলি খানের বাড়ি পর্যন্ত একটা খোলা গাড়ি করে গিয়েছিলেন"।[১]

১৭ই তারিখেও বিদ্রোহীদের প্রতিরোধের তীব্রতা এতটুকু হ্রাস পেল না। ইংরেজ ঐতিহাসিকই এইভাবে তার বর্ণনা দিয়েছেন: "আমাদের সৈন্যরা প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টা করল—যে প্রাসাদ আমাদের সকল প্রচেষ্টার লক্ষ্যস্থল; কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিদ্রোহীরা তাদের হটিয়ে দিচ্ছিল। বিদ্রোহীরা তখনও একেবারে দমে যায়নি। অনেকে দিল্লী ত্যাগ করেছিল, ··· কিন্তু তখনও শহরে তাদের অনেকেই রয়ে গিয়েছিল, যারা আমাদের দুর্বল বাহিনীর লোকদের কাজ খুবই কঠিন করে তুলল। ম্যাগাজিন ও ব্যাঙ্ক আমরা দখল করেছিলাম, কিন্তু লাহোর গেট তখনও তাদের হাতে ছিল। নিকলসন আহত হবার পর থেকে আমরা ওদিকে একেবারেই অগ্রসর হতে পারিনি। ··· এটা স্পষ্টই বোঝা গেল যে, আমাদের সৈন্যদের এরকম যুদ্ধের জন্য ক্ষুধা একেবারেই বাড়েনি এবং আমাদের লক্ষ্যে পৌছতে হলে সম্মুখ-যুদ্ধের কায়দা ছেড়ে দিয়ে অন্য কোনো চাতুরীপূর্ণ উপায় বের করতে হবে। আমাদের অল্পসংখ্যক লোকদের শত্রুর সামনে ফেলে দিয়ে বিপদাপন্ন করা বন্ধ করতেই হবে। এ বিষয়ে তাদের যথেষ্ট তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে। এরকম ভাবে অগ্রসর হতে তারা আর রাজী নয়; আর যদি রাজী হয়ও, তা হলে খুব অনিচ্ছা সত্ত্বেই হবে।"[২]

সমস্ত দিন ধরে রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ করার পর ১৭ই তারিখে ইংরেজরা মাত্র ব্যাঙ্কের বাড়িটা দখল করতে পেরেছিল। এডজুটান্ট জেনারেল সেদিন এই টেলিগ্রামটি পাঠিয়েছিলেন: "ব্যাঙ্ক ও ম্যাগাজিনের মধ্যবর্তী স্থানটি শুধু আমরা দখল করে আছি। ব্যাঙ্কের নিকট সমস্ত দিন ধরে সংঘর্ষ চলেছে। প্রাসাদ ও সেলিমগড়ে আমরা অনবরত গোলা ফেলছি। শত্রুরা একশ' দুশ' করে দলবদ্ধ হয়ে মথুরা দিয়ে গোয়ালিয়রের দিকে পালিয়ে যাচ্ছে। সকল রকমের অগাধ ঐশ্বর্য শহরে পড়ে আছে। ··· প্রত্যেক অঞ্চলে মৃত সিপাহীদের সংখ্যা খুবই বেশী।"[৩] ব্রিগেডিয়ার চেম্বারলেইন আর একটা টেলিগ্রামে জানালেন: "আমাদের সৈন্যদের শৃঙ্খলা অনেকখানি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তারা এখন চারদিকে ছড়িয়ে লুটপাট করছে আর

১। মার্টিন: "ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার", ২য়, পৃঃ ১৭০।

২। কে': পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ৩য়, পৃঃ ৬২৫-২৬।

৩। "পাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্ডস্," ৭ম খণ্ড, ২য়, পৃঃ ৬১।

মাতলামি করছে।"[১] ১৭ই তারিখে সমস্ত দিন ধরে বিদ্রোহীদের প্রতিরোধ একটুও হ্রাস পায়নি এবং সেলিমগড়ের কামান থেকে ইংরেজের গোলার উত্তরে তারাও সমানে উত্তর দিয়েছিল। ১৮ই তারিখেও উভয় পক্ষে সমানে যুদ্ধ চলল। বিদ্রোহীরা তখনও বিনা যুদ্ধে শত্রুকে এক ইঞ্চি জমি ছেড়ে দিতে প্রস্তুত নয়।

১৮ই তারিখে বিপদ্‌জনক 'রাস্তার যুদ্ধ' পরিহার করে আলেক্স টাইলর তাঁর ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে একটা একটা করে বাড়ির ভেতর দিয়ে অগ্রসর হতে লাগলেন। এই কৌশল যদিও খুব নিরাপদ, কিন্তু তার অগ্রগতি খুবই মন্থর এবং সমস্ত দিনের মধ্যে মাত্র কয়েকটি বাড়ি ইংরেজরা দখল করতে পেরেছিল এবং তাও অনেক ক্ষেত্রে বিদ্রোহীরা প্রচণ্ডভাবে বাধা দিয়েছিল। ঐদিন ইংরেজরা একবার লাহোর গেটও আক্রমণ করেছিল, কিন্তু বিদ্রোহীদের প্রচণ্ড প্রতিরোধের ফলে তাদের পালাতে হয়েছিল। এই ক্ষেত্রেও ইংরেজ সৈন্যদের আচরণ জেনারেল উইলসনের মুষড়ে-পড়া মেজাজকে আরও মুষড়ে দিল। আক্রমণের পাঁচদিন পর তিনি ১৮ই তারিখের রিপোর্টে লিখলেন ঃ

"আমরা গতকাল যে স্থানে ছিলাম, আজও সেইখানেই আছি। আজ সকালে লাহোর গেট দখল করবার একটা চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু তা বিফল হল এই কারণে যে, ইউরোপীয় সৈন্যরা তাদের অফিসারদের অনুসরণ করতে রাজী হয়নি। একবার ঝাঁপিয়ে পড়লেই লাহোর গেট অনায়াসে আমাদের হয়ে যেত, কিন্তু তারা অস্বীকার করে বসল। ঘটনা হচ্ছে এই যে, আমাদের লোকরা 'রাস্তার যুদ্ধ' একেবারেই পছন্দ করে না ; এতে তারা শত্রুকে দেখতে পায় না—শুধু দেখতে পায় যে, ছাদের উপর কিম্বা অন্য কোনো স্থানে লুক্কায়িত শত্রুর গুলীতে তাদের কমরেডরা কেবল ভূতলশায়ী হয়ে পড়ছে। তার ফলে তারা আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পড়ে ও আর অগ্রসর হতে রাজী হয় না। এটা খুবই দুঃখের বিষয় এবং আমার পক্ষে অত্যন্ত হৃদয়বিদারক। আমার মনে হয় আমরা যেটুকু দখল করেছি সেটুকু অধিকার করে থাকতে পারব, কিন্তু এর বেশী আর কি করা যেতে পারে তা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। শহরে আমার মাত্র ৩,১০০ পদাতিক আছে—নতুন সৈন্য পাবার কোনো সম্ভাবনাই নেই। এই অবস্থায় আমাকে যদি শহরের অভ্যন্তরে অগ্রসর হতে হয়, তা হলে সৈন্যরা শহরের অগণিত গলি ও অসংখ্য বাড়ির মধ্যে কোথায় হারিয়ে যাবে এবং ধ্বংস হয়ে যাবে, কিম্বা তাদের ফিরে আসতে হবে। এটা সত্য যে, বেশ কিছু সংখ্যক শত্রু পালিয়েছে, কিন্তু এখনও আজমীর ও দিল্লী গেটের মাঝে তাদের একটা মস্ত

১। "পাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্ড্‌স্", পৃঃ ৬১।

বড় শিবির আছে এবং যারা শহর থেকে চলে গিয়েছে, তারা যখন জানতে পারবে যে, আমরা আর অগ্রসর হতে পারছি না, তখন তাদের ফিরে আসারও সম্ভাবনা আছে।”[১]

উইলসনের এই রিপোর্ট থেকেই পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে, ইংরেজরা এই সময় কি ভয়ানক একটা বিপজ্জনক অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। বিদ্রোহীদের একটা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নেতৃত্বের পক্ষে তখনও শত্রুদের একেবারে নির্মূল করে দেওয়া খুবই সম্ভব ছিল; একটি মাত্র নির্মম আঘাতের দ্বারা ভারতের ভবিষ্যৎ তারা ওলট-পালট করে ফেলতে পারতো।

পরদিন, ১৯শে সেপ্টেম্বর ইংরেজরা গৃহ-ঝম্প ও 'রাস্তার-যুদ্ধ'—এই দুই কৌশলই একসঙ্গে চালাল। এর ফলে তাদের অগ্রগতি ভালই হল এবং সন্ধ্যার দিকে এমন একটা বাড়ি দখল করল যেটা ঠিক লাহোর বুরুজের পশ্চাতে অবস্থিত। এই লাহোর বুরুজেরই ৭টি কামান ইংরেজদের মধ্যে ভয়ানক আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল। এইভাবে পশ্চাৎ দিক থেকে আক্রান্ত হয়ে লাহোর বুরুজকে রক্ষা করার কোনো উপায় না দেখে বিদ্রোহীরা রাত্রিকালে বুরুজ ত্যাগ করে নিঃশব্দে চলে গেল। কিন্তু অন্য ধারে, কে' বলছেন: "লাহোর বুরুজের কেবলমাত্র নামটাই আমাদের মধ্যে এতবড় একটা আতঙ্কের সৃষ্টি করত যে, যদিও তা আমাদের হাতে এত সহজে এসে গিয়েছিল ও শত্রুর পক্ষ থেকে আর কোনো প্রকার বাধাও আসেনি, তা সত্ত্বেও সেখানে গিয়ে তাকে অধিকার করতে আমাদের সৈন্যদের সুস্পষ্ট অনিচ্ছা প্রকাশ পাচ্ছিল। বুরুজ পরিত্যাগ করা থেকে তাদের নিরস্ত করা খুবই কঠিন হয়ে পড়ছিল।”[২]

১৯শে তারিখে ইংরেজদের ভাগ্য এভাবে প্রসন্ন হবার পূর্বে গ্রেটহেড কেবলমাত্র ইংরেজদের নিয়ে গঠিত একটি বাহিনী ও দুটি কামান নিয়ে লাহোর গেট আক্রমণের চেষ্টা করছিলেন। তারা যখন একটা নিরাপদ সরু গলি দিয়ে যাচ্ছিল তখন হঠাৎ একদল বিদ্রোহী চাঁদনী চকের নিকট তাদের ভয়ঙ্করভাবে আক্রমণ করল। ইংরেজ বীরপুরুষরা তাদের কামান দুটি ফেলে দিয়ে যে যেখানে পারল আশ্রয় নিল। গ্রেটহেড তাদের আবার পুনর্গঠনের চেষ্টা করলেন। অকৃতকার্য হয়ে ৭৫শ বাহিনীকে হুকুম করলেন বিদ্রোহীদের আক্রমণ করতে, কিন্তু তাদের আশ্রয়স্থল ছেড়ে ইংরেজ সৈন্যরা এক পা-ও অগ্রসর হল না। ৮ম বাহিনীর লোকরাও অনুরূপ আদেশ পালন করতে অস্বীকার করল। বিদ্রোহীরা "আমাদের

১। কে' : **"হিষ্ট্রি অব দি সিপয় ওয়ার ইন ইণ্ডিয়া,"** ৩য় পৃঃ ৬৩০

২। ঐ, ৩য়, পৃঃ ৬২৭।

চাইতে অনেক বেশী সাহসের পরিচয় দিয়েছিল” এবং শত্রুর কামান দিয়েই শত্রুর উপর গোলাবর্ষণ করেছিল। গ্রেটহেড, “যিনি মানুষের জীবনের মূল্য জানতেন, এই রকম অবস্থায় কোনো জীবন নষ্ট না করে, বিজ্ঞতার সঙ্গে ··· তাঁর লোকদের ফিরিয়ে নেওয়াই ঠিক করলেন।” কিন্তু ইংরেজ বীরপুরুষরা তাদের আশ্রয়স্থল ছেড়ে এতটুকু নড়ল না—তারা এক পা এগোবেও না, এক পা পেছনেও যাবে না। অবশেষে সন্ধ্যার পর, যারা লাহোর বুরুজের পিছনের বাড়িটা দখল করেছিল, তাদের সাহায্যে গ্রেটহেড তাঁর লোকদের ‘কৃতিত্বের সঙ্গে’ ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন![১]

১৯শ তারিখে ইংরেজদের জুম্মা মসজিদের উপর আক্রমণ বিদ্রোহীদের প্রচণ্ড প্রতিরোধের ফলে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু চাঁদনী চকের দিকে তারা খানিকটা অগ্রসর হতে পেরেছিল। তা ছাড়া, সেলিমগড়ের কামানগুলিও, যার উপর ১৪ই তারিখ থেকে অবিরাম গোলাবর্ষণ হচ্ছিল, ক্রমশঃ এদিন নিস্তব্ধ হয়ে পড়তে লাগল। ঐদিন অনেক বিদ্রোহীকে নৌকোর সেতু পার হয়ে চলে যেতে দেখা গিয়েছিল।

একদিন পূর্বে অর্থাৎ ১৮ই তারিখে উইলসনের নিকট গুপ্তচররা বিশ্বস্ত খবব নিয়ে এসেছিল যে, বাদশাহ ও শাহজাদারা, বাদশাহের তিনটি বাহিনী ও কিছু বিদ্রোহী অশ্বারোহী ও পদাতিকদের নিয়ে, শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে প্রাসাদ রক্ষা করবার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।[২]

বাদশাহ যদি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে এই পরিকল্পনাই কার্যে পরিণত করতেন, তাতেও বিদ্রোহীদের পক্ষে একটা শেষ আশা ছিল এবং ইংরেজদের পক্ষে প্রাসাদ অধিকার করা খুব সহজ হত না। ইংরেজের সৌভাগ্য যে, প্রাসাদে তাদের শক্তিশালী বন্ধুর অভাব ছিল না। আশানুল্লা ও মির্জা এলাহী বক্স বেগম জিন্নৎ মহলের সাহায্যে বাহাদুর শাহর এই সঙ্কল্প পরিবর্তন করাতে সক্ষম হল এবং বাহাদুর শাহ এদের প্ররোচনায় রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করে কুতুবে আশ্রয় নিতেও সম্মত হলেন। ঠিক এরকম সময়ে বখ্‌ত খান বাহাদুর শাহকে অনুরোধ করেছিলেন তাঁর সঙ্গে লক্ষ্ণৌ চলে যেতে। কিন্তু বাদশাহ এই প্রস্তাবে সম্মত হননি।[৩]

১। কে’ঃ পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ৩য়, পৃঃ ৬২৮-২৯।
২। মার্টিন ঃ “ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার,” ৩য়, পৃঃ ১৫৮।
৩। মেটকাফ সম্পাদিত ঃ “টু নেটিভ ন্যারেটিভস্,” পৃঃ ৭০।

১৯শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যার সময় দিল্লীর ইংরেজ কর্তৃপক্ষ খবর পেল—বাহাদুর শাহ প্রাসাদ পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছেন।

২০শে সেপ্টেম্বর একজন ইংরেজ স্টাফ-অফিসার যে চিঠি লিখেছিলেন তাতে দিল্লীর যুদ্ধের বাস্তব অবস্থাটা ভালভাবেই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে: "আমাদের প্রধান বিপদ দিল্লীর অভ্যন্তরেই হয়েছিল। ... প্রতিটি রাস্তায় শত্রুরা প্রত্যেক ফুট জমির জন্য লড়েছিল এবং সাহস ও দৃঢ়তার সঙ্গে একটার পর একটা স্থান দখল করেছিল। ... বাস্তবিকপক্ষে আমরা নিজেদের অভিনন্দন জানাতে পারি যে, আমরা নিকৃষ্টতম সংখ্যা নিয়ে শহর আক্রমণের চেষ্টা করিনি। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, শহরের একটা অংশ অধিকার করবার পর আমাদের বাহিনী এতটাই বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছিল যে, এইরূপ একটা অর্ধ-বিজিত অবস্থা খুবই বিপদ্‌জনক হয়ে উঠল। ... সত্য ঘটনা এই যে, আক্রমণের পরের দিন থেকে আমাদের একটা ভয়ানক আশঙ্কার মধ্য দিয়ে কাটাতে হয়েছে। আমাদের অগ্রগতি ছিল খুবই মন্থর, যাদের আমরা যুদ্ধ করতে নামাতে পেরেছিলাম তাদের সংখ্যা ছিল খুবই অল্প, এবং শত্রুরা যে তাদের ঘাঁটিগুলি পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছিল তাতে আমাদের নায়করা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছিলেন।... বস্তুতঃ আমরা ইচ্ছে করেই নৌকোর সেতু কামান দিয়ে ধ্বংস করে দিইনি। আমরা আনন্দের সঙ্গেই পলায়নরত শত্রুদের এই সেতু ছেড়ে দিয়েছিলাম। আমি মনে করি না যে, আমাদের কামানের গোলা শত্রুকে পালাতে বাধ্য করেছিল। আমাদের সৈন্যরা একেবারে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল, তাই তারা এক মাইলও শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করতে সক্ষম হয়নি।"[১]

বাদশাহ প্রাসাদ ছেড়ে চলে যাবার পরও যুদ্ধ থেমে যায়নি। ২০শে তারিখে শহরের দক্ষিণ অঞ্চলে অনেক বার হাতাহাতি যুদ্ধ হয়। প্রাসাদের প্রধান গেট থেকে ব্যাঙ্কে ইংরেজদের উপর গোলা বর্ষিত হল। জুম্মা মসজিদের নিকট বেলা দ্বিপ্রহর পর্যন্ত বিদ্রোহীরা ভয়ানক ভাবে শত্রুকে বাধা দিল। অপরাহ্নে ইংরেজরা প্রাসাদ ও সেলিমগড় দখল করতে সমর্থ হল। এই শেষ অবস্থায়ও বিনা যুদ্ধে ইংরেজরা প্রাসাদ দখল করতে পারেনি। মৃত্যুবরণ করতে বদ্ধপরিকর একদল লোক প্রতিটি গেটে, প্রতিটি দরজায় বন্দুক হাতে শত্রুর জন্য অপেক্ষা করছিল। তাদের মৃতদেহের উপর দিয়ে ইংরেজকে প্রাসাদে প্রবেশ করতে হয়েছিল।[২] ৭ দিন ধরে শহরে অনবরত যুদ্ধ করার পর ২০শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যার দিকে ইংরেজরা পুনরায় ভারতের প্রাচীন রাজধানীতে তাদের অধিকার স্থাপন করল।

১। মার্টিন: "ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার" ৩য়, পৃঃ ১৩৩।

২। কে': পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ৩য়, পৃঃ ৬৩৩।

একজন ইংরেজ ঐতিহাসিক বলেছেনঃ "কেবলমাত্র ২০শ তারিখে সকাল বেলায় নিশ্চিতভাবে বোঝা গেল যে, দিল্লীর এই দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ প্রায় শেষ হতে চলল।" ১৯শ তারিখ পর্যন্ত দিল্লীর ভাগ্য সম্পূর্ণ দোতুল্যমান ছিল। যদিও ইংরেজরা দিল্লীর প্রাচীর ভেদ করতে সমর্থ হয়েছিল ও শহরের একটা অংশ দখল করতে পেরেছিল, তবে তার জন্য তাদের এত অত্যধিক মূল্য দিতে হয়েছিল যে, এই অতি কঠিন পরীক্ষার সময় তারা প্রায় পঙ্গু হয়ে পড়বার উপক্রম হয়েছিল। প্রতি মুহূর্তে ইংরেজ-নায়করা অনুভব করছিলেন যে, তাঁরা যেন একটা ফাঁদের মধ্যে পড়ে গিয়েছেন এবং যুদ্ধের ফলাফল একেবারেই অনিশ্চিত। ১৯শ তারিখ পর্যন্ত তাঁদের চরম জয় সম্বন্ধে তাঁরা খুবই সন্দিহান ছিলেন। বিদ্রোহী সিপাহী ও নাগরিকরা অতিশয় বীরত্বের সঙ্গে শহর রক্ষা করে যাচ্ছিল। তাদের দিকে বীরত্ব ও আত্মত্যাগের কোনোই অভাব ছিল না।

ইংরেজ-পক্ষে যে ১০,০০০ লোক দিল্লীর শেষ আক্রমণে অংশ গ্রহণ করেছিল, ৭ দিনের যুদ্ধে তাদের মধ্যে মৃতের সংখ্যা হয়েছিল ১,০০০ ও গুরুতর আহতদের সংখ্যা ৩,০০০। ফরেস্ট বলেনঃ "এই ক্ষতি আমাদের সামরিক ইতিহাসের সব থেকে রক্তাক্ত ঘটনাগুলিকে মনে করিয়ে দেয়।"[১] তার পরেই ফরেস্ট সেবাস্তপোলের যুদ্ধের (১৮৫৬) সঙ্গে দিল্লীর যুদ্ধের তুলনা করে বলেছেন যে, সেবাস্তপোলের যুদ্ধে ৯৭,১৭৪ ইংরেজ সৈন্যের মধ্যে হতাহতের সংখ্যা ছিল ১৩,৯৫৯—যা তখন খুবই অত্যধিক বলে গণ্য করা হত। কিন্তু দিল্লীর যুদ্ধে এর অনুপাতে হতাহতের সংখ্যা আরও অনেক বেশী হয়েছিলঃ[২]

ইংরেজ হতাহতের সংখ্যা	ইঞ্জিনিয়ার্স	গোলন্দাজ	অশ্বারোহী	পদাতিক
সেবাস্তপোলে	৮%	৭'১৫%	৪'৪২%	১৭'৪৩%
দিল্লীতে	১৩%	২২'৬%	৭'৩%	৩৭'৯%

বিদ্রোহীদের একমাত্র প্রধান সমস্যা ছিল নেতৃত্বের সমস্যা। সঠিক ও সবল নেতৃত্বের দ্বারা এই শেষ মুহূর্তেও ইংরেজকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে চূড়ান্ত বিজয় শত্রুর হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া তাদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব ছিল না। ইংরেজরা দিল্লীর শেষ যুদ্ধে জয়লাভ করেছিল তাদের নিজস্ব শক্তির বলে নয়, তারা জয়লাভ করেছিল বিদ্রোহীদের নেতৃত্বের দুর্বলতার জন্য। বিদ্রোহীদের বীরত্ব, সাহস ও আত্মোৎসর্গের কোনোই অভাব ছিল না, কিন্তু সিপাহী-অফিসাররা তাঁদের চূড়ান্ত সমস্যা অর্থাৎ সক্ষম নেতৃত্ব-গঠনের কাজে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

১। **"ফরেষ্ট ঃ হিষ্ট্রি অব দি ইণ্ডিয়ান মিউটিনি"**, ৩য়, **পৃঃ** ১৫০। ২। ঐ, **পৃঃ** ১৫১-৫৩।

দিল্লীতে বিদ্রোহীদের পরাজয়ের কারণ সামন্ততান্ত্রিক নেতৃত্ব নয়। দিল্লীর সামন্ত-সম্ভ্রান্ত ও সিপাহীদের অন্তর্দ্বন্দ্বে সিপাহীরাই শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করেছিল। রাজধানীতে নিজেদের সম্পূর্ণ ক্ষমতা স্থাপন করতে সক্ষম হয়েও সিপাহী নেতারা সবল নেতৃত্ব গঠন করতে পারলেন না। তাঁদের এই অক্ষমতার প্রধান কারণ এই যে, সিপাহী নেতারা আদর্শগতভাবে (ideologically) পশ্চাৎপদ কৃষক ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত (petty bourgeois) শ্রেণীর প্রতিনিধি ছিলেন। এই শ্রেণীর অন্যান্য অনেক সৎগুণ থাকা সত্ত্বেও, একক ভাবে এদের পক্ষে বৈপ্লবিক নেতৃত্ব গঠন করা সম্ভবপর হয় না। এই সময়কার ইংরেজদের মতো একটা অগ্রসর জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার মতো মানসিক ক্ষমতা ও দৃষ্টিভঙ্গী এই সব নেতাদের ছিল না। একমাত্র বুর্জোয়া শ্রেণী কিম্বা শ্রমিক শ্রেণী এরকম জাতীয় বিদ্রোহে সফল নেতৃত্ব দিতে সক্ষম। কিন্তু ভারতীয় ধনিক শ্রেণী তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ, কাপুরুষতা ও অপরিপক্কতার জন্য এই বিদ্রোহ হতে দূরে সরে ছিল; আর বর্তমান শ্রমিক শ্রেণী তখন পর্যন্ত জন্মগ্রহণ করেনি। সিপাহী নেতাবা তাঁদের আদর্শগত ও মানসিক অনগ্রসরতার জন্যই এত সুবিধা পেয়েও কোনো প্রকার সক্ষম নেতৃত্ব গড়ে তুলতে পারেননি; এবং ১৫ই থেকে ১৯শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দিল্লীতে তাঁরা যে সুবর্ণ-সুযোগ পেয়েছিলেন তার কিছুই কাজে লাগাতে পারেননি। এই কারণেই বিদ্রোহী দিল্লীর ইতিহাস হচ্ছে হারানো সুযোগের এক শোকাবহ ইতিহাস।

২১শে সেপ্টেম্বর গর্বিত দিল্লী পুনরায় বিদেশী আক্রমণকারীদের পদতলে সম্পূর্ণ-রূপে ধরাশায়ী হল। ৭ দিনের অমানুষিক হিংস্র যুদ্ধের ফলে ভারতের পুরাতন রাজধানী একটা বিরাট ধ্বংস স্তূপে পরিণত হল। যে বিরাট শহর দু' দিন পূর্বেও লক্ষ লক্ষ লোকের কোলাহলে মুখরিত ছিল, আজ সেই শহরেরই রাস্তাঘাট বাড়ি-ঘর জনমানব-বর্জিত। সবজিমণ্ডী থেকে লাহোর গেট পর্যন্ত চারধারে কেবল শবদেহ—উট, ঘোড়া, গরু ও মানুষের রোদ-পোড়া অস্থিসার অগণিত দেহগুলি গাদাগাদিভাবে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে আছে। বড় বড় গাছগুলি কোথাও বা শাখাপত্র শূন্য হয়ে দণ্ডায়মান, কোথাও বা ধরাশায়ী। ধনীদের বাগানবাড়ি-গুলির ধ্বংসাবশেষ স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে আছে। শহরের অভ্যন্তরের দৃশ্য আরও ভয়াবহ। কাশ্মীর গেট থেকে প্রাসাদ পর্যন্ত প্রত্যেকটি বাড়ি বিধ্বস্ত ও অগ্নি-কাণ্ডের ফলে কৃষ্ণাভ।

দিল্লীতে যে পাশবিক হত্যাকাণ্ড ও অবাধ লুণ্ঠন ২১শে সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হল, তা কেবলমাত্র যুদ্ধের উন্মাদনার বশেই ঘটেনি। এই হত্যাকাণ্ড ও লুণ্ঠন সম্পূর্ণরূপে ইংরেজদের ইচ্ছাকৃত ও পূর্ব-পরিকল্পিত। এর উদ্দেশ্য ছিল ‘নেটিভ’দের

মনে সর্বত্র এমন একটা ভয়ঙ্কর আতঙ্কের সৃষ্টি করা যে, তারা যেন আর কখনও বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কথা কল্পনাও না করতে পারে। জেনারেল আউটরাম প্রভৃতি বড় বড় ইংরেজ সামরিক ও বেসামরিক নায়করা খোলাখুলি-ভাবেই বলছিলেন যে, সমগ্র দিল্লী শহরকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্মীভূত করে ফেলতে হবে। দিল্লীতে ইংরেজ আক্রমণকারীরা এই কাজের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়েই এসেছিল। এই সময় রবার্টস্ দিল্লী শিবির থেকে লিখেছিলেন: "আমি আশা করি যে, শহর থেকে স্ত্রীলোক ও শিশুদের স্থানান্তরিত করা হয়েছে, কারণ আমরা একবার দিল্লীতে প্রবেশ করলে কাউকেই বাদ দেওয়া হবে না।"[১]

দিল্লীর হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংস জেনারেল নীল কর্তৃক সংঘটিত এলাহাবাদ ও কানপুরের হত্যাকাণ্ডের নৃশংসতার সঙ্গেই তুলনীয়। স্ত্রী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ, বন্ধু-শত্রু নির্বিশেষে কাউকেই বাদ দেওয়া হয়নি। কৃষ্ণবর্ণের মানুষ দেখা মাত্রই 'সুসভ্য' ইংরেজ পূর্ব-পরিকল্পিত সিদ্ধান্ত অনুসারে ধীর মস্তিষ্কে তাকে হত্যা করেছে! এই ভাবে কত সহস্র সহস্র নরনারী ও শিশুকে যে খুন করা হল, তার কোনো হিসাবও নেই। কেবলমাত্র 'দোষী' লোকদেরই যে এ রকম নৃশংসভাবে হত্যা করা হল, তা নয়। কে' লিখেছেন: "যারা কোনোদিন আমাদের বিরুদ্ধে কিছুই করেনি, যারা শান্তভাবে তাদের দৈনন্দিন কাজ করে গিয়েছে এবং এমন কি বিদ্রোহীরা যাদের লুণ্ঠন করেছে ও যাদের উপর অত্যাচার করেছে—এমন অসংখ্য লোককেও আমরা বেয়নেটের দ্বারা বিদ্ধ করেছি, অথবা তলোয়ার দিয়ে টুকরো টুকরো করেছি, অথবা বন্দুকের গুলী দিয়ে তাদের মস্তিষ্ক বিদ্ধ করেছি। ··· কালা-আদমি দেখা মাত্রই আমাদের জাতীয় উৎসাহ উদ্দীপিত হয়ে উন্মত্ততার সীমানায় পৌঁছে গিয়েছে।"[২]

এমন কি, ইংরেজের হিতাকাঙ্ক্ষী মইন-উদ্দিনও তার ডায়েরিতে লিখেছিল: "শহরে কোনো মানুষের জীবনই নিরাপদ নয়। পুরুষ মানুষ দেখলেই হল—তাকে বিদ্রোহী বলে ধরে তখনই গুলী করে হত্যা করা হচ্ছে।"[৩]

এমন কি, গ্রামাঞ্চলেও নির্দোষদের কি রকম ভাবে হত্যা করা হয়েছে তার অসংখ্য উদাহরণের মধ্যে একটি উদাহরণ—"একদল গরীব গ্রামবাসীদের নিকট কয়েকটি নতুন পয়সা পাবার অপরাধে তাদের সকলকে ফাঁসি দেওয়া হয়। একটা নিকটবর্তী ধনাগার না কি কিছু পূর্বে লুণ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু পরে দেখা গেল

১। "লেটার্স," পৃঃ ৩৭।
২। কে': পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ৩য়, পৃঃ ৬৩৬।
৩। মেটকাফ সম্পাদিত: "টু নেটিভ ন্যারেটিভস্", পৃঃ ৫৯।

যে, এই পয়সাগুলি দিয়ে আমাদেরই লোকরা গ্রামবাসীদের কাছ থেকে দুধ, শাক-সবজি, আটা ইত্যাদি কিনেছিল।"[১]

যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পরও বহুদিন ধরে ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে এইরূপ নৃশংস হত্যাকাণ্ড চলতে দেখে কোনো কোনো প্রকৃতিস্থ ইংরেজ শাসকও চিন্তান্বিত হয়ে পড়লেন। বম্বে প্রদেশের গভর্নর লর্ড এলফিনস্টোন জন লরেন্সকে লিখেছিলেন: "দিল্লীর যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পরও আমাদের সৈন্যদের নৃশংস কাজগুলি সত্যিই খুব হৃদয়বিদারক। শত্রু-মিত্র বাদবিচার না করেই পাইকারীভাবে প্রতিশোধ নেওয়া হচ্ছে। আর লুণ্ঠনের ব্যাপারে, আমরা নাদির শাহকেও ছাড়িয়ে গিয়েছি।"[২]

১৮৫৭ সালের পূর্বে দিল্লীতে আরও কয়েকবার লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল, কিন্তু এইবারকার সুসভ্য ইংরেজের হত্যাকাণ্ড, লুণ্ঠন ও ধ্বংসের বিস্তৃতি ও প্রকৃতি অন্যবারের তুলনায় সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। ইংরেজ ঐতিহাসিক মণ্টোগোমারি মার্টিন বলেছেন: "১৭৩৯ সালের তুলনায় (নাদির শাহর আক্রমণ) ১৮৫৭ সালে পুরাতন রাজধানীর ধ্বংস পূর্ণতরভাবে সম্পন্ন হয়েছিল। মোগল বাদশাহীর বিরুদ্ধে নাদিরের অত্যাচারের আতিশয্যকে কোনো ব্যক্তির একটা উগ্র কিন্তু ক্ষণস্থায়ী রোগের আক্রমণের সঙ্গে তুলনা করা যায়। সে রোগ মানুষের শরীরকে সব সময়ের জন্য দুর্বল করে দিলেও, সে আরোগ্য লাভ করে উঠে দাঁড়ায়। কিন্তু ইংরেজের আঘাতের ফলে দুর্বল রোগী একেবারেই মরে গেল"।[৩]

ইংরেজের উদ্দেশ্যও ছিল তাই—রোগীকে এমন প্রচণ্ড আঘাত করা যে, সে যেন আর কোনো দিন মাথা তুলে না দাঁড়াতে পারে। তা ছাড়া, আরও একটা বিশিষ্ট পার্থক্য ছিল এই যে, পূর্বেকার আক্রমণ, হত্যাকাণ্ড ও লুণ্ঠনগুলি করেছিল কতকগুলি বর্বর অসভ্য দস্যুদল, আর ১৮৫৭ সালের হত্যাকারী ও লুণ্ঠনকারীরা হল সুসভ্য ইংরেজ!

একজন ইংরেজ অফিসার দিল্লী থেকে ২২শে সেপ্টেম্বর একটা চিঠিতে লিখেছিলেন: "দিল্লীর ঐশ্বর্য বর্ণনা করা আমার কলমের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। সোনার কাজ-করা কাশ্মীরের শাল, সোনার লেস-যুক্ত কাঁচুলি, চোগা, চাপকান, ঘড়ি, সিল্ক, সোনা—যা ইংল্যাণ্ডে কোনো সম্ভ্রান্ত পরিবারের বাড়িতেও দেখা যায় না—প্রথম দিনেই শিখরা এসব লুটপাট করে জমা করছিল। তারা এক-একটা শাল, যার দাম ইংল্যাণ্ডে ১০০ পাউণ্ড হবে, মাত্র ৪ টাকায় বিক্রি করছিল।

১। কে': পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ৩য়, পৃ: ৬৩৮।

২। স্মিথ্: "লাইফ অব লর্ড লরেন্স", ২য়, পৃ: ২৬২।

৩। মণ্টোগোমারি মার্টিন: "ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার", ৩য়, পৃ: ১৪৮।

জেনে রেখো যে, ইংরেজরাও এই ব্যাপারে কারও পিছনে পড়ে ছিল না। এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, তারা এক-একজন ১,০০০ পাউণ্ড (১০,০০০৲ টাকা) সঙ্গে নিয়ে ইংল্যাণ্ডে ফিরে যাবে।”[১]

বস্তুতঃ লুণ্ঠনকারীদের পক্ষে দিল্লী ছিল স্বর্গরাজ্য। সোনা, রূপা, অলঙ্কার, মণি, মুক্তা, হীরা, কার্পেট, সিল্ক ও পশমের কাপড়—কিছুরই অভাব ছিল না। এ সব ধনরত্ন প্রাণ ভরে লুট করার প্রতিশ্রুতিতে প্রলুব্ধ হয়ে যেসব শিখ, পাঠান, বালুচী দুর্বৃত্ত-গুণ্ডা-বদমাশের দল ইংরেজ বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল, তারা ও ইংরেজ সৈন্যরা এমন সুযোগ পাওয়া মাত্রই হিংস্র জন্তুর মতো তাদের শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। দিল্লীর লুণ্ঠন সম্বন্ধে কে' এই ভাবে বর্ণনা দিয়েছেন :

“দিল্লী লুণ্ঠন করা শিখদের অনেক দিনকার একটা দিবা-স্বপ্ন। তাদের এই চিরাকাঙ্ক্ষিত অভিলাষ পুরণ করবার এখন তারা সুযোগ পেল। কোনো সঙ্কোচ আর তাদের বাধা দিয়ে রাখতে পারল না। সম্ভবতঃ পূর্ব-অভিজ্ঞতা ও চরিত্রগত ধূর্তামি দ্বারা তারা জানত যে, কি ভাবে লুক্কায়িত ধনরত্নের গুপ্তস্থান সন্ধান করে বার করতে হয়। যদি তা মেঝের নীচে পুঁতে রাখা হয়, তা হলে ফাটা জায়গায় তারা জল ঢেলে দিত ; যদি সত্যই পূর্বে ঐ স্থান খনন করা হয়ে থাকে তা হলে জল ভিতরে প্রবেশ করে যাবে, তা না হলে জল মেঝের উপর ভেসে উঠবে। আর যদি দেওয়ালে ইট দিয়ে গেঁথে রাখা হয়, তা হলে একজন চিকিৎসক যেমন রোগীর বক্ষঃস্থল পরীক্ষা করেন, সেই ভাবে কান পেতে টোকা মেরে দেখা হবে। ··· যে অসংখ্য পরিমাণ দেওয়াল ভেঙে ফেলা হয়েছিল ও মেঝে খুঁড়ে ফেলা হয়েছিল, তার থেকেই বোঝা গিয়েছিল যে, এরা এ বিষয়ে কতখানি উৎসাহ ও কর্মক্ষমতা দেখিয়েছিল। এটাও দেখা গিয়েছিল যে, তারা দেওয়ালের উপর দিয়ে এই সব লুটের মাল তাদের বন্ধুদের হাতে তুলে দিয়েছিল এবং তারা গরুর গাড়ি বোঝাই করে নিয়ে গিয়েছিল। তারা বলেছিল যে, তাদের দেশবাসীরা দিল্লীর পতনের কথা বিশ্বাসই করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা তাদের চোখের সামনে এই লুটের প্রমাণ দেখতে পাবে। কিন্তু কেউ যেন না ভাবেন যে, শিখরাই এই লুটের একমাত্র আংশীদার ছিল। সব জাতির সৈন্য ও তাদের অনুচররা নির্দয়ভাবে যেখানে যা পেয়েছে, তাই হস্তগত করেছে। ইউরোপীয় সৈন্যরাও, একটু কম করে হলেও, এই লুটে অংশ গ্রহণ করেছে। কিন্তু শিখ কমরেডদের মতো তাদের দৃষ্টি এতটা তীক্ষ্ণ ছিল না।”[২]

১। বল্ : “হিষ্ট্রি অব দি ইণ্ডিয়ান মিউটিনি,” ১ম, পৃঃ ৫২২।

২। কে' : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬৪০-৪১।

বস্তুতঃ ভাড়াটিয়া শিখ, পাঠান, বালুচী, গুর্খা এবং ইংরেজরাও এই অমানুষিক হত্যাকাণ্ড ও লুণ্ঠনের জন্য সমানভাবে দায়ী। কিন্তু এই সব দুষ্ট-চরিত্র ও গুণ্ডা-প্রকৃতির ভাড়াটিয়া শিখদের দুষ্কর্মের জন্য ঐতিহাসিক কে' যে সমগ্র শিখ জাতির প্রতি বক্রোক্তি করেছেন, তা তাঁর মতো একজন সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিকের পক্ষেই সম্ভব। কে' ও অন্যান্য ইংরেজ ঐতিহাসিকরা অনেক স্থলে উল্লেখ করেছেন যে, কত রকমের প্রতিশ্রুতি দিয়ে, কত প্রলোভন দেখিয়ে এবং লুণ্ঠনের অবাধ সুযোগ দেওয়া হবে বলে এই সব বাছাই-করা দুশ্চরিত্রদের ইংরেজ সৈন্যদলে ভর্তি করা হয়েছিল। দিল্লীর ও অন্যান্য স্থানের পাশবিক হত্যাকাণ্ড ও লুণ্ঠনের জন্য সম্পূর্ণভাবে ইংরেজরাই দায়ী। শিখদের তথাকথিত 'চিরকালের দিবা-স্বপ্ন', 'জাতীয় প্রতিশোধ নেবার আকাঙ্ক্ষা' ইত্যাদি বিষয়ে ইংরেজ শাসকরাই উস্কানি দিয়ে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে শিখদের উত্তেজিত করবার চেষ্টা করেছিলেন এবং আংশিকভাবে সফলও হয়েছিলেন।

শিখদের এই প্রকার ব্যবহার ইংরেজ শাসকবর্গের নিকট চিন্তার কারণও হয়ে উঠল। ইনটেলিজেন্স বিভাগের কর্তা মুইর লিখলেনঃ "সুবিবেচক লোকেরা এই ভেবে আশঙ্কিত হচ্ছেন যে, শিখরা যে পরিমাণ ধনরত্ন লুট করে নিয়ে যাচ্ছে, তা দেখে তাদের দেশবাসীরাও যদি অনুরূপ ধনরত্ন অর্জন করবার জন্য তাদের উদাহরণ অনুসরণ করতে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে ওঠে, তা হলে ব্যাপারটা আমাদের পক্ষে খুব অনুকূল না-ও হতে পারে।"[১]

"লুণ্ঠনের ব্যাপারে ইংরেজ বীরপুরুষরা, সে সম্মানিত অফিসারই হোক কিম্বা সামান্য সৈনিকই হোক, কেউ কারও পিছনে পড়ে ছিল না।" জেনারেল উইলসনের স্টাফের একজন অফিসার গ্রিফিথ্‌স্ তাঁর বইতে একজন ইংরেজ অফিসারের কথা উল্লেখ করেছেন, যে দু' লক্ষ টাকার মূল্যবান দ্রব্যাদি লুট করেছিল। গ্রিফিথ্‌স্ আরও বলেছেনঃ "যে উদাহরণটি এই মাত্র দেওয়া হল, এ রকম আরও অনেক উদাহরণ আমরা ঐ সময় জানতাম, যাদের প্রত্যেকের লুণ্ঠিত টাকার পরিমাণ দু' লক্ষ টাকার থেকে কিছুবা কম ছিল।"[২] এই সব দস্যুর দল মন্দির ও মসজিদ লুণ্ঠন করতেও এতটুকু ইতস্তত: করেনি। "মন্দিরের মূর্তিগুলি বিনা বাক্যব্যয়ে ফেলে দিয়েছিল এবং পূজার বেদী ভেঙে লুক্কায়িত ধনরত্নের সন্ধান করেছিল।"[৩] এই সব দেখে দিল্লীর ইংরেজ বাহিনীর একজন ইংরেজ

১। "রেকর্ডস্ অব দি ইনটেলিজেন্স ডিপার্টমেণ্ট," ১ম, পৃঃ ২০৮।

২। গ্রিফিথ্‌স্ঃ "সীজ অব দিল্লী," পৃঃ ২৩৪-৩৫।

৩। ঐ, পৃঃ ২৪৫।

চিকিৎসক ইনটেলিজেন্স বিভাগের কর্তা মুইরকে লিখেছিলেন : "শহরের প্রতিদিনকার লুণ্ঠনের পরিমাণ অত্যধিক বেশী—এত বেশী যে তা প্রায় বিশ্বাস করা যায় না। আমার মনে হয়, দিল্লীতে উপস্থিত প্রত্যেক অফিসার চাকুরি থেকে এখনই অবসর গ্রহণ করতে পারবেন।"[১] বাস্তবিকপক্ষে, ইংল্যাণ্ডে ফিরে যাবার পরই 'প্রচুর সংখ্যক' অফিসার ও সৈন্য চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করেছিল।[২] ব্যক্তিগতভাবে লুণ্ঠন ছাড়াও সরকারীভাবে সাড়ে পঁয়ত্রিশ লক্ষ লুটের টাকা দিল্লীর সৈন্যদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছিল।[৩]

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ধরে বিনা বাধায় এই হত্যাকাণ্ড ও লুণ্ঠন দিল্লী শহরে ও চতুষ্পার্শ্বে বেপরোয়াভাবে চলতে লাগল। এর ফলে ইংরেজ বাহিনীর সৈন্যদের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা এতই বেড়ে গেল যে, দিল্লীর সেনানায়ককে লুণ্ঠন বন্ধ করবার জন্য ২১শে ডিসেম্বর তারিখে একটা কড়া আদেশ জারি করতে হল। ঐ অফিসার ২১শে ডিসেম্বর তাঁর রিপোর্টে লিখেছিলেন : "বিনা বাধায় এ রকম লুটপাটের ফলে শৃঙ্খলা একেবারেই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। শত্রু হোক, মিত্র হোক, বিনা পক্ষপাতিত্বে সকলকেই সমানভাবে লুট করা হয়েছে। এমন কি আমাদের দেশবাসীদের সম্পত্তি পর্যন্ত, যা বিদ্রোহীদের নিকট থেকে উদ্ধার করা গিয়েছিল, তা-ও যুদ্ধের পুরস্কার বলে ঘোষণা করে আত্মসাৎ করতে দেওয়া হয়েছে।"[৪] তিন-চার মাস ধরে এ রকম বেপরোয়াভাবে লুটপাট করবার পর যখন লুট করার মতো আর কিছুই থাকল না, তখনই লুট বন্ধ হল।

১। "রেকর্ডস্ অফ দি ইনটেলিজেন্স ডিপার্টমেণ্ট", ১ম, পৃঃ ২৩৯
২। গ্রিফিথ্স্ : "সীজ অব দিল্লী", পৃঃ ২৩৩।
৩। "মিলিটারী প্রসিডিংস", নং ১২৭৯, ফেব্রুয়ারি ১৮৬৯।
৪। "পাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্ডস্", ৭ম খণ্ড, ২য়, পৃঃ ২৮১।

বাহাদুর শাহর গ্রেপ্তার ও বিচার

বাহাদুর শাহ্ যখন প্রাসাদ ত্যাগ করে ১৯শে সেপ্টেম্বর দিল্লীর ৯ মাইল দক্ষিণে কুতুবে আশ্রয় নিলেন, তখনও শত্রুর নিকট আত্মসমর্পণের কোনো ইচ্ছা তাঁর ছিল না। তা থাকলে প্রাসাদে বসেই তিনি তা করতে পারতেন। বাদশাহ্ কোথায় গিয়েছেন ইংরেজরা জানত না। তাদের এমন শক্তিও ছিল না যে, তারা বিদ্রোহীদের অনুসরণ করে। তা ছাড়া তখনও প্রচুর সংখ্যক বিদ্রোহী তাঁকে রক্ষা করবার জন্য তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই ছিল। এই সময় ইংরেজদের দুটো ভয়ের কারণ ছিল—হয়ত বিদ্রোহীরা সদলবলে ফিরে এসে দিল্লীতে আবার তাদের আক্রমণ করবে, নতুবা তারা বাহাদুর শাহকে অন্যত্র নিয়ে গিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। জেনারেল বখ্‌ত খান ও আরও কয়েকজন বিদ্রোহী অফিসার তখনও বাহাদুর শাহর সঙ্গেই ছিলেন। তাঁরা তাঁকে অযোধ্যায় নিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন। তাঁরা বাদশাহকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে, যদিও ইংরেজরা দিল্লী দখল করেছে, তবু এখনও সমস্ত অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ড তাঁদের সামনে রয়েছে এবং তাঁর ছত্রতলে যুদ্ধ চালিয়ে গেলে এখনও যুদ্ধে জিতবার সম্ভাবনা রয়েছে। এইটাই যে তাঁর পক্ষে একমাত্র সম্মানজনক পথ ছিল, তা বাহাদুর শাহ নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিলেন। বস্তুতঃ, তাঁর জীবনের আর ক'টা দিনই বা বাকি? তিনি কি শেষে জীবনের এই বাকি ক'টা অবশিষ্ট দিনের জন্য দাম্ভিক বিদেশী শত্রুর হাতে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবেন? যখন মরতেই হবে, তখন সৈন্যদের সঙ্গে থেকে রাজার মতো, মানুষের মতো মরাই তো শ্রেয়। তাঁর নিজের ও জাতির এই মহা-পরীক্ষার দিনে তিনি বাবর, হুমায়ুন ও আকবরের মতো মনুষ্যোচিত পথ অনুসরণ করবেন না?

যখন এই সম্মানজনক পথই তিনি বেছে নিতে যাচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময়ে তিনি তাঁর দুর্বলতার বশে এলাহী বক্স ও জিন্নৎ মহলের চক্রান্তে পা বাড়ালেন।

বখ্‌ত খান বাদশাহকে ওজস্বিনী ভাষায় আযোধ্যায় যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য যা বললেন, তা এলাহী বক্স চুপ করে শুনে গেলেন। তারপর বখ্‌ত খান যখন বাদশাহের নিকট থেকে পরদিন হুমায়ুনের কবর-ভূমিতে তাঁর সঙ্গে আবার দেখা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি নিয়ে চলে গেলেন, তখন এলাহী বক্স বাদশাহকে অনেক সাধ্য-সাধনা করে তাঁর বাসস্থানে নিয়ে গেলেন। সেখানে তিনি তাঁকে বোঝাতে লাগলেন যে, বিদ্রোহীদের সঙ্গে যাওয়া তাঁর পক্ষে কতখানি কষ্টসাধ্য কার্য, বিশেষ করে বিদ্রোহীদের পরাজয় যখন নিশ্চিত। তারপর তিনি অন্য দিকটা তুলে ধরলেন—বাদশাহ যদি তৎপর হয়ে বিদ্রোহীদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলেন তা হলে বিজেতা ইংরেজদের বিশ্বাস করানো যাবে যে, এ পর্যন্ত তিনি যা কিছু করেছেন সবই তাঁকে দিয়ে জোর করে করিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং তিনি প্রথম সুযোগ পাওয়া মাত্রই বিশ্বাসঘাতকদের সঙ্গে সম্বন্ধ ত্যাগ করেছেন।"[১]

বাহাদুর শাহর প্রিয় বেগম জিন্নৎ মহলও এই আলোচনায় যোগ দিলেন ও তাঁকে ইংরেজদের নিকট কয়েকটি শর্তে আত্মসমর্পণের জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। এইরূপ দোটানায় পড়ে বৃদ্ধ বাদশাহ যে খুবই বিভ্রান্ত হয়ে পড়বেন তাতে আর আশ্চর্য কি ? তাঁর পূর্বেকার সঙ্কল্প শিথিল হয়ে পড়ল। তাঁর শারীরিক ও মানসিক অবস্থা যে তখন খুবই শোচনীয় তা সহজেই অনুমেয়। তখন তাঁর বয়স প্রায় ৯০ বৎসর।[২]

এ রকম বৃদ্ধ বয়সে চার মাস ধরে অবিরাম যুদ্ধের ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার পর পুনরায় একটা অজানিত পরিবেশে তাকে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে—এ কঠিন সমস্যার সমাধান করা তাঁর পক্ষে সহজ ছিল না। দিল্লীর যুদ্ধে পরাজয়ের পর যখন বাহাদুর শাহর শরীর ও মন একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়েছে, তখন জিন্নৎ মহল ও এলাহী বক্স কৌশল করে বিদ্রোহী নেতাদের প্রভাব থেকে তাঁকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন একেবারে তাঁদের নিজেদের আওতায়। সঙ্গে সঙ্গে এলাহী বক্স দিল্লীতে ইংরেজের প্রধান গুপ্তচর ও তাঁর বন্ধু রজ্জব আলিকে বাহাদুর শাহর অবস্থানের খবর পাঠিয়ে দিলেন।[৩] রজ্জব আলিও তৎক্ষণাৎ দিল্লীর ইংরেজ বাহিনীর ইনটেলিজেন্স

১। ম্যালিসন : "ইণ্ডিয়ান মিউটিনিজ"—কেবিনেট এডিসন, ৪র্থ, পৃঃ ৫৫।

২। রাইক্‌স্‌ : "নোটস্‌ অন্‌ দি রিভোল্ট", পৃঃ ৮১।

৩। ঐ, ৪র্থ, পৃঃ ৫২। এই পৃষ্ঠাতেই ম্যালিসন রজ্জব আলি সম্বন্ধে বলেছেন যে, একজন সর্বোচ্চ দরের গুপ্তচর হতে হলে যেসব গুণ থাকা দরকার—দক্ষতা, ধূর্ততা, দুঃসাহস ও নিশ্চয়তা—রজ্জব আলির এ সব গুণই ছিল। ইংরেজেরা তাকে বিশ্বাস করত, সেও ইংরেজের অনুগত ছিল।

বিভাগের প্রধান অফিসার ক্যাপ্টেন হড্‌সনকে এই মূল্যবান খবরটি পাঠিয়ে দিল। এইখানে হড্‌সনের একটু পরিচয় দেওয়া বোধ করি অবান্তর হবে না। লেফটেনান্ট উইলিয়াম হড্‌সন ছিল হেনরী লরেন্সের একজন আশ্রিত ও প্রিয় পাত্র। পাঞ্জাব অধিকারের পর লরেন্স তাকে নবগঠিত 'গাইড কোরের' নায়ক নিযুক্ত করেন, কিন্তু শীঘ্রই 'হিসাবপত্রের গণ্ডগোলের জন্য' তাকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল এবং লণ্ডনের ডাইরেক্টররা তার সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিল যে, "সে কোনো দায়িত্বপূর্ণ কাজের উপযুক্ত নয়।" ডালহাউসিও তার উগ্র মেজাজ ও ঔদ্ধত্যের জন্য তাকে ভর্ৎসনা করেছিলেন। তারপর বিদ্রোহের সময় সে তার 'যোগ্যতা' প্রমাণ করবার আবার একটা সুযোগ পেল। দিল্লীর ইংরেজ বাহিনীর ইনটেলিজেন্স শাখার জন্য তাকে একটা পুরো বাহিনী গঠন করবার দায়িত্ব দেওয়া হয়।[১] ম্যালিসন তার সম্বন্ধে বলেছেন: "সে ছিল মধ্যযুগের একজন দস্যু। ··· মানুষের দুঃখ দুর্দশা দেখে তার মধ্যে কোনো সহানুভূতি জাগত না, রক্তপাতে তার কোনো দুঃখ হত না, খুন করে তার কোনো মর্মপীড়া হত না।[২] সংক্ষেপে, হড্‌সন ছিল একজন সত্যিকারের ঔপনিবেশিক 'হীরো'!

হড্‌সন রজ্জব আলির কাছ থেকে সংবাদ পাওয়া মাত্রই হেড কোয়ার্টারে গিয়ে জেনারেল উইলসনকে এ কথা রিপোর্ট করল এবং বাদশাহের সঙ্গে তাঁর আত্মসমর্পণ সম্বন্ধে এলাহী বক্সের মাধ্যমে কথাবার্তা চালাবার অনুমতি চাইল। সে আরও বলল যে, বাদশাহকে তাঁর জীবনের গ্যারান্টি দিলেই তিনি খুব সম্ভব আত্মসমর্পণ করতে রাজী হবেন। কিন্তু এটা একটা রাজনৈতিক ব্যাপার ও এইরূপ ব্যাপারে জেনারেল উইলসনের হস্তক্ষেপ করার কোনো অধিকার ছিল না। দিল্লীতে বেসামরিক কাজের জন্য ভার ছিল হার্ভী গ্রেটহেডের উপর, কিন্তু ২০শে সেপ্টেম্বর কলেরায় তাঁর মৃত্যু ঘটে। উইলসন প্রথমে হড্‌সনকে বাহাদুর শাহর সঙ্গে কোনো শর্তেই কথাবার্তা চালাতে দিতে রাজী হননি এবং বাদশাহের প্রাণ বাঁচাবার গ্যারান্টি দিতেও তাঁর যথেষ্ট আপত্তি ছিল। তাঁর মতে বাহাদুর শাহ ছিলেন আইনের আশ্রয়-বহির্ভূত লোক (outside the law)—তাঁর সঙ্গে কোনো কথাবার্তাই চলতে পারে না; তাঁর একমাত্র শাস্তি—মৃত্যু।[৩] কিন্তু তখন সেখানে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের পীড়াপীড়িতে উইলসন অবশেষে যখন বুঝতে পারলেন যে, বাদশাহকে আর কোনো উপায়েই ধরা যাবে না, তখন তিনি হড্‌সনকে বাহাদুর শাহর প্রাণ বাঁচাবার শর্তে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা চালাবার অনুমতি দিলেন।

১। কে': পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ২য়, পৃঃ ১৮২।

২। ম্যালিসন: "ইণ্ডিয়ান মিউটিনিজ", ২য়, পৃঃ ৭৫। ৩। ঐ, ৪র্থ, পৃঃ ৫২।

এ বিষয়ে ১১ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৮, হড্‌সন নিজেই লিখেছিল: "উইলসন বাদশাহের পশ্চাদ্ধাবন করবার জন্য সৈন্য পাঠাতে রাজী হলেন না। তখন, এবং শুধু তখনই, একটা বৃহত্তর বিপদ এড়াবার জন্য তাঁর কাছে বাদশাহের জীবনের প্রতিশ্রুতি চেয়েছিলাম এবং পেয়েওছিলাম,—শুধুমাত্র এই কারণেই যে, তাঁকে আমাদের হাতের মুঠোর মধ্যে আনবার আর কোনো উপায় ছিল না।"[১]

মুইরও লিখে গেছেন: "এই সময়ে আমরা জানতাম না বাহাদুর শাহ ও তাঁর পরিবার কোথায় আছেন। বাহাদুর শাহকে তাঁর জীবনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে যদি হড্‌সনকে এলাহী বক্সের সঙ্গে কতাবার্তা চালাবার অধিকার না দেওয়া হত, তা হলে একেবারেই বাদশাহকে ধরতে পারতাম কি না, সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।"[২]

উইলসনের অনুমতি পাওয়া মাত্রই হড্‌সন রজ্জব আলির মাধ্যমে এলাহী বক্স ও জিন্নৎ মহলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে তাঁদের জানাল যে, বাদশাহকে যেন তাঁরা কোনো মতেই বিদ্রোহীদের সঙ্গে অন্যত্র চলে যেতে না দেন। এ বিষয়ে হড্‌সন লিখেছিল: "এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমি এলাহী বক্সকে ডেকে পাঠালাম ও তাঁর মধ্যস্থতায় জিন্নৎ মহলের সঙ্গে আমি কথাবার্তা চালাতে লাগলাম।"[৩]

প্রথমদিকে বেগম জিন্নৎ মহল বিদ্রোহীদের একজন খুব উৎসাহী সমর্থক ছিলেন এবং তিনি আশা করেছিলেন যে, এজন্য বিদ্রোহীরাও তাঁর পুত্র জওয়ান বখ্‌তকে বাহাদুর শাহর উত্তরাধিকারী বলে মেনে নিতে রাজী হবে। কিন্তু এ বিষয়ে সিপাহী নেতারা কোনো উৎসাহই দেখাননি। জেনারেল বখ্‌ত খান বিদ্রোহী বাহিনীর অধিনায়ক হবার পর তাঁর সঙ্গেও কিছুদিনের জন্য ষড়যন্ত্র করেছিলেন এবং বখ্‌ত খানও নিজের ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য বেগমকে এ বিষয়ে নিরুৎসাহ করেননি। মির্জা মোগলের সঙ্গে বখ্‌ত খানের ঝগড়ার এটাও একটা কারণ ছিল। কিন্তু কিছুকাল পরে বেগম আর বখ্‌ত খানের কাছ থেকেও কোনো আশা পাননি। তারপর থেকেই জিন্নৎ মহল তাঁর পিতা এলাহী বক্সের সঙ্গে মিলিত হয়ে ইংরেজের সঙ্গে চিঠিপত্রের আদান-প্রদান শুরু করেন।

দিল্লীর পতনের পর তিনি আবার ইংরেজের সঙ্গে দর-কষাকষি করবার একটা সুযোগ পেলেন। অবস্থার যে সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে, তিনি হয়ত তা উপলব্ধি করতে পারেননি। স্বভাবতঃই তিনি জওয়ান বখ্‌তের ভবিষ্যৎ

১। হোমস্: "হিস্ট্রি অব দি ইণ্ডিয়ান মিউটিনি", ৩য় সংস্করণ, পৃঃ ৩৭২-৭৩।
২। "রেকর্ডস্ অব দি ইনটেলিজেন্স ডিপার্টমেণ্ট", ১ম, পৃঃ ২২০।
৩। "পাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্ডস্", ৭ম খণ্ড, ২য়, পৃঃ ৩২৫।

সম্বন্ধে খুবই চিন্তিত ছিলেন, কারণ যদিও সে তখন মাত্র একটি বালক ও বিদ্রোহে কোনো অংশ গ্রহণ করেনি, তবুও সে এমন শিশুও আবার ছিল না, যার জন্য ইংরেজের আক্রোশ থেকে সে রেহাই পেয়ে যেতে পারে। এলাহী বক্স ও রজ্জব আলির মন্ত্রণায় প্রলুব্ধ হয়ে তিনি ভাবলেন যে, তিনি যদি বাদশাহকে আত্মসমর্পণ করতে রাজী করাতে পারেন, তা হলে ইংরেজরা খুশী হয়ে কৃতজ্ঞতার বশে তাঁর পুত্রের জীবন-রক্ষা তো করবেই, এমন কি তাকে তারা মোগল সিংহাসনের উত্তরাধিকারী বলে মেনেও নিতে পারে। এই সব অলীক স্বপ্নে বিভোর হয়ে বেগম দু' ঘণ্টা ধরে বিভ্রান্ত, শক্তিহীন, আশাহত বৃদ্ধ স্বামীর উপর স্ত্রীলোকের সকল রকমের অস্ত্রপ্রয়োগ করে তাঁর মনস্কামনা সিদ্ধ করে নিলেন।

কিন্তু এ সবের পিছনে জিন্নৎ মহলের পিতা এলাহী বক্সের যে হাত ছিল, সেটা ভুললে চলবে না। এখানে সেই এলাহী বক্সের সামান্য একটু পরিচয়ও অবান্তর হবে না। তার সম্বন্ধে কে' লিখেছেন যে, বাদশাহের আত্মসমর্পণের বিষয়ে "আমরা দিল্লীর বাদশাহ পরিবারের একজন বিশ্বাসঘাতক, অর্থাৎ তখনকার ফ্যাসান-অনুযায়ী বলতে গেলে একজন 'রাজভক্ত' সভ্যের নিকট ঋণী। তিনি হচ্ছেন মির্জা এলাহী বক্স (বাদশাহের শ্বশুর)। এই লোকটি, যাঁকে সকলেই অন্যান্যদের চাইতে 'সম্মানিত' বলে মনে করত, নিশ্চয়ই খুব দূরদর্শী ছিলেন। ইংরেজরা শেষ পর্যন্ত জয়ী হবে—এই বিশ্বাসে তিনি স্পষ্টই বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর ব্যক্তিগত স্বার্থ গোপনে ইংরেজকে সাহায্য করাই, আর সেই স্বার্থের পরিপূরক হিসাবে প্রকাশ্যে বাদশাহের বন্ধুবৎ পরামর্শদাতার মর্যাদা দাবি করা। এই ভাবে যে খেলা তিনি দেখিয়েছিলেন তা প্রাচ্যের ধূর্তামিতে কম বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নয়। বিদ্রোহী নেতারা বাদশাহকে সঙ্গে করে নিয়ে চলে যাবার জন্য খুবই ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল। তারা তাঁকে বুঝিয়েছিল যে, রসদ ফুরিয়ে যাবার জন্যই তাঁরা দিল্লী পরিত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছিল। ··· অন্যত্র তারা ইংরেজদের সঙ্গে আরও ভীষণভাবে লড়বে। তাদের চেষ্টা প্রায় সফল হয়ে আসছিল, এমন সময় এই ধূর্ত মির্জা বৃদ্ধ বাদশাহকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দেবার কাজ থেকে তাঁকে নিরস্ত করেছিলেন।"[১]

জিন্নৎ মহলের সঙ্গে কথাবার্তা চালানোর পিছনে হড্‌সনের কেবলমাত্র শত্রু-নিপাত করা ছাড়াও আর এক উদ্দেশ্য ছিল। বাদশাহ আত্মসমর্পণে সম্মতি জানালে, হড্‌সন যে কেবলমাত্র বাহাদুর শাহর জীবন-রক্ষারই প্রতিশ্রুতি দিল তা নয়, সে বিনা অধিকারে জওয়ান বখ্‌তের জীবন-রক্ষার প্রতিশ্রুতিও দিয়ে দিল;

১। 'কে ঃ পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ৩য়, পৃঃ ৬৪৪।

অবশ্য উদারতা ও দয়ার পরবশ হয়ে নয়—জিন্নৎ মহলের নিকট থেকে দু' লক্ষ টাকা পাবার অঙ্গীকারে।[১] এডমণ্ড স্টোনের নিকট সণ্ডার্সের চিঠি থেকে আরও জানা যায় যে, জওয়ান বখ্‌ত তার মায়ের টাকা ও গহনা কোথায় লুকানো আছে সে খবর পরে সে ইংরেজদের কাছে প্রকাশ করে দেয়। তারপর জিন্নৎ মহলের বাড়ি লুট হয় ও ২ লক্ষ টাকার উপর অলঙ্কার ও মুদ্রা ইংরেজরা আত্মসাৎ করে নেয়।

যাই হোক, বাহাদুর শাহকে তাঁর জীবন-রক্ষা সম্বন্ধে এই প্রতিশ্রুতি-দানে ভারতের ইংরেজ শাসকবর্গ যে খুবই ক্রোধান্বিত হয়েছিলেন, তা ভারত সরকারের তদানীন্তন সেক্রেটারি সিলিল বীডন-এর ঔদ্ধত্যপূর্ণ চিঠি (১০ই অক্টোবর মুইরকে লিখিত) থেকেই বোঝা যায়: "দিল্লীর বাদশাহের সঙ্গে এরূপ রফা করাটা আমার কাছে খুবই আপসোসের কথা বলে মনে হয়। তাঁর পৌত্র ও পুত্রদের যেরূপ ন্যায্যভাবে প্রাণদণ্ড হয়েছে, সেভাবে তাঁরও উপযুক্ত শাস্তি—মৃত্যু। আমার মনে কোনো রকমের সংশয় নেই যে, এই লোকটি হচ্ছেন বিদ্রোহীদের একজন প্রধান নেতা, সুতরাং মৃত্যুদণ্ডই তাঁর প্রাপ্য এবং আমি এটা নিশ্চয় করে বলতে পারি যে, আমরা যদি তাঁকে প্রাসাদের প্রাচীরে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিতাম তা হলে তার ফল সমস্ত ভারতবর্ষে খুব ভাল হত। এটা না করার জন্য লোকে ভাববে যে, আমরা ভয়ের জন্যই তা করিনি।"[২] এই চিঠি থেকে একটা বিষয় পরিষ্কার ভাবেই বোঝা যায় যে, বাহাদুর শাহর 'অপরাধ' সম্বন্ধে ইংরেজ শাসকবর্গের কোনো সন্দেহই ছিল না।

২১শে সেপ্টেম্বর হড্‌সন ৫০ জন বাছাই-করা অশ্বারোহী নিয়ে হুমায়ুনের কবরের নিকট একটা ভাঙা বাড়িতে অপেক্ষা করতে লাগল ও তার দূত রজ্জব আলি ও এলাহী বক্সকে বাদশাহের নিকট পাঠিয়ে দিল। এখানে দু' ঘণ্টা ধরে হড্‌সনকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল, কারণ বাদশাহ তখনও সম্পূর্ণভাবে মন স্থির করে উঠতে পারেননি। তাঁকে আবার নতুন করে আত্মসমর্পণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বোঝাতে হল। তখনও ভারতের ভাগ্য যেন একটা সূক্ষ্ম সুতায় ঝুলছে। চারিদিকে তখনও প্রচুর সংখ্যক সশস্ত্র বিদ্রোহী বিদ্যমান। তারা কি এই লজ্জাকর ঘটনা ঘটতে দেবে? "মরিয়া হয়ে এ সব লোক এ রকম একটা মুহূর্তে যে কি একটা ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটিয়ে বসতে পারত, তা বলা খুবই কঠিন।"[৩]

১। "পাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্ডস্", ৭ম খণ্ড, ২য়, পৃঃ ৩১৮।

২। "রেকর্ডস্ অব দি ইনটেলিজেন্স ডিপার্টমেণ্ট", ২য়, পৃঃ ৩৬১।

৩। কে': পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ৩য়, পৃঃ ৬৪৫।

বাহাদুর শাহ, জিন্নৎ মহল ও জওয়ান বখ্‌ত যখন হড্‌সনের নিকট আত্মসমর্পণ করলেন, তখন প্রচুর লোক সেখানে জমায়েত হয়েছিল। তাদের চোখের সামনে কি শোকার্ত ঘটনা ঘটছে, তা তারা ঠিক উপলব্ধি করতে পারছিল না। এই জনতার মধ্যে কারও মুখ থেকে একটি কথা অথবা একটি ইঙ্গিত ফুটে বেরুলে এক মুহূর্তে হড্‌সন ও তার সঙ্গীদের সেদিন গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যেতে হত এবং বাদশাহকে শত্রুর হাত থেকে তারা ছিনিয়ে নিতে পারত। কিন্তু কিছুই ঘটল না। বাহাদুর শাহ আত্মসমর্পণ করলেন।

হড্‌সন যখন বন্দীদের নিয়ে হেড কোয়ার্টার্সে পৌছল, তখন জেনারেল উইলসন বলে উঠেছিলেন: "অতি উত্তম। তুমি ওঁকে আনতে পেরেছ দেখে আমি খুবই আনন্দিত। আমি সত্যিই তোমাকে কিম্বা ওঁকে পুনরায় দেখব বলে আশা করিনি।"

পরদিন ২২শে সেপ্টেম্বর হড্‌সন আবার হুমায়ুনের কবরে গেল এবং মির্জা মোগল, খিজির সুলতান ও আবু বকরকে আত্মসমর্পণ করতে বলল। কিছুক্ষণ ধরে নিষ্ফল দর-কষাকষির পর তারাও আত্মসমর্পণ করল। সে সময়ে সশস্ত্র বিদ্রোহীরা তাদের পাশেও এসে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু কেউই তাদের প্রতিরোধ করতে বলল না। লাহোর গেটের কাছাকাছি পৌঁছে যখন বিদ্রোহীরা আর তাদের অনুসরণ করল না, তখন হড্‌সন "বন্দীদের গরুর গাড়ি থেকে নামতে বলল ও তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ সব খুলে ফেলতে বলল। তারা কাঁপতে কাঁপতে আদেশ পালন করল, তারপর আবার তাদের গরুর গাড়িতে ফিরে যেতে বলা হল। তখন ··· একজন সৈন্যের কাছ থেকে একটা বন্দুক কেড়ে নিয়ে হড্‌সন ধীরে ধীরে নিজের হাতে তিনজন নিরস্ত্র ও অসহায় বন্দীকে একে একে গুলী করে হত্যা করল। তারপর তার শিকার নিয়ে সে দিল্লীতে প্রবেশ করল ও কোতোয়ালির সামনে প্রকাশ্যে মৃতদেহগুলিকে ঝুলিয়ে রেখে দিল।"[১]

তিনদিন পর, ২৫শ তারিখে, খুব গর্ব করে হড্‌সন লিখেছিল: "আমি নিজের কাজের জন্য সন্তুষ্ট না হয়ে পারছি না। আমাদের জাতির শত্রুদের ধ্বংস করার জন্য চতুর্দিক থেকে সকলেই আমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। সমস্ত ইংরেজ-জাতি উৎফুল্ল হবে।"[২]

আত্মসমর্পণ করার পর বাহাদুর শাহ তাঁর বেগম ও পুত্রসহ তাঁরই প্রাসাদে ভৃত্যদের একটা কামরায় ইংরেজের বন্দী হয়ে অতি হীন অবস্থায় কাল যাপন করতে লাগলেন। একদিন পরে, ২২শে সেপ্টেম্বর গ্রিফিথ্‌স্ তাঁকে

১। 'কে': পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ৩য়, পৃঃ ৬৫০-৫১। ২। ঐ, পৃঃ ৬৫৩।

দেখার পর লিখেছিলেন : "মোগল বংশের এই শেষ প্রতিনিধি একটা 'চারপাই'-র উপরে একটা বালিশে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। ··· তাঁর মুখ দিয়ে একটা কথাও বার হচ্ছিল না। যে অবস্থার মধ্যে তাঁকে ফেলা হয়েছে, তা যেন একেবারেই ভুলে গিয়ে, তিনি দিনরাত জমির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে এইভাবে চুপ করে বসে থাকতেন।"[১] হয়ত তিনি তাঁর আত্মসমর্পণ করার ভুল তখন বুঝতে পেরেছিলেন। কখনও কখনও তিনি কোনো দর্শককে তাঁর স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতেন। অনেক সময় তিনি বসে বসে কবিতা রচনা করতেন, কিন্তু তাঁকে এক টুকরো কাগজ-পেন্সিলও দেওয়া হয়নি, তাই কোনো কোনো সময়ে পোড়া কাঠি দিয়ে দেওয়ালে কবিতাগুলি লেখার চেষ্টা করতেন।

বাহাদুর শাহর বিচার হবে, কি হবে না, সে সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ ছিল। তাঁর 'অপরাধ' সম্বন্ধে তাঁদের কারুরই কোনো সন্দেহ ছিল না। তাই বিনা বিচারে তাঁকে নির্বাসনে পাঠিয়ে দিতে অনেকেই পক্ষপাতী ছিলেন। ২৭শ অক্টোবরে মুইর লিখেছিলেন : "বাদশাহের বিরুদ্ধে প্রমাণগুলি সাজানো ও ব্যাখ্যা করার জন্য তাঁর বিচারের কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। এগুলি সাজিয়ে গুছিয়ে গভর্নমেণ্ট অনায়াসে ছাপিয়ে ইউরোপে পাঠাতে পারে। সব প্রমাণই লিখিতভাবে রয়েছে। বিদ্রোহীদের সঙ্গে প্রকাশ্যভাবে বাদশাহ যেসব কাজ করেছেন, তা প্রমাণ করার জন্য প্রাসাদে যেসব গেজেটগুলি ছাপানো হয়েছিল তাই যথেষ্ট, আর তাঁর গোপনীয় কার্যকলাপ সম্বন্ধেও অনেক নথিপত্র রয়েছে।" যাই হোক, শেষ পর্যন্ত সামরিক আদালতে বাহাদুর শাহর বিচার করাটাই স্থির হল। ইতিমধ্যে মোগল বংশের যে কয়জন রাজপুরুষ দিল্লীতে ধরা পড়েছিল সকলকেই ইংরেজরা ফাঁসিতে ঝুলিয়েছিল। মুইর, ১৯শে নভেম্বর ১৮৫৭, লিখেছিলেন :

"গতকাল সকালে দিল্লীতে ২৪ জন শাহজাদাকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে। দুজন ছিলেন বাদশাহের ভগ্নিপতি, দুজন জামাতা, আর সকলেই ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভাগিনেয়।"[২] জওয়ান বখ্‌তেরও পরে ফাঁসি হয়েছিল। এক বাহাদুর শাহ ব্যতীত বাবর, হুমায়ুন ও আকবরের মোগল বংশ সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে গেল।

২৭শে জানুয়ারি ১৮৫৮, দেওয়ান-ই-খাসে এই বিচার শুরু হল। ৪৪ দিন ধরে বিচারের নামে এই প্রহসন চলেছিল। বাদশাহের বিরুদ্ধে ইংরেজ সরকারের প্রধান অভিযোগ হল : "ভারতে বৃটিশ সরকারের প্রজা হয়েও এবং এই বশ্যতার কর্তব্য উপেক্ষা করে দিল্লীতে ১১ই মে তারিখে সরকারের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে

১। "সীজ অব দিল্লী," পৃঃ ২০২।

২। "রেকর্ডস্ অব দি ইনটেলিজেন্স ডিপার্টমেণ্ট," ১ম, পৃঃ ২৭৩।

তিনি নিজেকে ভারত-শাসনকারী সম্রাট বলে ঘোষণা করেছিলেন এবং তৎক্ষণাৎ বিশ্বাসঘাতকতা করে ও বেআইনীভাবে তিনি দিল্লী শহর দখল করেছিলেন ; ১১ই মে থেকে ১লা অক্টোবর ১৮৫৭-এর মধ্যে বিভিন্ন সময়ে তাঁর পুত্র মির্জা মোগল, মহম্মদ বখ্ত খান ও আরও অনেক বিশ্বাসঘাতকের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন ; এবং এই বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ উদ্দেশ্য সফল করার জন্য ও ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসন ধ্বংস করবার জন্য দিল্লীতে তিনি সৈন্য-বাহিনী জমায়েত করেছিলেন ও বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য তাদের প্রেরণ করেছিলেন।" বাদশাহের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ ছিল এই যে, তিনি দিল্লীতে ইউরোপীয়দের হত্যা করেছিলেন অথবা তাদের হত্যায় সম্মতি দিয়েছিলেন।

বিচার আরম্ভ হলে বাহদুর শাহকে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি পড়ে শোনানো হল এবং একজন দোভাষী তরজমা করে সেগুলি তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন। "তারপর বাদীপক্ষ, দোভাষীর মারফত, তাঁকে প্রশ্ন করলেন, 'দোষী না নির্দোষ?' আসামী কিছুতেই বুঝতে পারলেন না, অথবা বুঝতে না পারার ভান করলেন। তাঁকে বোঝানো বেশ মুশকিল হল। অনেকক্ষণ পরে তিনি বললেন যে, তিনি তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলির প্রকৃতি সম্বন্ধে একেবারেই অজ্ঞ, যদিও অভিযোগ-পত্রের একটা অনুবাদ তাঁকে ২০ দিন পূর্বে দেওয়া হয়েছিল। অনেকক্ষণ পরে পুনরায় আসামী জবাব দিলেন, 'নির্দোষ'। তারপর যখন আদালতে দলিলগুলি পড়া হচ্ছিল, সেই সময়টা আসামী হয় তন্দ্রামগ্ন ছিলেন, নয়ত পার্শ্বে দণ্ডায়মান জওয়ান বখ্তের দিকে তাকিয়ে চিন্তা করছিলেন। জওয়ান বখ্ত একজন ভৃত্যের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিল ও মাঝে মাঝে হাসছিল। তাঁদের বর্তমান অবস্থার দ্বারা তাঁদের দুজনের একজনও অভিভূত হয়েছিলেন বলে মনে হয়নি। পক্ষান্তরে এই ঘটনাকে তাঁরা তাঁদের অদৃষ্টের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি বলেই ধরে নিয়েছিলেন।"[১]

এখানে বলা প্রয়োজন যে, বিচারকালে বাহাদুর শাহর নামে যে জবানবন্দী আদালতে পেশ করা হয়েছিল, তা একেবারেই তাঁর নিজের বক্তব্য কি না, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এ রকম জবানবন্দীর সঙ্গে বিচারকালে বাহাদুর শাহর আচরণের কোনোই সঙ্গতি নেই। তাঁকে 'নির্দোষ' প্রতিপন্ন করার জন্যই তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষীরা এই জবানবন্দী তৈরি করেছিলেন। আত্মসমর্পণ করার পর থেকে বিচারের শেষ পর্যন্ত তাঁর মানসিক অবস্থা যেরূপ ছিল, তাতে তাঁর পক্ষে ঐরূপ জবানবন্দী দেওয়া সম্ভবপর বলে মনে করা যায় না।

১। মার্টিন : "ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার," ৩য়, পৃঃ ১৬২

বিচারের দ্বিতীয় দিনেও বাহাদুর শাহ বিচারালয়ের কার্যাবলী সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন। তাঁকে হুকোয় তামাক খেতে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। আদালতে বসে হয় তিনি হুকো টানতেন, নয়ত কোথায় একটা স্বপ্নলোকে তলিয়ে যেতেন। মাঝে মাঝে মনে হত যেন সজাগ হয়ে সাক্ষীদের কথাবার্তা মন দিয়ে শুনছেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই একটু হেসে আবার তাঁর স্বপ্ন-রাজ্যে ফিরে যেতেন। চতুর্থ দিন "তাঁর স্বাস্থ্য অন্য দিনের চাইতেও একটু ভালই মনে হল ; ঐদিন বেশ খোস-মেজাজেই ছিলেন। এক একটা করে যখন দলিল পড়া হচ্ছিল, তিনি তখন খুব আনন্দের সঙ্গে হাসছিলেন, যেন এতগুলি দলিল দেখে তিনি খুবই আমোদ অনুভব করছিলেন।"[১]

২৪শে ফেব্রুয়ারি বাদীপক্ষের অভিযোগ শেষ হলে আসামীকে জিজ্ঞাসা করা হল তাঁর আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য কত সময় প্রয়োজন। মাত্র এক সপ্তাহ সময় চাওয়া হয়েছিল, কিন্তু আদালত তা অত্যধিক বলে মনে করায় এই অল্প সময়টুকুও তাঁকে দেওয়া হল না। ৯ই মার্চ যেদিন আদালতের শেষ অধিবেশন বসল, সেদিন বাহাদুর শাহর উকিল গোলাম আব্বাস বাদশাহের তরফ থেকে ঘোষণা করলেন ঃ "যে আদালতে বাহাদুর শাহর বিচার হচ্ছে, তাঁকে বিচার করবার অধিকার সেই আদালতের আছে বলে তিনি স্বীকার করেন না, সুতরাং তাঁর বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আনা হয়েছে, তার কোনো উত্তর তিনি দেবেন না।"[২]

তারপর বাদীপক্ষ সমস্ত সাক্ষ্য ও দলিলপত্র পরীক্ষা করে প্রমাণ করলেন যে, সমস্ত সন্ধিপত্র উপেক্ষা করে আসামী নিজেকে স্বাধীন সার্বভৌম সম্রাট বলে ঘোষণা করেছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। উপরন্তু, 'ইউরোপীয়'দের হত্যা, তাঁর হুকুমে না হলেও, তাঁর সম্মতিতে তাঁর পুত্রদের ও মোগল পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিদের সম্মুখে তাঁরই বডি গার্ডদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল। খুব অল্প সময়ের মধ্যে আলোচনা শেষ করার পর বিচারপতিরা রায় দিলেন যে, বাহাদুর শাহর বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ আনা হয়েছে তার সবগুলিতেই তিনি দোষী। এর জন্য বিশ্বাসঘাতক ও হত্যাকারী হিসাবে তাঁর মৃত্যুদণ্ড হওয়াই উচিত ; কিন্তু যেহেতু জেনারেল উইলসনের তরফে ক্যাপ্টেন হড্‌সন ২১শে সেপ্টেম্বর আত্মসমর্পণের পূর্বে তাঁর জীবন-রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সেহেতু এই আদালত তাঁকে যাবজ্জীবন নির্বাসন দণ্ডের হুকুম দিল।[৩]

১। মার্টিন ঃ "ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার" পৃঃ ১৬৪। ২। ঐ, পৃঃ ১৮৪।
৩। ঐ, পৃঃ ১৮৪।

বাহাদুর শাহকে কোথায় নির্বাসন দেওয়া হবে তা স্থির করতে কর্তৃপক্ষের অনেকদিন সময় লেগেছিল। এই সময়টা তাঁর পরিবারকে কি হীন অবস্থায় রাখা হয়েছিল, সে সম্বন্ধে লেয়ার্ড নামে বৃটিশ পার্লামেন্টের একজন ভূতপূর্ব এম. পি. লণ্ডনে একটি প্রকাশ্য জনসভায় ১১ই মে ১৮৫৮ সালে বলেছিলেন: "আমি দিল্লীতে বন্দী বাদশাহকে দেখে এসেছি। ... ঐ বৃদ্ধ লোকটির ভগ্নাবশেষ আমি দেখেছিলাম—একটা ঘরের মধ্যে নয়, প্রাসাদের একটা অতি ঘৃণ্য গর্তের মধ্যে। তিনি একটা 'চারপাই'-র উপর শুয়ে ছিলেন; একটা নোঙরা ছেঁড়া চাদর ছাড়া তাঁর গায়ে দেবার আর কিছু ছিল না! ... তিনি অতি কষ্টে বিছানায় উঠে বসলেন ও আমাকে তাঁর বাহুটি দেখালেন। রোগের জন্য ও জলের অভাবে সেখানে মস্তবড় একটা ঘা হয়েছে, সেখানে মাছি এসে বসছে। খুব দুঃখের সঙ্গে তিনি বললেন যে, তাঁকে উপযুক্ত পরিমাণ খেতে পর্যন্ত দেওয়া হয় না। ... একজন রাজার প্রতি কি আমাদের মতো খৃষ্টানদের ব্যবহার এই হওয়া উচিত? আমি তাঁর পরিবারের স্ত্রীলোকদেরও দেখেছিলাম, তাঁরা জড়োসড় হয়ে এক কোণে বসেছিলেন। আমি জানতে পেরেছিলাম যে, তাঁদের ভরণপোষণের জন্য দেওয়া হয় প্রতিদিন মাত্র ১৬ শিলিং (৮৲ টাকা) করে।"[১]

আন্দামানে তখন অনেক বিদ্রোহী বন্দীদের পাঠানো হচ্ছিল। বাহাদুর শাহকে এই সব বিদ্রোহীদের সন্নিকটে রাখাটা গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিল সমীচীন মনে করলেন না, তাই তাঁরা দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারকে অনুরোধ জানালেন বন্দী বাহাদুর শাহকে স্থান দেবার জন্য। ভারত সরকারের সেক্রেটারি বীড্‌ন চেয়েছিলেন, বাহাদুর শাহকে চীন দেশের হংকং-এ পাঠানো হোক।[২]

বীড্‌নের এই প্রস্তাব যে সাম্রাজ্যবাদীদের একটা উপযুক্ত প্রস্তাবই হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। প্রথম আফিং যুদ্ধের (১৮৩৯-১৮৪২) পর ইংরেজরা হংকং অধিকার করে। দ্বিতীয় আফিং যুদ্ধের (১৮৫৭) পর কোয়াংটাং প্রদেশের গভর্নর জেনারেল ইয়েহকে চীনের স্বাধীনতা রক্ষা করবার জন্য ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অপরাধে বন্দী করে কলকাতায় নির্বাসন দেওয়া হয় ও কলকাতার জেলে ১৮৬০ সালে মাতৃভূমি থেকে বহু দূরে তাঁর মৃত্যু হয়। তেমনি পাল্টা বাহাদুর শাহকে সুদূর বিদেশ হংকং-এর জেলে নির্বাসন দেওয়ার নিষ্ঠুর প্রস্তাবটিও বীড্‌নের মাথা থেকে বেরিয়েছিল।

৭ই অক্টোবর ১৮৫৮ সালে, বন্দী বাদশাহ ও তাঁর পরিবারকে গোপনে কড়া মিলিটারী পাহারায় একটা অজানিত গন্তব্য স্থানের পথে দিল্লী ত্যাগ করতে হল।

১। মার্টিনের পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১৮৫। ২। ঐ, পৃঃ ১৮৭।

তাঁরা কানপুর হয়ে ৪ঠা নভেম্বর এলাহাবাদে পৌছলেন। সেখান থেকে একটা স্টিমারে করে ৪ঠা ডিসেম্বরে তাঁরা ডায়মণ্ডহারবারে আসেন। বাহাদুর শাহর সঙ্গে ছিলেন তাঁর দুই পত্নী, বেগম তাজ মহল ও বেগম জিন্নৎ মহল এবং জওয়ান বখ্‌তের বালিকা স্ত্রী। পতিত ও লাঞ্ছিত বাদশাহের শেষ জীবনে তাঁর দুঃখকষ্টের অংশ গ্রহণ করে ভার একটু লাঘব করবার জন্য ভারতীয় নারীর মহান ঐতিহ্য অনুসরণ করে বিনা দ্বিধায় এই তিনটি মহীয়সী মহিলা স্বেচ্ছায় নির্বাসন বরণ করেছিলেন। প্রকৃত মুসলমানের ন্যায় প্রফুল্ল মনে তাঁরা অদৃষ্টের আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছিলেন। যে অফিসার রক্ষী হয়ে তাঁদের সঙ্গে গিয়েছিলেন, তাঁর কথায়ঃ "তাঁরা এতই প্রফুল্ল চিত্তে ছিলেন যে, তাঁদের দেখে মনে হত যেন তাঁরা দেশ ভ্রমণে চলেছেন।"

বন্দীরা কলকাতায় পৌছবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের একটা যুদ্ধ জাহাজ, 'মেঘেড়া'তে তুলে নেওয়া হল এবং ঐদিনই সকাল ১০ টার সময় জাহাজ সমুদ্রপথে যাত্রা শুরু করল, যার গন্তব্যস্থল একমাত্র জাহাজের ক্যাপ্টেনই জানতেন। এর ৪০ দিন পর, ১১ই জানুয়ারি ১৮৫৯, সালে, বন্দী বাহাদুর শাহর অদৃষ্ট সম্বন্ধে সাধারণ মানুষ অবগত হল এই ছোট্ট সংবাদটিঃ "দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার বাহাদুর শাহকে স্থান দিতে অসম্মত হওয়ায়, দিল্লীর ভূতপূর্ব বাদশাহকে 'কেপ অব গুড হোপে'র পরিবর্তে বৃটিশ-বর্মার রেঙ্গুনে পাঠানো হয়েছে। বাদশাহ ৯ই ডিসেম্বর রেঙ্গুন পৌছেছেন। তাঁকে নিয়ে যাওয়া হবে রেঙ্গুন থেকে ৩০০ মাইল ও পেগু থেকে ১২০ মাইল দূরে, সিটাং নদীর ধারে, কারেন দেশের নিকটবর্তী টংঘো নামক দূষিত ও জনশূন্য একটা স্থানে।"

চার বৎসর পর, ৭ই নভেম্বর ১৮৬২ সালে, এই নির্বাসনে বাহাদুর শাহর মৃত্যু হয়।

।। ব্রহ্মের টংঘুতে বাহাদুর শাহের শেষ দিনগুলি

বাহাদুর শাহ কি বিশ্বাসঘাতক ?

এই বই যখন লেখা শেষ হয়ে এসেছে, তখন ভারতের খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের "দি সিপয় মিউটিনি এণ্ড দি রিভোল্ট অব এইটিন্ ফিফটি সেভেন্" প্রকাশিত হয়। তাতে তিনি এই বিদ্রোহের চরিত্র, বাহাদুর শাহ, ঝান্সীর রানী, সিপাহীদের কার্যকলাপ ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রশ্ন তুলেছেন এবং যুক্তিসম্মত ও গ্রহণযোগ্য তথ্য প্রমাণ না দিয়েই সম্ভবতঃ নিজের মনগড়া কতকগুলি ধারণার বশবর্তী হয়ে ইংরেজ লেখকদের কোনো কোনো 'মতামত' (তথ্য নয়) পুনঃ প্রচারের জন্য সচেষ্ট হয়েছেন বলে মনে হয়। তাঁর বই প্রকাশ হবার পূর্ব পর্যন্ত এটাই শোনা যাচ্ছিল যে, তিনি পুরাতন নথিপত্র ঘেঁটে অনেক নতুন তথ্য আবিষ্কার করেছেন ও তার দ্বারা তিনি না কি তাঁর বক্তব্য অকাট্যভাবে 'প্রমাণ' করবেন। এ বিষয়ে এত বড় একজন খ্যাতনামা ঐতিহাসিকের কাছ থেকে অনেকেই তাই অনেক কিছু আশা করেছিলেন। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে, নতুন কোন তথ্য তিনি আবিষ্কার তো করেনই নি, বরং প্রাসঙ্গিক বহু পুরাতন তথ্য উপেক্ষা করে এবং তাঁর পূর্বাশ্রিত ধারণার পরিপূরক কতকগুলি দুর্বল তথ্যের অবতারণা করে তিনি ১৮৫৭ সালের জাতীয় মহাজাগরণের শোকাবহ ও বিয়োগান্ত পরিণতিকে হেয় ও মসীলিপ্ত করেছেন। যে কোনো কারণেই হোক, বাহাদুর শাহর সম্বন্ধেই তাঁর আক্রোশটা সব থেকে বেশী। সুতরাং তাঁর সেই 'প্রমাণ'গুলি এখানে আলোচনার প্রয়োজন।

বাহাদুর শাহ সম্পর্কে ডাঃ মজুমদারের প্রধান বক্তব্য হচ্ছে: "এতে কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না যে, অনেক ইতস্ততঃ ও বিলম্ব করার পর বাহাদুর শাহ অবশেষে হিন্দুস্থানের সম্রাটের পদ গ্রহণ করেছিলেন এবং এই পদের দায়িত্ব নিয়েছিলেন, কারণ এটা তাঁর উপর জোর করে চাপান হয়েছিল। এটা খুবই সম্ভব যে জোর না করলে, নিজের ইচ্ছায় কখনই ঐ বৃদ্ধ লোকটি

এই প্রকার দায়িত্ব গ্রহণ করতে অগ্রসর হতেন না।'—(জে. বি. ম্যালিসন: 'ইণ্ডিয়ান মিউটিনি অব এইটিন্ ফিফটি সেভেন্', পৃঃ ৮৪)। একজন ইংরেজ ঐতিহাসিকের এই অভিমত—যা ভারতীয়দের পক্ষে খুব বন্ধুত্বপূর্ণ নয়—তা প্রত্যেক নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক (!) গ্রহণ করবেন। কিন্তু সাধারণতঃ লোকে যা জানে না কিম্বা স্বীকার করে না, তা হচ্ছে এই যে, সিপাহীদের প্রতি অথবা তাদের কাজের প্রতি বাহাতুর শাহর কোনো সহানুভূতি ছিল না। শুধু তাই নয়, তিনি তাদের সঙ্গে যোগ দেবার পরও ইংরেজদের প্রতি আনুগত্য (loyalty) বজায় রেখেছিলেন। বিদ্রোহ সম্বন্ধে আগ্রায় বৃটিশ কর্তৃপক্ষের নিকট তিনি যে জরুরী সংবাদ পাঠিয়েছিলেন, তার দ্বারা এটা প্রমাণ হয়। তা ছাড়া ইংরেজ পলাতকদের আশ্রয় দেওয়া ও তাদের পলায়নে সাহায্য করা—এ সব সম্বন্ধে জীবনলালও লিখে গিয়েছেন।"[১]

বাহাতুর শাহকে জোর করে, ভয় দেখিয়ে বিদ্রোহে নামানো হয়েছিল; তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিদ্রোহীরা তাঁকে বিদ্রোহী ভারতের সম্রাট বলে ঘোষণা করেছিল; তারপর যুদ্ধের সময় জোর করে তাঁকে দিয়ে সমস্ত দলিল, আদেশ ও ঘোষণাপত্রগুলি বিদ্রোহীরা স্বাক্ষর করিয়ে নিত—এই সব কথা তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষীরা বাহাতুর শাহর বিচারের সময় তাঁকে 'নির্দোষ' প্রমাণ করার জন্য আদালতে বলেছিলেন। বিচারের সময় আদালতে যে জবানবন্দী তাঁর নামে পেশ করা হয়েছিল, তাতেও এই সব কথাগুলি আছে। কিন্তু কিছু পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই তথা-কথিত জবানবন্দী বাহাতুর শাহর নিজের নয়। বিচারকালে এই সব শুভাকাঙ্ক্ষীরা তাঁদের কোনো কথাই প্রমাণ করতে পারেননি। বাহাতুর শাহর উকিল গোলাম আব্বাসও তাঁর পক্ষ সমর্থনে উপরোক্ত জবানবন্দী কখনও উল্লেখ পর্যন্ত করেননি। পক্ষান্তরে, বাদীপক্ষ বাহাতুর শাহর কার্যাবলীর যে তালিকা পেশ করেছিলেন ও যে সমস্ত অকাট্য যুক্তি দিয়েছিলেন, তার দ্বারা কোনো মতেই ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অভিযোগে তাঁকে 'নির্দোষ' বলে ধরে নেওয়া যায় না। এই প্রসঙ্গে এই সব তথ্যগুলির মধ্যে একটি তথ্যের উল্লেখ বিশেষভাবে প্রয়োজন। "সকাল ৯টার সময় মিরাট বিদ্রোহীদের প্রধান অংশ মিলিটারী কায়দায় বন্দুক ঘাড়ে করে ও সঙিন উঁচু করে সেতু দিয়ে শহরে প্রবেশ করছিল। এর ঠিক এক ঘণ্টা পরে ৩৮শ বাহিনীর সুবাদার, যে কয়জন সিপাহী নিয়ে ম্যাগাজিন গেটের সামনে পাহারা দিচ্ছিল, তারা এসে ক্যাপ্টেন ফরেস্টকে খবর দিল যে, দিল্লীর বাদশাহ তাঁর একদল গার্ডকে পাঠিয়েছেন ম্যাগাজিন দখল করবার জন্য এবং সমস্ত ইংরেজদের

১। "দি সিপয় মিউটিনি এণ্ড দি রিভোল্ট অব এইটিন্ ফিফটি সেভেন্," পৃঃ ১১৮।

প্রাসাদে নিয়ে যাবার জন্য এবং যদি তারা এতে সম্মত না হয়, তা হলে কাউকে যেন ম্যাগাজিন ত্যাগ করতে না দেওয়া হয়। ··· তার কিছুক্ষণ পরেই বাদশাহের একজন অফিসার বাদশাহী সামরিক ইউনিফর্ম-পরা অনেক সৈন্য নিয়ে উপস্থিত হল ও উপরোক্ত সুবাদারকে বলল যে, বাদশাহ তাদের পাঠিয়েছেন পাহারার কাজে—তাদের স্থান অধিকার করবার জন্য। এর থেকে আমরা দেখতে পাই, কি তৎপরতার সঙ্গে এই ম্যাগাজিনের মতো সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ স্থানটিকে দখল করবার চেষ্টা হয়েছিল।"[১] এই সব ঘটনাগুলির উদাহরণ দেখিয়ে বাদীপক্ষ প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছিলেন যে, বাহাদুর শাহ বিদ্রোহ শুরু হবার অনেক আগে থেকেই ইংরেজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন ; তা না হলে এত তৎপরতার সঙ্গে এত বড় গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করবার প্রশ্নই উঠতে পারত না।

বাহাদুর শাহকে দিয়ে সিপাহীরা জোর করিয়ে সব কাজ করিয়ে নিত, তিনি নিজের ইচ্ছায় কোনো কাজই করেননি, এ সব যে কত ভিত্তিহীন ও কত বড মিথ্যা কথা তার অসংখ্য প্রমাণের মধ্যে (যার অনেক উদাহরণ এ বইতে পূর্বে দেওয়া হয়েছে) আর একটি প্রমাণ বাহাদুর শাহর নিম্নলিখিত হুকুম। বকর-ঈদের দিন, ১লা আগস্ট, যেদিন নিমখ বাহিনী ইংরেজকে আক্রমণ করবার জন্য অগ্রসর হয়ে গেল, সেদিন এই হুকুম তিনি দিয়েছিলেন বখ্‌ত খানকে, যিনি ছিলেন বিদ্রোহী বাহিনীগুলির মধ্যে সব থেকে শক্তিশালী বাহিনী বেরিলি ব্রিগেডের নায়ক ও সমগ্র বিদ্রোহী বাহিনীর অধিনায়ক : "নিথম বাহিনী আলিপুরের দিকে অগ্রসর হয়ে গিয়েছে, কিন্তু তাদের শিবিরের সাজসরঞ্জাম এখানেই পড়ে আছে। সুতরাং আপনাকে নির্দেশ দেওয়া যাচ্ছে যে, ২০০ অশ্বারোহী ও ৫ অথবা ৭ কোম্পানি পদাতিক সঙ্গে নিয়ে আপনি গাড়ি করে ঐ সমস্ত সাজসরঞ্জাম, তাঁবু ইত্যাদি এবং খাদ্যদ্রব্য নিয়ে আলিপুরের দিকে অগ্রসর হবেন। আপনাকে আরও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, শত্রুদের আপনি ইদগার দিকে এতটুকু অগ্রসর হতে দেবেন না। আপনাকে আরও জানানো যাচ্ছে যে, যদি আমাদের বাহিনী বিজয়ী হয়ে ফিরে না আসে, তা হলে তার ফল খুব খারাপ হবে। আপনাকে সাবধান করে দেওয়া হল এবং হুকুম অত্যন্ত জরুরী বলেই মনে করবেন।"[২]

এই হুকুম নিশ্চয়ই কোনো সিপাহী জোর করে, ভয় দেখিয়ে বাহাদুর শাহকে দিয়ে লেখায়নি, কারণ, এই হুকুম দেওয়া হচ্ছে আর কারুকে নয়, একেবারে

১। "টু হিস্টোরিক ট্রায়ালস ইন রেড ফোর্ট", ফোরওয়ার্ড বাই পণ্ডিত জওহর লাল নেহরু, পৃঃ ৩৯৮—৯৯।

২। ঐ, পৃঃ ৪০১।

সিপাহীদের সর্বাধিনায়ক বখ্‌ত খানকে, যাঁকে তিনি একমাস পূর্বে সব ক্ষমতা হাতে দিয়ে সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করেছিলেন। বাহাদুর শাহ এ রকম একটি নয়, আরও অনেক হুকুম এবং খুব কড়া হুকুমই সিপাহীদের ও সিপাহী-অফিসারদের মাঝে মাঝে দিতেন। এ অবস্থায় বাহাদুর শাহ্ সিপাহীদের হাতে মাত্র খেলার পুতুল ছিলেন, তাঁকে দিয়ে তারা জোর করে ভয় দেখিয়ে যা খুশি করিয়ে নিত ইত্যাদি অন্তঃসারশূন্য কথাগুলি কেন যে মেনে নিতে হবে, তা বোঝা কঠিন। এ কথা সত্য যে, তাঁর বার্ধক্যের জন্য তিনি সক্রিয়ভাবে অনেক সময়ই নেতৃত্ব দিতে সক্ষম ছিলেন না ও সিপাহী নেতাদের শাসনে রাখতেও পারতেন না, কিন্তু তাতে এটা প্রমাণ হয় না যে, তিনি সিপাহীদের হাতের পুতুল মাত্র ছিলেন।

বাহাদুর শাহ স্বেচ্ছায় বিদ্রোহে যোগ দেননি, সিপাহীরা তাঁকে ভয় না দেখালে তিনি বিদ্রোহে যোগ দিতেন না—ডাঃ মজুমদার এটা স্বতঃসিদ্ধ বলেই ধরে নিয়েছেন (এবং ঝান্সীর রানী, কুমার সিংহ প্রভৃতি সম্বন্ধেও তাঁর এই একই কথা)। সামন্ততান্ত্রিক রাজা, নবাব, জমিদারদের মধ্যে কেউ কেউ যে দেশপ্রেমিক হতে পারেন, নিজের দেশকে বিদেশী শত্রুর হাত থেকে মুক্ত করবার জন্য বিদ্রোহে যোগ দিতে পারেন, প্রতি দেশে তার অনেক উদাহরণ থাকা সত্ত্বেও, এ কথাটা মেনে নিতে যেন অনেকেরই ঘোরতর আপত্তি। বাহাদুর শাহ, ঝান্সীর রানী প্রভৃতি যেরকমভাবে ইংরেজের হাতে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়েছিলেন, তার ফলে তাঁদের পক্ষে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বিদ্রোহে যোগ দেওয়াটা কি এতই অসম্ভব ছিল? কল্পনাশক্তির অপব্যবহার করে ও ছলচাতুরির দ্বারা যেন-তেন-প্রকারেণ তাদের ইংরেজ-ভক্ত, বিশ্বাসঘাতক ইত্যাদি বলে 'প্রমাণ' করার কি এতই প্রয়োজনীয়তা? ৯০ বৎসর বয়সে বিদ্রোহে যোগ দেবার পূর্বে বাহাদুর শাহ যদি কিছুক্ষণের জন্য ইতস্ততঃ করেও থাকেন, যদি তাঁর মনের অবস্থা প্রথম দিকে দোদুল্যমানই হয়ে থাকে, সেটা কি এই বৃদ্ধের পক্ষে এতই অপরাধের বিষয়? কিন্তু যে মুহূর্তে তিনি মনস্থির করে বিদ্রোহে যোগ দিলেন, তখন থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি যে অকপটভাবে শত্রুকে পরাজিত করবার জন্য তাঁর সাধ্যমত চেষ্টা করেছিলেন, তা তাঁর বিদ্রোহকালীন কার্যকলাপ একটু পর্যবেক্ষণ করলেই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে—তেমন বহু প্রমাণ আমরা এ গ্রন্থে দিতে চেষ্টা করেছি।

দ্বিতীয়তঃ, সিপাহীদের প্রতি ও তাদের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের প্রতি বাহাদুর শাহর কোনোই সহানুভূতি ছিল না, তা প্রমাণ করবার জন্য ডাঃ মজুমদার যে যুক্তি দিয়েছেন তা বাস্তবিকই হাস্যকর। এখানেও তিনি 'নতুন' কোনো তথ্য দেননি।

জীবনলালের ডায়েরি থেকে কতকগুলি বড় বড় উদ্ধৃতি তুলে দিয়েছেন মাত্র। প্রথম উদ্ধৃতি ১২ই মে তারিখের ঘটনা—যখন বাহাদুর শাহ দু'বার সিপাহীদের অনুরোধে (তাদের জোর-জবরদস্তি করার ফলে নয়) শহর পরিদর্শন করে ব্যবসায়ী ও দোকানদারদের দোকান খুলতে বলেছিলেন। দ্বিতীয় উদ্ধৃতি ১৬ই মে'র ঘটনা—যেদিন আশানুল্লা ও মেহবুব আলি ইংরেজদের সত্বর দিল্লী আক্রমণ করবার জন্য আহ্বান জানিয়ে যে চিঠি লিখেছিল, বিদ্রোহীরা সেই চিঠি ধরে ফেলেছিল ও দরবারে গিয়ে ইংরেজের এই ঘৃণ্য দালালগুলির[1] শাস্তি দাবি করেছিল এবং উত্তেজিত সিপাহীরা, যে ৪০ জন ইংরেজ নরনারী বাহাদুর শাহর প্রাসাদে আশ্রয় নিয়েছিল, তাদের নিয়ে গিয়ে হত্যা করেছিল। এই দুটি অবান্তর উদ্ধৃতি থেকে এটা একেবারেই 'প্রমাণ' হয় না যে, বাহাদুর শাহ সিপাহীদের প্রতি কিম্বা তাদের আদর্শের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন না। এই প্রসঙ্গ আলোচনা করতে করতেই ডাঃ মজুমদার স্যার সৈয়দ আহম্মদ খান থেকে আরও একটি অবান্তর উদ্ধৃতি তুলে দিয়েছেন। ডাঃ মজুমদার তাঁর গ্রন্থে বলেছেন (পৃঃ ১২০): "বাহাদুর শাহ যে কেবলমাত্র মনুষ্যত্ববর্জিত ছিলেন তাই নয়, তিনি ছিলেন অত্যধিক কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। এ বিষয়ের উপর স্যার সৈয়দ আহম্মদের নিম্নলিখিত উক্তিটি অর্থপূর্ণ আলোকপাত করে: 'ভূতপূর্ব বাদশাহের একটা বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, তিনি নিজকে একটা মাছি অথবা মশায় রূপান্তরিত করতে পারতেন এবং এই প্রকার ছদ্মবেশে তিনি নিজেকে অন্যদেশে নিয়ে যেতে পারতেন ও সেখানে কি ঘটছে না ঘটছে তা জানতে পারতেন। তিনি যে নিজেকে এভাবে রূপান্তরিত করতে পারেন, এ কথা তিনি সত্যসত্যই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন।' এর সঙ্গে, বাহাদুর শাহ যে একবার সিপাহীদের ব্যবহারে খুবই বিরক্ত হয়ে সংসার ত্যাগ করে ফকীর হতে চেয়েছিলেন, তার খুবই সামঞ্জস্য আছে।" মোসলেম লীগের প্রতিষ্ঠাতা ও ভারতে সাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রচার করার একজন পাণ্ডা, সৈয়দ আহম্মদ খান এক সময়ে বাহাদুর শাহর নুন খেয়েছিলেন, কাজেই তিনি যে তাঁর এ রকম কুৎসাপূর্ণ গুণ গাইবেন, তাতে আর আশ্চর্য কি? এবং এ রকম একটা নোংরা উদ্ধৃতি তুলে দিয়ে ও তাকে সমর্থন করে ডাঃ মজুমদার কি জাতীয় রুচির পরিচয় দিয়েছেন, তা পাঠক সমাজই বিচার করবেন।

১। কর্নেল কীথ ইয়ং তাঁর স্ত্রীকে ১৯শে আগষ্ট ১৮৫৭ সালে লিখেছিলেন: "আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকরূপে চিঠিপত্র আদান-প্রদানের জন্য সিপাহীরা আশানুল্লাকে সন্দেহ করছে এবং তোমার আর আমার মধ্যে বলতে পারি যে, তারা খুব ভুল করছে না।"—("দিল্লী", পৃঃ ১৮৬)।

ডাঃ মজুমদারের সব থেকে গুরুতর বক্তব্য হচ্ছে যে, বিদ্রোহে যোগ দেবার পরেও বাহাদুর শাহ ইংরেজের প্রতি আনুগত্য বজায় রেখেছিলেন ও তাদের সঙ্গে গোপনে চিঠি বিনিময় করছিলেন, অর্থাৎ এক কথায় বাহাদুর শাহ বিশ্বাসঘাতক ছিলেন। তাঁর এই উক্তি 'প্রমাণ' করার জন্য তিনি আশানুল্লা, জীবনলাল, মইন-উদ্দিন প্রভৃতির মতো গুপ্তচর বিশ্বাসঘাতকদের কথাই বেদবাক্য বলে ধরে নিয়েছেন। জীবনলাল তার ডায়েরিতে লিখেছিল যে, ১১ই মে তারিখে বিদ্রোহীরা দিল্লীতে পৌঁছবার পর "আশানুল্লা বাদশাহের সঙ্গে গোপনে দেখা করলেন এবং বাহাদুর শাহর উপদেশ অনুসারে উটে করে একজন দূতকে চিঠি দিয়ে আগ্রার লেফটেনাণ্ট গভর্নরের নিকট পাঠিয়েছিলেন।" আদালতে বাহাদুর শাহর নামে যে মিথ্যা জবানবন্দী দেওয়া হয়েছিল, তাতেও এ কথার উল্লেখ আছে। তারপর বাদশাহের বিচারকালে আশানুল্লা তার সাক্ষ্যতে এ সম্বন্ধে যা বলেছিল, তাও ডাঃ মজুমদার তুলে ধরেছেন: "মিরাট থেকে বিদ্রোহীদের আগমনের সংবাদ দিয়ে আমি আগ্রার লেফটেনাণ্ট গভর্নরকে একখানা চিঠি লিখি। তাতে আমি জানাই যে, বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে বাদশাহ কোনো প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করতে অক্ষম এবং তিনি (গভর্নর) যেন সত্বর ইংরেজ সৈন্যের সাহায্য পাঠান।" সমস্ত ঘটনাটাই ভিত্তিহীন একটা সাজানো ব্যাপার বলেই ধারণা হয়। কারণ, ইংরেজরা তাদের গুপ্তচর ও দালালদের কাছ থেকে যেসব চিঠিপত্র ও সংবাদ পেয়েছিল, তার প্রায় সবই 'রেকর্ডস্ অব দি ইনটেলিজেন্স ডিপার্টমেণ্ট' নামে বইতে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এ রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ চিঠি, কিম্বা সে সম্বন্ধে কোনো প্রকার উল্লেখ পর্যন্ত কোনো রিপোর্টে পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে, যদি সত্যই এ রকম একটা চিঠি পাঠানো হয়ে থাকে তা হলে এ বিষয়ে প্রধানতঃ উৎসাহী ছিল আশানুল্লা—বাহাদুর শাহ নন। আর আশানুল্লা যে কি চরিত্রের লোক—তার প্রমাণ আমরা এ বইতে নানা উদ্ধৃতি থেকে পেয়েছি। সর্বশেষে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, বিদ্রোহীদের হঠাৎ আগমনে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে এবং বিদ্রোহে সর্বতোভাবে যোগ দেবার পূর্বে বাহাদুর শাহ যদি এ রকম একটা চিঠি পাঠিয়েই থাকেন, তাতে তাঁর প্রথম দিককার মনের দুর্বলতা ও দোদুল্যমান অবস্থার পরিচয় পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু তাতে তাঁর চরিত্রে আগাগোড়া বিশ্বাসঘাতকতা প্রমাণিত হয় না।

তারপর ডাঃ মজুমদার বলেছেন: "আমাদের নিকট অকাট্য প্রমাণ রয়েছে যে, তিনি (বাহাদুর শাহ) মিউটিনির প্রতি অথবা যাকে অনেকে 'স্বাধীনতার সংগ্রাম' নামে অভিহিত করতে ভালবাসেন, তার প্রতি বিশ্বাসঘাতক ছিলেন।"—

(পৃঃ ১২২)। তাঁর 'অকাট্য প্রমাণগুলি' 'আবিষ্কার' করে মূর্খ অন্ধকারাচ্ছন্ন ভারতবাসীর অজ্ঞতা দূর করবার জন্য তিনি কি প্রকারের আলোকসম্পাত করলেন, তা একটু দীর্ঘ হলেও, তাঁর নিজের মুখ থেকেই শোনা যাক।

তিনি তাঁর গ্রন্থে বলছেন (পৃঃ ১২২-২৩) ঃ "ইংরেজ সরকারকে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সাবধান করে ও বিদ্রোহীদের দমন করবার জন্য তাদের সাহায্য চেয়ে বাহাদুর শাহ যে জরুরী ও গোপনীয় চিঠি আগ্রায় পাঠিয়েছিলেন, তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তারপর একমাস যেতে না যেতেই, ··· যখন সিপাহীরা তাঁরই নাম করে যুদ্ধ করছিল ও নিজেদের রক্ত দিয়ে শহর রক্ষা করছিল, সেসময় তিনি ব্রিটিশ সেনানায়কের সঙ্গে গোপনভাবে ষড়যন্ত্র সুরু করলেন ও তাঁর নিকট প্রস্তাব করে পাঠালেন যে, তাঁরা যদি বৃত্তি দিতে ও পূর্বাবস্থা (status quo) বজায় রাখতে সম্মত হন, তাহলে তিনি গোপনভাবে একটা গেট দিয়ে ইংরেজ সৈন্যদের সহরে প্রবেশ করবার ব্যবস্থা করে দেবেন। যেহেতু এই তথ্য এতদিন পর্যন্ত অজ্ঞাত ছিল, সেজন্য আমি মূল দলিলগুলি নিচে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি, যাতে করে, যে-বাহাদুর শাহকে অনেক ভারতবাসী 'প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের' নেতা বলে গণ্য করে এসেছেন, সেই বাহাদুর শাহর প্রকৃত চরিত্র সম্বন্ধে পাঠক নিজেই বিচার করতে পারেন। নিচের উদ্ধৃতিগুলি পাঞ্জাবের চীফ কমিশনার সার জন লরেন্সকে লিখিত দিল্লী অভিযানের ইংরেজ সেনানায়ক জেনারেল রীডের ৪ঠা জুলাই তারিখের চিঠি থেকে নেওয়া হয়েছে ঃ 'আমাদের এক গোমস্তা, যে দিল্লীতে গিয়েছিল, গতকাল পালিয়ে আসতে পেরেছে। সে বাদশাহর নিকট থেকে এই মর্মে একটি বার্তা সঙ্গে নিয়ে এসেছে যে, যদি আমরা তাঁর বৃত্তি দিই ও তাঁর জীবন রক্ষা করার গ্যারান্টি দিই, তাহলে তিনি গেটগুলি আমাদের জন্য খুলে দেবেন। এ খবর কতখানি নির্ভরযোগ্য, তা একমাত্র ভবিষ্যতেই প্রমাণ হতে পারে। আমাদের পশ্চাতে বিদ্রোহীদের আক্রমণের জন্য আমরা তখন এতই ব্যস্ত ছিলাম যে, এটা বিবেচনা করার কোন সময়ই পাওয়া যায় নি। তবে এটা পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে যে, বাদশাহকে যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং যে কটা বছর তিনি বেঁচে থাকবেন, তার সংখ্যা খুব বেশী হবে না। তাঁকে যদি পেন্সন দেওয়া হয় তাহলে অনেক রক্তারক্তি বন্ধ হতে পারে।'

"নিম্নে গোমস্তা ফতে মহম্মদের ৪ঠা জুলাই-এর নিজস্ব বক্তব্য, যা এই মাত্র আমার হাতে এসে পৌছল, দেওয়া হল: 'প্রায় দুই সপ্তাহ পূর্বে আমার একজন বানিয়া বন্ধু, বুলাকী দাস আমার কাছে ইঙ্গিত করল যে, হাকিম আশানুল্লা ব্রিটিশদের সঙ্গে একটা রফা করতে চান, কিন্তু কিছু হবে না ভেবে তার

কথায় আর কান দিইনি। যাহোক, ৮ দিন পূর্বে সে এসে আমাকে বলল যে, হাকিম আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য খুব আগ্রহান্বিত। দু'দিন পরে আমি প্রাসাদে যাই এবং সেখানে হাকিম আমাকে একটা উঁচু দালানের উপরে একটা নির্জন ঘরে নিয়ে যান; সেখানে হাকিম, তাঁর মোক্তার বুলাকী দাস ও আমি ছাড়া আর কেউ উপস্থিত ছিল·না। হাকিম কাল বিলম্ব না করে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, বুলাকী দাস আমাকে যা বলেছে, আমি তা ভালভাবে বুঝতে পেরেছি কিনা? আমি বললাম যে, আমি বেশ বুঝতে পেরেছি, কিন্তু আমি এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু করতে পারব বলে তাঁকে আশা দিতে পারলাম না। তারপর তিনি বললেন যে, বাদশাহ ব্রিটিশের সঙ্গে রফা করবার জন্য অত্যধিক আগ্রহান্বিত হয়ে পড়েছেন। যদি, তাঁর ১ লক্ষ টাকা করে মাসিক ভাতা চলতে থাকবে এবং তাঁর পূর্বেকার অবস্থা বজায় থাকবে, এই বলে তাঁকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়—অবশ্য মৌখিক প্রতিশ্রুতিতেই হবে—তাহলে তিনি ইংরেজ সৈন্যদের ঢুকবার জন্য 'জেরদরওয়াজা' খুলে দেবেন। 'জেরদরওয়াজা' হচ্ছে নদীর ধারে সমুন্দ-বুরুজের নিকট প্রাসাদে প্রবেশ করবার একটি গোপনীয় পথ। বাদশাহ আরও বলেছেন যে, ইংরেজরা যখনই চাইবে তিনি তখনই সহরের যে কোন গেট তাদের জন্য খুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন। একথাও বলেছেন যে, ইংরেজকে সহর দখল করতে সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাদশাহী শীলমোহর-অঙ্কিত একটা চুক্তি-পত্র শীঘ্রই দেওয়া হবে। আমি এই প্রস্তাব যথাস্থানে পেশ করব ও তার উত্তর জানিয়ে দেব বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। প্রাসাদের অভ্যন্তরে তাঁর ক্ষমতা যতই থাক না কেন, ...সহরের গেটগুলি সিপাহীদের দখলে থাকার ফলে বাদশাহের যে কোন একটা গেট খুলে দেবার একেবারেই কোন ক্ষমতা আছে কিনা, সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।'

"যদিও এই কথাবার্তার কোন ফল হয়নি এবং জেনারেল রীড তা পূর্বেই বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু জেনারেল রীডের এই চিঠি মিউটিনি বা 'স্বাধীনতার সমরের' প্রতি বাহাদুর শাহর প্রকৃত মনোভাব উদ্ঘাটন করে দিচ্ছে।"

জেনারেল রীডের এই একমাত্র চিঠিখানাই হচ্ছে (এবং যে ঘটনা সম্বন্ধে রীড নিজেই সন্দেহান্বিত ছিলেন!) ডাঃ মজুমদারের কাছে এতদিনের গোপন রহস্য উদ্ঘাটনকারী 'সোনার কাঠি'! কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে এই যে, গোমস্তা মহাশয়ের এ রকম রোমাঞ্চকর গল্পটির ঐখানেই পরিসমাপ্তি ঘটে; এ রকম গল্পের কতখানি মূল্য দিতে হয় তা বুঝবার জন্য যে সাধারণ বুদ্ধিটুকুর প্রয়োজন, ইংরেজ শাসকদের তা অবশ্যই ছিল; তাই এ নিয়ে তারা আর বেশী

মাথা ঘামায়নি। রীডের চিঠিতে আর একটি লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এই যে, (যদি এই গল্পকে সত্য বলেই ধরে নেওয়া যায়) গোমস্তাকে প্রস্তাব দিয়েছিল আশানুল্লা, বাহাদুর শাহ নিজে নন। আর আশানুল্লা কি চরিত্রের লোক তা আগেই বলা হয়েছে। বাহাদুর শাহ যে আশানুল্লাকে এ রকম একটা প্রস্তাব করবার ক্ষমতা দিয়েছিলেন, তার কোনো গ্রহণযোগ্য প্রমাণ নেই। তবু তাকে সত্য ও স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নেওয়াটাই কি নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের কর্তব্য? সর্বশেষে এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বিবেচনা করা প্রয়োজন। বাহাদুর শাহ যদি সত্যই ইংরেজকে এ রকম একটা প্রস্তাব দেবারই সিদ্ধান্ত করে থাকতেন, তা হলে এই সমস্ত গোমস্তা, খানসামার দ্বারস্থ না হয়ে, তিনি নিজে ইংরেজ কর্তৃপক্ষের নিকট অনায়াসে চিঠি দিতে পারতেন, যেমন করেছিল আশানুল্লা, মেহবুব আলি, এলাহী বক্স, বেগম জিন্নৎ মহল ও শাহজাদারা; কিম্বা দিল্লীর কোনো গণমান্য বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে সহজেই দূত হিসেবে নিযুক্ত করে পাঠাতে পারতেন—এ কাজে নিশ্চয়ই কেউ তাঁকে বাধা দিতে পারত না। কারণ, এ গ্রন্থে বিবৃত ইংরেজ ঐতিহাসিকের নানা উদ্ধৃতি থেকে দেখেছি যে, বাহাদুর শাহ সত্যই সিপাহীদের খেলার পুতুল ছিলেন না এবং সিপাহীরা তাঁকে নজরবন্দীও করে রাখেনি। তা হলে এই সিদ্ধান্ত করাই কি সমীচীন নয় যে, যাকে 'বিশ্বাসঘাতকতা' বলে, যে শব্দটি দিয়ে আশানুল্লা বা জীবনলালকে চিহ্নিত করা যায় সহজে—তেমন নীচ প্রবৃত্তি বাহাদুর শাহর মনে কখনও স্থান পায়নি বলেই তিনি এ বকমের কাজ করেননি। পক্ষান্তরে, এই বইতে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, যখনই আশানুল্লা, এলাহী বক্স প্রভৃতি ইংরেজের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য বাহাদুর শাহকে পরামর্শ দিয়েছে, প্রত্যেকবারই ঘৃণাভরে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছেন।

তারপর আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ডাঃ মজুমদার মোগল পরিবারের কোনো কোনো পরিজনের বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ কার্যকলাপের জন্য, কোনো যুক্তি প্রমাণ না দিয়েই, বাহাদুর শাহকেই দায়ী করেছেন। এই বইতে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিদ্রোহের কিছুকাল পরে যখন জিন্নৎ মহল ও শাহজাদারা বুঝতে পারলেন যে, সিপাহীরা তাঁদের স্বেচ্ছাচারিতা আর সহ্য করছে না, তারা তাদের নিজেদের ক্ষমতা ও আধিপত্য বিস্তার করতে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছে এবং সিপাহীদের দ্বারা তাঁদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবার নয়, তখন তাঁরা গোপনে গোপনে ইংরেজের সঙ্গে চিঠিপত্রের আদান-প্রদান শুরু করলেন। দিল্লীর পলিটিকাল এজেন্ট গ্রেটহেড-এর লিখিত এই বিষয়ে দুটি চিঠি ডাঃ মজুমদার তাঁর গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন (পৃঃ ১২৩-২৪)।

প্রথম চিঠি—ক্যাম্প দিল্লী, ১৯শে আগস্ট : "আমি শাহজাদাদের নিকট থেকে চিঠি পেতে শুরু করেছি। তারা বলছে যে, তারা আমাদের প্রতি সব সময়ই অনুরক্ত ছিল এবং তারা জানতে চায় যে তারা আমাদের জন্য কি করতে পারে।"

দ্বিতীয় চিঠি—ক্যাম্প দিল্লী, ২৩শে আগস্ট : "জিন্নৎ মহলের নিকট থেকে একজন দূত এসেছে। যাতে করে কোনো রকমের একটা রফা হতে পারে, তার জন্য বাদশাহের উপর তাঁর প্রভাব বিস্তার করবেন বলে বলেছেন।"

চিঠির বিষয়ে একটি জিনিস লক্ষ্যণীয়। দিল্লী যুদ্ধের প্রায় শেষভাগে লিখিত বেগম জিন্নৎ মহলের চিঠিতেও বাহাদুর শাহ যে ইংরেজের সঙ্গে রফা করতে প্রস্তুত তার কোনো ইঙ্গিত পর্যন্ত নেই। বেগমসাহেবা শুধু বলেছেন যে, ইংরেজরা যদি রাজী হয়, তা হলে বাদশাহকে রাজী করবার জন্য তিনি তাঁর উপর 'মায়াজাল' বিস্তার করবেন মাত্র।

যাহোক, এই রকম দুর্বল কয়েকটা তথ্যের উপরে নির্ভর করে অত বড় ঐতিহাসিক ডাঃ মজুমদার উপসংহারে বলছেন : "সম্পূর্ণ বিভিন্ন দিক থেকে পাওয়া এই খণ্ড খণ্ড তথ্যগুলি এমন চমৎকারভাবে পরস্পরের সঙ্গে মিলে যায় (fit in with one another) যে, বাহাদুর শাহ ও তাঁর পরিবার যে শুধু মাত্র বিদ্রোহীদের প্রতিই বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন তাই নয়, সমস্ত ভারতবাসীর প্রতিও যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন, সে সম্বন্ধে কোনো প্রকার সন্দেহেরই অবকাশ নেই।"—(পৃঃ ১২৪)।

এই তো গেল ডাঃ মজুমদার-কথিত বিশ্বাসঘাতক বাহাদুর শাহ ও তাঁর পরিবার-পরিজনের কথা। এঁদের সম্পর্কে তাঁর যে মন্তব্য—তা দেখে মনে হয়, বিদ্রোহীদের সম্পর্কে ডাঃ মজুমদার বোধ করি বা শ্রদ্ধাপূর্ণ। সাধারণভাবে এইটেই স্বভাবতঃ মনে আসে। কিন্তু ডাঃ মজুমদার দিল্লীর ও অন্যান্য স্থানের বিদ্রোহী সিপাহীদের যেভাবে চিত্রিত করেছেন বা তাদের সম্পর্কে যেমন মন্তব্য করেছেন, তাতে তাঁর মনোভাব ও সিদ্ধান্ত সম্পর্কেই সন্দেহের কারণ থাকে। যেমন, সিপাহীদের সম্পর্কে তিনি বলছেন : "তারা সব সময় বেতনের জন্য চেঁচামেচি করত, ধনী নাগরিকদের ও দোকানদারদের লুট করত, লুটের বখরা নিয়ে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করত।"—(পৃঃ ৫২)। "সিপাহীদের লোভ এতই প্রবল ও ঘৃণ্য ছিল যে, অনেক লোক সন্দেহ করতে শুরু করল যে, তাদের চর্বি-মিশ্রিত টোটার প্রতিবাদটা নিজেদেরই ব্যক্তিগত স্বার্থ-সিদ্ধি করবার জন্যই একটা অজুহাত মাত্র কিনা। আসানুল্লা তার অভিমত দিয়েছিল যে, সিপাহীরা বিদ্রোহ করেছিল ধনরত্নে

লাভবান হবার আশায় এবং তারা যে ধর্মকে এর মধ্যে টেনে এনেছিল তা শুধু তাদের আসল বদ মতলব ঢাকবার জন্যই।"—(পৃঃ ১৭৩)।

লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, এখানেও তাঁর সেই প্রধান সাক্ষী—আশানুল্লা! শুধু বাহাদুর শাহর বিরুদ্ধেই নয়, ডাঃ মজুমদার ওই আশানুল্লা, জীবনলাল, চুনিলাল, মইন-উদ্দিন প্রভৃতির মত কুখ্যাত বিশ্বাসঘাতক ও ইংরেজের গুপ্তচরদের অভিমত পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উদ্ধৃত করে সিপাহীদের বিরুদ্ধেও কুৎসা প্রচার করতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হননি!

শুধু দিল্লীতেই নয়, ডাঃ মজুমদারের মতে, সর্বত্রই সিপাহীদের একই রকম ব্যবহার—লুটপাট, হত্যাকাণ্ড, নৃশংসতা ইত্যাদি! বেরিলিতে সিপাহীদের এসব কার্যকলাপ প্রমাণ করবার জন্য ডাঃ মজুমদার স্বর্গত দুর্গাদাস বন্দোপাধ্যায়ের "সঠিক খবরের" উপরই নির্ভর করে সন্তুষ্ট: "দিল্লীতে যেমন, এখানেও তেমনি সিপাহীরা অনেক ধনদৌলত লুট করে দেশে ফিরে গিয়েছিল। সাধারণের নিকট থেকে টাকা আদায় করার জন্য তাদের প্রতি সব রকমের নৃশংসতা প্রয়োগ করা হয়েছে। হিন্দু ও মুসলমানদের গরু ও শুয়োরের মাংস খাওয়ানোর ভয় দেখিয়ে, তাদের লুকানো ধনরত্নের সন্ধান দিতে বাধ্য করা হয়েছে। অনেক লোককে তারা ফুটন্ত জলের কড়াইতে বসিয়ে দিয়েছে। লুট, চুরি, ডাকাতি, ধর্ষণ—এই ছিল দৈনন্দিন ঘটনা।"—(পৃঃ ১৭৭)। দিল্লী ও বেরিলির ঘটনা সম্বন্ধে এই সব কাহিনীকাররা, যারা পরস্পরের নিকট একেবারেই অপরিচিত, যখন একই কথা লিখেছে, তখন তা নিশ্চয়ই সত্যি বলে ধরে নিতে হবে, কারণ পরস্পরের নিকট অপরিচিত অবস্থায় দূর দূর দেশে বসে তারা একই রকম মিথ্যা কথা লিখবে, এ কি সম্ভব?—এই হল ডাঃ মজুমদারের যুক্তি! কিন্তু তা যে খুবই সম্ভব, তার বহু প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল ফরাসী বিপ্লবের সময়; এখনও পাওয়া যাচ্ছে বলশেভিক বিপ্লবে, আর চীন বিপ্লবে। এ যে খুবই সম্ভব—তার কারণ হচ্ছে এই যে, যুগে যুগে এই সব গল্প-লেখকদের ধর্ম এক, স্বার্থ এক, প্রভু এক, শত্রু এক; সুতরাং বিদ্রোহী ও বিপ্লবীদের সম্বন্ধে তাদের সর্বত্র একই অভিযোগ—লুটপাট, হত্যা, ডাকাতি, ধর্ষণ! তা ছাড়া, ডাঃ মজুমদারের সাক্ষীগুলি—জীবনলাল, আশানুল্লা প্রভৃতির চরিত্র কী? সে বিষয়ে তারা এক-একটি মূর্তিমান! একাধিক বার তারা ও তাদের দল অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপের জন্য সিপাহীদের দ্বারা দরবারে অভিযুক্ত হয়েছে। ডাঃ মজুমদার সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে কুৎসাপূর্ণ মিথ্যা ইতিহাসের যে ইমারৎ গড়ে তুলতে চেয়েছেন—তার ভিত্তি বড় দুর্বল। আশানুল্লা, জীবনলালের মতো সাক্ষীরা হল দাগী গুপ্তচর,

স্বদেশদ্রোহী ও স্বার্থপুষ্ট। জঘন্য চরিত্রের এসব সাক্ষীর সাক্ষ্য অনন্যনিরপেক্ষ-ভাবে কখনই গ্রহণযোগ্য নয়, নির্ভরযোগ্যও নয়।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ডাঃ মজুমদার ১৮৫৭-র বিদ্রোহে কেবলমাত্র নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতা ও সিপাহীদের লুটপাট, ডাকাতি, ধর্ষণ ও নৃশংসতাই দেখতে পেলেন ও তাঁর প্রায় ৩০০ পৃষ্ঠাব্যাপী বইতে শুধু এই সব কুৎসাই প্রচার করলেন! হাজার হাজার সিপাহী যে মহান বীরত্বের সঙ্গে লড়েছে ও হাজারে হাজারে নির্ভীকভাবে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য নিজেদের জীবন বিসর্জন দিয়েছে, যে সম্বন্ধে সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিকরাও অনেক প্রশংসা করে গিয়েছেন, সে সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তাঁর ঐতিহাসিক নিরপেক্ষতার কলম প্রায় শুষ্ক হয়ে গিয়েছে! এখানে সেখানে যাও-বা একটু-আধটু উল্লেখ করে ফেলেছেন, সেখানেও দু' একটা বক্রোক্তি করতে ছাড়েননি। তিনি আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, সিপাহীরা দেশের জন্য, স্বাধীনতার জন্য জীবন দেয়নি, তারা জীবন দিয়েছিল ধর্মের জন্য, স্বর্গে গিয়ে সুখী হবার জন্য (পৃঃ ১৭৩)। ডাঃ মজুমদারকে আমরা শ্রদ্ধা করি। তবু, বেদনার সঙ্গে হলেও, তাঁকে জিজ্ঞাসা না করে পারি না, এটা কি তাঁর ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী, না মানসিক সংস্কার! মহাত্মা গান্ধী 'মাদার ইণ্ডিয়া'র লেখিকা ক্যাথরিন মেও-কে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন যে, তিনি হচ্ছেন ভারতের 'ড্রেন কীপার'। এই জাতীয় কুৎসা ঘাঁটায় কুখ্যাত মিস মেও-র মতলব অত্যন্ত সুপরিজ্ঞাত; কিন্তু ডাঃ মজুমদারের ওপরে যদি ওই জাতীয় কোন মতলব বা অভিসন্ধি আরোপ করতে হয়, তা হলে তা বড় বেদনার বিষয়!

পাঞ্জাব

মে মাসে মিরাট ও দিল্লীতে বিদ্রোহের সময় পাঞ্জাবে বৃটিশ শাসনের ভবিষ্যৎ একটা সূক্ষ্ম সুতোয় ঝুলছিল। মাত্র ৮ বৎসর পূর্বে চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধে (১৩ই জানুয়ারি, ১৮৪৯) শিখরা নিজেদের শৌর্য-বীর্যের পরিচয় দিয়ে ইংরেজ বাহিনীকে পরাস্ত করেছিল, কিন্তু আবার দু' মাস পরে গুজরাটের যুদ্ধে হেরে গিয়ে তারা স্বাধীনতা হারাল এবং শতদ্রু থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত সমস্ত পাঞ্জাব বৃটিশ সাম্রাজ্য ভুক্ত হল। কিন্তু তারপরেও পাঞ্জাব সম্বন্ধে ইংরেজরা সব সময়েই ভীত ছিল; তারা জানত যে, সুযোগ পেলেই পাঞ্জাবের লোকরা তাদের তাড়িয়ে দিয়ে নিজেদের স্বাধীনতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবে। বিশেষ করে শক্তিশালী শিখ সর্দাররা এত বড় একটা সাম্রাজ্য হারিয়ে চুপ করে চিরকালের জন্য বিদেশীর দাসত্ব মেনে নেবে, তা খুব কম লোকেই আশা করতে পেরেছিল। তা ছাড়া, আফগানিস্তানের দোস্ত মহম্মদ ও সীমান্তের পাঠানরাও কম ভয়ের কারণ ছিল না।

এই কারণে, পাঞ্জাবকে ঠাণ্ডা রাখার জন্য ইংরেজ সরকার তার সামরিক শক্তির বেশীর ভাগই এই প্রদেশে সমাবেশ করেছিল। মিরাট বিদ্রোহের সময় পাঞ্জাবে বৃটিশ বাহিনীর শক্তি ছিল ৬০,০০০। তার মধ্যে ইংরেজ সৈন্যের সংখ্যা ছিল মাত্র ১২,০০০। এদের প্রধানতঃ দু' ভাগে ভাগ করে পাঞ্জাবের দু' প্রান্তে সন্নিবেশ করা হয়েছিল—তার একটি হল পেশোয়ার উপত্যকায়, আর একটি হল শতদ্রু নদীর ধারে। আর বেঙ্গল আর্মির পুরবিয়াদের সংখ্যা ছিল ৩২,০০০, অর্থাৎ ইংরেজদের থেকে প্রায় তিনগুণ বেশী; এ ছাড়া ছিল ২,০০০ গুর্খা ও ১৪,০০০ ইরেগুলার পাঞ্জাব সৈন্য; আরও ১০,০০০ পাঞ্জাবী মিলিটারী পুলিসও ছিল। এই সংখ্যাগুলি থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, ইংরেজ ও পুরবিয়া সৈন্যদের মধ্যে পাঞ্জাবী সৈন্যরাই ভারসাম্য বজায় রাখছিল। যদি পুরবিয়া ও পাঞ্জাবীরা

একই শত্রুর বিরুদ্ধে মিলিত হত, তা হলে উত্তর ও মধ্য ভারতের মতো পাঞ্জাবেও মুহূর্তের মধ্যে বিদেশীর শাসন বিলুপ্ত হয়ে যেত।

এ বিষয়ে জন লরেন্সের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। ২১শে অক্টোবর তিনি লিখেছিলেন: "আমি সত্যই বলছি যে, আমি যখন গত ৪ মাসের ঘটনাবলীর দিকে ফিরে তাকাই, তখন আমরা কি করে এখনও বেঁচে আছি, তাই ভেবে আমার খুবই আশ্চর্য বোধ হয়। যদি শিখরা আমাদের বিরুদ্ধে যেত, তা হলে আমাদের বাঁচাতে পারত, এমন সাধ্য কারও ছিল না। কেউই আশাও করতে পারেনি, কল্পনাও করতে পারেনি যে, তারা (পাঞ্জাবীরা) এই সুযোগে তাদের জাতীয় স্বাধীনতা হারানোর প্রতিশোধ নেবার লোভ সংবরণ করবে।"[১]

কিন্তু সে সময়কার পাঞ্জাবের আভ্যন্তরীণ অবস্থা ইংরেজদেরই অনুকূলে গেল। পাঞ্জাবের লোক অনেকগুলি বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল—শিখ, হিন্দু, মুসলমান, পাঞ্জাবী ও পাঠান। এই প্রদেশে নিজেদের শাসন বজায় রাখবার জন্য এতগুলি সম্প্রদায়কে পরস্পরের বিরুদ্ধে ব্যবহার করাই ছিল ইংরেজ শাসকদের প্রধান অস্ত্র। পাঞ্জাবের ডালহাউসি-পন্থী শাসকরা, জন লরেন্স, হারবার্ট এডোয়ার্ডস্, জন নিকলসন্, নেভিল চেম্বারলেইন, মণ্টোগোমারি, এবট্, কুপার, রিচার্ড টেম্পল ইত্যাদি—ডালহাউসির ভাষায় যাঁরা ছিলেন 'বিজেতাজাতির শ্রেষ্ঠ নমুনা'—প্রত্যেকেই ছিলেন এ বিষয়ে সিদ্ধহস্ত।

হোমস্ বলেছেন: "ডালহাউসি তাঁর পাঞ্জাবের প্রতি পক্ষপাতিত্ব বশে এই প্রদেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য শ্রেষ্ঠ লোকদেরই বেছে বেছে পাঠিয়েছিলেন। আর একটা দেশের নাম করা খুবই কঠিন যেখানে সংখ্যানুপাতে এতগুলি উপযুক্ত সামরিক ও বেসামরিক অফিসারদের পাঠানো হয়েছিল।"[২]

পাঞ্জাব সম্বন্ধে আরও একটি প্রধান দ্রষ্টব্য বিষয় হল এই যে, পাঞ্জাবের সর্দাররা ও জমিদাররা ইংরেজের নিকট রাজনৈতিক ক্ষমতা হারালেও, তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থে কোনোই আঘাত লাগেনি। পাঞ্জাবে বৃটিশ শাসনের প্রথম কয়েক বৎসরে সর্দারদের অর্থনৈতিক ক্ষমতা সম্বন্ধে কি নীতি অবলম্বন করা হবে, এই নিয়ে হেনরী ও জন লরেন্স, এই দুই ভাইয়ের মধ্যে তীব্র মতভেদের সৃষ্টি হয়েছিল। হেনরী চেয়েছিলেন সর্দারদের জায়গীর ইত্যাদি অক্ষুন্ন রাখতে, আর জন চেয়েছিলেন তা খর্ব করে দিতে। শেষ পর্যন্ত হেনরীর নীতিই অবলম্বন করা হয়েছিল।

১। রাইক্স্: "নোটস্ অন দি রিভোল্ট", পৃঃ ৭৪।

২। হোমস্: "হিষ্ট্রি অব দি ইণ্ডিয়ান মিউটিনি"—১৯০৪ সংস্করণ, : পৃ৩১২।

"মিউটিনির সময় পাঞ্জাবে জন লরেন্সের গভর্নমেণ্টের বিস্ময়কর সফলতার প্রধান কারণ হচ্ছে, পুরাতন জায়গীরদারী অধিকারগুলি বজায় রাখবার জন্য স্যার হেনরী যেসব নীতি কার্যে পরিণত করেছিলেন, সেগুলি; যেসব সর্দারদের তিনি পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন এবং যাদের জন্য তিনি তাঁর পদ বিসর্জন দিয়েছিলেন, সেই সর্দাররাই তাদের সমস্ত দলবল নিয়ে আমাদেরই পাশে এসে দাঁড়াল এবং জন লরেন্সকে পাঞ্জাব থেকে দিল্লীতে সৈন্য পাঠাতে সমর্থ করে তুলল।"[১]

পাঞ্জাবের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, এখানে অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় শক্তিশালী ধনী কৃষকদের সংখ্যা বেশী ছিল। পাঞ্জাবে শান্তি স্থাপন ও নিজেদের শাসন সুদৃঢ় করবার জন্য ইংরেজরা খাজনা কম করে ধার্য করে এই শ্রেণীর লোকদের সন্তুষ্ট করবার চেষ্টা করেছিল। যেখানে অন্য প্রদেশের কৃষকরা তাদের ফসলের অর্ধেক কিম্বা তিন-চতুর্থাংশ খাজনা দিচ্ছিল, পাঞ্জাবে সেই ক্ষেত্রে ফসলের শতকরা মাত্র ১৫ ভাগ খাজনা ধার্য করা হয়। এই নীতির ফলে অধিক সংখ্যক সামান্য জমির মালিক ও ভূমিহীন কৃষকদের অবস্থার উন্নতি না হলেও কিছু সংখ্যক ধনী কৃষক যে কিছু কালের জন্য খানিকটা লাভবান হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। আরও একটি কথা এই যে, বিদ্রোহের পূর্বে পাঞ্জাবে ৩।৪ বৎসর ধরে কৃষকরা ভাল ফসল পেয়েছিল।

সর্বশেষে, "এ কথাটাও ভুললে চলবে না যে, পাঞ্জাবের লোকদের কোনোও অস্ত্র-শস্ত্র আর রাখতে দেওয়া হয়নি। এই সাধারণ নিরস্ত্রীকরণ কয়েক বৎসরের মধ্যেই জাতীয় প্রকৃতিতে অনেক পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। কঠিন ও বলবান লোকরা (বিদ্রোহের সময়) দেখতে পেল যে, তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত নয় এবং যুদ্ধের একটা প্রধান উপকরণ থেকে তারা বঞ্চিত। তারপর, সৌভাগ্যবশতঃ, যে শ্রেণীর লোক পূর্বে যুদ্ধের সময় নেতা হত এবং যাদের কেন্দ্র করে অসন্তুষ্ট লোকরা জমায়েত হতে পারত, সেই শ্রেণীর লোকদের পাঞ্জাবে আর রাখা হয়নি। রাজবন্দী ও বিপদ্‌জনক লোকদের সব সময়ই তাদের নিজের প্রদেশ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছিল। এই ব্যবস্থায় যে খুবই সুফল হয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সামন্ততান্ত্রিক কিম্বা অন্য কোনো ক্ষমতা নিয়ে যেসব সর্দাররা থাকল, তারা প্রত্যেকেই আমাদের দিকে ছিল। ··· তারা জানত যে, বিদ্রোহীরা প্রতিষ্ঠিত সরকারকে পরাস্ত করতে পারলে বিজয় গর্বে এতই উত্তেজিত হয়ে উঠবে যে, তখন তারাই (সর্দাররাই) হবে তাদের প্রথম বলি।"[২]

১। ফরেষ্ট : "ষ্টেট পেপার্স", ২য়, পৃঃ ১১।

২। "পাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্ডস্", ৮ম খণ্ড, ২য়, পৃঃ ৩৬১।

ইংরেজদের দিকে এতগুলি অনুকূল অবস্থা থাকা সত্ত্বেও তারা পাঞ্জাবে বিদ্রোহ ঠেকিয়ে রাখতে পারত না, যদি ঐ প্রদেশে আরও একটা অস্বাভাবিক ও ক্ষতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি না হত। অবশ্য এ পরিস্থিতি সমগ্রভাবে সকল ভারতবাসীর পক্ষেই ছিল ক্ষতিকর। বেঙ্গল আর্মির পাঞ্জাবী সিপাহীদের বলত পুরবিয়া; কারণ, এই সিপাহীরা ছিল ভারতের পূর্বাঞ্চলের বাসিন্দা। বেঙ্গল আর্মির সাহায্যেই ইংরেজরা খালসা বাহিনীকে পরাজিত করে পাঞ্জাব দখল করতে পেরেছিল। তারপর পাঞ্জাবে 'শান্তি-প্রতিষ্ঠা' করার জন্য, অর্থাৎ পাঞ্জাবের লোকদের দাবিয়ে রাখার জন্যও এই পুরবিয়াদেরই নিযুক্ত করা হয়। একটা 'আর্মি অব অকুপেশন'-এর ('বিজেতা বাহিনী'র) মতো বেঙ্গল আর্মির সিপাহীরা পাঞ্জাবে অবস্থান করত; তারাই যেন পাঞ্জাব জয় করেছে—এইরূপ ঔদ্ধত্যের সঙ্গে পাঞ্জাবের অধিবাসীদের সঙ্গে তারা ব্যবহার করত। এতে শিখদের দাবিয়ে রাখতে সুবিধা হয় বলে ইংরেজরা এই ঔদ্ধত্যকে প্রকারান্তরে প্রশ্রয় দিত। একজন ইংরেজ লেখক বলেছেন যে, পাঞ্জাবে এই ঘৃণাব্যঞ্জক 'পুরবিয়া' কথাটা পর্যন্ত ইচ্ছে করেই চালু করা হল, কারণ, "এর ফলে পাঞ্জাবী ও হিন্দুস্থানীদের মধ্যে ব্যবধান অনেক বেড়ে গেল এবং দু'পক্ষের সহযোগিতার সম্ভাবনা খুবই সুকঠিন হয়ে উঠল।"[১]

পুরবিয়াদের আধিপত্যজাত যে অপমান, তা "পাঞ্জাবীদের পক্ষে সহ্য করা আরও কষ্টকর ছিল এই কারণে যে, তারা তুলনায় নিজেদের বেশী বীরপুরুষ বলে মনে করত। জন লরেন্স ভেবেছিলেন যে, এই কথাটা (বীরত্ব) প্রমাণ করবার জন্য তারা এতই ব্যগ্র হয়ে পড়বে যে, সেটাই হবে এই প্রদেশটাকে রক্ষা করবার উপায়।"[২] অর্থাৎ এ সেই পারস্পরিক ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে বৃটিশের divide and rule নীতি। তবু, পাঞ্জাবে এত জাতি-বিদ্বেষ, বিভেদ ও প্রাদেশিকতা থাকা সত্ত্বেও যে পাঞ্জাবের অনেক শিখ, অনেক পাঞ্জাবী, অনেক পাঠান এত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও বিদ্রোহে যোগ দিয়ে অন্যান্য সকলের সঙ্গে মিলে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করতে চেয়েছিল—এইটাই পাঞ্জাবীদের পক্ষে কম গৌরবের কথা নয়।

দিল্লী ও মিরাট বিদ্রোহের খবর পাওয়া মাত্রই পাঞ্জাবের কর্তৃপক্ষ তৎক্ষণাৎ কতকগুলি সামরিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা অবলম্বন করার সঙ্গে সঙ্গে পুরবিয়া ও মোগলদের বিরুদ্ধে পাঞ্জাবীদের, বিশেষ করে শিখদের, ঘৃণা ও বিদ্বেষ উত্তেজিত

১। কেভ-ব্রাউন: "পাঞ্জাব এণ্ড দিল্লী ইন এইটিন ফিফটি সেভেন", ১ম, পৃঃ ৪১।

২। গিবন: "লরেন্সেস্ অব দি পাঞ্জাব," পৃঃ ২৫৮।

বিদ্রোহকালে অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ডের পাশে পাঞ্জাবের অবস্থান

করবার জন্য সব রকম পন্থা অবলম্বন করল। দিল্লীর বাদশাহ বাহাদুর শাহ পুরবিয়া সিপাহীদের হুকুম দিয়েছেন সমস্ত শিখদের ধ্বংস করতে, এই মর্মে লাহোরে ও অমৃতসরে দেওয়ালে প্রাচীর-পত্র টাঙিয়ে দিয়ে ও আরও নানা উপায়ে প্রচার করা চলল। এ বিষয়ে জীবনলাল তার ডায়েরিতে লিখেছে: "লাহোরের একজন সর্দারের নিকট থেকে যে চিঠি পাওয়া গিয়েছে তাতে বলা হয়েছে যে, সার জন লরেন্স পাঞ্জাবে একটা ইশ্‌তাহার বিলি করেছেন, যাতে তিনি এই কথা জানিয়েছেন যে, যারাই শিখদের হত্যা করবে ও তাদের মাথা কেটে নিয়ে আসবে, দিল্লীর বাদশাহ তাদের মোটা পুরস্কার দেবেন।"[১]

এইরূপ মিথ্যা প্রচার আরও নানা উপায়ে চারদিকে ছড়ানো হতে লাগল। ইংরেজরাই যে পাঞ্জাবের শত্রু, তারাই যে পাঞ্জাবের স্বাধীনতা হরণ করেছে, তাদের দাস করে রেখেছে, এ কথাটা চাপা দেওয়াই ছিল। মোগল বাদশাহ আর পুরবিয়া—এরাই হল পাঞ্জাবের শত্রু; আজ ইংরেজ শিখদের সেই জাতীয় শত্রুর সঙ্গে লড়ছে; শিখগুরুদের হত্যাকারীদের উপর প্রতিশোধ নেবার আজ অপূর্ব সুযোগ!—এই হল বৃটিশ প্রচারের অর্থ। এ বিষয়ে একজন ইংরেজ ঐতিহাসিক স্পষ্ট করে বলেছেন, "আমাদের একমাত্র উপায় ছিল শিখদের আহ্বান করা ও শত্রুকে দেখিয়ে দেওয়া, যে শত্রুকে তারা অবজ্ঞা করে, ঘৃণাও করে। ... এই বিদ্বেষকে আমরা শীঘ্রই কার্যকরী করে তুললাম। ... শুধু তাই নয়; পাঞ্জাবে বিদ্রোহী সিপাহীদের জন্তুর মতো শিকার করে বেড়ানোর কাজটা লাভজনকও ছিল বটে। ... একজন সশস্ত্র সিপাহীকে ধরার জন্য পুরস্কার দেওয়া হত ৫০৲ টাকা, নিরস্ত্র সিপাহীর জন্য ২৫৲ টাকা।"[২]

কিন্তু এত চেষ্টা করা সত্ত্বেও ইংরেজরা শিখ ও পাঞ্জাবীদের নিকট থেকে ৩-৪ মাস পর্যন্ত, বস্তুতঃ দিল্লীর পতন পর্যন্ত, বিশেষ কিছু সক্রিয় সাহায্য পায়নি। তাদের পরস্পরের মধ্যে যত বিদ্বেষই থাকুক, সকল পাঞ্জাবীরই ইংরেজবিদ্বেষ ছিল সব থেকে প্রবল। পাঞ্জাবের এই সময়কার অবস্থা সম্বন্ধে রবার্টস্‌ লিখেছিলেন: "সব নেটিভরাই সমান এবং আমি জোর করে বলতে পারি—অন্যান্যস্থানে যে রকম, পাঞ্জাবেও তেমনি সকলে আমাদের সর্বান্তঃকরণে ঘৃণা করে।"[৩]

সামরিকভাবে পাঞ্জাবে ইংরেজদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছিল মীয়ান মীর, লাহোর, গোবিন্দগড়, ফিরোজপুর, ফিলুর, মুলতান, কাঙ্গড়া, রাওয়লপিণ্ডি,

১। মেটকাফ সম্পাদিত: "টু নেটিভ ন্যারেটিভস্‌", পৃঃ ১৬৭

২। মীড: "সিপয় রিভোল্ট", পৃঃ ১৬৩-৬৪।

৩। "লেটার্স," পৃঃ ৫৬।

পেশোয়ার প্রভৃতি স্থানের দুর্গ ও অস্ত্রাগারগুলি রক্ষা করার উপর। ১২ই মে তারিখে আনারকলিতে (লাহোর) এক জরুরী সভায় ইংরেজ কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, এই সব স্থানে সিপাহীরা বিদ্রোহী মনোভাবাপন্ন হোক আর না হোক, এক মুহূর্ত সময় না দিয়ে তাদের নিরস্ত্র করতে হবে ও এই ভাবে ইংরেজের শক্তির পরিচয় দিয়ে পাঞ্জাবের লোকদের অভিভূত করে ফেলতে হবে।

১২ই তারিখে মিলিটারী পুলিসের একজন অফিসার ইংরেজ কর্তৃপক্ষকে সংবাদ দিল যে, মীয়ান মীরের সিপাহীদের মধ্যে বিদ্রোহের চক্রান্ত চলেছে। পাঞ্জাবের কমিশনার মণ্টোগোমারি লিখেছিলেন, "১৩ই তারিখে আমাদের বিপদ, আমরা যা মনে করেছিলাম, তার চাইতে অনেক বেশী ছিল। যুগপৎ দুর্গ দখল করার ও ক্যানটনমেণ্টে সিপাহীদের বিদ্রোহ শুরু করার একটা চক্রান্ত হয়েছিল। এই প্রচেষ্টার গুরুত্ব উপলব্ধি করবার জন্য এটা মনে রাখতে হবে যে, এই দুর্গ লাহোর শহরে আধিপত্য বজায় রাখার কেন্দ্রস্বরূপ এবং এখানেই ধনাগার ও অস্ত্রাগার অবস্থিত। এখান থেকে মাত্র ৫০ মাইল দূরে ফিরোজপুরেও আর একটি অস্ত্রাগার আছে, সেটা হচ্ছে এই অঞ্চলে সব থেকে বড়। যদি এই দু'টি স্থানের পতন হত, তা হলে আপতত পাঞ্জাব আমাদের সম্পূর্ণভাবে হারাতে হত, এখানকার সমস্ত ইউরোপীয়দের জীবন নষ্ট হত, দিল্লী পুনর্দখল করা যেত না এবং ভারতবর্ষকে আবার একেবারে প্রথম থেকে জয় করতে হত।"[১]

লাহোর থেকে মাত্র ৬ মাইল দূরে অবস্থিত এই মীয়ান মীর ছিল সামরিক দিক থেকে পাঞ্জাবে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান। এই স্থান বিদ্রোহীদের দ্বারা অধিকৃত হলে, শুধু যে ইংরেজদের সামরিক শক্তির মূলে প্রচণ্ড আঘাত পড়ত তাই নয়, পাঞ্জাবের লোকেরাও, বিশেষ করে পাঞ্জাব ইরেগুলার বাহিনী, ইংরেজের শক্তি ও ক্ষমতায় বিশ্বাস হারিয়ে ফেলত ও বিদ্রোহের দিকেই ঝুঁকে পড়ত। ১২ই তারিখে রাত্রে ইংরেজ সৈন্যদের একটা 'বল নাচে'র আয়োজন করা হয়েছিল। যথারীতি এই নৃত্য অনুষ্ঠিত হল। ঐ দিন সন্ধ্যার সময়ই হুকুম দেওয়া হল যে, পরদিন সকালে একটা প্যারেড হবে। ইংরেজ সৈন্যদের সারারাত আমোদপ্রমোদ করতে দেখে পরদিনকার প্যারেড সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই রইল না।

১৩ই মে সকালে বাহিনীগুলি সব এক লাইনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে গেল। দক্ষিণে ৮১শ ইংরেজ বাহিনী ও ইংরেজ গোলন্দাজ বাহিনী, মাঝখানে সিপাহী পদাতিক, বামপার্শ্বে সিপাহী অশ্বারোহী। প্রথমে ব্যারাকপুরের ৩৪শ বাহিনীর বরখাস্তের হুকুম পড়ে শুনিয়ে দেওয়া হল। তার পরেই শুরু হল আসল কাজ।

১। "পাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্ডস্", ৮ম খণ্ড, ১ম, পৃঃ ২২৯।

সিপাহীদের পিছনে হটতে বলা হল ; আর ইংরেজ সৈন্যরা সিপাহীদের সামনা-সামনি এসে দাঁড়াল। ইতিমধ্যে ইংরেজ গোলন্দাজরা ইংরেজ পদাতিকদের পেছনে থেকে ও সিপাহীদের অলক্ষ্যে কামান সাজিয়ে তৈরী হয়ে থাকল। সচরাচর প্যারেডে এই রকমই হয়ে থাকে বলে তখনও সিপাহীদের মধ্যে কোনো সন্দেহ জাগেনি। তারপরেই একজন ইংরেজ অফিসার হিন্দুস্থানীতে এই সব সিপাহীদের বরখাস্তের হুকুম পড়ে শুনিয়ে দিলেন এবং পড়া শেষ হওয়া মাত্রই তাদের অস্ত্রশস্ত্র জমির উপর রেখে দেবার হুকুম হল। সঙ্গে সঙ্গে ৮১শ ইংরেজ বাহিনী ভাগ ভাগ হয়ে কয়েক পা পিছিয়ে কামানগুলির মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ল। সিপাহীরা মুহূর্তের মধ্যে দেখতে পেল—তারা উদ্যত কামানের মুখে দাঁড়িয়ে আছে। কয়েক মুহূর্তের জন্য সিপাহীরা নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, তারপর তারা অস্ত্র সমর্পণ করল।[১] এই ভাবে প্রায় ২৫,০০০ সিপাহী মাত্র ৬০০ ইংরেজের তৎপরতা ও কৌশলের কাছে পরাজিত হল।

মীয়ান মীরের ঘটনা সম্বন্ধে কে' ঠিকই বলেছেন যে, "এই চমৎকার পরিকল্পনাটি চূড়ান্ত কৌশলের দ্বারা কার্যে পরিণত করা হয়েছিল এবং যদি প্রথম আঘাতেই কোনো যুদ্ধ জয় করা হয়ে থাকে, তা হলে পাঞ্জাবের যুদ্ধ ঐদিন লড়া হয়েছিল এবং ঐদিন সকালেই জেতা হয়েছিল।"[২]

লাহোর থেকে ৩০ মাইল দূরে ও অমৃতসরের পাশে গোবিন্দগড়ের দুর্গও সিপাহীরা প্রস্তুত হবার পূর্বেই ইংরেজ সৈন্যদের দ্বারা অধিকৃত হল। সমস্ত শিখ অঞ্চলকে ঠাণ্ডা রাখবার জন্য গোবিন্দগড়ের দুর্গের গুরুত্ব মীয়ান মীরের চাইতে কোনো অংশে কম ছিল না।

ফিরোজপুরের অস্ত্রাগার ভারতের অন্যতম সর্ববৃহৎ অস্ত্রাগার। সব রকমের কামান, বন্দুক, গোলাবারুদ এখানে প্রচুর পরিমাণে ছিল। ৪৫ম ও ৫৭ম পদাতিক ও ১০ম অশ্বারোহী সিপাহী বাহিনীগুলি এখানে ছিল। আর ছিল ৬১ম ইংরেজ বাহিনী ও একদল শক্তিশালী ইংরেজ গোলন্দাজ। এই দুর্গের নায়ক ঠিক করে-ছিলেন ৪৫ম ও ৫৭ম বাহিনী দুটিকে পৃথক পৃথক ভাবে নিরস্ত্র করবেন। তাদের যখন মার্চ করিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন তারা ইংরেজ সৈন্যদের সন্দেহজনক গতিবিধি লক্ষ্য করে। ৪৫ম বাহিনীর সিপাহীরা, সংখ্যায় মাত্র ২০০, তখনই বিদ্রোহ করে অস্ত্রাগার আক্রমণ করল। সেখানে ইংরেজ সৈন্যরা তখন পাহারা দিচ্ছিল। কিছুক্ষণ যুদ্ধ করার পর ঐ স্থান অধিকার করতে অসমর্থ হয়ে তারা

১। কুপার : "ক্রাইসিস্ ইন দি পাঞ্জাব", পৃঃ ৪-৫।

২। কে' : "হিষ্ট্রি অব দি সিপয় ওয়ার ইন ইণ্ডিয়া", ২য়, পৃঃ ৪৩৩।

শহরে চলে গেল। ততক্ষণে শহরের লোকও বিদ্রোহী হয়ে যা কিছু বিদেশী—ক্যানটনমেণ্ট, গীর্জা, বাংলো ইত্যাদি ধ্বংস করতে শুরু করে দিয়েছে। ৫৭ম বাহিনীর সিপাহীরা নিষ্ক্রিয় থেকে গেল—যদিও তারাই ছিল সব থেকে বেশী বিদ্রোহী ভাবাপন্ন। ১০ম বাহিনীর অশ্বারোহীরা ইংরেজের দিকেই লড়ল। পরের দিন ১৪ই তারিখে ৫৭ম পদাতিক ও ১০ম অশ্বারোহীদের বিনা বাধায় নিরস্ত্র করা হল। সব সিপাহীরা একসঙ্গে মিলিতভাবে আক্রমণ করলে নিশ্চয়ই তারা অস্ত্রাগার অধিকার করতে পারত এবং তা ঘটলে, কেভ-ব্রাউনের মতে, ইংরেজরা 'চার মাসের চার গুণ সময়ের মধ্যেও' দিল্লী অধিকার করতে পারত না। এখানে ব্যর্থ হয়ে বিদ্রোহী সিপাহীরা দিল্লীর দিকে চলে গেল।

ফিলুরের দুর্গের অবস্থান ফিরোজপুরের চাইতেও বেশী গুরুত্বপূর্ণ ছিল। দিল্লী-লাহোর-পেশোয়ার গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ধারে, জলন্ধর ও লুধিয়ানার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত এই ফিলুর দুর্গ সত্যই 'পাঞ্জাবের চাবি-কাঠি' ছিল। এই চমৎকার সামরিক অবস্থান ছাড়াও, ফিলুরের অস্ত্রাগারের স্থান ছিল ফিরোজপুরের পরেই। এসময় অন্যান্য স্থানের তুলনায় ফিলুরের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, এখানে ইংরেজ সৈন্যের সংখ্যা ছিল খুবই কম। এই দুর্গ রক্ষার ভার ছিল ৩য় সিপাহী বাহিনীর উপর। এখান থেকে ২৪ মাইল দূরে জলন্ধরে থাকত ইংরেজ ৮ম বাহিনী ও একদল গোলন্দাজ, আর থাকত ৩৬ম ও ৬১ম সিপাহী পদাতিক ও কিছু অশ্বারোহী। ইংরেজরা খবর পেল যে, জলন্ধরের সিপাহীরা ফিলুরের কমরেডদের সঙ্গে এই স্থানগুলি দখল করবার জন্য ষড়যন্ত্র করছে। সঙ্গে সঙ্গে তারা ফিলুরে একদল ইংরেজ সৈন্য আর জলন্ধরে কাপুরতলার রাজার সৈন্যদের পাঠিয়ে দিয়ে সিপাহীদের নিরস্ত্র করবার ব্যবস্থা করতে লাগল। সিপাহীরা বিদ্রোহী ভাবাপন্ন হলেও তারা তৎপরতার সঙ্গে কাজ করতে পারল না। বিনা বাধায় ফিলুর দুর্গের ভার ইংরেজ সৈন্যদের ছেড়ে দিল। ইংরেজরা দুর্গ দখল করল বটে, কিন্তু তাদের এত শক্তি ছিল না যে, তারা ৩য় বাহিনীকে নিরস্ত্র করে। এর এক সপ্তাহ পরে এই সিপাহীদেরই দিল্লী আক্রমণের জন্য কতকগুলি অবরোধ-কামান শতদ্রু নদীর অপর পারে নিয়ে যাবার জন্য হুকুম করা হল। তারা কামানগুলি অপর পারে নিয়ে যাবার দু' ঘণ্টা পরেই বন্যার জলে নৌকোর সেতু ভেসে গিয়েছিল। যা হোক, হুকুম মতো তারা কামানগুলি নাভা রাজার সৈন্য আর ৯ম ইরেগুলার শিখ বাহিনীর হাতে তুলে দিল। অথচ এই ৩য় বাহিনীর সৈন্যরাই এই ঘটনার মাত্র দু' সপ্তাহ পরে বিদ্রোহ করেছিল। একদিকে এই আনুগত্য ও বশ্যতা, অন্যদিকে বিদ্রোহ—তাদের এরূপ অসামঞ্জস্য ও পরস্পরবিরোধী ব্যবহারের

কারণ অবশ্য বিস্ময়জনক। কমিশনার রিকেটস্-এর লুধিয়ানা রিপোর্টে যেটা দেখা যায়, সেটা হলো এই যে, ৩য় বাহিনীর সিপাহীরা অন্যান্য বাহিনীর সিপাহীদেব সঙ্গে স্থির করেছিল—তারা সকলে মিলে একটা বিশিষ্ট দিনে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে এবং এই কারণেই আশু কোনো সুবিধার লোভে তাদের সিদ্ধান্ত-বহির্ভূত কোনো কাজে অগ্রসর হয়নি।[১]

বাস্তবিকপক্ষে, ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের ইতিহাসে সিপাহীদের এরূপ স্ববিরোধী কার্যের প্রচুর উদাহরণ পাওয়া যায়, যখন ইতস্ততঃ ও অবহেলার বশে এবং তৎপরতার অভাবে শত্রুকে ধ্বংস করবার শ্রেষ্ঠ সুযোগগুলি তারা হারিয়েছে ও তাদের শত্রুদের সুবিধা করে দিয়ে নিজেদেরই ধ্বংসের পথ পরিষ্কার করেছে।

৭ই জুন মধ্য রাত্রিতে জলন্ধরের সিপাহীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করল। সেখানকার অল্পসংখ্যক ইংরেজ ধ্বংস করে তারা অনায়াসে শহর দখল করতে পারত। শহবে বিদ্রোহের খবর প্রচার হবার সঙ্গে সঙ্গেই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে সামরিক ও বেসামরিক ইংরেজরা যে যেখানে পেরেছিল আশ্রয় গ্রহণ করেছিল।

কিন্তু বিদ্রোহ করেই জলন্ধরের সিপাহীরা ফিলুরে চলে গেল। সেখানে ৩য় বাহিনী দ্রুত এসে তাদের সঙ্গে যোগ দিল। সমবেত বিদ্রোহীরা তখন স্থির করল, শতদ্রু পার হয়ে তারা লুধিয়ানা দিয়ে দিল্লী চলে যাবে। ফিলুরের অপর পারেই আর একটি সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান লুধিয়ানা। জলন্ধরের বিদ্রোহের খবর পেয়েই লুধিয়ানার ইংরেজ গোলন্দাজরা ও একদল নাভা সৈন্য বিদ্রোহীদের বাধা দেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে রইল। নৌকোর সেতু ভেসে যাবার ফলে বিদ্রোহীরা ৪ মাইল উত্তরে নৌকো করে নদী পার হবার চেষ্টা করল। তাদের নৌকোগুলি যখন মাঝপথে তখন ইংরেজ কামানের গোলায় তাদের বেশ ক্ষতি হল। প্রত্যুত্তর দেবার জন্য সিপাহীদের কোনো কামান ছিল না। তা সত্ত্বেও অসম সাহসের পরিচয় দিয়ে নদী পার হয়ে তারা বন্দুক ও তলোয়ার নিয়েই ইংরেজদের আক্রমণ করল। নাভার রাজার শিখ সৈন্যরা প্রথমেই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করল[২]; তারপর ইংরেজ বাহিনীর নায়ক উইলিয়ামস্ ও আরও কয়েকজন ইংরেজ মারা যাবার পর ইংরেজ গোলন্দাজরাও রণে ভঙ্গ দিল। ৮ই জুন মধ্যাহ্নে বিজয়-উল্লাসে বিদ্রোহীরা লুধিয়ানা শহরে প্রবেশ করল।

বিদ্রোহীদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই লুধিয়ানার জনসাধারণও বিদ্রোহে যোগদান করল। সিপাহীরা ধনাগার দখল করল ও জেলখানা খুলে দিল।

১। কে’ঃ পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ২য়, পৃঃ ১৯০।

২। ঐ, পৃঃ ৫০৫।

ইংরেজদের বাংলো, সরকারী অফিসগুলি ও গুদাম ইত্যাদি সব লুঠ হয়ে গেল। যেসব ভারতীয় ইংরেজ-ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিল, তাদের বাড়িঘরও লুট হয়ে গেল।[১] এখানে বিশেষ দ্রষ্টব্যের বিষয় হল এই যে, লুধিয়ানা ছিল একটি শিখ-প্রধান শহর এবং শিখরাই এখানে বেশী করে বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল। ইংরেজের এত সাবধানতা সত্ত্বেও জলন্ধর-দোয়াবের বিদ্রোহ চমৎকার ভাবে সফল হয়েছিল। কেবলমাত্র শহরেই নয়, শতদ্রু নদীর দু'ধারে ফিরোজপুর থেকে লুধিয়ানা পর্যন্ত ও সেখান থেকে আম্বালা, থানেশ্বর পর্যন্ত গ্রামগুলিতেও বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছিল। শিখ, হিন্দু, মুসলমান কেউই পিছিয়ে পড়ে থাকেনি। পাঞ্জাবের লোকরা, বিশেষ করে শিখরা (এই অঞ্চলে শিখদের সংখ্যাই বেশী ছিল), যে ইংরেজের গুণমুগ্ধ হয়ে পড়েনি, জলন্ধর-দোয়াবের এই গণ-বিদ্রোহ ইংরেজের নিকট তা প্রমাণ করে দিল। লুধিয়ানার এই বিদ্রোহ আরও প্রমাণ করে দিল যে, শিখরাও সুযোগ ও নেতৃত্ব পেলে অন্যান্য ভারতবাসীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিদেশী শত্রুকে বহিষ্কার করে নিজেদের দেশকে মুক্ত করতে প্রস্তুত ছিল।[২] ফিলুরে যে ৩য় সিপাহী বাহিনী বিদ্রোহ করেছিল তাদের মধ্যে দুজন ইংরেজের হাতে ধরা পড়ে যায়। তাদের একজন ছিল ঝেলামের মুসলমান আর একজন মাঞ্ঝা শিখ, যে লেফটেনাণ্ট ইয়র্ককে গুলী করে মারার চেষ্টা করেছিল। ইংরেজের গুলীতে দুজনকেই অবশ্য মৃত্যু বরণ করতে হয়।

লুধিয়ানাতে বিদ্রোহীরা আসা মাত্রই লুধিয়ানার মৌলভী জনসাধারণকে বিদ্রোহের জন্য আহ্বান জানালেন। এই মৌলভী সম্বন্ধে ডেপুটি কমিশনার রিকেটস্-এর রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, তিনি পূর্বে "দু' বার মুসলমানদের বিদ্রোহের কাছাকাছি নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁকে অনেক আফগান শাহজাদা সম্মান করতেন (শাহ জামান ও শাহ সুজার বংশধররা আরও অনেক আফগান নির্বাসিতের সঙ্গে বছরে ৭৫,০০০৲ টাকা পেন্সন-ভোগী হয়ে ওখানে বাস করছিলেন), এবং তাঁদের একজন সফডার জঙ্গ তাঁর দলভুক্ত ছিলেন। নীচু জাতির লোকদের কাছে তিনি ছিলেন সর্বেসর্বা। তাঁর প্রতিপত্তি সমগ্র জেলা ছাড়িয়ে আরও অনেক স্থানে বিস্তার লাভ করেছিল, কারণ তিনি ছিলেন জাতিতে গুজার মুসলমান, আর এই জাতি শতদ্রুর সমগ্র নিম্নভূমিতে বাস করত। ইংরেজের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করার অপরাধে তাঁকে লুধিয়ানায় ১৮৪৯ সালে অন্তরীণ করে রাখা হয়েছিল। সিপাহীদের আসার পর তিনি তাঁর ভক্তদের নিয়ে তাঁর ধর্মের

১। "পাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্ডস্", ৮ম খণ্ড, ১ম, পৃঃ ১৩।
২। ঐ, পৃষ্ঠা ১০১।

সবুজ পতাকা উড়িয়ে চললেন দিল্লীর দিকে।[১] দুর্গে কামানগুলি দাঁড় করাবার জন্য ২০০ গুজার সিপাহীদের সাহায্য করেছিল; দুর্গের নিকটবর্তী সব লোকেরাই সিপাহীদের সাহায্য করেছিল, একসঙ্গে তাদের ১০ দিনের মতো খোরাক জোগাড় করে এনে দিয়েছিল এবং আরও অনেক প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এনে দিয়েছিল।[২]

শ্রমিকরাও যে বিদ্রোহীদের সাহায্য করতে সব সময় খুব অগ্রণী ছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। উক্ত রিপোর্টেই দেখা যায় যে, লুধিয়ানার কাশ্মীরী শাল-কর্মীরা "গভর্নমেণ্ট স্টোর্স লুট করতে, আমেরিকান মিশন ধ্বংস করে দিতে (যেখানে তারা অনেকেই শিক্ষা লাভ করেছিল), গীর্জা ও বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিতে, প্রেস ভেঙে দিতে এবং প্রতিশোধ নেবার জন্য সরকারী কর্মচারী ও ইংরেজের শুভাকাঙ্ক্ষীদের বাড়িগুলি সিপাহীদের দেখিয়ে দিতে বিশেষভাবে অগ্রণী ছিল।"[৩]

বিদ্রোহের সময় ধনী ও বানিয়াদের ব্যবহার সম্বন্ধে রিকেটস্ তাঁর রিপোর্টে যা বলে গিয়েছেন, তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি লিখেছেন: "প্রধান প্রধান চৌধুরী, ব্যবসায়ী ও মহাজনরা একটু চেষ্টা করলেই শহরের শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখবার জন্য নীচু স্তরের লোকদের উপর তাদের সাধারণ প্রভাব খাটিয়ে অনেক কিছু করতে পারত, কিন্তু তারা তাদের টাকার থলিগুলি নিরাপদ গুপ্তস্থানে লুকিয়ে রেখে দরজা বন্ধ করে চুপ করে বসে থাকল। যখন রণযোধ সিং-এর অধীনে শিখ বাহিনী ১৮৪৫ সালে লুধিয়ানা আক্রমণ করেছিল, তখন এদেরই প্রত্যেকটি লোক তাঁকে সাদরে অভিনন্দন জানিয়েছিল। এই শ্রেণীর সকল লোকই বাতাস যেদিকে বয় সে দিকেই ঝুঁকে পড়ে। যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের মুখ্য স্বার্থে ব্যাঘাত না ঘটে, ততক্ষণ পর্যন্ত যেই জিতুক তাতে তাদের কিছু আসে যায় না। যদিও শৃঙ্খলা ও সুশাসনে এদের চাইতে বেশী আর কেউ লাভবান হয় না এবং বিপরীত অবস্থায় এরাই সব থেকে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তথাপি সরকারের প্রতি আনুগত্য ও স্বদেশপ্রেম—প্রকৃত অর্থে ও স্বদেশপ্রেমের নিজস্ব দাবিতে স্বদেশপ্রেম এদের নিকট সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত। দূরদর্শিতা ও জ্ঞানের অভাবে তারা তাদের চোখের সামনে যা ঘটছে তার বেশী কিছু দেখতে পায় না। কাপুরুষোচিত চরিত্র ও কেবলমাত্র নিজেদের লাভের চিন্তা বশতঃ, তারা যে কার পক্ষে, সেটা তারা সজোরে ঘোষণা করতে পারে না। ··· এদের আর উপেক্ষা করা গভর্নমেণ্টের উচিত হবে না। তাদের ভয় ও স্বার্থের কথা মনে রেখে

১। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৯৫। ২। ঐ, পৃঃ ৯৪।

৩। ঐ, পৃঃ ৯৫।

তাদের নিকট থেকে জোর করে সম্মান ও সাহায্য আদায় করতে হবে। ··· এই সব লোক সরকারী ঋণে মাত্র দু' লক্ষ টাকা দিয়েছে, তাও খুব অনিচ্ছার সঙ্গে, এবং দিল্লী অধিকারের পূর্বে এদের কাছ থেকে কিছুই পাওয়া যায়নি।"[১]

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ, বিজয়ী সিপাহীরা তাদের এই তাৎপর্যপূর্ণ জয়ের ও শিখ অঞ্চলের মধ্যস্থলে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপরে অবস্থিত লুধিয়ানার গুরুত্ব একেবারেই বুঝতে পারল না। একদিন পর ৯ই জুন তারা লুধিয়ানা ত্যাগ করে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করল। লুধিয়ানাকে কেন্দ্র করে যদি বিদ্রোহীরা জলন্ধর-দোয়াব দখল করে বসত এবং শিখ ও পাঞ্জাবীদের স্বাধীনতার সংগ্রামে আহ্বান জানাত, তা হলে বিদ্রোহীদের নৈতিক ও সামরিক শক্তি এতই বেড়ে যেত যে, সমগ্র পাঞ্জাবে বৃটিশদের অবস্থান খুবই দুর্বল হয়ে পড়ত এবং জনসাধারণ তাদের মনের দোদুল্যমান অবস্থা কাটিয়ে বিদ্রোহের দিকে ঝুঁকে পড়ত। এই বিপদ্‌জনক পরিস্থিতির গুরুত্ব ইংরেজরা খুব ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিল। কে' বলেছেন: "দুর্গ দখল করে, কামানগুলিতে গোলন্দাজ বসিয়ে, ধনাগার হস্তগত করে এবং জনসাধারণের অধিকাংশের সাহায্য পেয়ে বিদ্রোহীরা অনায়াসে, অন্ততঃ কিছুকালের জন্য, আমাদের উপেক্ষা করতে পারত। ইংরেজদের পক্ষে পাঞ্জাব থেকে দিল্লী যাবার প্রধান রাস্তার উপর এই শহর হারানো বাস্তবিকই অত্যন্ত ক্ষতিকর হত; দিল্লী অধিকারের প্রচেষ্টা অনির্দিষ্ট কালের জন্য পিছিয়ে যেত ও তার ফলে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সমগ্র অভিযানেরও সর্বনাশ হয়ে যেত।"[২]

লুধিয়ানার কমিশনার রিকেটস্ তাঁর রিপোর্টে লিখেছিলেন যে, সিপাহীরা যদি লুধিয়ানাতেই থেকে যেত, তা হলে "তারা সমস্ত শতদ্রু অঞ্চলে অরাজকতা বিস্তার করে দেশীয় শিখ রাজ্যগুলিকে কাহিল করে দিতে পারত, ··· কিন্তু তাদের গোলা-বারুদ শেষ হয়ে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি জলন্ধর ত্যাগ করার সময় তারা ভুল করে গুলীশূন্য টোটা সঙ্গে নিয়েছিল। সেইজন্য আমাদের সৈন্যদের সঙ্গে কোনো রকমের সংঘর্ষ এড়িয়ে তাদের দিল্লী অভিমুখে দ্রুত মার্চ করে চলে যেতে হয়েছিল।"[৩]

বিদ্রোহীরা লুধিয়ানা ছেড়ে চলে যাবার পর একটি ইংরেজ বাহিনী এসে বিজয়গর্বে শহরে প্রবেশ করল; তারপরেই শুরু হল তাদের তাণ্ডব! কত লোককে যে তারা গুলী করে মারল ও ফাঁসিতে ঝোলাল, তার কোনো হিসেব

১। "পাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্ডস্", ৮ম খণ্ড, ১ম, পৃঃ ৯৫-৯৬।

২। কে' ঃ হিষ্ট্রি অব সিপয় ওয়ার ইন ইণ্ডিয়া", ২য়, পৃঃ ৫০৮।

৩। ঐ, পৃঃ ৫০৮।

নেই। বিদ্রোহীদের সাহায্য করার জন্য দুর্গের ৩০০ গজের মধ্যে যত বাড়িঘর ছিল, সব ধূলিসাৎ করে দেওয়া হল। ১৭ই জুন তারা শহরের অধিবাসীদের নিরস্ত্র করতে শুরু করল। "খানাতল্লাসী খুব ভালভাবেই করা হয়েছিল। ১০ গাড়ি-ভর্তি সব রকমের অস্ত্রশস্ত্র ধরা হয়েছিল ··· ইউরোপীয় অফিসারদের তত্ত্বাবধানে আম্বালা, থানেশ্বর, জগদ্রী ও ফিরোজপুর শহরগুলিতেও এভাবে খানাতল্লাসী করা হয়েছিল। ··· কিছুদিন পরে এই ডিভিশনের প্রত্যেকটি গ্রাম আবার দ্বিতীয়বার আরও ভাল করে খানাতল্লাসী করা হয়েছে।"[১] কুপার এ সম্বন্ধে আরও সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন: "এই কুখ্যাত ও হাঙ্গামাকারী শহরের লোকেরা কমিশনার রিকেটস্ যে লৌহদণ্ড দিয়ে জিলাতে বিদ্রোহ দমন করলেন তার প্রথম আঘাত, হাড়েহাড়েই উপলব্ধি করতে পারল। এই কাজের জন্য তিনি যে খ্যাতি লাভ করেছিলেন তা খুবই সু-অর্জিত। বাস্তবিকপক্ষে কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁর নামটাই লোকের মনে এত আতঙ্কের সৃষ্টি করত যে, কয়েকজন অধিবাসী তাঁকে 'সাবাড়' করে দেবার জন্য দিল্লীর বাদশাহের নিকট দরখাস্ত করেছিল।"[২] এই খানাতল্লাসী থেকে কোনো লোকই রেহাই পায়নি। ইংরেজ সৈন্যরা কেবলমাত্র অস্ত্রশস্ত্রই বাজেয়াপ্ত করেনি, গহনা ও টাকা-পয়সা নিতেও তারা ভোলেনি।[৩] এই ধরনের খানাতল্লাসী ও অত্যাচার একেবারে সিমলা পর্যন্ত করা হয়েছিল।

এসব সাধারণ শাস্তি ছাড়াও সমস্ত লুধিয়ানা শহরের উপর একটা পাইকারী জরিমানা বসানো হল। দোষী-নির্দোষ, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে শহরের প্রত্যেকটি লোককে জরিমানা দিতে বাধ্য করা হয়েছিল। সরকারের মতে যখন সকল শ্রেণীর লোকই বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল, তখন সকলেই জরিমানা দিতে বাধ্য। তা ছাড়া, জেলখানা বেত্রদণ্ড ইত্যাদির ন্যায় সাধারণ শাস্তির চাইতে এরকম পাইকারী জরিমানাকে সকলে আরও ভয় করে; শাস্তি বজায় রাখার পক্ষে এর মতো মহৌষধ আর নেই! এই উপায়ে শুধু লুধিয়ানা শহরেই নয়, সমস্ত জিলায় যে খুব 'সন্তোষজনক ফল' পাওয়া গিয়েছিল, সে সম্বন্ধে রিকেটস্ তাঁর রিপোর্টে অনেক কিছু লিখেছিলেন।[৪]

বিদ্রোহী সিপাহীরা যখন লুধিয়ানা ত্যাগ করল, তখন "তাদের একটি ছোট দল প্রধান বাহিনী থেকে পৃথক হয়ে উত্তরের দিকে পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে চলতে

১। "পাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্ডস্", ৮ম খণ্ড, ১ম, পৃঃ ১৭।
২। কুপার: "ক্রাইসিস্ ইন দি পাঞ্জাব," পৃঃ ৪১।
৩। "পাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্ডস্", ৮ম, ১ম, পৃঃ ৯৭।
৪। ঐ, পৃঃ ৯৯-১০০।

লাগল ; তারা হোসিয়ারপুর জিলায় শতদ্রু পার হল, তারপর সমস্ত আম্বালা জিলা অতিক্রম করে যমুনা নদীর অন্যধারে পৌছে গেল। সর্বত্রই জনসাধারণের নিকট থেকে তারা বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা পেয়েছিল। লোকে বিদ্রোহীদের খাদ্য সরবরাহ করেছিল এবং নিরাপদ রাস্তা দিয়ে তাদের সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল।"[১] পাঞ্জাবের গ্রামবাসীদেরও সহানুভূতি ও সমর্থন যে পুরামাত্রায় বিদ্রোহীদের প্রতিই ছিল, তা এরকম সরকারী রিপোর্টগুলি থেকেই বোঝা যায়। সমগ্র থানেশ্বর জিলায় গ্রামবাসীদের বিদ্রোহ সক্রিয় আকার ধারণ করেছিল। বিশেষ করে গুজারদের মধ্যে ব্যাপকভাবে বিদ্রোহ ছড়িয়ে গিয়েছিল। সিপাহীরা চলে যাবার পর ইংরেজরা এক একটা করে প্রত্যেকটি গুজার-গ্রাম আগুন দিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছিল এবং গুজারদের পাইকারীভাবে হত্যা করা হয়েছিল। সিপাহীদের সাহায্য করার অপরাধে থানেশ্বর শহরে একদিনে ২২ জন লোককে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল।[২]

এই সময়ে নাভা রাজ্যে জেইটো নামক স্থানে জনসাধারণ গুরু শ্যামদাসের নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ফরিদকোটেও এই বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। যখন ফিরোজপুরের ডেপুটি কমিশনার মেজর মার্সডেন দুটি কামান সহ ১০ম ইংরেজ অশ্বারোহী এবং পাতিয়ালার কিছু সৈন্য নিয়ে জেইটো আসলেন, তখন শ্যামদাসের অধীনে ৩০০০ গ্রামবাসী ইংরেজকে আক্রমণ করে। এই যুদ্ধে শ্যামদাস ও আরও অনেকের মৃত্যু হয়।[৩] এর কিছুদিন পরে বিদ্রোহীরা থানেশ্বরের জেলখানা আক্রমণ করে, কারণ এখানে অনেক বিদ্রোহীকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। বিদ্রোহী বন্দীদের যখন ঐখানে রাখা নিরাপদ নয় ভেবে আম্বালায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন গ্রামবাসীরা ইংরেজদের আমুন্দে আক্রমণ করেছিল। এদের রক্ষা করার জন্য আর একটি ইংরেজ বাহিনীকে কামান সহ আসতে হল। এখানেও সমস্ত স্থানটাই ধ্বংস হয়ে গেল ও অনেক লোক হতাহত হল।[৪] এই সব উদাহরণগুলি থেকেই স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, পাঞ্জাবের কতকগুলি জিলায় বিদ্রোহ শুধু সিপাহীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, গণবিদ্রোহের আকারেই তা প্রসার লাভ করছিল। বস্তুতঃ ইংরেজ সম্পর্কে একটা অসহযোগিতার মনোভাব সমাজের সকল স্তরে ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করেছিল। ঐতিহাসিক কে' বলেছেন যে, বিদ্রোহের প্রথম দিকে আম্বালা থেকে দিল্লী পর্যন্ত "সর্বশ্রেণীর নেটিভরা দূরে সরে ছিল; তারা ঘটনাগুলি লক্ষ্য করে যাচ্ছিল। আমাদের ক্ষমতা

১। "পাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্ডস্", ৮ম খণ্ড, ১ম, পৃঃ ১৭।
২। ঐ, পৃঃ ১৫। ৩। ঐ, পৃঃ ১৫ ও ৫৩। ৪। ঐ, পৃঃ ১৬।

কিছুদিনের মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে ভেবে, ধনী থেকে কুলী পর্যন্ত কেউই আমাদের কোনোরকম সাহায্য করছিল না।"

মীয়ান মীরে সিপাহীদের নিরস্ত্রীকরণের দেড় মাস পরে ২৬শ বাহিনীর ৭৫০ জন সিপাহী অপমান ও লাঞ্ছনা আর সহ্য করতে না পেরে ৩০শে জুলাইতে বিদ্রোহ করে অন্যত্র চলে যাবার চেষ্টা করল। তাদের হাতে কোনো অস্ত্র ছিল না। অমৃত-সহরের ডেপুটি কমিশনার কুপার ১৫০ জনের একটা মিলিটারী পুলিসের দল নিয়ে তৎক্ষণাৎ সিপাহীদের পশ্চাদ্ধাবন করলেন। ভূতপূর্ব খালসা বাহিনীর একজন পুরাতন জেনারেল হরসুখ রায় এবং ইংরেজদের একজন আদি 'বন্ধু' সিন্ধনওয়ালা পরিবারের সর্দার পরতাব সিং কিছু অনুচর সহ কুপারের সঙ্গে চললেন। সিপাহীরা যখন অমৃতসহর থেকে ২২ মাইল দূরে আজনালা গ্রামে পৌছল, তখন সেখানকার স্থানীয় পুলিস অফিসার দেওয়ান প্রেমনাথ পুলিস ও গ্রামবাসীদের নিয়ে "ওখানকার নৌকো দুটো বিদ্রোহীদের হাত থেকে রক্ষা করল এবং অনেককে মারতে মারতে নদীতে ফেলে দিল। এই ভাবে ১৫০ থেকে ২০০ লোক গুলীতে নয়ত জলে ডুবে মারা গেল।"[১]

অবশিষ্ট বিদ্রোহীরা সাঁতার কেটে নদীর মাঝখানে একটা দ্বীপের উপর আশ্রয় নিল। বন্যার ফলে দ্বীপের যে অংশ জেগে ছিল তা হচ্ছে ২০০ গজ লম্বা ও ৭০ গজ চওড়া সামান্য একটু স্থান। অনাহারে ও ক্লান্তিতে বিদ্রোহীরা তখন মৃতবৎ হয়ে পড়েছে। সূর্য অস্ত যাবার পূর্বেই কুপার তাঁর দলবল নিয়ে হাজির হলেন এবং দ্বীপ থেকে ১৬০ জন বিদ্রোহীকে বন্দী করে আজনালায় নিয়ে এলেন। ইতিমধ্যে বীরপুঙ্গব পরতাব সিং-ও চারদিকের গ্রামগুলি থেকে ৬৬ জনকে ধরে নিয়ে এলেন। অন্যরাও কয়েকজন করে বন্দী নিয়ে আসল। এই ভাবে ২৮২ জন বন্দীকে ৩১শে জুলাইয়ের রাত্রে একটা ছোট ঘরে বন্দী করে রাখা হল।

পরদিন প্রত্যুষে ইংরেজ ঔপনিবেশিক 'হীরো' কুপার বীরদর্পে তাঁর কাজ শুরু করলেন। যেখানে যত দড়ি পাওয়া গিয়েছিল, ফাঁসির জন্য সব তিনি আনিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু তাতেও যখন আর কুলিয়ে উঠল না, তখন অবশিষ্টদের গুলী করে হত্যা করাই ঠিক হল। এই 'কঠিন কর্তব্যে'র বর্ণনা তিনি নিজেই এই ভাবে দিয়েছেন: "এই ভাবে ১৫০ জনকে গুলী করে মারার পর একজন গুলীচালক (যে ছিল গুলীচালকদের মধ্যে সব থেকে বয়োজ্যেষ্ঠ) অজ্ঞান হয়ে পড়ল। তারপর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে আবার কাজ শুরু হল। এই ভাবে যখন ২৩৭ জনকে সাবাড় করে দেওয়া হয়েছে, তখন দেখা গেল যে, বাদবাকি

১। "পাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্ডস," ৮ম খণ্ড, ১ম, পৃঃ ৩৮৮।

বন্দীরা, যাদের একটা খুব ছোট দুর্গের মতো স্থানে কিছুক্ষণ পূর্বে আটকিয়ে রাখা হয়েছিল, তারা বেরিয়ে আসতে রাজী হচ্ছে না। ... তাদের অদৃষ্টে কি লেখা আছে তা তারা কয়েক ঘণ্টার জন্য নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিল। দরজা যখন খোলা হল, তখন কি দৃশ্য দেখা গেল? তারা প্রায় সকলেই মরে পড়ে আছে। অজ্ঞাতসারে হলওয়েলের অন্ধকূপ হত্যার বিয়োগান্ত নাটক আবার অভিনীত হল। ... ৪৫ জনের দেহ, যারা ভয়ে, ক্লান্তিতে, গরমে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরে গিয়েছিল, টেনে বের করা হল এবং অন্যান্য মৃতদেহগুলির সঙ্গে একই গর্তে ফেলে দেওয়া হল।"[১] এই ভাবে বেলা ১০টার মধ্যে ২৮২ জন লোককে, কুপারের কথায়, "অমরধামে! পাঠিয়ে দেওয়া হল (launched into eternity)।"[২] কুপার আরও বলেছেন যে, বন্দীরা সব রকমের মনের ভাবই প্রকাশ করেছিল—ভয়, বিস্ময়, রাগ ও দৃঢ় শান্তভাব, "কিন্তু পালাবার পূর্বে তাদের অফিসারদের কে খুন করেছিল কেউই তা প্রকাশ করতে রাজী হয়নি।" ২৬শ বাহিনীর যারা বেঁচে থাকল, তাদের ভাগ্যও সুপ্রসন্ন ছিল না। ঐ বাহিনীর ৪১ জন সিপাহীকে ধরে মীয়ান মীরে নিয়ে যাওয়া হয় ও সেখানে কামানের মুখে তাদের উড়িয়ে দেওয়া হয়। তার কয়েকদিন পরে আরও ৬০ জনকে গুরুদাসপুরে হত্যা করা হয়। ২৬শ বাহিনীর খুব কম সিপাহীই শেষ পর্যন্ত জীবন নিয়ে পলায়ন করতে সক্ষম হয়েছিল।[৩]

কুপারের এই বীরত্বের খবর পাওয়া মাত্রই জন লরেন্স তাঁর নিজের ও বৃটিশ সরকারের তরফ থেকে কুপারকে লিখলেন, "২৬শ বাহিনীর লোকদের ধরায় ও শাস্তি দেওয়ায় যে যোগ্যতা ও সফলতার পরিচয় দিয়েছেন, তার জন্য আপনাকে বিশেষভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি।" আর মণ্টোগোমারি লিখলেন: "আপনার কাজের জন্য আপনাকে আজ প্রশংসা করছি। কি নিপুণতার সঙ্গে আপনি এই কাজ করেছেন। ... আপনি যতদিন বাঁচবেন এটা আপনার মাথার মুকুটমণি হয়ে থাকবে।"[৪] এই আজনালারই অতি নিকটে ৬২ বৎসর পরে অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে আর একজন ইংরেজ 'হিরো' জেনারেল ডায়ার এই কুপারেরই উদাহরণ অনুসরণ করেছিলেন!

এই সময় থেকে পাঞ্জাবে 'কুপারইজ্‌ম্' কিভাবে চালানো হয়েছিল, সে সম্বন্ধে কুপার নিজেই লিখে গিয়েছেন: "সমস্ত দিন, সমস্ত রাত ধরে একদল অশ্বারোহী এক স্থান থেকে আর এক স্থানে অনবরত সংবাদ নিয়ে যাতায়াত

১। কুপার: "ক্রাইসিস্ ইন দি পাঞ্জাব", পৃঃ ১৬২-৬৩।

২। "পাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্ড্‌স্", ৮ম খণ্ড, ১ম ভাগ, পৃঃ ৩৮০।

৩। ঐ, পৃঃ ৩৮০। ৪। কুপার: "ক্রাইসিস্ ইন দি পাঞ্জাব", পৃঃ ১৬৭-৬৯।

করছিল। প্রত্যেকটি প্রভাবশালী ব্যক্তিরই গতিবিধি ও চালচলনের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হয়েছিল। যদিও রাজা দীননাথের মৃত্যুতে আমাদের একজন শত্রুর অপসরণ হল, তবুও অনেকে আবার থেকে গেলেন যাদের প্রতি আমাদের সতর্ক থাকতে হল।"[১] কি ভাবে চারদিকে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি করা হল, সে সম্বন্ধে কুপার বলছেন: "রাজদ্রোহকে সমূলে বিনষ্ট করবার জন্য আমরা হারেমের পর্দা ভেদ করে অন্তঃপুরে প্রবেশ করে যেতাম; কোনো মসজিদ বা মন্দিরও রেহাই পেত না। পণ্ডিত ও মৌলভীদের পর্যন্ত তাদের অনুচরদের মাঝখান থেকে আমরা ছিনিয়ে আনতাম, বিশিষ্ট নাম-করা লোকদের মাঝরাতে আমরা ধরে নিয়ে আসতাম। নিশ্চিত পুরস্কারের আশায় যতক্ষণ না রাজদ্রোহীদের আবিষ্কার করতে পারত ততক্ষণ গুপ্তচর তাদের পেছনে লেগে থাকত। ভিদকের ডিটেক্‌টিভদের মতো সর্বত্র গুপ্তচর ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল—বাজারে, মেলায়, উপাসনার স্থানে, জেলে, হাসপাতালে, বাজারে, ঘাটে যেখানে লোকে স্নান করে, সেতুর উপর যেখানে লোক জড়ো হয়ে গল্পগুজব করে, গ্রামে কুয়োর পাশে ও গাছতলায়, কাছারিতে, রাস্তার ধারে যেখানে মজুররা রাস্তা মেরামত করে, এবং সরাইখানায়। কোনো মানুষেরই জিহ্বা তার আর নিজের সম্পত্তি রইল না। অ্যাংলো-স্যাকসনের নতুন জাগ্রত দৃঢ়তার সামনে এশিয়াবাসীর ছলচাতুরী একেবারে পঙ্গু হয়ে গেল।"[২] পাঞ্জাবের 'ডালহাউসি-বয়'দের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তারা কোনো আধা-আধি কাজ পছন্দ করত না। সমগ্র পাঞ্জাবে পুলিসের সাহায্যে পুরোমাত্রায় তারা সন্ত্রাসবাদ চালাতে লাগল।

পাঞ্জাবের সর্দাররা যে সকলেই ইংরেজের গুণমুগ্ধ ছিলেন তা নয়; কুপার তাঁর বইতে সর্দার নার সিং সম্পর্কে একটা উদাহরণ দিয়েছেন। যখন এসিস্টেন্ট কমিশনার নার সিংকে ডেকে পাঠালেন, তখন তিনি 'ঘুমোচ্ছিলেন,' তাঁকে 'বিরক্ত করা চলবে না।' 'তাঁর শরীরের একটা বিশিষ্ট স্থানে সাংঘাতিক একটা ফোঁড়া হওয়ার জন্য তিনি শয্যাগত!' এটা নিশ্চয়ই ইংরেজ-প্রীতির পরিচায়ক নয়। বস্তুতঃ খুব কম সর্দারই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ইংরেজকে সাহায্যের জন্য অগ্রসর হয়ে এসেছিলেন। "যারা আমাদের সঙ্গে নেই, তারাই আমাদের বিরুদ্ধে"—বিশেষ করে সর্দারদের সম্বন্ধে সরকার এই নীতি অনুসরণ করে তাদের ইংরেজকে সাহায্য করতে বাধ্য করল। যেসব সর্দার ১৮৪৮ সালে দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়েছিল (এই যুদ্ধকে ইংরেজরা তাদের বিরুদ্ধে শিখদের বিদ্রোহ বলে

১। কুপার: "ক্রাইসিস্ ইন দি পাঞ্জাব," পৃঃ ২০। ২। ঐ, পৃঃ ২৪-২৫।

৩। ঐ, পৃঃ ২৮।

মনে করত), দাগী আসামীদের মতো একটা ব্ল্যাকলিস্টে তাদের নাম রাখা হয়েছিল। মিরাটের বিদ্রোহের পরই জন লরেন্স তাঁদের প্রত্যেককে লিখে পাঠালেন যে, "তাঁদের দোষ-স্খালনের এই হচ্ছে অপূর্ব সুযোগ, কাল বিলম্ব না করে তাঁদের সদলবলে আসা প্রয়োজন। ··· তাঁরা দলবল সঙ্গে নিয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সংগঠিত করে দিল্লীতে পাঠিয়ে দেওয়া হল।"[১] ইংরেজের এই প্রকার জবরদস্তির বিরুদ্ধে সর্দারদের মধ্যে অনেক বিক্ষোভ ছিল, তার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। দিল্লী থেকে একজন গুপ্তচর ১লা আগস্টে লিখেছিল: "সামশের সিং, রণযোধ সিং, গুরুমুখ সিং প্রভৃতি সিদ্ধনওয়ালা সর্দারদের ভ্রাতুষ্পুত্র বাহাদুর সিং সর্দারদের একটা চিঠি নিয়ে বাদশাহের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন ··· তাতে সর্দাররা পাঞ্জাবে ইংরেজদের আক্রমণ করবেন কিনা জানতে চেয়েছেন।"[২]

শিখ সর্দারদের কি ভাবে ভয় দেখিয়ে তাঁদের সাহায্য আদায় করা হত, একজন ইংরেজ ঐতিহাসিক সে সম্বন্ধে লিখেছেন: "পুলিসরা প্রথম থেকেই প্রশংসনীয়ভাবে কাজ করছিল। তাদের সংখ্যা বাড়ানো হল এবং তাদের শান্তি-রক্ষার কাজে সাহায্যের জন্য সর্দারদের নিজেদের অনুচরদের মধ্যে থেকে এক এক দল লোক দিতে হল।"[৩] যেটুকু 'সহযোগিতা' পাঞ্জাবে ইংরেজরা পেয়েছিল, তা অন্ততঃ বিদ্রোহের প্রথম দিকে জোর-জবরদস্তি করেই আদায় করতে হয়েছিল।

পাঞ্জাবের 'সহযোগিতার' আর একটি নমুনা হচ্ছে যে, 'নেটিভ' সংবাদপত্র-গুলির উপর অত্যন্ত কঠিন সেন্সরসিপ প্রয়োগ করা হল, "যা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কড়াভাবে চালু ছিল।"[৪] রাজদ্রোহ প্রচারের অজুহাতে অনেকগুলি সংবাদপত্র বন্ধ করে দেওয়া হল, আর যেগুলি প্রকাশ হত, সেগুলি ইংরেজ সরকারেরই মুখপত্র হয়ে দাঁড়াল।

ইংরেজরা শিখদের যে শত্রু বলে মনে করে না, এ কথাটা বোঝাবার জন্য কেবলমাত্র পুরবিয়া সিপাহীদের প্রতিই নয়, বেসামরিক সমস্ত হিন্দুস্থানীদের প্রতি অত্যাচার চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছল। যে সমস্ত হিন্দুস্থানীরা সরকারী চাকুরিতে ছিল, তাদের বহিষ্কার করে দেওয়া হল এবং তাদের স্থানে শিখদের নেওয়া হল। হিন্দুস্থানীদের কড়া নজরে রাখা হত এবং সপ্তাহে সপ্তাহে নিয়মিতভাবে তাদের

১। বস্‌ওয়ার্থ স্মিথ্: "লাইফ অব লর্ড লরেন্স" ২য়, পৃঃ ৯৭।

২। "পাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্ডস্", ৮ম খণ্ড, ১ম, পৃঃ ২৯০।

৩। হোমস্: "হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়ান মিউটিনি," পৃঃ ৩৩৪।

৪। "পাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্ডস্", ৮ম খণ্ড, ২য়, পৃঃ ২৩৩।

কতক জনকে ধরে দলবদ্ধ ভাবে মার্চ করিয়ে পাঞ্জাব থেকে বার করে দেওয়া হত। দিল্লীর পতনের পরও এই কাজটি চালু ছিল।[১]

শিখদের ইংরেজ-প্রীতি সম্বন্ধে ইংরেজরা কোনো দিনই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেনি। বিদ্রোহের প্রথম দিকে শিখদের বৃটিশ বাহিনীভুক্ত করতে ইংরেজরা যে যথেষ্ট ইতস্তত: করেছিল, ভারত সরকারকে লিখিত পাঞ্জাব সরকারের সেক্রেটারি ব্র্যাণ্ডরেথের ১৭ই মে তারিখের এই চিঠিই তার প্রমাণ: "পুরাতন খালসা সৈন্যদের নিয়ে সৈন্যবাহিনী গঠন করতে চীফ কমিশনারকে বলা হয়েছে। কিন্তু এইরূপ সৈন্যবাহিনী গঠন করা খুবই বিপদজনক হবে মনে করে তিনি এ কাজ করতে হুকুম দেননি ; বিশেষ কারণ এই যে, শতদ্রু নদীর ওধারের শিখ রাজ্যগুলি থেকে খালসা বাহিনীর সব থেকে দুর্ধর্ষ লোকগুলি আসত এবং সেখানকার শিখরা আমাদের ভাল চোখে দেখে না।"[২]

এর কিছুদিন পর ঐ ব্র্যাণ্ডরেথই আর একটা রিপোর্টে লিখেছিলেন: "যে বাহিনী আমরা গঠন করেছি, তা ধীরে ধীরে রিক্রুট করা হয়েছিল এবং কতটা তাদের উপর নির্ভর করা চলে, এটা দেখে তার সংখ্যা বাড়ানো হয়েছিল। সকল রকমের জাতি, যা পাঞ্জাবে প্রচুর রয়েছে—হিংস্র বালুচী, সক্ষম আফ্রিদী এবং অনুগত পাহাড়ী নিয়েই—এই বাহিনী তৈরী হয়েছে।"[৩]

ইংরেজের এত অত্যাচার ও সন্ত্রাসনীতি সত্ত্বেও পাঞ্জাবে অনেক লোক যে ইংরেজের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে বিদ্রোহ প্রচার করছিল, তা মন্টোগোমারির কথাতেই বোঝা যায়। ১৩ই জুনের এক সার্কুলারে তিনি বলেছিলেন: "যদিও এ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই যে, সমস্ত পাঞ্জাবে সাধারণত: রাজভক্তির মনোভাবই বিদ্যমান, তথাপি এমন কোনো স্টেশন বা বড় শহর নেই, যেখানে রাজদ্রোহ প্রচার করবার জন্য ও আমাদের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে ক্ষেপিয়ে তোলার জন্য দুশ্চরিত্র লোক নেই। আমি বিশ্বাস করি যে, এমন বাজার খুব কমই আছে যেখানে ইংরেজ রাজত্বের অবসান হয়েছে, এ কথাটা লোকে খোলাখুলিভাবে বলে না। আর যখন এ কথাটা বারবার বলা হচ্ছে, তখন জনসাধারণ কথাটা বিশ্বাস করতে শুরু করেছে। তাদের মন এই সম্ভাবনার জন্য তৈরী হচ্ছে এবং সময় মতো তারা বিদ্রোহী হয়ে উঠতে পারে।"[৪] পাঞ্জাবের একটা সরকারী রিপোর্টে দেখা যায় যে, ওখানকার পোস্ট অফিসগুলিতে প্রচুর বিদ্রোহাত্মক চিঠিপত্র কর্তৃপক্ষ

১। "পাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্ডস্", পৃ: ২৩৫। ২। ঐ, ৭ম খণ্ড, ১ম, পৃ: ৩৭।
৩। ঐ, ৭ম খণ্ড, ১ম, পৃ: ২০৯। ৪। ঐ, ৮ম, ২য়, পৃ: ৩১৫।

আবিষ্কার করেছিল। "সাধারণতঃ রাজদ্রোহের কথা রূপক ও হেঁয়ালি ভাষায় ব্যক্ত করা হত।"[১]

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল চেম্বারলেইন যখন জুন মাসে একটা বাহিনী নিয়ে দিল্লী অভিমুখে যাচ্ছিলেন, তখন কয়েকজন 'বিশ্বস্ত' শিখ সর্দার, যাঁরা সাধারণ শিখদের মনোভাব ভাল করেই জানতেন, তাঁকে সাবধান করে দিয়েছিলেন যে, শিখ ও অন্যান্য পাঞ্জাবীদের মধ্যে অসন্তোষের মাত্রা এতই বেড়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে যে, তাঁদের কেবলমাত্র ইংরেজ সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ করবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।[২] পাঞ্জাবের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী লিখেছিলেনঃ "আমি এটা ভুলতে পারছি না যে, শিখরা আমাদের খুব ভালভাবে সাহায্য করলেও, বাস্তবিকপক্ষে বলতে গেলে, তাদের এই প্রকার ভাল সাহায্যের জন্যই তাদের বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে আমরা খুবই সন্দেহ পোষণ করতাম। ... তারা অনেকবার খোলাখুলিভাবেই গর্ব প্রকাশ করেছে যে, তারা আমাদের বিরুদ্ধে একবার লড়েছিল, আবার তারা আমাদের বিরুদ্ধে লড়তে পারে, 'তখন কে জানে বৃটিশ-রাজ কোথায় থাকবে?' একজন অফিসারকে সাবধান করে আমাদের বিশ্বস্ত বন্ধু পাতিয়ালার মহারাজা যা লিখেছিলেন, তা আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না—'শিখদের যদি চুপ করে বসে থাকতে দেওয়া হয়, তা হলে তারা হিন্দুস্থানীদের চাইতেও সাংঘাতিক হবে'।"[৩]

লুধিয়ানার ডেপুটি কমিশনার রিকেটস্‌ও তাঁর রিপোর্টে ইংরেজের বিরুদ্ধে শিখদের প্রচণ্ড বিক্ষোভের কথা লিখেছিলেনঃ "যখন আমি শহরের সমস্ত বিক্ষুব্ধ শ্রেণীগুলির কথা স্মরণ করি, যখন নাভা সৈন্যদের সন্দেহজনক সাহায্যের ও মালের কোটলার অশ্বারোহীদের ততোধিক সন্দেহজনক অবস্থার কথা ভাবি এবং যখন চিন্তা করি যে, ১২শ ইরেগুলার বাহিনীর ১৫০ জন বিদ্রোহী ছিল এই জিলারই লোক ও ৯ম ইরেগুলার বাহিনীও তাই, যাদের সকলকেই আমরা কেটে ফেলেছিলাম এবং যখন ভাবি যে, এরা বিদ্রোহ করেছিল তাদের নিজেদেরই আত্মীয়স্বজনের প্রভাবের ফলে, ... তখন আমি এই সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য হই যে, যদি দিল্লীর বিদ্রোহীরা আরও তিন সপ্তাহ টিকে থাকতে পারত, তা হলে এ জিলায় নিশ্চিত বিদ্রোহ হত।"[৪]

১। "জেনারেল রিপোর্ট অন দি এডমিনিস্ট্রেশন অব দি পাঞ্জাব ফর ১৮৫৬-৫৭ এণ্ড ১৮৫৭-৫৮", পৃঃ ১২।

২। "পাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্ডস্‌", ৮ম খণ্ড, ২য়, পৃঃ ৩৩৯।

৩। লুডলোঃ "থটস্‌ অন দি পলিসি অব দি ক্রাউন টুওয়ার্ডস্‌ ইণ্ডিয়া", পৃঃ ১৭০।

৪। "পাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্ডস্‌," ৮ম খণ্ড, ১ম, পৃঃ ১১৫-১৬।

পাঞ্জাবের লোক যে ক্রমশই চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, তা ব্র্যাণ্ডরেথের রিপোর্ট থেকেই দেখা যায়। তিনি ১৮ই সেপ্টেম্বর ভারত সরকারকে জানিয়েছিলেন: "এই দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ পাঞ্জাবের লোকের ধৈর্য শেষ করে দিচ্ছে। মুরীর বিদ্রোহ সম্বন্ধে আমি এর পূর্বেই রিপোর্ট করেছি। তা দমিত হয়েছে বটে, কিন্তু হাজারার লোকদের রাজভক্তি যে টলে উঠেছে, তা মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে।"[১]

পাঞ্জাব সরকারের আর একটি রিপোর্টে দেখা যায়, "প্রথম দিকে আমাদের অবস্থা যেরূপ আশাপ্রদ দেখা যাচ্ছিল তা ক্রমশঃ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে আসতে লাগল। যখন সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস চলে যেতে লাগল, তবুও আমরা বিদ্রোহ দমন করতে পারলাম না, তখন পাঞ্জাবীরা ভাবতে শুরু করল যে, বৃটিশ-শক্তি এত আঘাত সামলিয়ে আর উঠে দাঁড়াতে পারবে না। যে বাধাগুলি রাশিকৃতভাবে আমাদের বিরুদ্ধে জমা হয়ে উঠেছিল, মনে হচ্ছিল তা আর আমরা অতিক্রম করে উঠতে পারব না। যখন দলের পর দল ইউরোপীয় সৈন্যরা পাঞ্জাব ছেড়ে দিল্লী যেতে লাগল, অথচ তাদের স্থানে আর কেউ এল না, যখন বিদ্রোহীদের সফলতা দেশময় প্রতিধ্বনিত হতে লাগল, যখন সমস্ত হিন্দুস্থানে সিপাহীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে দিল্লী অভিমুখে ছুটতে লাগল, যখন বিদ্রোহাত্মক চিঠিপত্র এসে পৌঁছতে লাগল, তখন পাঞ্জাবীরা বুঝতে শুরু করল, আমরা কতখানি নিরুপায় ও আমাদের ভবিষ্যৎ কত আশাহীন। তাদের মনে তখন বিশ্বাস থেকে জাগল সন্দেহ , সন্দেহ থেকে অবিশ্বাস, তারপর তা অসন্তোষে পরিণত হল। এই বিক্ষোভ যখন বিস্তার লাভ করেছে, ঠিক সেই সময় পতন হল দিল্লীর।"[২]

ঐ রিপোর্টেই কিছু পরে আরও বলা হয়েছে: "এই বিপদের পূর্বাভাষ আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে দেখা দিল দুটি স্থানে, যা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন ও অনেক দূরে অবস্থিত এবং যেখানে আমাদের শাসনে লোকে সব থেকে বেশী উপকৃত হয়েছে, সে দুটি স্থান হলো হাজারা ও গোগারীয়া। তবু সেখানে যে বিদ্রোহ হয়ে গেল, তা কোনো বিশিষ্ট অভিযোগের ফলে হয়নি। তা হয়েছিল কেবলমাত্র এই বিশ্বাসের ফলে যে, বৃটিশ-শক্তি একেবারে ক্ষমতাশূন্য হয়ে পড়েছে। দিল্লীর পতন না হলে সর্বত্র যা ঘটত এই দুটি জায়গা হচ্ছে তার উদাহরণ।"[৩]

মুরী ও গোগারীয়ার বিদ্রোহ দুটি পাঞ্জাবের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আগস্ট মাসের শেষে হাজারা জেলার কাড়াল জাতি বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং

১। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ৭ম খণ্ড, ১ম, পৃঃ ৫৯।

২। ঐ, ৮ম খণ্ড, ২য়, পৃঃ ৩৬৩। ৩। ঐ, পৃঃ ৩৬৪।

১লা সেপ্টেম্বর মাঝরাতে তারা মুরীর পার্বত্য গ্রীষ্মাবাস আক্রমণের জন্য অগ্রসর হয়। মুরীর কর্তৃপক্ষ প্রস্তুত হয়েইছিল। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর কাড়ালরা মুরী ত্যাগ করে পার্শ্ববর্তী কয়েকটি পাহাড় দখল করে রইল। রাওয়লপিণ্ডি, অ্যাবটাবাদ থেকে সৈন্য পাঠিয়ে, কাড়ালদের সমস্ত গ্রামে আগুন ধরিয়ে দিয়ে, তাদের গরু-বাছুর সব কেড়ে নিয়ে, অনেক কাড়ালকে বন্দী করে, এ বিদ্রোহ দমন করা হয়। মুরীর দু'জন হিন্দুস্থানী সরকারী ডাক্তার ও আরও ৫০ জন লোকের মৃত্যুদণ্ড হয়। পাঞ্জাবের সব বড় বড় ইংরেজ কর্মচারীদের স্ত্রী ও শিশুরা এখানেই থাকত, সুতরাং এখানে বিদ্রোহ সফল হলে তার নৈতিক প্রতিক্রিয়া সমস্ত পাঞ্জাবে ও বিশেষ করে ইংরেজদের মধ্যে কি রকম হত, তা সহজেই অনুমেয়।[১]

গোগারীয়া জেলার বিদ্রোহ যোগ্য নেতৃত্ব পাওয়ার ফলে আরও অনেক ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল ও অনেক দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। লাহোর থেকে ৭৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে মুলতান বিভাগে অবস্থিত এই অঞ্চলে মুসলমান খুরুল জাতির বাস। বারী দোয়াবের খুতিয়াল জাতি এবং ভুটে জাতিও এই বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল। শিখপ্রধান বুচোকী থানাতেও সকলেই বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল।[২] বিদ্রোহীরা এই অঞ্চলের অনেকগুলি থানা আক্রমণ করে সব অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত করেছিল। অনেক দিনের জন্য মেজর চেম্বারলেইনকে একটা সরাইখানায় অবরোধ করে রেখেছিল। লাহোর ও মুলতান থেকে সৈন্য পাঠিযে এ বিদ্রোহ সম্পূর্ণভাবে দমন করতে ইংরেজের অনেক দিন লেগেছিল। বিদ্রোহীদের নেতা আহম্মদ খানের যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুর পরও তারা আরও অনেকদিন ধরে বনে-জঙ্গলে মীর বাহাওয়াল ফতোয়ানার নেতৃত্বে যুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছিল।[৩] বিদ্রোহী নেতাদের সঙ্গে বাওহালপুরের নবাবের ঘনিষ্ট যোগাযোগ ছিল। এজন্য ইংরেজ সরকার তাঁকে শাসিয়েছিল। দিল্লীর পতনের সঙ্গে সঙ্গে নবাবের 'চরিত্রের' অদ্ভুত পরিবর্তন হল। তাড়াতাড়ি ডিগবাজি খেয়ে অনেক বিদ্রোহীদের বন্দী করে ইংরেজের নিকট তাঁর রাজভক্তির প্রমাণ দিলেন!

আর্থিক সমস্যার সমাধানের জন্য পাঞ্জাব সরকার জুন মাসে ঋণের জন্য আবেদন করেছিল। এই ঋণের জন্য শতকরা ৬ টাকা সুদ দেওয়া হবে, আর এক বৎসরের মধ্যে সব টাকা ফেরত দেওয়া হবে। এই সুদের হার তখনকার দিনের পক্ষে খুব লোভনীয়ই ছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। পাঞ্জাবীদের, বিশেষ করে ধনীদের,

১। "পাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্ডস্", ৮ম খণ্ড, ২য়, পৃঃ ১২৪।

২। ঐ, ৮ম, ১ম, পৃঃ ২৬৬।

৩। কেভ-ব্রাউন: "পাঞ্জাব এ্যাণ্ড দিল্লী ইন এইটিন ফিফটি সেভেন", ২য়, পৃঃ ২০০-২২৩।

বৃটিশ সরকারের প্রতি মনোভাব কি রকম ছিল, তা এই ঋণ সম্পর্কেই খুব ভালভাবে বোঝা যায়। একজন ঐতিহাসিক বলেছেন: "যেসব সর্দাররা সৈন্য, অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আমাদের সাহায্যের জন্য অগ্রসর হয়ে এসেছিলেন, তাঁরাই উদার-ভাবে আমাদের ঋণও দিয়েছিলেন, কিন্তু ধনী মহাজন ও ব্যবসায়ীরা যেটুকু একেবারেই না দিলে নয়, তার বেশী দেয়নি।"[১] মণ্টোগোমারি এ সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছিলেন তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ: "আমরা আশা করেছিলাম যে লাহোর ও অমৃতসহরের ধনীরা ৬ টাকা সুদে যে ঋণ দেবে, তার পরিমাণ বেশ মোটাই হবে। কিন্তু বিপরীতটাই হল ঘটনা। ··· যারা ৫০ লক্ষ টাকার মালিক তারা দিয়েছে মাত্র ১০০০৲ টাকা, অন্যান্যরাও দিয়েছে এই হারে। আমাদের সরকারের প্রতি তাদের এ প্রকার হীন অবিশ্বাস তাদের রাজভক্তির অভাবই প্রমাণ করে।"[২] লাহোর ডিভিশনের কমিশনার রবার্টস্ তাঁর রিপোর্টে লিখেছিলেন যে, যেটুকু ঋণ তারা দিয়েছে, তা দেওয়া হয়েছে অতি অনিচ্ছাসত্ত্বে ও অতি কার্পণ্যতার সঙ্গে, "৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ঋণ উঠেছিল (লাহোর শহরে) মাত্র ৭৫,০০০৲ টাকা, তার মধ্যে একটি পরিবার দিয়েছিল ৫৫ হাজার টাকা।"[৩] সমগ্র পাঞ্জাবে ভয় দেখিয়ে, খোশামোদ করেও ৩০শে এপ্রিল ১৮৫৮ পর্যন্ত ইংরেজ সরকার মাত্র ৪৬ লক্ষ টাকা তুলতে পেরেছিল। কিন্তু এর অর্ধেকেরও বেশী এসেছিল পাঞ্জাবের রাজভক্ত রাজা ও সর্দারদের কাছ থেকে। পাতিয়ালার রাজা দিয়েছিলেন ৭ লক্ষ, কাশ্মীরের মহারাজা ৫,৭১,০০০৲, নাভা ৩ লক্ষ, কাপুরতলা ৩ লক্ষ ইত্যাদি।"[৪]

পাঞ্জাবের দেশীয় রাজ্যগুলির কমিশনার বারনেস্ কি ভাবে ভয় দেখিয়ে ঋণ আদায় করেছিলেন, সে সম্বন্ধে তিনি নিজেই তাঁর রিপোর্টে লিখেছিলেন: "ধনী মহাজনদের খুব স্পষ্ট করেই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, বৃটিশ সরকারের প্রতি তাঁরা কতখানি অনুগত, তা এই ঋণ সম্পর্কে তাঁদের মনোভাবই প্রমাণ করে দেবে এবং যাঁরা পিছিয়ে থাকবেন, তাঁরা সরকারের বিশ্বাস ও শুভাকাজ্ক্ষা হারিয়ে ফেলবেন।"[৫] বারনেস্-এর অধীনে শিখ রাজারা দিয়েছিলেন ১২।১৩ লক্ষ টাকা এবং তিনি বলেছিলেন, "আমি দৃঢ় সঙ্কল্প করেছিলাম যে, ঐ পরিমাণ টাকা আমি ধনীদের কাছ থেকেও তুলব।" কিন্তু তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন।

বিদ্রোহের প্রথম দিকেই পাঞ্জাব সরকার যেসব সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল, তার মধ্যে একটি হল শিখ ও পাঞ্জাবীদের বেঙ্গল আর্মি থেকে সরিয়ে

১। হোমস্: "হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়ান মিউটিনি", পৃঃ ৩৩৪।
২। "পাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্ডস্," ৮ম খণ্ড, ২য়, পৃঃ ২৩৭।
৩। ঐ, ৮ম খণ্ড, ১ম, পৃঃ ২৬৮। ৪। ঐ, পৃঃ ৩০৬-০৭। ৫। ঐ, পৃঃ ১৯।

তাদের নিয়ে আলাদা করে নতুন বাহিনী গঠন করা। ২০শে মে থেকে এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, পাঞ্জাব জয় করার পর ভারত সরকার বেঙ্গল আর্মির প্রত্যেক রেজিমেণ্টে হিন্দুস্থানীদের প্রাধান্য খর্ব করবার জন্য ২০০ করে শিখ ভর্তি করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পাঞ্জাবের বাইরে দেখা গিয়েছিল যে, যেখানেই বেঙ্গল আর্মির কোনো রেজিমেণ্ট বিদ্রোহ করেছে, সেখানে শিখরাও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই হিন্দুস্থানীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে বিদ্রোহের মধ্যে এগিয়ে গিয়েছে। শিখরা দু' একটি ক্ষেত্রে ছাড়া কখনই হিন্দুস্থানী সিপাহীদের বিদ্রোহাত্মক কথাবার্তা, জল্পনাকল্পনা সম্বন্ধে তাদের ইংরেজ অফিসারদের কাছে রিপোর্ট করেনি। এর কারণ এই যে, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল ভারতীয়ই একটা সময়ের জন্য বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী ভাবাপন্ন হয়ে উঠেছিল।

এ বিষয়ে 'পাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্ডস্' উল্লেখ করেছে: "এক সময়ে মনে হয়েছিল যে, সমস্ত দেশময় সকল শ্রেণীর মধ্যেই একটা চক্রান্ত চলেছে—সেটা হল সাদা আদমীর বিরুদ্ধে কালা আদমীর একটা বিদ্রোহ। সিমলার নিকট নাসিরী ব্যাটালিয়নের খারাপ ব্যবহারের মতো ঘটনা এইটেই প্রমাণ করে দিল যে, একটা কোনো বিষ গুর্খাদেরও পর্যন্ত স্পর্শ করেছে, যে বিষ গুর্খাদের স্পর্শ করার সব থেকে কম সম্ভাবনা ছিল।"[১]

১৮৫৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি ২১ জন শিখকে লুধিয়ানাতে ফাঁসি দেওয়া হয়। ঝান্সীতে যে বেঙ্গল আর্মির ১২শ রেজিমেণ্ট বিদ্রোহ করেছিল, এই শিখরা সেই বাহিনীরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। "অনুসন্ধান করে জানা গিয়েছিল যে, শিখ সৈন্যরাও ঐ বিদ্রোহে বিশেষভাবে অংশ গ্রহণ করেছিল।"[২] শিখরা যে অনেক স্থানে বিদ্রোহে যোগ দিয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে হিন্দুস্থানীদের সঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করেছিল, সে সম্বন্ধে আক্ষেপ করে মণ্টোগোমারি লিখেছিলেন: "অনেক শিখ যারা (বেঙ্গল) রেজিমেণ্টগুলির সঙ্গে ছিল, তাদের দেশ ও প্রভুদের প্রতি কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয়েছিল। তারা অনেকেই বিদ্রোহের ঘূর্ণাবর্তে জড়িয়ে পড়েছিল এবং দিল্লীর পতনের পর তারা গোপনে দেশে ফিরে আসার চেষ্টা করেছিল।"[৩]

হিন্দুস্থানীদের থেকে পৃথক করে যে নতুন পাঞ্জাব বাহিনী গঠন করা হল, আগস্ট মাসের শেষে তার শক্তি হল ৫০,০০০ লোক। লক্ষ্য করবার বিষয় হল এই যে, এই পাঞ্জাব বাহিনীতে শিখদের সংখ্যা খুব বেশী ছিল না। এই ৫০,০০০ লোকের মধ্যে ২৪,০০০ আফ্রিদী, বালুচী, মুলতানী প্রভৃতি মুসলমান, ১৩,৩৫০ শিখ,

১। "পাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্ডস্", ৮ম খণ্ড, ২য়, পৃঃ ৩৩৮।

২। ঐ, ৭ম খণ্ড, ২য়, পৃঃ ২৪৭।

৩। ঐ, পৃঃ ২৩৬।

৮,০০০ হিন্দু, ২,২০০ গাড়োয়ালি, গুর্খা ইত্যাদি। অর্থাৎ শিখদের সংখ্যা মাত্র এক-চতুর্থাংশের কিছু বেশী ছিল। ইংরেজরা যে শিখদের বিশ্বাস করত না এবং শিখরাও যে ইংরেজের গুণমুগ্ধ হয়ে দলে দলে ইংরেজ বাহিনীতে যোগ দেয়নি, অন্ততঃ দিল্লীর পতন পর্যন্ত, এই সংখ্যাগুলি থেকেই তা ভালভাবে প্রমাণিত হয়। ইংরেজরা যে ভেদ-নীতি অনুসরণ করে এই নতুন বাহিনী গঠন করেছিল, তা তাদের নিজেদের রিপোর্টেই পাওয়া যায়ঃ "মুসলমানদেরও বিভিন্ন জাতি থেকে নেওয়া হয়েছে—যেসব জাতিগুলির মধ্যে এক ধর্ম ছাড়া আর বিশেষ কোনো ঐক্যই নেই। এই মুসলমানরা আবার হিন্দুস্থানীদের প্রতি যেমন বিরূপ, তেমনি শিখদেরও বিরোধী। দ্বিতীয় পাঞ্জাব যুদ্ধের সময় এবং তার পূর্বেও বহুবার প্রমাণ হয়েছে যে, শিখদের বিরুদ্ধে লড়াইতে তাদের উপর নির্ভর করা চলে।"[১] পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৪ই সেপ্টেম্বর দিল্লী আক্রমণের সময় ইংরেজ বাহিনীর শক্তি ছিল মোট ১০,০০০ লোক। এদের মধ্যে পাঞ্জাব বাহিনীর শক্তি ছিল প্রায় ৩,০০০ হাজার। এই তিন হাজারের মধ্যে শিখদের সংখ্যা এক হাজারেরও কম ছিল। এদের সঙ্গে পাতিয়ালা, নাভা ও ঝিন্দের ১,১০০ সৈন্য যোগ করলেও মোট শিখদের সংখ্যা হয় মাত্র ২,০০০।

পাঞ্জাব সম্বন্ধে, বিশেষ করে শিখদের সম্বন্ধে, বাস্তব ঘটনা হচ্ছে এই যে, দিল্লীর পতনের পূর্ব পর্যন্ত সাধারণ পাঞ্জাবী ও সাধারণ শিখদের ইংরেজরা হিন্দুস্থানী ও মোগলদের বিরুদ্ধে হাজার রকমের কুৎসা ও জাতিবিদ্বেষ প্রচার করেও দলে টানতে পারেনি। পাঞ্জাবের সাধারণ মানুষ—শিখ, হিন্দু, মুসলমান—সকলেই ইংরেজকেই প্রধান শত্রু বলে মনে করত। এই সত্য ইংরেজ সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারীরা ও ঐতিহাসিকরা যে বারবার স্বীকার করে গিয়েছেন, সে সম্বন্ধে অনেক তথ্য ইতিপূর্বেই দেওয়া হয়েছে। অনেক শিখ ভলান্টিয়ার হয়ে ও অনেক শিখ ইংরেজ শিবির ত্যাগ করে দিল্লীতে যে বিদ্রোহে যোগ দিয়ে স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল, তাও অনেকবার উল্লেখ করা হয়েছে। যেসব শিখ ইংরেজের হয়ে লড়েছিল, তা তারা ইংরেজ-প্রীতির বশবর্তী হয়ে করেনি। শিখ রাজারা ও কয়েকজন শিখ সর্দার ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য ও পুরস্কারের লোভে এই সব শিখদের, অনেক সময় কতকটা জোর করেই তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, আবার অনেক সময় পুরস্কারের ও লুটপাটের প্রলোভন দেখিয়ে, বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য পাঠিয়েছিল। "অনেকে যারা পুরাতন উত্তেজনাপূর্ণ দিনগুলির কথা ভেবে নির্জনে বসে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলত এবং

১। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৩৪০-৩৪১।

কোনো প্রকারের গণ্ডগোল শুরু হলেই যারা আমাদের বিরুদ্ধে হাঙ্গামা আরম্ভ করে দিতে পারত, তারাই শেষে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে, যে জীবিকা-অর্জনে স্বদেশে তারা সক্ষম হচ্ছিল না, এখন সেই জীবিকার আশায় ও হিন্দুস্থানের লুটে অংশ গ্রহণ করবার জন্য দিল্লী অভিমুখে সানন্দে যাত্রা করল।"[১]

সেজন্য আমরা বারবার লক্ষ্য করেছি যে, সুযোগ পেলেই তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছে, অথবা অনেক ক্ষেত্রে দলত্যাগ করে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। আমরা এটাও দেখেছি যে, কাশ্মীরের মহারাজা যে ডোগরা বাহিনী দিল্লীতে যুদ্ধ করতে পাঠিয়েছিলেন, তারা প্রথম দিনের যুদ্ধেই কিভাবে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে সরে দাঁড়িয়েছিল।

এ ব্যাপারে স্বনামধন্য ঐতিহাসিক ডাঃ মজুমদারের মন্তব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর নিঃসংশয় বিশ্বাস যে, হিন্দুস্থানী ও মোগলদের প্রতি ঘৃণাবশতঃই শিখরা 'সর্বান্তঃকরণে' বৃটিশ সরকারকে সাহায্য করেছিল![২] কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁর এ বিশ্বাস তথ্যের দ্বারা প্রমাণিত হয় না। অনেক শিখ যে ইংরেজের বিরুদ্ধেই ছিল এবং অনেক শিখ যে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়েওছিল, সে সম্বন্ধে তিনি একটি কথাও বলেননি! এটা কি তাঁর 'নিরপেক্ষ' দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয়?

শিখদের সম্বন্ধে যে কথা প্রযোজ্য, সীমান্তের পাঠানদের সম্বন্ধেও তাই। অসংখ্য পাঠান ঝান্সী, লক্ষ্ণৌ, বেরিলি, দিল্লী ইত্যাদি স্থানে বিদ্রোহে যোগ দিয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে খুব বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। সমস্ত সীমান্ত অঞ্চল ইংরেজের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে পরিপূর্ণ ছিল এবং ১৮৫৭-৫৮ সালে বিদ্রোহের কালে নানা সময়ে নানা স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে তারাও বিদ্রোহ করেছে এবং অনেক ক্ষেত্রে বিদ্রোহী হিন্দুস্থানী সিপাহীদেরও সাহায্য করেছে। সীমান্তের অবস্থা সম্বন্ধে পেশোয়ার ডিভিশনের ডেপুটি কমিশনার হেণ্ডারসন তাঁর রিপোর্টে লিখেছিলেন: "এদের মনোভাবে ছিল একটা অদ্ভুত রকমের মিশ্রণ। তাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ছিল দিল্লীর বাদশাহের প্রতি, যদিও হিন্দুস্থানীদের প্রতি তারা ছিল বিদ্বেষপরায়ণ। ··· এই সীমান্ত জাতিগুলির মেজাজ ও মনোভাব সব সময়ই আমাদের দুশ্চিন্তার কারণ ছিল এবং তাদের মধ্যে আমাদের বন্ধু বলে বিশেষ কেউ ছিল না। ··· আগস্ট মাসের শেষে অর্থাৎ যখন তাদের জির্গা ও সভাগুলিতে ও তাদের নেতাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে আমরা সমর্থ হয়েছিলাম এবং যখন তারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, তখনই আমরা এই সীমান্তের লোকদের আমাদের বাহিনীতে ভর্তি করতে শুরু করি।"[৩]

১। "পাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্ডস্", ৭ম খণ্ড, ২য়, পৃঃ ৩৬০।

২। "সিপয় মিউটিনি এণ্ড দি রিভোল্ট অব ১৮৫৭", পৃঃ ৩২২। ৩। ঐ, পৃঃ ১০৩।

ইংরেজ বাহিনীতে কোন ধরনের পাঠানদের ভর্তি করা হয়েছিল, সে সম্বন্ধে পেশোয়ারের কমিশনার কর্নেল এডোয়ার্ডস্ তাঁর রিপোর্টে লিখেছিলেন : "পেশোয়ার উপত্যকার সব ভবঘুরে ও গুণ্ডাদের টেনে নেওয়া হল। ··· আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে, বিদ্রোহের সময় এখানে অপরাধের (crime) সংখ্যা যত কম হয়েছিল, তা আর কোনো সময়ই হয়নি। বস্তুতঃ এটা স্বীকার করতেই হবে যে, কেবল-মাত্র একটা বাহিনীতেই, যে বাহিনীটা বর্তমানে লক্ষ্ণৌতে যুদ্ধ করছে, খুব কম করে ৬০ জন নাম-করা দাগী দস্যু রয়েছে। তাদের নেতৃত্বে আছে দুর্ধর্ষ মুখুরম খান। যে নেটিভ ভদ্রলোকটি এদের বাহিনীতে ভর্তি করেছিলেন, তিনি মন্তব্য করেছিলেন, 'এরাই পুরবিয়াদের মারুক, অথবা পুরবিয়ারাই এদের মারুক, তাতে সমান ভাবে রাষ্ট্রেরই উপকার হবে'।"[১]

বস্তুতঃ পাঞ্জাবে হিন্দু, মুসলমান, শিখ সম্প্রদায়-নির্বিশেষে সকলের মধ্যেই প্রচুর অসন্তোষ জমা হয়েছিল, কিন্তু প্রকৃত নেতৃত্বের অভাবেই তা জাতীয় আকারে প্রকাশ লাভ করতে পারেনি। ভারতের অন্যান্য স্থানের ন্যায় পাঞ্জাবেও তখনো কোনো রাজনৈতিক দল বা সংগঠন গড়ে না ওঠাতে এই সর্বজনীন অসন্তোষ বিচ্ছিন্ন ও অসংগঠিতই থেকে গেল। পাঞ্জাবের শিখ ও মুসলমান সর্দাররা এবং সীমান্তের খান ও মালিকদের বেশীর ভাগই ইংরেজবিরোধী ছিলেন। তাঁরা তখনকার অবস্থায় বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিতে পারতেন, কিন্তু সাহস করে অগ্রসর হয়ে এলেন না ; তাঁরা অতি-বুদ্ধিমানের মতো 'হাওয়া কোন দিকে বয়' তাই দেখতে লাগলেন। এই সুযোগে শিখ রাজাদের ও কিছু শিখ সর্দারদের হাত করে, কিছু লোককে ভয় দেখিয়ে, কিছু লোককে প্রলোভন দেখিয়ে এবং কিছু গুণ্ডা ও দুশ্চরিত্রদের দলবদ্ধ করে ইংরেজ সরকার এই সংকটের সম্মুখীন হল।

১। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১৮৩।

পাতিয়ালা, নাভা ও ঝিন্দ

পাতিয়ালা, নাভা, ঝিন্দ, কাপুরতলা—এসব শিখ রাজ্যগুলি যমুনা ও শতদ্রু নদীর মধ্যবর্তী ১৫,০০০ বর্গ মাইল স্থান অধিকার করে ছিল ও তাদের লোকসংখ্যা ছিল ৪০ লক্ষ। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের যে অংশ এই রাজ্যগুলির মধ্য দিয়ে গিয়েছে, তার দৈর্ঘ হল ২০০ মাইল এবং এই রাস্তার জনপূর্ণ এলাকাগুলির "অধিকাংশ লোকই বিদ্রোহের সময় বিদ্রোহীদের প্রতিই সহানুভূতি দেখিয়েছিল।"[১] বিদ্রোহের প্রচণ্ড ঢেউগুলো যদি এই খানে বাধা না পেত, তা হলে সমগ্র পাঞ্জাবে তা দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়ত। কারণ, পাঞ্জাব ও তদানীন্তন উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের (অযোধ্যা, রোহিলখণ্ডের) মধ্যে কোনো স্বাভাবিক সীমারেখা ছিল না। এই শিখ রাজ্যগুলিই বিদ্রোহের ঢেউ প্রতিরোধের ব্যাপারে বাঁধের কাজ করেছিল।

মিরাট ও দিল্লীর বিদ্রোহের সঙ্গে সঙ্গেই গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের দু' ধারে আম্বালা পর্যন্ত সব জিলাগুলিতে বৃটিশ শাসনযন্ত্র ভেঙে চুরমার হয়ে যাবার উপক্রম হল। শিখ রাজ্যগুলির কমিশনার বারনেস্ লিখেছিলেন: "সিস্‌রা, হান্সী, হিসার, পানিপথ, মুজফ্‌ফরনগর ইত্যাদি প্রতিবেশী জেলাগুলি সম্পূর্ণরূপে বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ল। বেসামরিক কর্মচারীদের হয় হত্যা করা হয়েছিল, অথবা তাদের পালিয়ে যেতে হয়েছিল। পানিপথের ম্যাজিস্ট্রেটের কর্নালের বাইরে কোনো ক্ষমতা ছিল না। সাহারানপুরের ম্যাজিস্ট্রেট খুব সাহসের সঙ্গে নিজেকে রক্ষা করলেন বটে, কিন্তু তাঁর জেলায় নিজের বলতে আর কিছু রইল না; লুণ্ঠনকারীরা যা খুশি তাই করতে লাগল। কর্তৃপক্ষকে উপেক্ষা করে সশস্ত্র দলগুলি দেশময় ঘুরে বেড়াতে লাগল। দেশের সর্বত্র অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ল।"[২] সকল শ্রেণীর লোকই ধরে নিয়েছিল যে, ইংরেজদের অন্তিম অবস্থা এসে গিয়েছে।

১। "পাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্ডস্‌", ৮ম খণ্ড, ১ম, পৃঃ ৮। ২। ঐ, পৃঃ ৮।

সৈন্য বিভাগ পর্যন্ত একেবারেই পঙ্গু হয়ে পড়ল। "ইঁদুর যেমন ডুবন্ত জাহাজ ছেড়ে যায়, শিবিরের অনুচররাও তেমনি শিবির পরিত্যাগ করে চলে গেল।" তা ছাড়া, "পানিপথ ও হিসারে রংঘুর বিদ্রোহ খুবই সফল হয়েছিল এবং তারা শিখ রাজ্যগুলির লোকদের এই বলে উত্তেজিত করতে লাগল যে, তারা কি এতই কাপুরুষ যে এখনও তারা ফিরিঙ্গীদের আনুগত্য মেনে চলছে! চারদিকে খুব সংঘর্ষ চলেছে এবং পুলিস এই সব ঘটনার রিপোর্ট করতে পর্যন্ত ভয় পাচ্ছে।"[১]

রুপুরে বিদ্রোহ চারিদিকে বিস্তার লাভ করেছিল। দুটি শিখ পুলিস কোম্পানিকে ওখানে শান্তি রক্ষা করতে পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু সেখানে গিয়েই তারা নিজেরাই বিদ্রোহে যোগ দিয়ে সকলকে উত্তেজিত করতে লাগল। বারনেস্ বলেছেন: "যাই হোক, পাঁচজনকে ধরা হল এবং তাদের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অপরাধ প্রমাণ করা হল। মোহর সিং নামক রুপুরের একজন ব্যক্তিকেও ধরা হল। আমি ও মিঃ ফোরসাইট ৫ই জুন এই সব লোকের বিচার করলাম এবং ঐ দিনই তাদের ফাঁসি দিলাম।"[২]

একই সময়ে ফিরোজপুর জেলায় দিল্লীর বাদশাহের সমর্থনে বিদ্রোহ করার অপরাধে রানিয়ার নবাব ও আরও ১৭ জনকে ফাঁসি দেওয়া হল।[৩]

যখন দিল্লী থেকে বিদ্রোহের আগুন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে ইংরেজদের গ্রাস করে ফেলতে উদ্যত হয়েছে, যখন বৃটিশ-রাজের শাসনযন্ত্র ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে এবং যখন ইংরেজ শাসকরা বিদ্রোহ দমনে অসমর্থ হয়ে উঠছে, ঠিক এই রকম গভীর সংকটপূর্ণ মুহূর্তে শিখ রাজারা তাঁদের ইংরেজ প্রভুদের বাঁচাবার জন্য তাঁদের সমস্ত সৈন্যবল, ধনবল ও জনবল নিয়ে অগ্রসর হয়ে এলেন। রবার্টস্ এ সম্বন্ধে লিখেছেন যে, ফুলকিয়া পরিবার (পাতিয়ালা, ঝিন্দ, নাভা) কোন দিকে যাবে তাই ভেবে লাহোরের কর্তৃপক্ষ খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। পাতিয়ালা রাজার ব্যক্তিগত বন্ধু আম্বালার ডেপুটি কমিশনার ডগলাস্ ফোরসাইট তৎক্ষণাৎ মহারাজার সঙ্গে দেখা করলেন। "তিনি মহারাজাকে বর্তমান বিপদ্‌জনক পরিস্থিতি সম্বন্ধে বলতে শুরু করেছেন এমন সময় মহারাজা তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন যে, যা ঘটেছে তা তিনি সবই জানেন। তারপর ফোরসাইট জিজ্ঞাসা করলেন যে, দিল্লী থেকে পাতিয়ালায় দূত এসেছে এ কথাটা সত্য কি না। কিছু দূরে বসে আছে এমন কয়েকজনকে দেখিয়ে মহারাজা বললেন: 'ঐ যে তারা।' ফোরসাইট তখন মহারাজার সঙ্গে গোপনে কথা বলতে চাইলেন। মহারাজাকে একলা পেয়ে তিনি বললেন: 'মহারাজা

১। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১০। ২। ঐ, পৃঃ ১১।
৩। ঐ, পৃঃ ৫৬।

সাহেব, আমার এই প্রশ্নের উত্তর দিন : আপনি আমাদের পক্ষে, না বিপক্ষে?' মহারাজা সানন্দে উত্তর দিলেন—'যতদিন বেঁচে থাকব, আমি আপনাদেরই, কিন্তু এটা জানবেন যে, আমার নিজের দেশেই অনেক শত্রু আছে; আমার অনেক আত্মীয়স্বজন আমার বিরুদ্ধে, তাদের একজন হচ্ছে আমার নিজের ভাই। যা হোক, আমাকে কি কাজ করতে হবে বলুন।' ফোরসাইট তখন গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড নিরাপদ রাখার জন্য মহারাজাকে তাঁর নিজের সৈন্যবাহিনী কর্নালের দিকে পাঠাতে বললেন। মহারাজা এই শর্তে রাজী হলেন যে, ইউরোপীয় সৈন্যও শীঘ্রই সেখানে পাঠানো হবে। এটা খুবই একটা সঙ্গত শর্ত, কারণ তিনি জানতেন যে, তাঁর লোকেরা যদি আমাদের চূড়ান্ত জয়ের উপর আস্থাবান না হয়, তা হলে তাদের বিশ্বাস করা যাবে না।"[১]

দিল্লী বিদ্রোহের মাত্র তিন দিন পর ১৪ই মে তারিখে "পাতিয়ালার রাজা ১,৫০০ সৈন্য ও ৪টি কামান নিয়ে থানেশ্বরে প্রবেশ করলেন। ... ১৭ই তারিখে ঝিন্দের রাজাও ৪০০ লোক নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন ও পরদিন কর্নালে গেলেন।"[২]

নাভা ও কাপুরতলার রাজারাও এই ভাবে চটপট করে তাঁদের লোকজন নিয়ে হাজির হলেন। এই সময়ে ইংরেজ কর্তৃপক্ষের চিন্তার বিষয় ছিল বিদ্রোহী এলাকাগুলি পুনর্দখল করার দিকে নয়, বরং এই অঞ্চলের প্রধান রাস্তা ও নদী পার হবার স্থানগুলি ইংরেজ বাহিনীর যাতায়াতের জন্য ও যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম পাঠাবার জন্য নিরাপদ রাখা। শিখ রাজাদের এই দায়িত্বটাই দেওয়া হল। এ সম্পর্কে বার্নস্ লিখেছেন: "যুদ্ধের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই সব শিখ রাজারা যে সৈন্য পাঠিয়েছিলেন, তাদেরই তত্ত্বাবধানে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সাজসরঞ্জামগুলি অনবরত পাঠানো হত। তাঁদেরই সৈন্যরা আমাদের সামরিক ঘাঁটিগুলি রক্ষা করত এবং ফিরোজপুর ও ফিলুর থেকে একেবারে দিল্লী পর্যন্ত সমস্ত গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডটাই পাহারা দিত। ... একদল ঝিন্দ সৈন্য বাঘপথের সেতু দখল করে ছিল ও তারই ফলে আমাদের মিরাট বাহিনী হেড কোয়ার্টার্সে যোগ দিতে সক্ষম হয়েছিল।"[৩]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিদ্রোহ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজ শিবির থেকে ভারতীয় অনুচররা সব অন্তর্ধান হয়েছিল এবং কর্তৃপক্ষ গরুর গাড়ি, উট,

১। লর্ড রবার্টস্: **"ফরটি-ওয়ান ইয়ার্স ইন ইণ্ডিয়া,"** ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০৩-৪।

২। **"পাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্ডস্"**, ৮ম খণ্ড, ২য়, পৃঃ ২৮।

৩। ঐ, পৃঃ ৭।

গাড়িচালক, ডুলিবাহক ইত্যাদি কিছুই আর সংগ্রহ করতে পারছিল না। এই সব সংগ্রহ করাও এই রাজাদের ও সর্দারদের একটা প্রধান কাজ হল।

শিখ রাজ্যের সর্দাররা স্বেচ্ছায় ইংরেজকে সাহায্য করতে আসেননি। তাঁদের কাছ থেকে জোর করে, ভয় দেখিয়ে সাহায্য আদায় করা হয়েছিল। রাজারা ইংরেজের দিকে ঝুঁকে পড়ার পর সর্দাররা যখন কোণ-ঠাসা হয়ে গেলেন, তখন সহজেই ইংরেজদের পক্ষে ভয় দেখানো সম্ভব হল। কমিশনার বার্নস্ এই কাজ কি করে সম্পন্ন করেছিলেন, সে সম্বন্ধে তিনি নিজেই তাঁর রিপোর্টে লিখেছিলেন : "পুলিসে নতুন লোক ভর্তি না করে, ১৮৪৯ সালে যেসব জায়গীরদারদের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, তাঁদেরই এই কাজের জন্য লোক দিতে বলা হল। এই সব ছোট ছোট সম্ভ্রান্তদের সংখ্যা এই রাজ্যগুলিতে অনেক। এঁরা কাজের পরিবর্তে রাষ্ট্রকে শান্তির সময়ে তাঁদের আয়ের আট ভাগের এক ভাগ বিনিময়-ট্যাক্স দিয়ে থাকেন। যেহেতু এই সব সর্দারদের ঘরবাড়ি ও সম্পত্তি এই প্রদেশেই, সেহেতু, আমি ভেবে দেখলাম যে, এটাই হচ্ছে তাঁদের আনুগত্যের চমৎকার গ্যারান্টি। আমি ঠিক করলাম যে, আমরা নিজেরা পুলিসের দল গঠন না করে, এঁদেরই দলগুলিকে এই কাজে লাগাতে হবে। সুতরাং আমি তাঁদের সকলকে ডেকে পাঠালাম এবং তাঁদের কাছ থেকে এই সাহায্য দাবি করলাম ; এর পরিবর্তে কিছুকালের জন্য তাঁদের বিনিময়-ট্যাক্স দেওয়া থেকে রেহাই দিলাম। ··· এই পন্থা খুব চমৎকার ফল দিল। আমাদের সব ঘাঁটিগুলি দৃঢ় হল এবং সর্বত্র একটা নিরাপত্তার ভাব বিস্তার লাভ করল। জায়গীরদাররাও তাঁদের উপর এই বিশ্বাস স্থাপনের ফলে খুব সন্তুষ্ট হলেন এবং খুব তৎপরতার সঙ্গে তাঁদের কর্তব্য পালন করলেন।"[১]

এই সব শিখ রাজা ও সর্দারদের উপর—ইংরেজদের ঘাঁটিগুলি পাহারা দেওয়া, সরবরাহ ডিপার্টমেন্টের জন্য লোক জোগাড় করা, রাস্তাঘাট নিরাপদ রাখা ও যুদ্ধের সরঞ্জাম পাহারা দিয়ে এক স্থান থেকে আর এক স্থানে নিয়ে যাওয়া—এই সব কাজের ভার দেওয়া হয়েছিল। তা ছাড়া, আরও দুটি কাজ তাঁদের করতে হয়েছিল—ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর জন্য লোক সংগ্রহ করা ও সরকারের জন্য ঋণ জোগাড় করা। রাজভক্তির এত পরাকাষ্ঠা দেখিয়েও পাতিয়ালা ও ঝিন্দের রাজারা সন্তুষ্ট হননি। দিল্লীর শেষ আক্রমণের সময় তাঁরা নিজেদের দলবল নিয়ে সশরীরে উপস্থিত ছিলেন ও যুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন![২] এই সব রাজাদের রাজভক্তি দেখে অনেক ইংরেজ-শাসক এতই তাঁদের গুণমুগ্ধ হয়েছিলেন

১। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৮।

২। ফরেষ্ট : "ষ্টেট পেপার্স," ১ম, পৃঃ ৩৮৩।

যে, এমন কি কুপারের মত একজন 'অগ্নি-ভক্ষক', তলোয়ার-ঝন-ঝন-কারী ভারতীয়-বিদ্বেষী ব্যক্তিও পাতিয়ালার রাজার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন এবং তাঁর সম্বন্ধে বলেছিলেন, পাতিয়ালার রাজা এতই অনুগত ছিলেন যে, "তিনি বৃটিশ বাহিনীর স্বার্থের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এক চোখ খোলা রেখে ঘুমোতেন" এবং তিনি হচ্ছেন "অভূতপূর্ব লোভকে জয় করে এশিয়ার সম্মান বজায় রাখার জলন্ত দৃষ্টান্ত!"[১] এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে, বিদ্রোহের সময় বাহাদুর শাহ পাতিয়ালার রাজাকে বিদ্রোহে যোগ দেবার জন্য আহ্বান জানিয়ে দূত পাঠিয়ে চিঠি লিখেছিলেন; রাজা এই চিঠিগুলি কমিশনার বার্নস্‌কে দিয়ে দিয়েছিলেন।[২]

শিখ রাজারা নিজেদের এত আনুগত্য সত্ত্বেও তাঁদের প্রজাদের কিন্তু রাজভক্ত করে তুলতে পারেননি। এই সব রাজাদের সৈন্যরা সুযোগ পেলেই যে অনেক সময় দলত্যাগ করে বিদ্রোহীদের দিকে চলে যেত, তার অনেক উদাহরণ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।[৩] পাতিয়ালার মহারাজা নিজেই ডেপুটি কমিশনার ফোরসাইটকে বলেছিলেন যে, তাঁর নিজের রাজ্যের মধ্যেই 'গৃহশত্রুর' অভাব নেই। জনসাধারণ ছাড়াও রাজ-দরবারের মধ্যেও যে শক্তিশালী 'গৃহশত্রুর' অভাব ছিল না, তা নিম্নের ঘটনা থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়: "পাতিয়ালার মহারাজা ১০০ জন বিদ্রোহী সিপাহীকে ধরেছিলেন এবং তাদের একটা দুর্গের মধ্যে বন্দী করে রেখেছিলেন। তাঁর দেওয়ান নিহাল চাঁদ, যিনি দিল্লীর লোক, ভুল করে এই সব বন্দীদের মুক্তি দিয়ে দেন। কিছুকাল পরে আজ এই ঘটনার কথা চিন্তা করে আমার মনে সন্দেহ হচ্ছে যে, তাদের হয়ত ইচ্ছা করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। বন্দীদের আমাদের হাতে সমর্পণ করতে সকলেই অনিচ্ছুক ছিলেন, এমনকি আমার মনে হয় মহারাজা নিজেও অনিচ্ছুক ছিলেন।"[৪]

এই সব নানা কারণে ও উগ্র ভারতীয়-বিদ্বেষের ফলে ইংরেজ-শাসকরা তখন তাদের পরম বন্ধুদেরও বিশ্বাস করতে পারেনি এবং পাতিয়ালার রাজার মতো লোককেও, যিনি ইংরেজ প্রভুদের স্বার্থের দিকে এক চোখ খোলা রেখে ঘুমোতেন, তারা অনেকে বিশ্বাস করতে পারেনি। বিদ্রোহ শুরু হবার বেশ কিছুদিন পর, যখন পাতিয়ালার রাজা তাঁর কাজের দ্বারা তাঁর ইংরেজ-ভক্তি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছেন, সেই সময় রবার্টস্ লিখেছিলেন, "এখনও সাধারণভাবে বিশ্বাস করা হয়

১। কুপার: "ক্রাইসিস্ ইন দি পাঞ্জাব", পৃঃ ৩৭।

২। "পাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্ডস্", ৭ম খণ্ড, ১ম, পৃঃ ৫৭।

৩। ঐ, ৮ম খণ্ড, ১ম, পৃঃ ১২।

৪। "লেটার্স", পৃঃ ৩৩।

যে, পাতিয়ালার রাজা এবং জলন্ধর-দোয়াব ও পাঞ্জাবের কয়েকজন সর্দার বিদ্রোহে যোগ দিতে খুবই ইচ্ছুক। কিন্তু আমাদের সরকারী কাজকর্ম ঠিক ঠিক ভাবে চলছে দেখে তারা বুঝতে পারছে যে, আমরা একেবারে শেষ হয়ে যাইনি, যদিও আমরা খুব জোর ঘা খেয়েছি।"[১] ১লা জুনে জীবনলাল তার ডায়েরিতে লিখেছিল: "সংবাদ এসেছে যে, সমগ্র পাতিয়ালা বাহিনী ইংরেজদের বিরুদ্ধে। যখন হিন্দুস্থানীরা তাদের ধর্ম রক্ষা করার জন্য লড়ছে, সেইসময় মহারাজা ইংরেজকে সাহায্য করছেন—এই বলে সৈন্যরা খোলাখুলিভাবে মহারাজাকে ভর্ৎসনা করেছে।" এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত ঘটনাটিও খুব তাৎপর্যপূর্ণ: "মহারানী ভিক্টোরিয়াকে লর্ড ক্ল্যারেনডনের নিকট একটা যুক্তিপূর্ণ ও ন্যায্য চিঠি লিখতে দেখা যায়। ক্ল্যারেনডন অভিযোগ করেছিলেন যে, নৃশংসতার বিরুদ্ধে মহারাজা দলীপ সিং (রণজিৎ সিংএর পুত্র) তাঁর ক্রোধ জ্ঞাপন করেননি। এই চিঠিতে মহারানী ক্ল্যারেনডনকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, তাঁর নিজের দেশের লোকদের 'পাষণ্ড', 'দানব', ইত্যাদি বলা হবে ও শত শত দেশবাসীকে হত্যা করা হবে—এসব তিনি শুনে ও দেখে পছন্দ করবেন, এটা তাঁর কাছ থেকে আশা করা যায় না।"[২]

বাস্তবিকপক্ষে, ইংরেজ সরকারের সব থেকে ঘোরতর সঙ্কটের দিনে, মে, জুন ও জুলাই মাসে, যখন ইংরেজের ভারত-সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হতে চলেছিল, তখন এই শিখ রাজারাই বৃটিশ সাম্রাজ্যকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন। একথা বলা একেবারেই অত্যুক্তি হবে না যে, শিখ রাজাদের নিকট থেকে সাহায্য না পেলে বিদ্রোহ দেখতে দেখতে পেশোয়ার পর্যন্ত সমস্ত পাঞ্জাবকে গ্রাস করে ফেলত। স্মরণ রাখতে হবে যে, যখন শিখরাজ্য পাঞ্জাব গ্রাস করবার জন্য দু' দু' বার ইংরেজরা পাঞ্জাব আক্রমণ করেছিল, তখন এই পাতিয়ালা, নাভা, ঝিন্দ ও কাপুরতলার শিখ রাজারাই নিজেদের স্বধর্মী ও স্বজাতি ভাইদের বিরুদ্ধে বিদেশী ইংরেজদেরই সাহায্য করেছিলেন! তাঁরা যে পুনরায় নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য স্বদেশের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করবেন, তাতে আর আশ্চর্য কি!

তাঁদের এই অসাধারণ সাহায্যের জন্য পাতিয়ালা, নাভা, ঝিন্দ ও কাপুরতলার রাজাদের প্রত্যেককে গভর্নর জেনারেল তাঁর অভিনন্দন জানিয়ে এই চিঠিখানা লিখেছিলেন: "শতদ্রু ও পাঞ্জাবের যুদ্ধের সময় (১ম ও ২য় শিখ যুদ্ধ) আপনি আপনার শুভেচ্ছা ও রাজভক্তির বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ দিয়েছিলেন। আজকে আবার সে সুযোগ উপস্থিত হয়েছে, তাতেও আপনি অগ্রসর হয়ে এসে বিদ্রোহ দমন

১। "লেটার্স", পৃঃ ৩৩।

২। এডিথ সিটওয়েল: "ভিক্টোরিয়া অব ইংল্যাণ্ড", পৃঃ ১৬৬।

করবার জন্য সৈন্য ও অর্থ দিয়ে এবং আমাদের সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়ে আপনার রাজভক্তির ও উৎসাহের পরিচয় দিয়েছেন। এই ব্যবহার আমাকে খুবই সন্তুষ্ট করেছে।" শিখ যুদ্ধের পর ইংরেজ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে কাপুরতলার সর্দার নিহাল সিংকে 'রাজা' উপাধি দিয়েছিলেন। পাতিয়ালা, নাভা ও ঝিন্দ—এঁরাও ইতিমধ্যেই 'রাজা' হয়েছিলেন। বিদ্রোহের সময় তাঁরা যে অভূতপূর্ব রাজভক্তি প্রদর্শন করলেন, তার জন্য সদাশয় বৃটিশ সরকার এঁদের সকলকেই 'মহারাজা' উপাধিতে ভূষিত করলেন! এ ছাড়া নিহাল সিং একটি সম্পত্তিও পেলেন, যার বাৎসরিক আয় ২০ লক্ষ টাকা। পাতিয়ালা, নাভা এবং ঝিন্দও এইভাবে পুরস্কৃত হয়েছিল!

দ্বিতীয় উত্তম ও ব্যর্থতা

২রা জুলাই তারিখে রোহিলখণ্ডের বেরিলি ব্রিগেডের নেতৃত্বে বখ্‌ত খানের আগমনে বিদ্রোহী দিল্লীর একটি নতুন অধ্যায় শুরু হল। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সুগঠিত ও সুদৃঢ় নেতৃত্বের অভাবে বিদ্রোহী সরকার এক মহা সংকটপূর্ণ অবস্থার ভিতর দিয়ে যাচ্ছিল। যদিও তারা দিনের পর দিন দুঃসাহসিকভাবে ইংরেজদের আক্রমণ করে তাদের দিল্লী আক্রমণের পরিকল্পনাকে ভেস্তে দিয়েছিল এবং তাদের শিবিরের অবস্থা কাহিল করে তুলেছিল, কিন্তু তবুও তাদের সব থেকে যে বড় সমস্যা—একটি সুদৃঢ় রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্ব সংগঠিত করা—তার কিছুই সমাধান করতে পারেনি। সিপাহীরা যে সামরিক কোর্ট গঠন করেছিল, তার আধিপত্য তারা তখনও সম্পূর্ণভাবে বিস্তার করতে পারেনি। শাহজাদারা এক একজন এক একটি বাহিনীর নায়ক; অধিকন্তু শাহজাদা মির্জা মোগল সমগ্র বিদ্রোহী বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। ক্ষমতার অপব্যবহার করে তাঁরা শহরে এক ভয়ানক অরাজকতার সৃষ্টি করলেন। এই অরাজকতার সুযোগ নিয়ে ইংরেজের দালাল ও গুপ্তচররা তাদের অন্তর্ঘাতী কাজের দ্বারা বিদ্রোহীদের অস্তিত্ব বিপদাপন্ন করে তুলল। দিল্লীর বিদ্রোহী জনসাধারণও নিজেদের রাজনৈতিক সংগঠন ও শিক্ষার অভাবে কোনো প্রকারের নেতৃত্ব গঠন করতে সক্ষম হল না।

মইন-উদ্দিনের নিম্নলিখিত বর্ণনা থেকে বোঝা যাবে, বেরিলি বাহিনীর আগমনের দিন দিল্লীর নাগরিকরা বখ্‌ত খান ও এই বাহিনীর নিকট থেকে কতখানি আশা করেছিল এবং বখ্‌ত খান নিজে দিল্লীর তথা ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করবার কত বড় একটা সুযোগ পেয়েছিলেন:

"যমুনার নৌকা-সেতু মেরামত করা হয়েছে, কারণ বেরিলি বাহিনীর আগমনের জন্য সকলেই অপেক্ষা করছে। রোহিলখণ্ডের এই বাহিনী যখন অনেক দূরে তখন বাহাদুর শাহ একটা দূরবীন দিয়ে তাদের দেখছিলেন। ২রা জুলাই সকাল বেলা নবাব আহম্মদ কুলি খান অনেক সম্ভ্রান্ত নাগরিকদের নিয়ে তাদের অভ্যর্থনা করার জন্য এগিয়ে গেলেন। হাকিম আশানুল্লা খান, জেনারেল সামুদ খান, ইব্রাহিম আলি খান, গোলাম কুলি খান এবং অন্যান্য নেতারাও উপস্থিত ছিলেন। রোহিলখণ্ড বাহিনীর নায়ক মহম্মদ বখ্‌ত খান বাদশাহের কাছে উপস্থিত হয়ে বাদশাহকে তাঁর সেবা গ্রহণ করবার জন্য অনুরোধ জানালেন। বাদশাহ বললেন, 'আমি সর্বান্তঃকরণে চাই যে, দিল্লীর অধিবাসীরা রক্ষিত হোক, তাদের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা বজায় থাকুক এবং আমাদের বিজয় ও বৃটিশ শত্রুর ধ্বংস সাধিত হোক।' জবাবে জেনারেল বখ্‌ত খান জানালেন যে, যদি বাদশাহ ইচ্ছা করেন তা হলে তিনি বিদ্রোহী বাহিনীর অধিনায়ক হতে সম্মত আছেন। এই কথায় বাদশাহ সাদরে জেনারেলের করমর্দন করলেন। তারপর তিনি বিভিন্ন বাহিনীর নেতাদের ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তাঁরা বখ্‌ত খানকে তাঁদের অধিনায়ক নির্বাচিত করতে রাজী আছেন কিনা। তাতে সকলেই সম্মতিসূচক ভোট দিলেন এবং প্রত্যেকেই সামরিক শপথ গ্রহণ করে জানালেন যে, তাঁরা বখ্‌ত খানকে তাঁদের অধিনায়ক বলে মেনে নেবেন। দরবারের অধিবেশন শেষ হয়ে গেলে বাহাদুর শাহর সহিত বখ্‌ত খানের আবার কথাবার্তা হল। সমস্ত শহরে প্রচার হয়ে গেল যে, বখ্‌ত খান এখন থেকে সর্বাধিনায়কের পদে নিযুক্ত হয়েছেন।...আর মির্জা মোগল বখ্‌ত খানের সহকারী নিযুক্ত হলেন। বখ্‌ত খান বাদশাহকে বললেন যে, এমন কি যদি কোনো শাহজাদাও লুটপাট করে তা হলে তিনি তার নাক-কান কেটে দিতে ইতস্ততঃ করবেন না। বাদশাহ তাতে উত্তর দিলেন: 'আপনার হাতে চূড়ান্ত ক্ষমতা দেওয়া হল, আপনি যা ভাল বুঝবেন, এতটুকু ইতস্ততঃ না করে, তাই করবেন।' কোতোয়ালকে জানিয়ে দেওয়া হল যে, যদি তাঁর নিজের অবহেলার জন্য শহরে কোনো রকম গণ্ডগোল কিম্বা লুটপাট হয়, তা হলে তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হবে। বখ্‌ত খান বাদশাহকে জানালেন যে, তাঁর সঙ্গে ৪টি পদাতিক বাহিনী, ৭ শত অশ্বারোহী ও ৯টি কামান আছে। এই বাহিনীকে ৬ মাসের বেতন অগ্রিম দিয়ে দেওয়া হয়েছে, এবং এখন তাঁর হাতে ৪ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত থাকাতে বাদশাহের কোনো চিন্তার কারণ নেই।"[১]

১। মেটকাফ সম্পাদিত: "টু নেটিভ ন্যারেটিভস্‌." পৃঃ ৬০-৬১।

এই ভাবে বখ্‌ত খানের হাতে ডিক্টেটরি ক্ষমতা তুলে দেওয়া হল। তাঁর কাজ হল দুটি: (১) শহরে শান্তিশৃঙ্খলা স্থাপন করে বিদ্রোহী সরকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা এবং (২) ইংরেজ শত্রুকে পরাজিত করা। এই কর্তব্য পালন করার জন্য তাঁর নিজের বেরিলি বাহিনী ছাড়াও তিনি পেলেন মিরাট, দিল্লী, জলন্ধর, নাসিরাবাদ, আগ্রা ও হিসারের বিদ্রোহী বাহিনীগুলি এবং কয়েক সহস্র দিল্লীর নাগরিক ভলান্টিয়ার। দিল্লীর যুদ্ধের প্রারম্ভে ইংরেজ বাহিনী ছিল সংখ্যাগুরু; এখন বিদ্রোহী সিপাহীদের সংখ্যা হল ইংরেজ বাহিনীর দ্বিগুণ। পুরো একমাস ধরে বখ্‌ত খান এই সুবিধাটা পেয়েছিলেন। অন্যান্য সুবিধাও বখ্‌ত খান কম পাননি। নর্মান লিখেছিলেন: বিদ্রোহীরা যমুনার নৌকা-সেতু দিয়ে সর্বত্র স্বাধীনভাবে যাতায়াত করছে, "শহরে বিদ্রোহীদের গমনাগমন ও তাদের খাদ্য দ্রব্যের আমদানি বন্ধ করতে আমরা সম্পূর্ণ অক্ষম ছিলাম, আর পাঞ্জাবের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ রাখাটা কতই-না কষ্টসাধ্য হচ্ছিল। বিদ্রোহীরা যদি তাদের অশ্বারোহীদের বিচারপূর্বক ও সাহসের সঙ্গে পরিচালনা করতে পারত, তা হলে আমরা যে খুবই বিপদে পড়তাম, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।"[১]

দিল্লীর এই সামরিক সুবিধাগুলি ছাড়াও সাধারণভাবে বিদ্রোহীদের অবস্থা এই সময়ে সমস্ত ভারতে খুবই আশাপ্রদ ছিল। বেঙ্গল আর্মির বেশীর ভাগই তখন বিদ্রোহে যোগ দিয়েছে এবং পেশোয়ার থেকে কলকাতা পর্যন্ত অন্যান্য বাহিনী-গুলিতেও বিদ্রোহ ধূমায়িত হচ্ছিল। উত্তর ভারতের একটা বড় অংশে বৃটিশ-শাসন নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে, আর অন্যান্য স্থানেও প্রচণ্ড আলোড়ন চলেছে। ইংরেজরা সর্বত্র আতঙ্কগ্রস্ত এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তখন তাদের খুবই নৈরাশ্য। ভারতে বন্ধু বলতে তাদের কেউই নেই। শিখ এবং পাঠানরাও অন্যান্যদের মতোই বৃটিশ-বিরোধী; তারা বিদ্রোহী ভারতের ঘটনাবলী লক্ষ্য করে যাচ্ছে, আর অপেক্ষা করছে।

দিল্লীর প্রাঙ্গণে ইংরেজ-শিবিরের অবস্থাও খুব আশাপ্রদ ছিল না। জুলাই মাসের প্রথম দিকে তাদের শোচনীয় অবস্থা সম্বন্ধে কে' লিখেছেন: "প্রতিটি জয় আমাদের অত্যধিক মূল্য দিয়ে ক্রয় করতে হচ্ছিল এবং আমাদের লক্ষ্য দিল্লী অধিকার করার বিষয়ে আমরা একেবারেই অগ্রসর হচ্ছিলাম না। প্রতিদিনই আমরা উপলব্ধি করতে পারছিলাম যে, বিদ্রোহীদের কামানের তুলনায় আমরা অনেক পিছিয়ে পড়েছিলাম। তাদের কামানের গোলা আমাদের উপর এসে পৌঁছত, কিন্তু আমরা তাদের কাছে একেবারেই পৌঁছতে পারতাম না। তাদের

১। ফরেস্ট: "ষ্টেট পেপার্স", ১ম, পৃঃ ৪৪৯।

কামানগুলি আমাদের কামানের থেকে অনেক বেশী ভারী ছিল, আর তাদের গোলা আমাদের থেকে বেশী দূরে পৌঁছত এবং অনেক সময়ই তা ধ্বংসাত্মক নিশ্চয়তার সঙ্গে কাজ করত। ··· আমরা ঐ কামানগুলিকে নিস্তব্ধ করে দিতে পারিনি। ··· আমাদের গোলা-বারুদ যখন শূন্যের কোঠায় এসে পৌঁছচ্ছে, তখন বিদ্রোহীদের শহরে-মজুত গোলা-বারুদ এত অপর্যাপ্ত যে, তারা ঘণ্টায় ঘণ্টায় যতই ব্যবহার করুক না কেন, তাতে তাদের কিছুই আসত-যেত না।”[১]

এই প্রকার একটা শুভ মুহূর্তে জেনারেল বখ্‌ত খান দিল্লীতে পদার্পণ করলেন এবং দিল্লী তথা ভারতের ভাগ্য-নিয়ন্তার পদে অধিষ্ঠিত হলেন। তাঁর এখন প্রধান কর্তব্য হল এই সকল অনুকূল শক্তিগুলিকে সংযোজন করে বিজয়ের দিকে অগ্রসর হওয়া। দিল্লীতে বিদ্রোহীদের প্রথা অনুযায়ী বেরিলি বাহিনীর আগমনের পরদিন, ৩রা জুলাই, তাদের শত্রুকে আক্রমণ করতে হবে। বখ্‌ত খান ঠিক করলেন, আলিপুর দখল করে সেখানে ইংরেজদের পাঞ্জাবের সঙ্গে প্রধান গমনাগমনের পথ কেটে দেবেন। পাঁচ-ছয় হাজার সিপাহী ও কয়েকটি কামান নিয়ে তিনি বিনা বাধায় আলিপুর দখল করলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, প্রত্যূষে বখ্‌ত খান তাঁর দলবল নিয়ে আবার দিল্লীতে ফিরে গেলেন।

বখ্‌ত খানের এই চালে ইংরেজরা যে কতখানি বিপদ্‌গ্রস্ত হয়েছিল, তা সহজেই বোঝা যায়। নর্মানের সামরিক রিপোর্টে লেখা হয়েছিল, “বিদ্রোহীরা রাত্রে আলিপুর লুট করার পর যে কোথায় বিলীন হয়ে গেল, তা আমরা একেবারেই বুঝতে পারলাম না। তারা কি সোজা রাই ও লাডসৌলীর দিকে গেল, না দিল্লীতে ফিরে গেল? আমাদের সকলেই ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল এই ভেবে যে, তারা হয়ত কর্নালের দিকে, নতুবা ভারতীয়দের পাহারায় আমাদের যে ধনভাণ্ডার আসছিল, তা কর্নাল ও দিল্লীর মাঝামাঝি কোনো জায়গায় হস্তগত করবার জন্য অগ্রসর হচ্ছে।”[২]

গুপ্তচরের মারফত ও যারা ইংরেজ-শিবির ত্যাগ করে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল, তাদের কাছ থেকে সিপাহীরা ইংরেজের দুর্বলতার কথা সঠিকভাবে জানতে পেরেছিল। তাই তারা তাদের কৌশলও বদলিয়ে ফেলল। তারা ঠিক করল, এখন থেকে তারা ইংরেজের সম্মুখ ও পশ্চাদ্‌ভাগ একই সময়ে আক্রমণ করবে। তাদের বর্তমান সংখ্যাধিক্য এই কৌশল কার্যে পরিণত করার পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক হত। তাছাড়া দিল্লী থেকে কর্নাল পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় বিদ্রোহী জনসাধারণ,

---

১। কে’: পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৪৮।

২। ফরেস্ট: “ষ্টেট পেপার্স”, ১ম, পৃঃ ৪৫০।

বিশেষ করে গুজাররা, ইংরেজদের সব সময়ই হয়রান করছিল। এই সব বিদ্রোহী-দের সাহায্যে কর্নাল পর্যন্ত যে কোনো স্থানে ইংরেজকে আক্রমণ করে পাঞ্জাবের সঙ্গে তাদের গমনাগমনের পথ কেটে দেওয়া ও ইংরেজ-শিবিরকে বিচ্ছিন্ন করে তাদের পঙ্গু করে দেওয়া আগস্ট মাসের শেষ পর্যন্ত দিল্লীর সিপাহীদের পক্ষে একেবারেই কঠিন ছিল না। এরকম একটা পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্যই জেনারেল বখ্‌ত খান ৩রা জুলাই সদলবলে সুসজ্জিত হয়ে দিল্লী থেকে খুবই একটা শুভ মুহূর্তে বেরিয়েছিলেন। তাঁর পক্ষে এই কর্তব্য সমাধান করা কিছুই শক্ত হত না। কিন্তু কোনো স্থানে ইংরেজকে কোন প্রকারের আক্রমণ না করে তিনি কি কারণে দিল্লীতে ফিরে গেলেন, তা মহাবিদ্রোহের ইতিহাসের একটা বড় রহস্যই থেকে যাবে। এর ফলে বখ্‌ত খান শুধু যে নিজের নেতৃত্ব সুদৃঢ়ভাবে স্থাপন করার একটা সুবর্ণ সুযোগ হারালেন, তাই নয়, এতে আরও প্রমাণ হয়ে গেল যে, বাহাদুর শাহ, সিপাহীরা ও জনসাধারণ তাঁর উপর যে আস্থা স্থাপন করেছিলেন, তার যোগ্য তিনি নন।

৪ঠা জুলাই-এর ব্যর্থতার পর বিদ্রোহীরা আবার পাথরের দেওয়ালে কপাল ঠোকার পুরাতন নীতি গ্রহণ করে ৯ই ও ১৪ই জুলাইতে পুনরায় হিন্দু রাও-এর বাড়ি আক্রমণ করল। পূর্বেরই মতো নিজেদের জীবনের মায়া সম্পূর্ণভাবে বিসর্জন দিয়ে প্রচণ্ডভাবে তারা শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এই দু'টি আক্রমণের ফলে ইংরেজ-শিবিরের অবস্থান আবার কেঁপে উঠল—আবার তাদের নতুন করে সংকট দেখা দিল। এই দু'দিনই ইংরেজদের প্রচুর হতাহত হল।

জেনারেল রীড গভর্নর জেনারেলকে তাঁর রিপোর্টে লিখলেন: "আমি আপনাকে অতি দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আমাদের ক্ষতি অত্যন্ত সাংঘাতিক হয়েছে, যা আপনি এর সঙ্গেই বিবরণ থেকে দেখতে পাবেন এবং আমি আরও গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল চেম্বারলেইন অতি গুরুতর-ভাবে আহত হয়েছেন।"[১] ৯ই জুলাই ইংরেজদের হতাহতের সংখ্যা ছিল ২২৩ জন; এবং ১৪ই তারিখে ১৬ জন অফিসার সহ ২০০ জনেরও বেশী—দু' দিনে প্রায় ৪৫০ জন; সমগ্র বাহিনীর তুলনায় এটাও যে মস্ত বড় একটা সংখ্যা, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ভারতীয়দেরও ক্ষতি কম হল না। ইংরেজদের মতে বিদ্রোহীদের হতাহতের সংখ্যা ছিল ১৪ই জুলাইতে ১০০০! —(ফরেস্ট: ১ম, পৃঃ ৪৫৬)। অর্থাৎ একজন বৃটিশ সৈন্য পাঁচজন ভারতীয়ের সমান! যাহোক, মহাবিদ্রোহের সময়

১। ফরেষ্ট: "ষ্টেট পেপার্স," ১ম, পৃঃ ৩২১।

সাধারণতঃ প্রায় প্রতিটি যুদ্ধেই ভারতীয়দের হতাহত যে বেশী হয়েছিল, তাতে সন্দেহই নেই। এ থেকে একটা বিষয় অন্ততঃ প্রমাণ হয় যে, ভারতবাসীরা সেই দিন এই সত্যটি বুঝতে পেরেছিল যে, সস্তায় স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করা যায় না, তার জন্য উপযুক্ত মূল্য দিতে হবে।

সিপাহীদের এই তীব্র আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য ইংরেজ-শিবিরের প্রতিটি সৈন্যকে যুদ্ধে নামতে হয়েছিল এবং পূর্বেরই ন্যায় গুর্খা, পাঠান ও শিখ ভাড়াটিয়াদেরই এই বেগ সামলাতে হয়েছিল।[১] এই যুদ্ধেও ইংরেজ সৈন্যদের ভূমিকা সম্বন্ধে কে' মন্তব্য করেছেন—"এই যুদ্ধ এমন ধরনের যুদ্ধ যা ইংরেজদের নিকট খুবই অরুচিকর ও তাদের পক্ষে খুবই ধ্বংসমূলক।" ইংরেজ অশ্বারোহীরা অনেকেই পলায়ন করে নিজেদের প্রাণ রক্ষা করেছিল। ইংরেজদের একজন শ্রেষ্ঠ নায়ক, এডজুটাণ্ট জেনারেল চেম্বারলেইন এবং তাদের কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেল বেচার এই যুদ্ধে গুরুতরভাবে আহত হয়েছিলেন।

৯ই তারিখের যুদ্ধে সিপাহীরা বখ্‌ত খানের নেতৃত্বে মাউণ্ড ব্যাটারি দখল করেছিল। একদল ইংরেজ অশ্বারোহী ও পদাতিক ১৩টি ১৮-পাউণ্ডার কামান নিয়ে এই ব্যাটারি রক্ষার কাজে নিযুক্ত ছিল। তাদের দক্ষিণ পাশে ছিল একদল ভারতীয়। বিদ্রোহীদের তীব্র আক্রমণের বেগ প্রতিরোধ করতে না পেরে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে ইংরেজরা ভারতীয়দের পিছনে আশ্রয় নিল। বিদ্রোহীরা তাদের সঙ্গে যোগ দেবার জন্য বারবার ভারতীয়দের আহ্বান জানিয়েছিল। "কিন্তু তা সত্ত্বেও নেটিভ গোলন্দাজগুলো আশ্চর্য রকমের ভাল ব্যবহার করেছিল এবং তাদের পিছনকার ইংরেজদের ডেকে বলছিল তাদের মধ্য দিয়েই বিদ্রোহীদের উপর গুলী করতে।"[২]

ইংরেজরা এসব যুদ্ধে কি রকম বীরত্ব দেখাত দু'একটি নমুনা দিলেই তা বোঝা যাবে। যেমন, ৯ই জুলাই ফাগান নামক বীরপুঙ্গব যে মুহূর্তে শুনতে পেল যে বিদ্রোহীরা আক্রমণ করেছে, "সেই মুহূর্তে সে কেবলমাত্র একটা কলম হাতে করে তার তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেল ও কয়েকজন লোককে সঙ্গে নিয়ে ১৫ জন শত্রুকে বধ করল এবং একজন বিদ্রোহী রিসালদারকে হত্যা করে তার তলোয়ার আর বন্দুকটি নিয়ে চলে এল।"[৩] ইংরেজের ঔপনিবেশিক বীরত্বের এই কাহিনীটি একজন বেনামী ইংরেজ অফিসার, "যিনি দিল্লীতে যুদ্ধ করেছিলেন", তাঁর 'হিস্ট্রি অব দি সীজ অব দিল্লী'তে লিপিবদ্ধ করেছেন এবং ঐতিহাসিক কে'-ও বিনা

১। কে' ঃ পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ২য়, পৃঃ ৫৮২।

২। ফরেষ্ট ঃ "ষ্টেট পেপার্স," ১ম, পৃঃ ৪৫৩। ৩। কে', ঐ, ২য়, পৃঃ ৫৮১।

দ্বিধায় গল্পটি উদ্ধৃত করেছেন! কিন্তু তার পরেই কে' এই যুদ্ধের যে বিবরণ দিয়েছেন, তা একেবারে অন্যরূপ। সবজিমণ্ডীতে একজন সিপাহী হিল নামে একটি অশ্বারোহীকে আক্রমণ করে তার ঘোড়া সহ তাকে ভূতলশায়ী করে দেয়। হিল আবার উঠে দাঁড়ায় ও সিপাহীটির সঙ্গে তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ করে। হিলকে আবার মাটিতে ফেলে দিয়ে তার বুকের উপর দাঁড়িয়ে যে মুহূর্তে সিপাহীটি তলোয়ার দিয়ে তাকে আঘাত করতে যাবে, ঠিক সে সময় ইংরেজ গোলন্দাজদের নায়ক মেজর টোম্বস্ সিপাহীটিকে গুলী করে মেরে ফেললেন। টোম্বস্ যখন আরও দু'জন ইংরেজের সাহায্যে আহত হিলকে তুলে নিয়ে যাচ্ছেন, এমন সময় তিনি ভয়ে বিহ্বল হয়ে দেখলেন যে, আর একজন সিপাহী তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে ও দেখতে দেখতে একজনকে বধ করে আর একজনকে জখম করে ফেলেছে। ঠিক সেইসময় এ সিপাহীটিও একটা গুলীর আঘাতে নিহত হল। এই যুদ্ধে বীরত্ব দেখাবার জন্য টোম্বস্ ও হিল উভয়েই 'ভিক্টোরিয়া ক্রস' পেয়ে সম্মানিত হয়েছিলেন, কিন্তু যে দু'টি সিপাহী দেশের স্বাধীনতার জন্য নিজেদের জীবন বিসর্জন দিয়েছিলেন, তাঁরা অজ্ঞাতই রয়ে গেলেন।

ইংরেজের ঔপনিবেশিক বীরত্বের আর একটি উদাহরণ: পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বখ্‌ত খানের আক্রমণের ফলে ইংরেজ অশ্বারোহীরা পলায়ন করেছিল। তারা শিবিরে ফিরে আসার পর "কোনো প্রকৃত শত্রুর অভাবে একদল নিরীহ ভৃত্য, খানসামা, মেথর ইত্যাদিকে, যারা গীর্জার এক কোণে ভয়ে জড়সড় হয়ে বসে ছিল, খুন করে ফেলল। এই সব ভৃত্যদের প্রভুভক্তি, বিশ্বস্ততা ও প্রতিদিনকার ধৈর্যপূর্ণ যত্ন ও সেবা—এসব কিছুই সেদিনকার সাদা সৈন্যদের কালা আদমীর প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণার আগুন নির্বাপিত করতে পারল না।"[১] এ সম্পর্কে 'সীজ অব দিল্লী'র বেনামী লেখক ইংরেজ অফিসারের মন্তব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য: এই যুদ্ধ "আমাদের লোকদের এতই পাশবিক করে ফেলেছিল যে, তারা একটা অতি নগণ্য পশুর থেকেও একজন নেটিভের জীবনকে হেয় মনে করত। আমাদের অফিসাররাও তাঁদের কাজের দ্বারা অথবা আদেশের দ্বারা এই অবস্থার পরিবর্তন করার চেষ্টা করেননি।"[২]

বস্তুতঃ, ভারতীয় ও এশিয়াবাসীদের বিরুদ্ধে ইংরেজের যে জাতি-বিদ্বেষ সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রথম থেকে তাদের চরিত্রে প্রবল হয়ে উঠেছিল, তা এখন আরও প্রবলতরভাবে চতুর্দিকে প্রকাশ পেতে লাগল। অধিকন্তু এসব

১। কে': পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ২য়, পৃঃ ৫৮১।

২। ঐ, পৃঃ ২০৬।

সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজরা দু' তিন পুরুষ ধরে একশ্রেণীর 'নেটিভ'দের দাসসুলভ মনোভাব, কাপুরুষতা ও বিশ্বাসঘাতকতায় এতই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল যে, ভারতীয়দের বিদ্রোহ করার ঔদ্ধত্য দেখে তারা একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। তারপর, তারা কেবলমাত্র বিদ্রোহ করেই ক্ষান্ত হল না! ইংরেজ বীর পুরুষরা ভেবেছিল যে, তাদের সব সাদামুখ দেখবামাত্রই বিদ্রোহীরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে। তা তো তারা করলই না, বরং উল্টে তারা বারবার ইংরেজ প্রভুদের উগ্রভাবে প্রহার করতে লাগল! ভারতীয়দের এরূপ ব্যবহার তাদের নিকট যেমন অপ্রত্যাশিত, তেমনই অসহ্য। তাই প্রকৃত শত্রুকে ধারে কাছে না পেয়ে তারা নির্দোষ ও নিরীহদের উপরই প্রতিশোধ বেশী করে নিত।

যা হোক, ২৩শে জুন এবং ৯ই ও ১৪ই জুলাই-তে বিদ্রোহীদের আক্রমণের ফলে ইংরেজ-শিবিরের অবস্থা এতই সংকটজনক হয়ে পড়ল যে, বিদ্রোহীদের পুনরায় কোনো আক্রমণ তারা আর সহ্য করতে পারবে কিনা, এই সমস্যা সেনা-নায়কদের সামনে খুব বড় হয়ে দেখা দিল।

জুলাই-এর মাঝামাঝি পর্যন্ত ইংরেজদের সমর-পরিষদের ঘন ঘন অধিবেশন হচ্ছিল এবং দিল্লীর উপর শেষ আক্রমণের দিনও অনেকবার স্থির হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বিদ্রোহীদের আক্রমণের ফলে অনির্দিষ্ট কালের জন্য তাদের দিল্লী আক্রমণের প্ল্যান স্থগিত রাখতে হল।

এদিকে লর্ড ক্যানিং-এর দপ্তর থেকে ১৪ই জুলাই তারিখে দিল্লীর ইংরেজ বাহিনীকে জরুরীভাবে জানানো হল, "সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ এখনও বিস্তারলাভ করছে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না বিদ্রোহীদের পরাজিত করে দিল্লীতে বৃটিশ সরকারের পুনঃপ্রতিষ্ঠার কথা সকলকে জানাতে পারা যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় বিদ্রোহ আমাদের ভারত-সাম্রাজ্যের শেষ সীমা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়াটাই খুব সম্ভব। সামরিক গতিবিধির পক্ষে সময় সব থেকে মূল্যবান; বর্তমান ক্ষেত্রে যে এর একটি রাজনৈতিক মূল্যও আছে, সে সম্বন্ধে অত্যুক্তি করা চলে না। মুসলমান সার্বভৌমত্বের কেন্দ্র দিল্লীতে যে এতদিন ধরে এই সরকারেরই বিদ্রোহী সিপাহী ও জনসাধারণ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, এ ঘটনাটি ভারতে বৃটিশ-শাসনের ভিত্তিমূল কাঁপিয়ে তুলেছে।"[১]

কিন্তু ইতিমধ্যে ইংরেজ-শিবিরের সংকট আরও ঘনীভূত হয়ে উঠল। জেনারেল এনসনের মত জেনারেল বারনার্ডেরও কলেরায় মৃত্যু হল। জেনারেল রীড তখন কমাণ্ডার-ইন-চীফ নিযুক্ত হলেন। কিন্তু কয়েকদিন বাদেই দিল্লীর যুদ্ধের ভয়ঙ্কর

১। ফরেষ্ট: "ষ্টেট পেপার্স," ১ম, পৃঃ ৩২৪।

রূপ দেখে তিনি ১৭ই জুলাই জেনারেল আর্কডেল উইলসনের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়ে ভগ্নস্বাস্থ্যের অজুহাতে পদত্যাগ করলেন।

২৩শে জুনের পলাশী যুদ্ধের শতবার্ষিকী দিনের যুদ্ধের পর থেকে লাহোরে ও দিল্লীর ইংরেজ-শিবিরে অনেক উচ্চস্থানীয় লোক বলতে লাগলেন যে, তাঁদের পক্ষে আপাততঃ দিল্লীর শিবির পরিত্যাগ করে কর্নালে চলে যাওয়াই উচিত। ৯ই ও ১৪ই জুলাই-এর আক্রমণের পর এই মত আরও শক্তিশালী হয়ে উঠল। উইলসন যেদিন সেনানায়ক হলেন, তার পরদিনই তিনি জন লরেন্সকে ফরাসী ভাষায় লিখলেন: "আমার যথা সত্বর ও যত বড় সম্ভব নতুন সৈন্যবাহিনী দ্বারা বলীয়ান হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। যদি শীঘ্র আমি নতুন সৈন্য না পাই, তাহলে কর্নালে আমি সরে যেতে বাধ্য হব। কিন্তু এরূপ পদক্ষেপের পরিণাম খুবই শোচনীয় হবে।"[১]

১৭ই জুলাই দিল্লীতে ঝান্সী বাহিনী এসে পৌঁছল এবং পরের দিন তারাই ইংরেজদের উপর আক্রমণ করল। ঠিক ছিল যে, বিদ্রোহীরা দু' ভাগে বিভক্ত হয়ে একদল যাবে আলিপুরে ইংরেজের নতুন সৈন্যদলকে আক্রমণ করতে, অন্য দলটি সবজিমণ্ডী থেকে ইংরেজ-শিবির আক্রমণ করবে। যে কোন কারণেই হোক, আলিপুরে আক্রমণ একেবারেই হল না।[২] টিলার নীচেই অনেকক্ষণ ধরে ভয়ানক-ভাবে যুদ্ধ হল। যুদ্ধের পরই উইলসন সন্ধ্যার সময় কর্তৃপক্ষকে রিপোর্ট করলেন: "আবার একটা ভয়ানক যুদ্ধ হয়ে গেল। যদিও সিপাহীরা হেরে গিয়েছে, তবু আমাদের ক্ষতিও প্রচুর পরিমাণে হয়েছে। ··· আমাদের বাহিনী খুবই একটা সংকটজনক অবস্থার মধ্যে আছে।"[৩] ইংরেজদের উপর এটা ২১শ আক্রমণ। টিলার দক্ষিণের আত্মরক্ষী কামানের ব্যাটারিগুলি রক্ষা করা ইংরেজদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। নবাগত শিখ গোলন্দাজদের দ্বারা এই ব্যাটারিগুলি সুদৃঢ় করা হয় এবং তাদেরই দ্বারা এগুলি রক্ষা করার ব্যবস্থা হয়। এইদিনকার যুদ্ধের পর ইংরেজ মাইনার্স ও স্যাপার্সরা সবজিমণ্ডীর সমস্ত বাড়ীগুলি ধূলিসাৎ করে দেয়, যাতে করে বিদ্রোহীরা তাদের আক্রমণের জন্য এই বাড়িগুলি আর ব্যবহার না করতে পারে।

১। কে': পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ২য়, পৃঃ ৫৮৯।

২। একজন গুপ্তচরের সংবাদে জানা যায় যে, আলিপুরে যাবার জন্য বিদ্রোহীরা বাঘপথের সেতু মেরামত করতে শুরু করে। কিন্তু তার পূর্বেই এত বৃষ্টি হয়েছিল যে, সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে যায়। বিদ্রোহীরা ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরে আসে।

৩। "পাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্ডস্", ৭ম, ১ম, পৃঃ ২২৬।

ঠিক এই সময় দিল্লীতে সঠিক খবর পৌছল যে, একটা বিরাট নতুন বৃটিশ বাহিনী কর্নালে পৌছে গিয়েছে এবং অনেক কামান, গোলাবারুদ ও সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে একটা 'সীজ-ট্রেন' তাদের পিছনে পিছনে আসছে।[১] এদের আগমনের জন্য ইংরেজরা বাঘপথের সেতু, যা বিদ্রোহীরা ভেঙ্গে দিয়েছিল, মেরামত করেছে। এই সেতু আবার ভেঙে দেবার জন্য একদল সিপাহীকে পাঠানো হল। ইংরেজকে বাধা দেবার জন্য আর একদলকে পাঠানো হল আলিপুরে।

জীবনলালের ডায়েরিতে ২০শে জুলাই-তে দেখা যায়: "একদল স্যাপার্স (শিখ) ইংরেজ-শিবির ত্যাগ করে দিল্লীতে এসেছে। তাদের অফিসাররা দরবারে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা রিপোর্ট করলেন যে, ইংরেজ-শিবিরে এখন ৬০০০ সৈন্য আছে। দিল্লীর সমস্ত সিপাহীরা যদি একত্র হয়ে তাদের আক্রমণ করে, তাহলে বাদশাহ খুব সম্ভব বিজয়ী হবেন; আর যদি বিলম্ব করা হয়, তাহলে ইংরেজদের এত নতুন সৈন্য এসে যাবে যে, বাদশাহের সৈন্যরা আর তাদের হারাতে পারবে না।"[২]

এ ঘটনার দুইদিন পর বখ্‌ত খান মির্জা মোগলের সঙ্গে দেখা করলেন ও "তাঁকে বললেন যে, সমগ্র বাহিনীর একটা সাধারণ প্যারেডের হুকুম দিতে হবে।... সেখানে প্রত্যেক সিপাহীকে শপথ গ্রহণ করতে হবে যে, তারা শেষ পর্যন্ত শত্রুর সঙ্গে লড়বে। আর যারা যুদ্ধ করতে রাজী নয়, তাদের দেশে ফিরে যেতে বলা হবে।"[৩] এর আরও ৩।৪ দিন পর বখ্‌ত খানের অনুরোধে বাহাদুর শাহ মির্জা মোগলকে গভর্ণরের উপাধিতে ভূষিত করলেন। বখ্‌ত খান আরও প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, জওয়ান বখ্‌তকে উত্তরাধিকারী বলে স্বীকার করে নেওয়া হবে।[৪]

যখন এইভাবে নতুন উদ্যমে আবার ইংরেজের উপর আক্রমণের প্রস্তুতি চলছিল, সেই সময় ৩১শে জুলাই নিমখ বাহিনী দিল্লী পৌছল। শক্তিশালী নিমখ বাহিনীর আগমন বেরিলি বাহিনীর আগমনের মতই গুরুত্বপূর্ণ। নাসিরাবাদ ও বেরিলি বাহিনী তাদের সঙ্গে ৬টি করে কামান এনেছিল, আর নিমখ বাহিনী আনল ৯টি। এত বড় একটা অশ্বারোহী, পদাতিক ও গোলন্দাজ বাহিনীর আগমনে স্বভাবতঃই বিদ্রোহীদের উৎসাহ অনেক বেড়ে গেল।

১লা আগস্ট বকর-ঈদের দিন হাজার হাজার হিন্দু-মুসলমান সিপাহী 'হয় মারবো নয় মরবো,' এই শপথ গ্রহণ করে ১০।১২টি কামান সঙ্গে করে সহর থেকে বেরিয়ে পড়ল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, নজফ্‌গড়ের ঝিল পার হয়ে ইংরেজ-শিবিরের পশ্চাদ্-

১। মেটকাফ সম্পাদিত: "টু নেটিভ ন্যারেটিভস্," পৃঃ ১৬২। ২। ঐ, ১৫৩।
৩। ঐ, পৃঃ ১৬২। ৪। ঐ, পৃঃ ১৬৭।

ভাগ আক্রমণ করা। সেতু তৈরী করবার সব কিছু জিনিসপত্রও তারা সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল। সিপাহীরা যে একটা অত্যন্ত কঠিন ও সাহসিক কাজের ভার নিয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে পৌছতে হলে মাইলের পর মাইল বর্ষার জলে-ডোবা জমি পার হয়ে আসতে হবে। মানুষ হাঁটুভাঙ্গা জল পার হয়ে যেতে পারলেও, কোনো কামান সঙ্গে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব ছিল। কিন্তু সিপাহীরা এতেও নিরুৎসাহ হল না। মুষলধারে বৃষ্টির মাঝে তারা সেতু তৈরি করে ফেলল। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই সে সেতু বন্যার জলে প্লাবিত হয়ে গেল। এভাবে ব্যর্থ হয়ে মধ্যাহ্নে তাদের ফিরে আসতে হল। কিন্তু তারা শহরে ফিরে গেল না। কিষেনগঞ্জ থেকে সন্ধ্যার দিকে টিলার দক্ষিণ অংশে ইংরেজদের আক্রমণ করল এবং "সমস্ত রাত ধরে কামান আর বন্দুকের গর্জন অনবরত চলতে লাগল।" তার পরদিনও বিকাল ৪টা পর্যন্ত সমানে যুদ্ধ চলল।

এই যুদ্ধ সম্বন্ধে ফরেস্ট লিখেছেন, "ধর্মের উত্তেজনায় উন্মত্ত হয়ে সিপাহীরা যখন আমাদের আক্রমণ করল···আমাদের ব্যাটারির কামানের গোলা তখন তাদের ছত্রভঙ্গ করে দিল। বারবার তারা নিজেদের পুনর্গঠন করে আমাদের ব্যাটারি-গুলির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার চেষ্টা করছিল, কিন্তু প্রতিবারই আমরা তাদের প্রতিহত করছিলাম। আগস্ট মাসের সে রাতে সমস্তক্ষণ ধরে বিরামহীনভাবে যুদ্ধ চলল; শহরের বুরুজগুলা থেকে অনবরত কামানের গোলা এসে পড়তে লাগল এবং আমাদের কামানগুলিও যে উত্তর পাঠাতে লাগল, তার আলোকে সমস্ত টিলা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। ধর্মান্ধদের হুঙ্কারে ও গোলাগুলীর শব্দে আকাশ ধ্বনিত হতে লাগল। সূর্যোদয় হল, তবুও যুদ্ধ চলতে লাগল এবং মধ্যাহ্নের পরে মরদের মতো যুদ্ধ করে, তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেল। তাদের ক্ষতি খুব বেশী হয়েছিল।"[১] সামরিকভাবে সিপাহীদের ১লা ও ২রা আগস্টের আক্রমণ সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয়েছিল। বিদ্রোহীদের ক্ষতি যে পরিমাণ হয়েছিল, তার তুলনায় ইংরেজদের ক্ষতি হয়েছিল খুবই সামান্য।

এত আয়োজন ও আশার পর বকর-ঈদের দিনের আক্রমণের বিফলতায় দিল্লীতে সকলেই খুব নিরাশ হল! বাহাদুর শাহও অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন। সন্ধ্যার সময় তিনি সব অফিসারদের ডেকে বললেন: "তোমরা যা কিছু টাকা এনেছিলে, সবই তোমরা খরচ করে ফেলেছ। রাজকোষ এখন একেবারে শূন্য, তাতে একটি পয়সাও নেই। আমি শুনতে পাচ্ছি যে, সিপাহীরা দিনের পর দিন

১। "হিষ্ট্রি অব ইণ্ডিয়ান মিউটিনি," ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১৩।

তাদের গৃহে ফিরে যাচ্ছে। আমি এখন আর জয়ী হবার আশা করি না। আমার এখন ইচ্ছা যে, তোমরা সকলে শহর ছেড়ে অন্য কোনো কেন্দ্রে চলে যাও।"[১] অফিসাররা সকলেই বাদশাহকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলেন। বখ্‌ত খান বোঝালেন যে, বৃষ্টি হবার ফলে সব জায়গা ভেসে গিয়েছিল এবং তার ফলে সিপাহীদের ফিরে আসতে হয়েছিল। সকলে মিলে বাদশাহকে প্রতিশ্রুতি দিল যে, তারা টিলা জয় করবেই।

১লা ও ২রা আগস্টের আক্রমণ ব্যতীত ১৪ই জুলাই থেকে প্রায় আগস্টের শেষ পর্যন্ত, অর্থাৎ প্রায় দেড় মাস ব্যাপী এই দীর্ঘকাল, এক রকম নির্বিঘ্নেই কেটেছে। পর পর ভয়ঙ্কর আক্রমণের ফলে জুলাই মাসের প্রথম ভাগে ইংরেজ-শিবিরের অবস্থান এতই সংকটাপন্ন হয়ে উঠেছিল যে, তাদের নায়করা দিল্লীর ক্যানটনমেণ্ট পরিত্যাগ করে কর্নালে চলে যাবার কথা চিন্তা করছিলেন। পাঞ্জাবের শাসনকর্তা কুপার লিখেছিলেন, "১৪ই থেকে জুলাই-এর শেষ পর্যন্ত সমগ্র ভারতের ভবিষ্যৎ একেবারে অনির্দিষ্ট হয়ে উঠেছিল।"[২] ২৭শে জুলাইতে "দু'জন ভারতীয় গোলন্দাজ ইংরেজ শিবির ছেড়ে চলে আসে। তারা এই বলে খবর দেয় যে, ইংরেজ শিবিরে যুদ্ধ করার মতো খুবই কম সৈন্য আছে।"[৩] ২৯শে জুলাই কয়েকজন শিখ ইংরেজ শিবির থেকে এসে ইংরেজদের চরম দুরবস্থার সংবাদ দেয়।[৪] বিদ্রোহীরা ইংরেজদের এই চরম দুরবস্থার সংবাদ পেয়েও এরূপ স্বর্ণ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারল না।

বিদ্রোহীদের এই নিষ্ক্রিয়তার সুযোগে একধারে যেমন ইংরেজরা তাদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থাগুলি সুদৃঢ়ভাবে গঠন করে নিল এবং শত্রুদের আক্রমণের জন্য নতুন সৈন্যবাহিনী গঠন করবার যথেষ্ট সময় পেল, অন্য ধারে তেমনি বিদ্রোহীদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বিশৃঙ্খলা আরও প্রকট হয়ে উঠল। যে জেনারেল উইলসন ১৪ই জুলাই-এর যুদ্ধের পর ক্যানটনমেণ্ট পরিত্যাগ করে কর্নালে চলে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন, সেই জেনারেল উইলসনই তাঁর গুপ্তচরদের মারফত বিদ্রোহীদের দুর্বলতার সংবাদ পেয়ে জুলাই মাস শেষ হবার পূর্বেই ক্যানটনমেণ্ট আঁকড়ে ধরে থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের শাসনকর্তা কলভিনকে ৩০শে জুলাইতে উইলসন দিল্লীর ক্যানটনমেণ্ট থেকে লিখলেন: "এখন এটা আমার দৃঢ় সংকল্প যে, বর্তমান অবস্থান আমি ধরে থাকবই এবং শত্রুর

১। মেটকাফ সম্পাদিত: "টু নেটিভ ন্যারেটিভস্‌", পৃঃ ১৭৮।

২। কুপার: "ক্রাইসিস্ ইন দি পাঞ্জাব," পৃঃ ২০১।

৩। মেটকাফ সম্পাদিত: "টু নেটিভ ন্যারেটিভস্‌" পৃঃ ১৬৯। ৪। ঐ, পৃঃ ১৭২।

আক্রমণ শেষ পর্যন্ত প্রতিরোধ করবই। শত্রুরা সংখ্যায় অগণিত এবং তাদের পক্ষে ব্যূহভেদ করে আমাদের অভিভূত করে ফেলাটাও অসম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের বাহিনী স্বস্থানে দাঁড়িয়ে মরবার জন্য প্রস্তুত। সৌভাগ্যবশতঃ শত্রুদের না আছে মস্তিষ্ক, না আছে কৌশল। আর আমরা খবর পাচ্ছি যে, তাদের মধ্যে খুবই ঝগড়াঝাঁটি শুরু হয়ে গিয়েছে।"[১]

বিদ্রোহীদের সংখ্যাধিক্য ইংরেজদের আর ভয়ের কারণ হল না; তারা জানত যে, যুদ্ধে সংখ্যাধিক্যের চাইতেও চূড়ান্ত নির্ণয়কারী প্রশ্ন হল উপযুক্ত নেতৃত্ব। ইংরেজদের চরম দুরবস্থার সময় বিদ্রোহীদের যোগ্য নেতৃত্বের অভাবটাই তাদের সব থেকে আশান্বিত করে তুলল। ইংরেজ নায়করা দেখতে পেল যে, সবল নেতৃত্বের অভাবেই বিদ্রোহীরা তাদের সংখ্যাধিক্য ও দুর্দমনীয় সাহস থাকা সত্ত্বেও পঙ্গু হয়ে আছে।

জুলাই ও আগস্ট মাসের মধ্যে এত ক্ষমতা, সুযোগ ও সুবিধা পাওয়া সত্ত্বেও বখ্‌ত খান কোনো নেতৃত্ব গড়ে তুলতে পারলেন না। তা ছাড়া, তিনি যুদ্ধে কোনো রকম কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি বলে বিদ্রোহীদের মধ্যে তাঁর সম্মান অনেকখানি কমে গিয়েছিল। জীবনলালের ডায়েরিতে দেখতে পাওয়া যায় যে, ২৯শে জুলাই-এর দরবারে "স্যাপার্সদের সুবাদার কাদির বক্স এক বক্তৃতায় অভিযোগ করলেন যে, বখ্‌ত খান ইংরেজদের আক্রমণের ব্যাপারে খুবই অবহেলা করছেন। অনেকদিন হয়ে গেল তিনি সিপাহীদের নিয়ে যুদ্ধ করতে যাননি। ইংরেজরা এই সুযোগে সৈন্য ও সাজসরঞ্জাম জোগাড় করে শহর আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। জেনারেল শুনে খুব চটে গেলেন। কিন্তু বাদশাহ তাঁকে নিরস্ত করে বললেন যে, সুবাদার ঠিক কথাই বলেছেন। কিন্তু এই দরবারে কিছুই ঠিক হয়নি।"[২]

সময় মতো ও সঠিকভাবে বেতন না পাবার জন্য এবং আরও নানা কারণে সিপাহীদের নিজেদের মধ্যেও দলাদলি বেড়ে যাচ্ছিল। অফিসাররা পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে শুরু করল, যার ফলে বিভিন্ন বাহিনীগুলির মধ্যেও ঝগড়াবিবাদ সংক্রামক ব্যাধির মতো ছড়িয়ে পড়তে লাগল; শৃঙ্খলা বলে আর কিছু রইল না।[৩] ৩০শে জুলাইতে "বেরিলি ও নিমথ বাহিনীর অফিসারদের মধ্যে ঝগড়া হয়েছিল। জেনারেল বখ্‌ত খান সেখানে গিয়ে একটা মিটমাট করে দিলেন।"[৪]

১। কে' : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ২য়, পৃঃ ৫৯৪।

২। মেটকাফ সম্পাদিত : "টু নেটিভ ন্যারেটিভস্‌", পৃঃ ১৭১।

৩। "বাদশাহ অনেক রাত পর্যন্ত দরবারে ছিলেন এবং দিল্লী ও মিরাট বাহিনীর অবাধ্যতা সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেন।"—(মেটকাফ সম্পাদিত : "টু নেটিভ ন্যারেটিভস্‌", পৃঃ ১৫৫)।

৪। ঐ, পৃঃ ১৭৪।

এই অবস্থায় ইংরেজের দালালরাও খুব সক্রিয় হয়ে উঠল। ২৩শে জুলাইতে "মির্জা এলাহী বক্স বাদশাহের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে ইংরেজের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করবার জন্য পরামর্শ দিলেন। বাদশাহ উত্তর দিলেন যে, এতে তাঁর কোনো হাত নেই এবং তিনি তা করতে পারবেন না।"[১] পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এলাহী বক্স, আশামুল্লা প্রভৃতি নিয়মিতভাবে ইংরেজ কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে আদেশ পেত। এ সম্পর্কে ইনটেলিজেন্স বিভাগের কর্তা মুইর আগ্রা থেকে ২৪শে আগস্ট জেনারেল হ্যাভলককে যে পত্র লেখেন তা উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখছেন: "গ্রেটহেড ১৭ই তারিখে মির্জা এলাহী বক্সের নিকট থেকে এক চিঠি পেয়েছেন; তাতে তিনি জানতে চেয়েছেন, তিনি আমাদের জন্য কি করতে পারেন।"[২]

২০শে আগস্ট এক গুপ্তচরের রিপোর্টে দেখা যায়: "গতকালের দরবারে মিরাট বাহিনী বাদশাহের নিকট অভিযোগ করে এবং জিজ্ঞাসা করে, কেন বখ্‌ত খান ও লাল খানকে জেনারেল ও কর্নেল করা হয়েছে? তাঁরা কখনই যুদ্ধ করতে যাননি এবং যে অর্থ তাঁরা সঙ্গে এনেছেন তা তাঁরা রাজকোষে দেননি। আমরা যা কিছু এনেছিলাম সবই বাদশাহের হাতে তুলে দিয়েছি; আমরা প্রতিবার ইংরেজকে আক্রমণ করেছি, যার ফলে আমাদের অনেক লোকের মৃত্যু হয়েছে। এর পরিবর্তে আমরা কোনো বেতন পাচ্ছি না এবং তার ফলে আমাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যেরও খুব অভাব। আমাদের ইচ্ছা যে, আমরা প্রাসাদ ও শহর লুট করি, তারপর এমন একটা জায়গায় চলে যাই, যেখানে আমরা খেতে পরতে পাব। আপনি আপনার জেনারেল ও কর্নেলদের নিয়ে শহর রক্ষা করার চেষ্টা করুন। বাদশাহ উত্তর করলেন যে, এত ব্যস্ত হওয়া উচিত নয়, তাদের কর্তব্য হচ্ছে টিলা দখল করা ইত্যাদি। কিন্তু সিপাহীরা খুবই রাগান্বিত ও উদ্ধত ভাবে কথা বলল। বখ্‌ত খান ও মির্জা মোগল পরস্পরের প্রতি অত্যন্ত শত্রুভাবাপন্ন হয়ে উঠেছেন। সিপাহীরা কোনো হুকুমই মানে না। ইংরেজের উপর আক্রমণ-পরিকল্পনা করা হয়, কিন্তু সিপাহীরা সেগুলি কার্যকরী করতে অস্বীকার করে। যারা আক্রমণ করবার জন্য যায়, তারাও এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে রাতে শহরে ফিরে আসে। ··· বস্তুতঃ বিদ্রোহীরা একেবারেই হতাশ হয়ে পড়েছে। একদিন তারা সদলবলে দিল্লী ছেড়ে চলে যাবে। বিদ্রোহীদের সংগঠন দ্রুত ভেঙে পড়ছে। বর্তমানে টাকা এবং গোলাবারুদের খুবই অভাব। ··· বিদ্রোহীদের সংখ্যা ২০,০০০ থেকে ২৫,০০০ হবে, কিন্তু তাদের মধ্যে যোদ্ধা খুবই কম আছে।"[৩]

১। ঐ, পৃঃ ১৬৪। ২। "ইনটেলিজেন্স ডিপার্টমেন্ট রিপোর্ট", ২য়, পৃঃ ১৪২।

৩। "পাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্ডস্", ৮ম খণ্ড, ১ম ভাগ পৃঃ ৪০৭-৮।

নেতৃত্বের অভাব

ইংরেজ বাহিনী যখন আম্বালা ও মিরাট থেকে যাত্রা শুরু করেছিল, তখন তারা এই সংকল্প নিয়ে এসেছিল যে, দিল্লী পৌছানো মাত্রই তারা শহরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাদের মধ্যে অনেকেই জন লরেন্সের কথায় বিশ্বাস করে ধরে নিয়েছিল যে, দিল্লীতে সাদামুখের আবির্ভাব হবার সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্রোহী গুণ্ডা বদমাশরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে। ৮ই জুন তারিখে দিল্লীর ক্যানটনমেণ্ট ও টিলা দখল করেই ইংরেজরা খুব আশান্বিতভাবে চিন্তা করতে লাগল কিভাবে এইবার তারা তাদের পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করবে। তাদের আশান্বিত হবার আরও একটা কারণ ছিল, এই সময়ে তাদের সংখ্যা দিল্লীর বিদ্রোহী সিপাহীদের থেকে বেশী ছিল।

কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে ইংরেজের এই অতি প্রিয় পরিকল্পনাটি ভেস্তে গেল—অবশ্য তাদের নিজেদের দোষে নয়, সিপাহীদের রণশীলতার জন্য। পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে ইংরেজকে সন্তুষ্ট করার পরিবর্তে, বিদ্রোহীরা সংখ্যালঘু হয়েও ইংরেজদের একদিনের জন্যও বিশ্রাম করবার অবসর না দিয়ে বেপরোয়াভাবে তাদের উপর আক্রমণ চালাতে শুরু করল। ইংরেজরা এসেছিল বিদ্রোহী দিল্লীকে অবরোধ করে তার অস্তিত্ব বিলুপ্ত করতে, কিন্তু দু'এক দিনের মধ্যেই তারা বুঝতে পারল যে, তারা নিজেরাই অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। ৯ই জুন তারিখে বিদ্রোহীরা প্রচণ্ডভাবে হিন্দু রাও-এর বাড়ি আক্রমণ করল। সিপাহীরা বুঝতে পেরেছিল যে, ইংরেজদের হটাতে হলে প্রথমেই তাদের হিন্দু রাও-এর বাড়ি দখল করতে হবে। তাই তারা আবার ১০ই তারিখে ও পুনরায় ১১ই তারিখে ঐ বাড়ি আক্রমণ করল।

১০ই জুনের যুদ্ধের একটি ঘটনা: "যখন গুর্খারা অগ্রসর হচ্ছিল, তখন বিদ্রোহীরা তাদের চেঁচিয়ে বলল যে, তারা গুর্খাদের সঙ্গে কথা বলতে চায়,

তারা যেন গুলী না ছোঁড়ে। কয়েকজন বিদ্রোহী বলল: 'আমরা আশা করি গুর্খারা আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে, আমরা তাদের গুলী করব না।' গুর্খারা উত্তর করল: 'হাঁ, আমরা আসছি, তোমাদের সঙ্গে যোগ দেব।' এইভাবে গুর্খারা বিদ্রোহীদের থেকে মাত্র কুড়ি পা পর্যন্ত অগ্রসর হল, তারপর হঠাৎ গুলী করে ২০।৩০ জনকে মেরে ফেলল"—(ফরেস্ট: 'স্টেট পেপার্স,' ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৯৪)।

ইংরেজ বাহিনীর অভিযান শুরু হবার পরই বাহাদুর শাহ দিল্লী রক্ষা করার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন। "সমস্ত বুরুজগুলিতে লোক মোতায়েন হল, এবং সিপাহীরা সর্বত্র তাদের স্ব স্ব স্থানে তৈরী হয়ে থাকল। ··· এই সব জায়গায় ও যুদ্ধক্ষেত্রে গোলাবারুদ সরবরাহ হতে লাগল।"[১] জুন মাসের প্রথম দিকেই জেনারেল সামুদ খানকে বিদ্রোহী বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করা হল। মে মাসে দিল্লীতে বিদ্রোহীদের মধ্যে গোলন্দাজদের সংখ্যা খুবই কম ছিল। বারুদখানার লস্করদের উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে তাদের ভাল গোলন্দাজ করে নেওয়া হল। সাহসী ও যোগ্য সিপাহীদের উপর গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার দেওয়া হল। অনেক বিদ্রোহী প্রথম থেকেই কর্মতৎপরতা দেখাতে লাগল। "কুলী খান ছিল ইংরেজ বাহিনীতে মাসিক ২৮৲ টাকা বেতনের একজন সাধারণ গোলন্দাজ। সমস্ত দিন ইংরেজের উপর কামান চালিয়ে সে খুব কৃতিত্বের পরিচয় দিল। সমস্ত শহর তার প্রশংসায় মুখরিত হয়ে উঠল। বাদশাহ এই লোকটির দুঃসাহসের পরিচয় পেয়ে এত খুশী হলেন যে, তিনি তৎক্ষণাৎ ১০০ মণ বারুদ তৈরি করবার হুকুম দিলেন।"[২]

এ সম্পর্কে ফরেস্ট ও নর্মান তথ্য রেখে গেছেন। দিল্লীর শিবির থেকে যে রিপোর্ট ১৩ই জুন গভর্নর জেনারেলকে পাঠান হয়েছিল, তাতে লেখা ছিল: "বিদ্রোহীরা কতকগুলি দুর্ধর্ষ কামান দাঁড় করিয়েছে। কামান ব্যবহার করার কাজেও তারা খুব নিপুণতা দেখাচ্ছে এবং সব সময়ই গোলাবর্ষণ করে যাচ্ছে" —(ফরেস্ট: 'স্টেট পেপার্স,' ১ম, পৃঃ ২৮৩)। আর নর্মান তাঁর 'ন্যারেটিভ'-এ বলেছেন, "অবরোধের প্রথম দিকে বিদ্রোহীদের মাত্র এক কোম্পানি গোলন্দাজ ছিল, কিন্তু যেসব গোলন্দাজ ছুটিতে ছিল তাদের দলে নিয়েই হোক, অথবা বারুদখানার প্রচুর সংখ্যক বুদ্ধিমান লস্করদের শিখিয়ে নিয়েই হোক, কিম্বা উভয় পন্থার দ্বারাই হোক, আমাদের দিল্লীতে আসার প্রথম দিন থেকেই আমরা দেখতে পেয়েছি যে, বিদ্রোহীদের অনেকগুলি কামান চালাবার মতো শিক্ষিত গোলন্দাজের অভাব নেই"—(ঐ, পৃঃ ৪৩৯।)।

১। মেটকাফ সম্পাদিত: "টু নেটিভ ন্যারেটিভস্", পৃঃ ১১৭।

২। ঐ, পৃঃ ১২০।

রোটকে বিদ্রোহ করে দু'তিন শ' সিপাহী ১১ই জুন দিল্লীতে এসে পৌছল ; ইংরেজকে আক্রমণ করবার জন্য তাদেরই উৎসাহ সব থেকে বেশী। প্ল্যান করা হল, ১২ই তারিখে ইংরেজ শিবির দু'দিক থেকে একই সঙ্গে আক্রমণ করা হবে। যদি এই প্ল্যান ঠিকভাবে কার্যকরী করা হত, তা হলে সেই দিনই হয়ত বিদ্রোহীরা ইংরেজ আক্রমণকারীদের শিবির থেকে উচ্ছেদ করতে পারত। কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক, বিদ্রোহীরা যুগপৎ আক্রমণ করল না, তাদের দুইটি শাখা বিভিন্ন সময়ে শত্রুকে আক্রমণ করল।[১] এ সম্পর্কে ফরেস্ট বলে গেছেন : "ফ্ল্যাগ স্টাফ টাওয়ারে আর হিন্দু রাও-এর বাড়ির উপর বিদ্রোহীরা যে একই সময়ে আক্রমণ করবার কথা ভেবেছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাদের পক্ষে খুবই সৌভাগ্যের বিষয় যে, এই দুটি আক্রমণ বিভিন্ন সময়ে ঘটেছিল।"[২]

জেনারেল সামুদ খান ১,৮০০ লোক ও ১২টি কামান নিয়ে কাশ্মীর গেট দিয়ে বেরিয়ে ইংরেজদের তাদের শিবিরের পার্শ্বস্থিত টিলার উপর ফ্ল্যাগ স্টাফ টাওয়ারে আক্রমণ করেছিলেন। কাশ্মীর গেট দিয়ে এই আক্রমণ এতই আকস্মিক হয়েছিল যে, ইংরেজরা এই আঘাতের জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। এই আক্রমণ সম্বন্ধে নর্মান তাঁর সরকারী রিপোর্টে লিখেছিলেন : "যমুনা ও মেটকাফ হাউসের মধ্যবর্তী খাদগুলিতে আত্মগোপন করে প্রচুর সংখ্যক সিপাহী প্রত্যুষে আমাদের হঠাৎ তীব্রভাবে আক্রমণ করেছিল এবং ফ্ল্যাগ স্টাফ টাওয়ারের বাম দিকে অবস্থিত টিলার উপর একটা উঁচু জায়গা অধিকার করেছিল। তাদের গুলী চলছিল ঘন ঘন ও তীব্র বেগে। বহু গুলী এসে আমাদের শিবিরের ভিতরেও পড়ছিল ; এমন কি কয়েক জন শত্রু টিলা থেকে শিবিরের দিকে অবতরণও করেছিল।"[৩] ইংরেজরা কোনোমতে আত্মরক্ষা করতে লাগল।

এই ভাবে খানিকক্ষণ যুদ্ধ চলার পর সামুদ খান সিপাহীদের ফিরে যাবার আদেশ দিলেন। কিন্তু যে সময়ে সামুদ খানের সিপাহীরা ফিরে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময় সিপাহীদের অন্য দলটি হিন্দু রাও-এর বাড়ি আক্রমণ করা শুরু করল। কিছুক্ষণ যুদ্ধ করার পর তারাও ফিরে গেল। বিদ্রোহীরা যদি একই সময়ে ইংরেজ শিবিরের দুই ধারে আক্রমণ করত, তা হলে ইংরেজদের তখন যে পরিমাণ সৈন্য ছিল তা দিয়ে দু' দিকে আত্মরক্ষা করা তাদের পক্ষে খুবই কঠিন হত। বিদ্রোহীদের বারংবার আক্রমণের ফলে ইংরেজ বাহিনী তখন কিরূপ

১। "হিস্ট্রি অফ দি ইণ্ডিয়ান মিউটিনি", ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮৫।

২। ফরেষ্ট : "ষ্টেট পেপার্স," ১ম, পৃঃ ৪৪০।

৩। মেটকাফ সম্পাদিত : "টু নেটিভ ন্যারেটিভস্," পৃঃ ১১৭।

বিপদ্‌জনক অবস্থার মধ্যে পড়েছিল সে সম্বন্ধে নর্মান লিখেছিলেন: "আমাদের অর্ধেক সৈন্যকে সব সময় চারদিকে পাহারার কাজে থাকতে হত। যখনই শত্রুর আক্রমণ হত তখনই মাত্র কয়েকজনকে রিজার্ভ রেখে আর সব সৈন্যকেই আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য যুদ্ধে নামতে হত।"[১]

বারবার বিদ্রোহীদের এইরূপ আক্রমণে আর একটি ফল হচ্ছিল, ইংরেজ শিবিরে যেসব ভারতীয় সৈন্য ছিল, যাদের রাজভক্তির উপর ইংরেজরা কোনো সময়েই সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারেনি, তারা অনেকেই বিচলিত হয়ে পড়ছিল।

১২ই তারিখে যখন বিদ্রোহীরা হিন্দু রাও-এর বাড়ি আক্রমণ করে, "তখন একদল ইরেগুলার অশ্বারোহী, যাদের রাজভক্তিতে আমরা বিশ্বাস করেছিলাম, শত্রুর সঙ্গে গিয়ে যোগ দেয়।" গুর্খা বাহিনীর নায়ক রীড বলেন: "যেন তারা শত্রুকে আক্রমণ করতে যাচ্ছে এইভাবে তারা এগিয়ে চলল। কিন্তু যে মুহূর্তে তারা শত্রুর সম্মুখীন হল, আমি আতঙ্কিতভাবে দেখলাম যে, তারা শত্রুর সঙ্গে একেবারে মিশে গেল।"[২]

৬০ম বাহিনী রোটকে যখন বিদ্রোহ করে দিল্লী চলে যায়, তখন তাদের সিপাহী-অফিসাররা ইংরেজের সঙ্গেই থেকে যায় ও বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য ইংরেজ শিবিরে আসে। ১২ই তারিখের যুদ্ধে এই সব ভারতীয় অফিসাররাও ইংরেজ শিবির ত্যাগ করে বিদ্রোহীদের সঙ্গে গিয়ে যোগ দেয়। ১৫ই জুন যখন বিদ্রোহীরা আবার ইংরেজদের আক্রমণ করে, তখন এই সব অফিসারদের একজন—সর্দার বাহাদুরকে প্রচণ্ডভাবে যুদ্ধ করতে দেখা যায়। ঐ দিনকার যুদ্ধেই তাঁর মৃত্যু হয়। যাই হোক, এই ব্যর্থতার ফলে বাহাদুর শাহ খুবই ক্ষুব্ধ হলেন এবং "সামুদ খানকে ভর্ৎসনা করলেন।"[৩]

বৃটিশ সরকার যেমন বুঝতে পেরেছিল যে, ভারত-সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য দিল্লী পুনর্দখল করা তাদের পক্ষে আশু কর্তব্য, সেইরূপ বাহাদুর শাহ এবং অন্যান্য বিদ্রোহী নেতারা বুঝতে পেরেছিলেন যে, ভারতে বিদ্রোহের প্রসারের জন্য ও বিদ্রোহীদের আত্মবিশ্বাস বলবৎ রাখার জন্য একটা বড় রকমের যুদ্ধে ইংরেজকে যত সত্বর সম্ভব পরাজিত করা নিতান্ত আবশ্যক। সমগ্র ভারতবর্ষ, বিশেষ করে পাঞ্জাব, তখন একটা অতি সংকটময় অবস্থার ভিতর দিয়ে যাচ্ছে এবং এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত সকল ভারতবাসী দিল্লীর দিকে উদ্‌গ্রীব হয়ে

১। ফরেষ্ট: "ষ্টেট পেপার্স", ১ম, পৃঃ ৪৪২।
২। কে': "হিষ্ট্রি অব দি সিপয় ওয়ার ইন ইণ্ডিয়া", ২য়, পৃঃ ৫৪৬।
৩। মেটকাফ সম্পাদিত: "টু নেটিভ ন্যারেটিভস্." পৃঃ ১২১।

তাকিয়ে আছে। সেই সংকটপূর্ণ সন্ধিক্ষণে, যখন ইংরেজ সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ এই বিরাট ভূখণ্ডে টলটলায়মান, ঠিক সেই মুহূর্তে শত্রুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের একটা প্রধান বিজয় দোদুল্যমান প্রদেশগুলিকে বিদ্রোহের দিকে দ্রুত অগ্রসর করে দিয়ে বিদ্রোহী ভারতের চূড়ান্ত বিজয়কে সুনিশ্চিত করে দিতে পারত। তাই বাহাদুর শাহ দৃঢ়প্রতিজ্ঞভাবে টিলা আক্রমণ করে ইংরেজদের শিবির থেকে বিতাড়িত করবার জন্য বরাবর সিপাহী নেতাদের তাগিদ দিচ্ছিলেন।

১৫ই জুন একবার ইংরেজ শিবির আক্রমণ করার পর, বিদ্রোহীরা আবার ১৭ই তারিখে ভয়ঙ্করভাবে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। একধারে ইংরেজদের যুদ্ধে ব্যস্ত রেখে বিদ্রোহীরা হিন্দু রাও-এর বাড়ির নিকট দেওয়াল দিয়ে ঘেরা ঈদগা নামে একটা পুরাতন মসজিদে একটা কামানের ব্যাটারি তৈরি করবার চেষ্টা করছিল। এই দুঃসাহসিক কাজে যদি বিদ্রোহীরা সফল হত, তা হলে ইংরেজরা খুবই বিপদ্‌গ্রস্ত হত, কারণ তাতে ইংরেজ শিবিরের দক্ষিণ ও পশ্চাদ্‌ভাগ আক্রমণ করা বিদ্রোহীদের পক্ষে খুবই সহজ হয়ে পড়ত। বিদ্রোহীদের এই পরিকল্পনা টের পাওয়ামাত্র ইংরেজরা তৎক্ষণাৎ তাদের সমস্ত শক্তি ঐখানে নিয়োগ করে পাল্টা আক্রমণের দ্বারা বিদ্রোহীদের হটিয়ে দিল।

পরদিন—১৮ই জুন, বিখ্যাত নাসিরাবাদ বাহিনী রাজধানীতে এসে পৌঁছল। তারা ৬টি শক্তিশালী কামানও সঙ্গে নিয়ে এল। এগুলি সেই কামান, যেগুলি জেলালাবাদের যুদ্ধে খ্যাতি অর্জন করেছিল। এই শক্তিশালী বাহিনীর আগমনে দিল্লীতে বিদ্রোহীদের শক্তি অনেক পরিমাণে বেড়ে গেল। ১৯শে জুন সূর্যের তেজ যখন খুবই তীব্র হয়ে উঠেছে, তখন নাসিরাবাদ বাহিনী লাহোর গেট দিয়ে বেরিয়ে এসে সবজিমণ্ডী পার হয়ে, ইংরেজ শিবিরের অরক্ষিত পশ্চাদ্‌ভাগে নজফ্‌গড় ক্যানালের ধারে হঠাৎ এসে হাজির হল। এরূপ অকস্মাৎ আক্রান্ত হয়েও, ইংরেজরা দৃঢ়তার সঙ্গে বাধা দিতে লাগল। কয়েক ঘণ্টা এই ভাবে যুদ্ধের পর বিদ্রোহীরা ইংরেজ শিবিরের দেড় মাইলের মধ্যে অগ্রসর হয়ে এল। "বিদ্রোহীরা আমাদের অভ্যাস ভাল করেই জানত। কাজেই সূর্যের তাপ যখন সব থেকে বেশী, ঠিক সেই সময় তারা আমাদের আক্রমণ করত। দেশের জলবায়ু ছিল তাদের প্রধান মিত্র।"[১]

পদাতিক, অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ—নাসিরাবাদ বাহিনীর এই তিনটি শাখাই নজফ্‌গড়ের যুদ্ধে নিপুণভাবে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করে উৎকৃষ্টতর নেতৃত্ব ও শৃঙ্খলার পরিচয় দিয়েছিল। তাদের কামানের দ্রুত ও নিশ্চিত-লক্ষ্যের

১। কে' : "হিষ্ট্রি অব দি সিপয় ওয়ার ইন ইণ্ডিয়া" ২য়, পৃঃ ৫৪০।

ফলে ইংরেজ বাহিনী প্রায় বিধ্বস্ত হয়ে এসেছিল এবং তাদের ভবিষ্যৎ একটি অদৃশ্য সূক্ষ্ম সূতায় ঝুলছিল। ইংরেজ গোলন্দাজ-নায়ক টোম্বস্, তাঁর লোকদের তাদের কামানের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরতে দেখছিলেন। ইংরেজ অশ্বারোহীরা বারবার সিপাহীদের আক্রমণ করে তাদের স্থানচ্যুত করবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু বারবারই তাদের অনেক হতাহতের পর ফিরে যেতে হয়েছিল এবং তাদের নায়ক ইউল নিহত হয়েছিল। পাঞ্জাব গাইডস্ দলের পাঠান অশ্বারোহীদের নিয়ে তাদের নায়ক ড্যালি বিদ্রোহীদের একবার মরিয়া হয়ে আক্রমণ করল, কিন্তু তারাও ব্যর্থ মনোরথ হয়ে আহত ড্যালিকে কাঁধে করে ফিরে আসতে বাধ্য হল। বিখ্যাত ইংরেজ অশ্বারোহী, অফিসার হোপ গ্র্যাণ্ট যখন আক্রমণ করলেন, তখন তিনি দেখলেন, একটি গুলীর আঘাতে তাঁর ঘোড়া নিহত। তিনি তাঁর মৃত ঘোড়ার উপর পড়ে গেলেন; একজন সিপাহী তলোয়ার নিয়ে তাঁকে আঘাত করতে উদ্যত হলে একজন পাঠান অশ্বারোহী সিপাহীটিকে হত্যা করল।

সন্ধ্যা ৮টার সময় ইংরেজরা পরাজিত হয়ে অনেকগুলি কামান ও অনেক সাজসরঞ্জাম যুদ্ধক্ষেত্রে ফেলে রেখে তাদের শিবিরে ফিরে গেল। রবার্টস্ এই দিনকার যুদ্ধ সম্বন্ধে লিখেছিলেন: "সিপাহীরা আমাদের পরাজিত করে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিয়েছিল।" স্বভাবতঃই ইংরেজরা সেই রাত্রে খুবই ক্লান্ত, হতাশ ও ভগ্নোৎসাহ হয়ে পড়েছিল এবং তাদের অফিসাররাও অত্যন্ত নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছিলেন। এই সম্পর্কে কে' লিখেছেন: "রাত্রিতে যখন আমাদের অফিসাররা বিষণ্ন বদনে তাঁবুতে সমবেত হলেন, তখন তাঁরা দেখতে পেলেন, তাঁদের পশ্চাতে শত্রুরা আগুনের ধারে জমায়েত হচ্ছে। আমাদের খুব সাংঘাতিক ক্ষতি হয়েছিল। ... আমাদের আরও সর্বনাশ হত, যদি বিদ্রোহীরা স্থায়িভাবে আমাদের পশ্চাতে শিবির ফেলত এবং যদি তারা দিল্লী থেকে সাহায্য পেয়ে পুনরায় আমাদের পশ্চাৎ ও পার্শ্বদেশ আক্রমণ করত।"[১] এই অবস্থায় সিপাহীরা যদি রাত্রিকালে ইংরেজ শিবির আক্রমণ করত, তা হলে সেখান থেকে শত্রুকে হঠিয়ে দেওয়া তাদের পক্ষে খুব কঠিন হত না। কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক, বিদ্রোহীরা সেই রাত্রে আর শত্রুদের আক্রমণ করল না। এই ভাবে বিদেশী আক্রমণকারীদের পরাজিত করবার আরও একটা নিশ্চিত সুযোগ বিদ্রোহীরা গ্রহণ করল না। পরদিন প্রত্যুষে ইংরেজরা যখন তাদের সর্বশক্তি সংগ্রহ করে বিদ্রোহীদের সম্মুখীন হল, তখন তারা দেখে অবাক হয়ে গেল যে, তাদের এই ভয়াবহ শত্রু তাদের পূর্বদিনের বীরত্বপূর্ণ বিজয়কে পদদলিত করে বিনা যুদ্ধে শহরাভিমুখে প্রত্যাবর্তন

১। কে': পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ২য়, ৫৫২।

শুরু করে দিয়েছে! সত্যই এই যুগে পরম দয়ালু ভগবান ইংরেজের প্রতিই প্রসন্ন ছিলেন!

সাভারকারের মতে বিদ্রোহীদের এইভাবে শহরে ফিরে যাবার কারণ ছিল—"তাদের গোলাবারুদের অভাব" ('ইণ্ডিয়ান ওয়ার অব ইণ্ডিপেণ্ডেন্স,' পৃঃ ২৯৩)। এই সময় দিল্লী শহরে গোলাবারুদের খুব অভাব ছিল কিনা তা সঠিকভাবে বলা কঠিন। বিদ্রোহীদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তখনও খুব দুর্বল ছিল বলেই সম্ভবতঃ এরূপ শোচনীয় ঘটনা ঘটতে পেরেছিল। এ বিষয়ে ফরেস্ট বলেন যে, বিদ্রোহীরা সত্যই ইংরেজ শিবিরের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ও দুর্বল দিকটাই আক্রমণের জন্য বেছে নিয়েছিল। "যদি তারা সেস্থান দখল করে বসে থাকতে পারত, তা হলে তারা আমাদের পাঞ্জাবের সঙ্গে যাতায়াতের পথ কেটে দিতে পারত। আমাদের ছোট বাহিনীটা একেবারে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ত; বিনা রসদে ও বিনা লোকবলের সাহায্যে, বিদ্রোহীদের প্রতিদিনকার ক্রমবর্ধমান শক্তির বিরুদ্ধে আমাদের পক্ষে শিবির দখলে রাখা অসম্ভব হত। সেদিনকার যুদ্ধের যখন ফলাফল বিচার করা হল, তখন আমাদের শিবিরের সকলে হতাশ হয়ে পড়েছিল।"[১]

২৩শে জুন, ১৮৫৭ সাল ছিল পলাশী যুদ্ধের শতবার্ষিকী দিবস—শত্রুর সঙ্গে শেষ বোঝাপড়া করার জন্য এই দিবসটি আজ প্রতিটি দেশপ্রেমিক ভারতবাসীর নিকট বিশেষ করে স্মরণীয়; আজ একশত বছরের জাতীয় অপমানকে ধুয়ে মুছে ফেলে ভারতের হৃত স্বাধীনতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার দিবস। ইংরেজ শিবিরে সকলেই জানত যে, বিদ্রোহীরা ঐদিন চরম প্রতিশোধ নেবার জন্য তৈরী হচ্ছে। ইংরেজরা তাদের ভবিষ্যৎকে খুব উজ্জ্বল বলে মনে করল না। তাই ২১শে জুন রবিবার শিবিরের প্রতিটি ইংরেজ গির্জায় সমবেত হয়ে পুনরায় পরম দয়ালু ভগবানের শরণাপন্ন হল। এই সব ধর্মপ্রাণ খৃষ্টভক্তদের প্রার্থনায় ভগবান এবারও মুগ্ধ হলেন! পরদিন কিছু পাঠান ও শিখ সমেত ইংরেজ সৈন্যদের বেশ একটা বড় দল পাঞ্জাব থেকে ইংরেজ শিবিরে এসে পৌঁছল। দিল্লীতে বিদ্রোহীদের সংখ্যাও জলন্ধর ও ফিলুরের বিদ্রোহী সিপাহীদের আগমনে বর্ধিত হল।

২৩শে জুন সিপাহীরা দৃঢ়সংকল্প নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে বেরিয়ে এল। ১৯শে জুনের আক্রমণ যেমন নবাগত নাসিরাবাদ ব্রিগেডের দ্বারা চালিত হয়েছিল, ২৩শে তারিখের আক্রমণে তেমনই জলন্ধরের বিদ্রোহীরা তার পুরোভাগে ছিল। বিদ্রোহীদের পরিকল্পনা ছিল যে, তারা দু' ভাগে বিভক্ত হয়ে একদল যাবে নজফ্‌গড়ে আর একদল আক্রমণ করবে হিন্দু রাও-এর বাড়ি। কিন্তু পাঁচদিন পূর্বে

১। ফরেষ্ট: "হিষ্ট্রি অব দি ইণ্ডিয়ান মিউটিনি", ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯২।

নজফ্‌গড়ের যুদ্ধের পর ইংরেজরা ওখানকার সেতু ভেঙে দিয়েছিল। তাই বিদ্রোহীদের ফিরে আসতে হল। ইংরেজদের রিপোর্টে দেখা যায়, "বিদ্রোহীরা সেতু মেরামত করতে শুরু করল। কিন্তু এতই বৃষ্টি হয়েছিল যে, সব কিছুই ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তার ফলে বিদ্রোহীরা ব্যর্থ হয়ে ফিরে এল। আমাদের প্রতি ভগবানের খুবই দয়া বলতে হবে। বিদ্রোহীরা যদি সদলবলে সেতু পার হত, তা হলে পাঞ্জাবের সঙ্গে আমাদের যাতায়াতের পথ তারা কেটে দিতে পারত। তা ছাড়া এদের সঙ্গে লড়বার জন্য আমাদের শিবির থেকে অনেক সৈন্য পাঠাতে হত, কিন্তু তা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হত না।"[১]

নজফ্‌গড় আক্রমণে ব্যর্থ হয়ে সিপাহীরা সবজিমণ্ডী থেকে শত্রুকে আক্রমণ করল। আর অন্য একটি দল হিন্দু রাও-এর বাড়ির সম্মুখভাগ দিয়ে অগ্রসর হল। দু'দলই প্রচণ্ডভাবে দু'ধার থেকে একই সময়ে বৃটিশের উপর কামানের গোলা বর্ষণ করতে লাগল। মোরী বুরুজের কামানগুলিও চলতে লাগল। সবজিমণ্ডীর আক্রমণ ইংরেজদের পক্ষে প্রতিরোধ করা কঠিন হয়ে পড়ল; তাদের ক্রমশঃ পিছু হঠতে হল। সিপাহীরা ক্রমশঃ হিন্দু রাও-এর বাড়ির পশ্চাদ্‌ভাগে অগ্রসর হয়ে মাউণ্ড ব্যাটারি আক্রমণ করল।

এই রকম একটা ভয়ানক বিপদ্‌জনক অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য ইংরেজরা আত্মরক্ষার কৌশল ছেড়ে দিয়ে মরিয়া হয়ে বিদ্রোহীদের প্রতি-আক্রমণ শুরু করল। ইংরেজ, পাঠান, গুর্খা ও শিখ সৈন্যের বাহিনী তিনবার সবজিমণ্ডীতে সিপাহীদের আক্রমণ করল। কিন্তু সবজিমণ্ডীর সরু সরু রাস্তা, দেওয়াল দিয়ে ঘেরা বড় বড় বাড়ি, বাগান ও ছাদ থেকে সিপাহীদের হটানো সহজ ছিল না। অনেকবার হাতাহাতি যুদ্ধও হল; সবজিমণ্ডীর গলিগুলি হতাহতে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। তিন বারই ইংরেজরা হটে আসতে বাধ্য হল।

সবজিমণ্ডীর যুদ্ধের সব থেকে বড় বিশেষত্ব হল ইংরেজ সৈন্যের কাপুরুষতা। প্রথম বারের পর দ্বিতীয় বার তারা বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে বড় একটা অগ্রসর হয়নি। তারা গুর্খা, শিখ, পাঠান ভাড়াটিয়াদেরই বিদ্রোহীদের গুলীর মুখে বারবার ঠেলে পাঠিয়ে দিয়েছিল। মহাবিদ্রোহের সময় বারবার ইংরেজ সৈন্যেরা এই কৌশল অবলম্বন করেছে এবং বারবার এই সব ভাড়াটিয়ারা তাদের প্রভুদের নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছে। ঐতিহাসিক কে'-ই ইংরেজ সৈন্যদের ঐদিনকার

১। "পাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্ডস্‌", ৭ম খণ্ড, ১ম, পৃঃ ১৭১।

ব্যবহার সম্বন্ধে দরদী ভাষায় বলেছেন, "এই ধরনের যুদ্ধ ইংরেজ সৈন্যের রুচি ও মেজাজের সঙ্গে সব থেকে কম খাপ খায়।"[১]

গুর্খা বাহিনীর নায়ক মেজর রীড ২৩শে জুনের যুদ্ধের বর্ণনা এইভাবে দিয়েছেন: "বিদ্রোহীরা বেলা ১২টা আন্দাজ আমার সমগ্র অবস্থানের উপর প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ শুরু করল। বিদ্রোহীদের চাইতে বেশী নিপুণতার সঙ্গে আর কেউ যুদ্ধ করতে পারত না। তারা ইংরেজ রাইফেল বাহিনী, পাঠান গাইড বাহিনী ও আমার গুর্খা বাহিনীর উপর বারবার ঝাঁপিয়ে পড়ছিল এবং এক সময়ে আমার মনে হয়েছিল যে, আমি নিশ্চয়ই ঐদিনকার মতো হেরে গিয়েছি। তা ছাড়া, শহরের কামান এবং তারা যে কামানগুলি সঙ্গে নিয়ে এসেছিল সেগুলি যেরূপ দ্রুত ও ভয়ঙ্করভাবে গোলা বর্ষণ করছিল, তাতে আমার সমগ্র অবস্থান বিধ্বস্ত হয়ে যাচ্ছিল।"[২] কিন্তু পূর্বেও যা অনেকবার ঘটেছে, এবারেও ঠিক তাই হল। ঠিক জিতবার মুহূর্তে, বিদ্রোহীরা তাদের কামান ইত্যাদি নিয়ে সূর্যাস্তের সময় শহরে ফিরে যেতে শুরু করল। বৃটিশ বাহিনী এতই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল যে, তারা বিদ্রোহীদের পশ্চাদ্ধাবন পর্যন্ত করতে পারল না। কে' লিখেছেন: "এটা আমাদের সেই রকম জয়, যে রকম জয় আরও কয়েকটা হলে আমাদের সমগ্র অবস্থানটি একটি কবরখানায় পরিণত হত, আর শত্রুরা সেখানে এসে বিনাবাধায় শিবির স্থাপন করতে পারত।"[৩]

আরও আশ্চর্যের বিষয় হল এই যে, ২৩শে জুনের পর ১২ দিন ধরে বিদ্রোহীদের, ২৭শে-র ও ৩০শে-র দুটি ছোট আক্রমণ ছাড়া, আর কোনো রকমের বড় আক্রমণ হল না। ২৩শে জুন পর্যন্ত বিদ্রোহীরা ইংরেজদের খুব ঘন ঘন আক্রমণ করে আসছিল ; এক দিনের জন্যও শত্রুকে তারা বিশ্রাম করতে দেয়নি। ২৩শে জুনের আক্রমণের ফলে বিদ্রোহীরা যে প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি করেছিল, তার সুফল সংগ্রহ করার জন্য তারা আর কোনো চেষ্টাই করল না। ইতিমধ্যে চারদিনের অবসরে ইংরেজরা তাদের আঘাত সামলে নিয়ে, নতুন শক্তি সংগ্রহ করে বিদ্রোহী-দের বেরিলি বাহিনীকে আঘাত হানবার জন্য তৈরী হল। জুন মাসের শেষে ইংরেজ শিবিরের সৈন্য সংখ্যা বর্ধিত হয়ে হল ৬,৬০০।[৪]

১। কে': পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ২য়, পৃঃ ৫৫৫।
২। ফরেষ্ট: "হিষ্ট্রি অব দি ইণ্ডিয়ান মিউটিনি", ১ম, পৃঃ ৯৪।
৩। কে': পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ২য়, পৃঃ ৫৫৩।
৪। ফরেষ্ট: "ষ্টেট পেপার্স", ১ম, পৃঃ ৪৪৮।

গুর্খা বিদ্রোহ

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ সম্বন্ধে ইংরেজরা যে সমস্ত বই লিখে গিয়েছেন, তাতে তাঁরা পঞ্চমুখে গুর্খাদের ইংরেজ-ভক্তি ও বীরত্বের প্রশংসা করেছেন। দিল্লীর যুদ্ধে দেখা গিয়েছে যে, গুর্খারা কি ভাবে নিজেদের প্রাণ দিয়ে ইংরেজকে অনিবার্য ধ্বংসের হাত থেকে বারবার রক্ষা করেছিল ও ইংরেজের চূড়ান্ত জয়কে সম্ভব করে তুলেছিল। কিন্তু এই গুর্খারাই যে ১৮৫৭ সালের অভ্যুত্থানের প্রারম্ভেই ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল, সে সম্বন্ধে বেশীর ভাগ ইংরেজ-লিখিত ইতিহাসে সঠিক ও বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া তো দূরের কথা, অনেকেই তার উল্লেখ পর্যন্ত করেননি। ১৯১১ সালে পাঞ্জাব সরকার 'পাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্ডস্' নাম দিয়ে যে কিছু দলিল পত্র ছাপিয়েছিলেন, তাতে গুর্খা বিদ্রোহের সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়।

বিদ্রোহের পূর্বে অন্যান্য বাহিনীগুলির ন্যায় গুর্খা বাহিনীতেও ইংরেজের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের অভাব ছিল না। সিমলার কয়েক মাইল উত্তরে জুটোগে যে নাসিরী গুর্খা বাহিনী ছিল, তারা চর্বিযুক্ত টোটা ব্যবহার করতে অস্বীকার করেছিল। আম্বালায় যে সিরমুর ও ৬৬ম গুর্খা বাহিনী দুটি ছিল, তারাই কিন্তু জুটোগের গুর্খাদের প্রভাবিত করেছিল। এই থেকেই বোঝা যায় যে, যে সিরমুর বাহিনী কিছুকাল পরে দিল্লীর যুদ্ধে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সব থেকে সাহসের সঙ্গে লড়েছিল, তাদের মধ্যেও ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়েছিল এবং এক সময়ে তারাই উদ্যোগী হয়ে স্বজাতীয়দের উত্তেজিত করেছিল। টোটা ব্যবহার করতে অস্বীকার করার পর জুটোগের গুর্খারা তাদের ভাইদের কাছে আম্বালায় চিঠি লিখেছিল, কিন্তু কর্তৃপক্ষ সে চিঠি ধরে ফেলেছিল এবং জুটোগ বাহিনীকে ধাপ্পা দিয়ে বলেছিল যে, আম্বালার গুর্খারা টোটা ব্যবহার করছে। জুটোগের লোকরা এতে খুব উত্তেজিত

হয়ে পড়ে এবং বলে যে, তারা আম্বালার গুর্খাদের জাতিচ্যুত করবে। জুটোগের কিছু কিছু গুর্খা ধর্মনাশের আশঙ্কায় একটা না একটা ছুতো করে চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে চলে যায়। ১৩ই মে সিমলার বেসামরিক ইংরেজরা একটা ভলান্টিয়ার বাহিনী গঠন করবে বলে সিদ্ধান্ত করে এবং সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হতে থাকে। এই ঘটনার ফলে গুর্খাদের মধ্যে উত্তেজনা আরও বেড়ে যায়।[১]

ঠিক এই সময়েই সিমলা অঞ্চলে যত বাহিনী ছিল সকলের উপরই হুকুম হল আম্বালা অভিমুখে রওনা হতে। জুটোগের গুর্খাদের নিকট যখন এই হুকুম পড়ে শোনানো হচ্ছিল, তখন তারা শিষ দিচ্ছিল ও ইংরেজ অফিসারদের প্রতি অসম্মান-জনক মন্তব্য করছিল। "বাহিনীর লোকরা অবাধ্যতাসূচক ও বিদ্রোহাত্মক ভাষা ব্যবহার করছিল এবং তাদের অনেকেই জুটোগ থেকে এক পা-ও নড়বে না বলে তাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করছিল।"[২] জুটোগ বাহিনী এই হুকুম পালনে অস্বীকার করল এবং কাউকে সেখান থেকে কোনো কামান বা গোলা বারুদও নিয়ে যেতে দিল না। "তারা ঘোষণা করল যে, কিছুতেই তারা মার্চ করবে না; তারা ঘৃণাব্যঞ্জকভাবে বারবার কমাণ্ডার-ইন-চীফের নাম করতে লাগল এবং দাবি করতে লাগল যে, তাদের হাতে তাঁকে সমর্পণ করা হোক।"[৩]

সিমলার ডেপুটি কমিশনার লর্ড উইলিয়াম হে গুর্খাদের বোঝাবার যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন। কিন্তু "তারা বলল যে, তাদের সমতলভূমিতে অর্থাৎ দিল্লীতে নিয়ে গেলে কোনো ভাল ফলই হবে না। ··· তা ছাড়া, তারা কোনো মতেই তাদের 'ভাইয়া'দের বিরুদ্ধে লড়বে না, এ বিষয়ে তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।"[৪] লর্ড হে তারপর মুণ্ডির রাজা মিঞা রতন সিংকে পাঠালেন গুর্খাদের শান্ত করবার জন্য, কিন্তু তাতে কোনো ফলই হল না। তারপর মেজর বুগ্‌ট্ গেলেন। কিছুক্ষণের জন্য শিবিরে খুব গণ্ডগোল হল। দু'জন গুর্খার সঙ্গে বুগ্‌ট্ একেবারে বিবর্ণ মুখে ফিরে এলেন। গুর্খা দু'জন হে'র নিকট চর্বি মিশ্রিত টোটা, ভেজাল আটা, বেতনের নিয়মাবলীর অসুবিধা ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক অভিযোগ করল।[৫]

পার্বত্য রাজ্যের একজন অফিসার ক্যাপ্টেন ব্রিগ্‌স্ তাঁর রিপোর্টে লিখেছিলেন: "হরিপুরে কয়েকজন পাহাড়ী আমাকে বলল যে, নাসিরী বাহিনী একটা মেইল-ব্যাগ ধ্বংস করেছে, সমতলভূমিতে নিয়ে যাবার সময় কমাণ্ডার-ইন-চীফের একটা তাঁবু জ্বালিয়ে দিয়েছে এবং অফিসারদের বাংলোগুলিতে আগুন

১। "পাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্ডস্", ৮ম খণ্ড, ১ম, পৃঃ ১৩৫-৩৬।

২। ঐ, পৃঃ ৫৮।

৩। ঐ, পৃঃ ৬০।

৪। ঐ, পৃঃ ৬৩।

৫। ঐ, পৃঃ ৬২।

লাগিয়ে দেবার চেষ্টায় ছিল। তারা সর্বত্র সব লোকদের বলে বেড়াচ্ছিল যে, বৃটিশ রাজত্ব শেষ হয়ে গিয়েছে এবং তারা যদি শুনতে পায় যে, কেউ আমাদের (বৃটিশ) সাহায্য করেছে কিম্বা আমাদের কোনো কাজ করেছে, তা হলে তাকে তারা গুলী করে মারবে।"[১]

তারপর পথে ব্রীগ্‌স্‌-এর বাহিনীর কয়েকজন নাসিরী গুর্খার সঙ্গে দেখা হল। তারা তাঁর সামনে বৃটিশ গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে খুব গালাগালি শুরু করল: "এটা হচ্ছে দোকানদারদের বদমাশ সরকার।" একজন গুর্খা ব্রীগ্‌স্‌কে হত্যা করতে চেয়েছিল, কিন্তু আর একজন তাকে থামিয়ে বলল, "একটা লোককে মেরে কি হবে; কমাণ্ডার-ইন-চীফকে সরাতে হবে; পরদিন সিমলায় তারা সমস্ত ইংরেজকে খতম করে দেবে এবং শহরে আগুন ধরিয়ে দেবে।"[২] একজন ইংরেজ অফিসারের সামনেই গুর্খাদের এই বিদ্রোহাত্মক কথাবার্তা থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায় যে, ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে তাদের কতখানি আক্রোশ পুঞ্জীভূত হয়েছিল এবং ভারতের অন্যান্য 'ভাইয়া'দের মতো তাদেরও সেই আক্রোশ ফেটে পড়বার উপক্রম হয়েছিল।

দিল্লীর হত্যাকাণ্ডের খবরে সিমলার ইংরেজ বীরপুরুষরা খুবই চঞ্চল হয়ে পড়েছিল। তার পরেই যখন তারা গুর্খাদের প্রকৃত মনোভাবের খানিকটা আভাষ পেল, তখন তারা বীরত্বের লম্ফঝম্প ভুলে গিয়ে তল্পিতল্পা ছেড়ে দিয়ে যে যেদিকে পারল ছুটতে শুরু করল। ঐতিহাসিক মার্টিনের কথায়—যেসব ইংরেজ "মাত্র দুই একদিন পূর্বে সিমলা রক্ষা করার জন্য ভলাণ্টিয়ার দলে নাম লিখিয়েছিল, তারাই সর্বাগ্রে কাপুরুষতার উদাহরণ দেখালেন এবং স্ত্রীলোক ও শিশুদের গুর্খাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে গিরি-সংকটের মধ্য দিয়ে পলায়ন করলেন। একটা সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় আতঙ্ক ইউরোপীয়দের মধ্যে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল।"[৩] এইসব বীর পুরুষরা পথে কোথায়ও থামেনি, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা কোনো নিকটবর্তী রাজার বাড়িতে পৌছতে পেরেছিল। "সৌভাগ্যের বিষয় যে, রাজারা খুবই তাঁদের দয়া দেখিয়েছিলেন।" আরও লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, এই সব ইংরেজ বীরপুরুষদের মধ্যে বড় বড় সামরিক অফিসারেরও অভাব ছিল না। লেফটেনাণ্ট জেনারেল কীথ ইয়াং নিজেই লিখেছেন যে, রাজা সংসার সেনের বাড়িতে যাঁরা আশ্রয় নিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন মেজর জেনারেল পেনী, চারজন লেফটেনাণ্ট-

---

১। "পাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্ডস্", পৃঃ ১৩২।

২। মার্টিন: "ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার", ৩য় খণ্ড, পৃ: ৭৯।

৩। "পাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্ডস্", ৮ম খণ্ড, ১ম, পৃঃ ৬৫।

কর্নেল, কীথ ইয়াং স্বয়ং, গ্রেটহেড, কুইন ও কলিয়ার এবং চারজন ক্যাপ্টেন ও তিনজন লেফটেনান্ট।[১]

দুই দিনের মধ্যেই সিমলাতে আর একটিও ইংরেজকে দেখা গেল না। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে তারা, যে যেরকম ভাবে পারল, শহর ছেড়ে পালিয়ে যেতে লাগল। "সকলেই এতটা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, বয়োজ্যেষ্ঠরা তাঁদের বিবেচনাশক্তি ও জোয়ানরা তাঁদের পৌরুষ হারিয়ে ফেললেন। ইউরোপীয়রা, যাঁদের অনেকেই উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এই সব খবরগুলির পিছনে কোন সত্য আছে কিনা তা জানবার জন্য একমুহূর্ত অপেক্ষা না করেই, একটা কল্পিত বিপদের হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্য অতি অশোভনীয়ভাবে যিনি যেদিকে পারলেন পালিয়ে গেলেন। ··· বৃদ্ধ এবং জোয়ান, সুস্থ এবং রুগ্ন, মূর্ছারোগগ্রস্ত মহিলা এবং দৃঢ়চেতা স্ত্রীলোক অর্ধ-ভূষিত অবস্থায় মহাবেগে গিরিসংকটের বন্ধুর ও খাড়া পথ দিয়ে ছুটে চলল এই আশা নিয়ে যে, কোনো গভীর ও নির্জন স্থানে ভয়ঙ্কর গুর্খাদের ছুরিকাঘাত থেকে অন্তত তারা নিস্তার পাবে। ··· সিমলা থেকে ডুগসাই যাবার রাস্তা সর্বপ্রকারের ও সর্বাবস্থার আতঙ্কগ্রস্ত পলাতকদের দ্বারা চব্বিশ ঘণ্টার উপর জনাকীর্ণ হয়ে ছিল।"[২]

স্থানীয় অধিবাসীরা এই রকম দৃশ্য কোনো দিন কল্পনাও করতে পারেনি। এই প্রকার আতঙ্ক "আমাদের সম্মানের পক্ষে খুবই হানিকর হল। ভৃত্যরা ও বাজারের নিম্নশ্রেণীর লোকেরা আমাদের তিন দিনের এই আতঙ্কে তাদের প্রভুদের প্রতি সমস্ত সম্মান হারিয়ে ফেলল ও গুর্খাদের চাইতেও বেশী বিপদ্‌জনক হয়ে পড়ল।"[৩]

এদিকে বিদ্রোহ জুটোগেই শুধু সীমাবদ্ধ রইল না; অন্যান্য নিকটবর্তী স্থানেও দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে লাগল। কাসাউলীতে ২০০ জন ইংরেজ সৈন্য ও মাত্র ৫০ জন গুর্খা ছিল, তা সত্ত্বেও গুর্খারা বিনা বাধায় ধনাগার দখল করে সমস্ত টাকা পয়সা নিয়ে জুটোগে চলে গেল।[৪] হরিপুরে তারা কমাণ্ডার-ইন-চীফের তাঁবু পুড়িয়ে দিল ও কতকগুলি জিনিসপত্র লুট করল। সিরিতে তারা দু' একজন ইংরেজ অফিসার ও স্ত্রীলোককে থামিয়ে তাদের জিনিসপত্র পরীক্ষা করেছিল।"[৫] বিদ্রোহ-মূলক চিঠি লেখার অপরাধে হিন্দুর নামক স্থানে রামপ্রসাদ নামে একজন পাহাড়ীর

১। কীথ ইয়াং: "দিল্লী: ১৮৫৭", পৃঃ ৩২৩।

২। মার্টিন: পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ৩য়, পৃঃ ৭৯।

৩। "পাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্ডস্," ৮ম খণ্ড, ১ম, পৃঃ ১৩৮।

৪। ঐ, পৃঃ ৬৬।

৫। ঐ, পৃঃ ৬৭।

ফাঁসি হয়। যখন রাস্তা-বিভাগের (P. W. D.) ইংরেজরা সিমলায় ফিরে যাচ্ছিল, তখন তাদের অনেক লাঞ্ছিত হতে হয়েছিল ও তাদের বলা হয়েছিল যে, আম্বালার উত্তরে শীঘ্রই কোনো ফিরিঙ্গী আর থাকবে না।

লর্ড উইলিয়াম হে তাঁর নিজের রিপোর্টে লিখেছিলেন: "গুর্খারা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল এবং একটা সময়ে তারা ইংরেজ অধিবাসীদের উপর আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছিল। অধিকন্তু, তারা এতই উত্তেজিত অবস্থায় ছিল যে, একটা আকস্মিক গুলী, কিম্বা একজন গুর্খা ও ইউরোপীয়ের মধ্যে সামান্য ঝগড়া, কিম্বা ইউরোপীয়রা তাদের আক্রমণ করতে যাচ্ছে—কোনো মতলববাজ নেটিভের এরূপ যে কোনো রকমের একটা গুজব প্রচার, এই রকম যে কোনো একটা ঘটনা, এক মুহূর্তে তাদের ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ডের দিকে ঠেলে দিতে পারত। ··· সমতলে যেসব বাহিনী বিদ্রোহ করেছিল তাদের মধ্যে সব থেকে যেসব খারাপ লোক ছিল, নাসিরী বাহিনীতেও সেই রকম বিদ্রোহী ভাবাপন্ন অনেক লোক ছিল। প্রথম অবস্থায় তারা যে চরমপন্থা অবলম্বন করেনি, তার কারণ আমাদের সাবধান ও দূরদর্শী ব্যবহার; আর এদের পরবর্তী ভাল ব্যবহারের কারণ, অন্যান্য গুর্খা বাহিনীগুলির বিশ্বস্ততা।"[১]

সরকারী রিপোর্টে আর এক স্থলে বলা হয়েছে: "(নাসিরী) বাহিনীর উগ্র লোকেরা চরমপন্থা অবলম্বন করতে চেয়েছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে যারা ভাল প্রকৃতির, তারাই তাদের বাধা দিয়েছিল। এইভাবেই ১৬ই তারিখের লজ্জাজনক উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনা ঘটে: বিদ্রোহী গুর্খা সিপাহীরা তাদের গুর্খা অফিসারদের ধাক্কা মারতে মারতে কোণঠাসা করে দিয়েছিল ও তাদের ভয় দেখিয়েছিল, কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ কোনো রক্তপাত হয়নি। দু' দু' বার এই সব গুর্খারা সিমলা লুট করতে শুরু করেছিল, কিন্তু দু' দু' বারই তাদের মধ্যে ঠাণ্ডা প্রকৃতির রাজভক্ত লোকেরা তাদের নিরস্ত করেছিল।"[২]

গুর্খাদের নিজেদের মধ্যে এই মতভেদই হল ইংরেজদের স্বর্ণ সুযোগ। গুর্খাদের সব দাবি তৎক্ষণাৎ কর্তৃপক্ষ মেনে নিল। জুটোগের বিদ্রোহীদের ক্ষমা করা হল ও তাদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল যে, চর্বি মিশ্রিত টোটা ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না, অথবা তাদের কোনো ধর্মবিরোধী কাজও করতে বলা হবে না। যে কয়েকজন গুর্খাকে বরখাস্ত করা হয়েছিল তাদেরও চাকুরিতে পুনর্বহাল করা হল। গুর্খা অফিসাররা ও তাদের মধ্যে যারা 'ভাল লোক' ছিল, তারা তখন সকলকে বুঝিয়ে শান্ত করে দিল এবং তার পরেই জুটোগের নাসিরী বাহিনী আম্বালা

১। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৬৯।

২। ঐ, পৃঃ ১৩৭।

অভিমুখে যাত্রা করল। এই ভাবে গুর্খা বিদ্রোহ নেতৃত্বের অভাবে বিস্তার লাভ করতে পারল না।

সিমলা অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যেও যে বিদ্রোহী মনোভাব পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল, তাও স্থানীয় রাজাদের সাহায্যে দাবিয়ে দেওয়া হল। ১০ই আগস্ট বারনেস্ লিখেছিলেন, "সিমলা অঞ্চলের পার্বত্য রাজারা তাঁদের রাজ্য ও সম্পত্তির জন্য ইংরেজদেরই ধন্যবাদ দিতে বাধ্য, কারণ ১৮১৩ সালে গুর্খাদের বিরুদ্ধে তাঁদের রক্ষা করে ইংরেজরাই তাঁদের রাজ্য ফিরিয়ে দিয়েছিল। স্বভাবতঃ ও কৃতজ্ঞতাবশতঃ আমাদের সঙ্গেই তাঁরা যুক্ত।... এই কারণে সিমলা ভালভাবেই সুরক্ষিত।"[১] এই সব রাজাদের ভলান্টিয়ার বাহিনী গঠন করতে বলা হল। যখন জলন্ধরের বিদ্রোহী সিপাহীরা শতদ্রু পার হয়ে পিঞ্জরতুনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, তখন এই সব রাজারা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ভলান্টিয়ার বাহিনী পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, যেমন ফিলুরের রাজা দিয়েছিলেন ২৫০, বাগুলের রাজা দিয়েছিলেন ১৫০, হিন্দুরের রাজা দিয়েছিলেন ১০০ ইত্যাদি।[২] পাঞ্জাবের অন্যান্যস্থানে যে নীতি অবলম্বন করা হয়েছিল, এখানেও সেই ভেদনীতিই অবলম্বন করা হল। দেখানো হল যে, হিন্দুস্থানীরাই হচ্ছে আসল শত্রু। তাদের ঘরবাড়ি খানাতল্লাসী করা হল, অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নেওয়া হল ও চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হল এবং সঙ্গে সঙ্গে বলা হল যে, ইংরেজরা পার্বত্য লোকদের বন্ধু বলেই মনে করে ও তারা ইংরেজদের সম্পূর্ণ বিশ্বাসভাজন।[৩]

গুর্খাদের ও পাহাড়ীদের বিদ্রোহী মনোভাবের হঠাৎ বিস্ফোরণের সময়, যখন ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী এত আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল, লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে এই যে, তখন এরাও ভারতের অন্যান্য স্থানের জনসাধারণের মতো জাতীয়তাবোধের নবচেতনায় অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছিল। তারা সমস্বরে বলে উঠেছিল, 'ভাইয়াদের বিরুদ্ধে আমরা লড়ব না।' সব ভারতবাসী তাদের 'ভাইয়া', সব ভারতবাসী আজ এক, সকলকেই আজ মাতৃভূমিকে মুক্ত করবার জন্য বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে লড়তে হবে,—এই চেতনা অনগ্রসর জাতির মধ্যেও জেগে উঠেছিল। এই ঘটনার বৈপ্লবিক তাৎপর্য তখনকার ইংরেজ শাসকরাও কতকটা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই একটি সরকারী রিপোর্টে গুর্খা বিদ্রোহের সম্বন্ধে বলা হয়েছিল: "এ ঘটনা থেকে এটাই বোঝা যায় যে, এই দূরবর্তী ও স্বভাবতঃ শান্তিপূর্ণ জাতির মধ্যেও অন্যান্যদের মতোই একটা পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছিল এবং অনেক

১। "পাঞ্জাব মিউটিনি রেকর্ডস্", পৃঃ ২৯৯।

২। ঐ, পৃঃ ১৩৯।

৩। ঐ, পৃঃ ৭২।

ক্ষেত্রে এটাই তাদের বিদ্রোহের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল।"[১] আম্বালার কমিশনার এই একই মত ব্যক্ত করেছিলেন, যখন তিনি তাঁর রিপোর্টে স্বীকার করেছিলেন যে, "নাসিরী বাহিনীর দুর্ব্যবহারের মতো ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে, কোনো একটা সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা, যা যে সব সৈন্যের নিকট পৌঁছবার সব থেকে কম সম্ভাবনা ছিল, এমন কি সেই গুর্খারাও আক্রান্ত হয়েছিল।" এর থেকে বারনেসের মনে হয়েছিল যে, এটা সাদাদের বিরুদ্ধে কালাদের একটা চক্রান্ত![২] গুর্খা ও পাহাড়ীদের মধ্যে এই জাতীয় নবজাগরণ, যা বৈপ্লবিক সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ ছিল, বিকাশ লাভ করবার সুযোগ না পাওয়ার প্রধান কারণ ছিল নেতৃত্বের অভাব।

১। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ .৩৭।

২। ঐ, ৮ম খণ্ড, ২য়, পৃঃ ৩৬৮।

অযোধ্যায় বিদ্রোহ—রেসিডেন্সী অবরোধ

বক্সার যুদ্ধের পর ১৭৬৪ সালে মোগল সম্রাট ও অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার সঙ্গে ইংরেজের যে সন্ধি হয়, তাতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সম্রাটের নিকট থেকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করে এবং অযোধ্যার নবাব বৃটিশ ছাড়া অন্য কোনো শক্তির সঙ্গে (অর্থাৎ মারাঠাদের সঙ্গে) মিত্রতা স্থাপন করবেন না বলে চুক্তিবদ্ধ হন। এই সন্ধির সুযোগ নিয়ে ইংরেজরা অযোধ্যার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ক্রমশঃ তাদের প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করল। সুজাউদ্দৌলার মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আসফউদ্দৌলা ১৭৭৫ সালে আর একটি সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে তাঁর রাজ্যে ইংরেজ সৈন্যদের অবস্থানের জন্য খরচের পরিমাণ অনেক বাড়িয়ে দিতে বাধ্য হলেন। ঐ বৎসরেই বেগমদের কাছ থেকে (আসফ-উদ্দৌলার মাতা ও মাতামহী) ৫৫ লক্ষ টাকা জোর করে আদায় করা হল। সেই ফয়জাবাদে যেখানে বেগমরা থাকতেন, বৃটিশ সৈন্য পাঠানো হল এবং বছরের পর বছর তাঁদের উপর লুণ্ঠন ও অত্যাচার চলার পর তাঁদের যা কিছু অবশিষ্ট সম্পত্তি তাও ১৭৮২ সালের ডিসেম্বরে ইংরেজের হাতে সমর্পণ করতে হল।

১৭৯৭ সালে আসফউদ্দৌলার মৃত্যুর পর ওয়াজির আলির পরিবর্তে, তাদের একজন হাতের পুতুল সাদত আলিকে ইংরেজরা অযোধ্যার সিংহাসনে বসাল। পরের বছর একটা নতুন সন্ধি নবাবের ঘাড়ে চাপিয়ে এলাহাবাদের দুর্গ, যেটাকে সকলে 'উত্তর-পশ্চিমের চাবি-কাঠি' বলত, দখল করল এবং প্রতি বৎসর অযোধ্যায় অবস্থিত কোম্পানির সৈন্যদের খরচ বাবদ ৭৬ লক্ষ টাকা করে নবাবের নিকট থেকে আদায় করতে লাগল। এই সন্ধিচুক্তির ফলে নবাব তাঁর অবশিষ্ট স্বাধীনতাটুকুও হারিয়ে ফেললেন ও প্রকৃতপক্ষে অযোধ্যা ইংরেজের শাসনেরই অন্তর্ভুক্ত হল। যদিও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে নবাব বঞ্চিত হলেন, রাষ্ট্রের যা কিছু গলদ, যা কিছু দোষ,

অযোধ্যার যুদ্ধ
(১৮৫৮-৫৯)
লর্ড ক্লাইভের অভিযান পথ
অন্যান্য প্রধান অভিযান পথ
প্রধান যুদ্ধক্ষেত্র ----×০
মাইল ৩০
আলিগঞ্জ
নানপারা
বরাদিয়া
সাজাহানপুর
মিটভৌলী
বারাইক
কুণ্ডকোট
তুলসীপুর
হার
ফরক্কাবাদ
ফতেহগড়
রুইয়া
বিরভা
দুমেরিয়া
বৈরামঘাট
সেক্রোরা
সুন্দিলী
মিরন কি সরাই
লক্ষ্ণৌ
নবাবগঞ্জ
বরবাঙ্কি
দরিয়াবাদ
ঘর্ঘরা নং
বস্তি
বুনী
ফয়জাবাদ
জগদীশপুর
কানপুর
বুখরাওন
বেরা
রায় বেরেলী
বুন্দিয়াখেরা
সুলতানপুর
আমেথী
আজিমগড়
শঙ্করপুর
রামপুর-কুশীয়া
প্রতাপগড়
জয়ানপুর
গোমতী নং
যমুনা নং
গঙ্গা নং
সারাওন
এলাহাবাদ

তার জন্য কিন্তু এই নামমাত্র নবাবই দায়ী রইলেন। দেশের শাসনযন্ত্র ইংরেজের কতকগুলি দালালের হাতে চলে গেল ; সর্বত্র অবাধ লুণ্ঠন ও অত্যাচারের ফলে সমস্ত দেশময় একটা অরাজকতার সৃষ্টি হল।

ইংরেজের এই দুর্নীতিপরায়ণ প্রভুত্ব অনেকেই মেনে নিতে রাজী হলেন না। ওয়াজির আলির নেতৃত্বে তাঁরা বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন ও কয়েকজন ইংরেজ নিহত হল। কিন্তু বিদ্রোহ বেশীদূর অগ্রসর হল না এবং ওয়াজির আলি তাঁর সমস্ত জীবন বন্দী অবস্থায় ফোর্ট উইলিয়ামে কাটালেন। বিদ্রোহ দমিত হবার পর গভর্নর জেনারেল ওয়েলেস্‌লী নবাবকে আর একটা নতুন সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করে সমগ্র গঙ্গা-যমুনা দোয়াব অর্থাৎ অযোধ্যার প্রায় অর্ধেক রাজ্য সরাসরি দখল করে বসলেন।

যখন ওয়াজেদ আলি ১৮৪৭ সালে অযোধ্যার সিংহাসনে আরোহণ করলেন, তখন রাজভাণ্ডারে মাত্র এক কোটি বিশ লক্ষ টাকা অবশিষ্ট ছিল। ইংরেজের ক্ষুধা মেটাবার জন্য ৫ বৎসরের মধ্যে তা কমতে কমতে মাত্র সাড়ে সাত লক্ষ টাকায় এসে দাঁড়াল ! কয়েক বছরের মধ্যেই অযোধ্যার পরিণতি কি হবে তা ডালহাউসি ভালভাবেই জানতেন। অযোধ্যার নবাবরা সন্ধির সমস্ত চুক্তিগুলিই বিশ্বস্তভাবে পালন করে আসছিলেন। তাই এই নিরীহ, আশ্রিত ও রক্ষিত রাজ্যটিকে গ্রাস করার জন্য একটা সামান্য অজুহাতও খুঁজে পাওয়া কঠিন হচ্ছিল।

কিন্তু নেকড়ের যখন ছাগলকে ভক্ষণ করবার প্রয়োজন হয়, তখন ছাগলের জল ঘোলা করতে বেশীক্ষণ লাগে না। তাই অযোধ্যার বৃটিশ রেসিডেন্ট স্লীম্যান, লাট সাহেবের নিকট চিঠির পর চিঠি লিখতে লাগলেন যে, নবাব হচ্ছেন একটি দুশ্চরিত্র, লম্পট ব্যক্তি ; তিনি সর্বক্ষণ নর্তকী ও কতকগুলি নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকের দ্বারাই পরিবেষ্টিত হয়ে থাকেন ; "রাজকার্যের জন্য তাঁকে এক মুহূর্তের জন্য পাওয়াও যায় না এবং তিনি এ সম্বন্ধে কিছু বোঝেনও না, বা কেয়ারও করেন না।" আর সব থেকে বড় অভিযোগ হল যে, "তিনি তাঁর প্রজাদের দুঃখ-দুর্দশা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন !"

১৮৫৪ সালে মেজর জেনারেল আউটরাম, স্লীম্যানের স্থানে রেসিডেন্ট পদে নিযুক্ত বলেন। আউটরামও ঐ একই স্বর গাইতে লাগলেন—নবাব রাজকার্যে একেবারেই মন দেন না, রাজ্য অরাজকতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, প্রজারা আর্তনাদ করছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। লণ্ডনে কোর্ট অব ডাইরেক্টারস্‌ এই রকম চিঠির পর চিঠি পেতে লাগলেন। তারপর ছাগলকে ভক্ষণ করার দিন স্থির করতে বেশী সময় লাগল না, অবশ্য ছাগলেরই ভালোর জন্য ! অযোধ্যার ৫০ লক্ষ লোকের

প্রতি 'মানবতার জন্য,' তাদের 'নেটিভ অত্যাচারের' হাত থেকে বাঁচাবার জন্য, ও 'কৃষকদের অসাধারণ দুর্দশা থেকে রক্ষা করার জন্যে' অযোধ্যা বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করাই স্থির হল।

ওয়াজেদ আলির বিরুদ্ধে এই সব অভিযোগ সম্বন্ধে বোর্ড অব ডাইরেক্টার্সের একজন সভ্য জোন্‌স্ লিখেছিলেন: "এই দেশের রীতিনীতি অনুসারে নৃত্য ও গীত খুব আপত্তিজনক ব্যবসা নয়। নবাবের সমস্ত ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে; বৃটিশ রেসিডেন্টরা নবাবের মন্ত্রী নিয়োগ করা, তাঁর প্রজাদের মধ্যে কিভাবে বিচার হবে সে সব নিয়ন্ত্রণ করা, এই ধরনের সব ক্ষমতাই নিজেদের হাতে নিয়ে নিয়েছেন এবং যখন তিনি তাঁর সৈন্যবাহিনীর সংস্কার করতে চেয়েছিলেন তখন তার অনুমতি তাঁকে দেওয়া হয়নি। ··· তা হলে, আমাদের এই সমস্ত উদ্ধত হস্তক্ষেপের দরুন তাঁর বিরক্তি থেকে মুক্তি পাবার জন্য কি প্রকার কাজের অধিকার আমরা তাঁকে দিতে প্রস্তুত?" নবাবের নৈতিক চরিত্রের বিষয়ে জোন্‌স্ বলেছিলেন যে, খুব ভালভাবেই খোঁজ নিয়ে তিনি জানতে পেরেছিলেন—নবাবের চাইতে বেশী চরিত্রবান লোক খুব কমই আছে। তারপর অযোধ্যার তখনকার অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে জোন্‌স্ নিজে অনেক সন্ধান নিয়ে এই মত দিয়েছিলেন যে, "জীবিকার্জনের জন্য শ্রমিকদের অন্য প্রদেশে চলে যেতে হত না। সব শহরগুলিই সমৃদ্ধিশালী ছিল, প্রাসাদ নির্মিত হত, শিল্পকে উৎসাহ দেওয়া হত, রাস্তাঘাটও তৈরী হত; সোরা, নীল ও শস্যদ্রব্যের রপ্তানি একেবারেই কমে যায়নি এবং জনসাধারণের মনোভাব এতটুকু দমে যায়নি,···অপরাধের সংখ্যাও খুব কম।"[১]

৪ঠা ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬, সকাল বেলায় "বৃটিশ রেসিডেন্ট মেজর জেনারেল আউটরাম প্রাসাদে গিয়ে নবাবকে কয়েকটি কথা ব্যাখ্যা করে, তাঁর হাতে একটা সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করতে দিলেন। এই সন্ধির দ্বারা তিনি তাঁর রাজ্যের শাসনভার সম্পূর্ণরূপে কোম্পানির হাতে তুলে দেবেন। তার পরিবর্তে তাঁর জন্য মোটা রকমের একটা আয়ের ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে এবং তিনি কতকগুলি বিশেষ সুবিধা ও সম্মানের অধিকারী হবেন। এই দলিলটি খুব মন দিয়ে পড়ার পর নবাব দুঃখে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়লেন এবং যখন কোনো যুক্তির দ্বারাই সন্ধিপত্রে তাঁকে স্বাক্ষর করতে রাজী করানো গেল না, তখন রেসিডেন্ট ঘোষণা করলেন যে, তাঁকে বাধ্য হয়ে নবাবকে জানাতে হচ্ছে যে, তিনি তিন দিন পর অযোধ্যার শাসনভার হাতে নেবেন।"[২]

১। বল্: "হিস্ট্রি অব দি ইণ্ডিয়ান মিউটিনি", ১ম, পৃঃ ১৫১।

২। ঐ, ১ম, পৃঃ ১৪৬।

৮ই ফেব্রুয়ারিতে এক ঘোষণাপত্রে সকলকে জানানো হল যে, ঐদিন থেকে অযোধ্যার লোকেরা বৃটিশ সরকারের প্রজা হল! এই কাজের সমর্থনে ডালহাউসির ঘোষণা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বললেন, "অযোধ্যার যে শাসনযন্ত্র লক্ষ লক্ষ লোককে দুঃখদৈন্যের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে, তাকে যদি আর এক মুহূর্তও সহ্য করা হয়, তা হলে বৃটিশ সরকার ভগবান ও মানুষের সামনে দোষী বলে গণ্য হবে।"

নবাবকে বাৎসরিক ১২ লক্ষ টাকা বৃত্তি দিয়ে কলকাতায় নির্বাসিত করা হল। তাঁকে এটাও জানিয়ে দেওয়া হল যে, যদি তিনি সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করতেন, তা হলে তাঁকে বৎসরে ১৫ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হত! যাই হোক, এইভাবে সমস্ত পবিত্র সন্ধি-চুক্তিগুলি উপেক্ষা করে একটি রক্ষিত মিত্র রাজ্যকে গ্রাস করবার পর ইংরেজ শাসকরা গর্ব করে বলতে লাগল, "এখন জনসাধারণের বেশীর ভাগই তাদের কার্যের সমর্থন করে, সুতরাং নতুন সরকার খুবই নিরাপদ।"[১] জনসাধারণের ইংরেজের প্রতি কতখানি দরদ ছিল তা অবশ্য তারা এক বৎসর যেতে না যেতেই জানিয়ে দিয়েছিল!

অযোধ্যা অধিকারের সঙ্গে সঙ্গেই তালুকদার ও কৃষকদের বিরুদ্ধে ইংরেজ সরকার তাদের সেটেলমেণ্ট অফিসারদের লেলিয়ে দিল। তাদের উপর চলতে লাগল বার্ড ও টোমাসনের স্টিম-রোলার। কর্নেল স্লীম্যান লিখিত 'ডায়েরি অব এ টুর ইন আউদ' ছাপা হয়ে গুপ্তভাবে ইংরেজ কর্মচারীদের মধ্যে প্রচারিত হল। এই বইতে তালুকদারদের একদল দস্যু, দখলকারী ও হত্যাকারী বলে অভিহিত করা হয়েছিল এবং তাদের পিষে সমান করে দেওয়ার নীতি সুপারিশ করা হয়েছিল। তালুকদারদের অগ্রাহ্য করে সেটেলমেণ্ট অফিসাররা সরাসরি কৃষকদের সঙ্গে নতুন করে জমি ও খাজনার বন্দোবস্ত করল। তালুকদারদের জঙ্গল দিয়ে ঘেরা যেসব দুর্গ ছিল তার অনেকগুলিই ইংরেজরা ধ্বংস করে দিল, জঙ্গল পরিষ্কার করে ফেলা হল; আর তাদের যেসব সৈন্যসামন্ত ছিল তাদেরও অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নিয়ে বিদায় করে দেওয়া হল। এদের কিছু কিছু লোক কৃষিকার্যে নিযুক্ত হল, কিন্তু বেশির ভাগই বেকার অবস্থায় ঘুরে বেড়াতে লাগল। নবাবের বাহিনীতে যে ৬০,০০০ সৈন্য ছিল তাদেরও এই একই দুরবস্থা হল।

তালুকদারী উঠে যাওয়ার ফলে কৃষকরা কিন্তু মোটেই লাভবান হল না। বর্ধিত খাজনা ও ট্যাক্সের বোঝা তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হল। আবশ্যকীয় জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাওয়ায় সাধারণ মানুষের দুর্দশাও বেড়ে গেল। একজন

১। কে' : "হিষ্ট্রি অব দি সিপয় ওয়ার ইন ইণ্ডিয়া", ৩য়, পৃঃ ৪১৮।

ইংরেজ অফিসার লিখেছিলেন, "আমরা মানুষকে সুখী করার চাইতে আমাদের রাজভাণ্ডার পূর্ণ করার দিকেই বেশী জোর দিয়েছিলাম। স্ট্যাম্পের উপর ট্যাক্স, দরখাস্তের উপর ট্যাক্স, খাদ্যদ্রব্যের উপর, বাড়ির উপর, খেয়া পার হবার উপর—সব কিছু উপর ট্যাক্স। তারপর সব কিছুই কনট্রাক্টরকে দেওয়া হত; আফিংএর কনট্রাক্ট, খাদ্যশস্যের কনট্রাক্ট, লবণের কনট্রাক্ট—যা প্যারিসে অক্ট্রোয়া নামে কুখ্যাতি অর্জন করেছিল।"[১]

এ ছাড়া ইংরেজ সরকার যেসব নতুন আইন-আদালত স্থাপন করল, তার ফলেও লোকের দুর্গতির সীমা রইল না। কে' এই সম্বন্ধে বলেছিলেন, "আমাদের রাজস্ব আইনের ফলে কৃষকরা যেমন উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল, আমাদের নতুন আইন-কানুনগুলিও এত বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ দীর্ঘস্থায়ী ও ব্যয়সাধ্য হয়ে পড়ল যে, তাতেও জনসাধারণ কম হয়রানি ভোগ করল না। তা ছাড়া আমাদের সরকার সব কিছুরই এত বিনাশক হয়ে উঠল যে, জনসাধারণের কাছে তা খুবই অপ্রিয় হয়ে পড়ল।"[২] এক কথায় ইংরেজ শাসনে কোনো শ্রেণীর লোকই সন্তুষ্ট হতে পারেনি। উচ্চতম সম্রান্ত ব্যক্তি থেকে শুরু করে নিম্নতম কৃষক পর্যন্ত সকলেই বিক্ষুব্ধ হয়ে রইল।

১৮৫৭ সালে মার্চ মাসে হেনরী লরেন্স চীফ কমিশনার হয়ে অযোধ্যায় এসে বুঝতে পারলেন যে, এই বারুদখানায় যে কোনো মুহূর্তে বিস্ফোরণ হতে পারে। তিনি তালুকদারদের ও সিপাহীদের কিছু সুযোগ সুবিধা দিয়ে, কিছু মিষ্টি কথা বলে শান্ত করবার চেষ্টা করলেন। আর সারা এপ্রিল মাস ধরে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদের নিয়ে পৃথক পৃথক ভাবে দরবার করলেন। মুসলমানদের বললেন যে, ইংরেজরা শিখদের অত্যাচার থেকে মুসলমানদের মুক্ত করেছে এবং শিখদেশের অভ্যন্তরে, মাঞ্ঝা প্রদেশেও আজ মুসলমানরা স্বাধীনভাবে নমাজ পড়তে পারছে। হিন্দুদের লরেন্স জিজ্ঞাসা করলেন, মুসলমান রাজত্বে তাঁরা যে অবস্থায় ছিলেন, আজ কি তার থেকে তাঁরা ভাল অবস্থায় নেই? স্বৈরাচারী নবাবের অধীনে ফিরে গেলে তাঁদের কি ভাল হবে? আর শিখদের বললেন, শিখ ও মুসলমানদের প্রতিশোধ নেবার সম্ভাবনাটা যেন তারা ভুলে না যায়! রাজা ও তালুকদারদের বললেন যে, দেশে যদি অরাজকতার সৃষ্টি হয়, যদি কৃষকরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, তা হলে তাঁরাই সব থেকে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবেন, তাঁরাই তাঁদের সম্পত্তি ও প্রতিপত্তি থেকে বঞ্চিত হবেন। কিন্তু ইতিমধ্যে ব্যাপার এতদূর গড়িয়েছিল যে, সাম্রাজ্যবাদীদের চিরাচরিত ভেদনীতির কৌশল প্রয়োগ করেও শেষরক্ষা হল না। চারদিকে

১। রীজ: "পারসোনাল ন্যারেটিভ অব দি সীজ অব লক্ষ্ণৌ," পৃঃ ৩৪।

২। কে': পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ৩য়, পৃঃ ৪২৬।

অসন্তোষ নানাভাবে প্রকাশ পেতে লাগল। গুরুত্বটা লরেন্স নিজেও ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারলেন, যেদিন ১৮ই এপ্রিল রাস্তা দিয়ে গাড়ি করে যাবার সময় একটা ঢিল এসে তাঁর মাথায় পড়ল।

২রা মে তারিখে ৭ম বাহিনীকে টোটা ব্যবহার করতে হুকুম করা হলে তারা আদেশ অমান্য করে। দু' এক দিন পর এই বাহিনীকে বরখাস্ত করে দেওয়া হয়। মিরাট ও দিল্লীর বিদ্রোহের খবর লক্ষ্ণৌতে এসে পৌঁছল ১৫ই মে। বিপদ ঘনীভূত হয়ে আসছে দেখে হেনরী লরেন্স রেসিডেন্সীকে কেন্দ্র করে ৬০ একর জায়গা নিয়ে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। চারদিকে পরিখা খনন করে, দেওয়ালগুলিকে মেরামত ও মজবুত করে, দরজা ও জানালার নিকট ব্যারিকেড তৈরি করে, চারদিকে কামানের ব্যাটারি প্রস্তুত করে ও সৈন্য সমাবেশ করে, খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করে শত্রুর আক্রমণকে প্রতিরোধ করবার জন্য সব রকম ব্যবস্থাই অবলম্বন করলেন। দিন দিন রেসিডেন্সী শক্তিশালী হয়ে উঠতে লাগল। অধিকন্তু বিদ্রোহের কোনো চিহ্নমাত্র না দেখতে পেয়ে, লরেন্স ক্যানিংকে ২৩শে জুন গর্ব করে লিখলেন, "আমার সন্দেহ হচ্ছে যে, আমরা একেবারেই আক্রান্ত হব কিনা। আমাদের প্রস্তুতির ফলে শত্রুরা খুবই শঙ্কিত হয়ে উঠেছে।"[১] আবার ২৭শে জুনেও তিনি জেনারেল হ্যাভলক ও হুইলারকে একই মর্মে তাঁর বিশ্বাস ও আশার কথা জানালেন।

তিন দিন যেতে না যেতেই ৩০শে জুন রাত ৯টায় লক্ষ্ণৌতে অবস্থিত সিপাহীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করল। কিন্তু ইংরেজের কামানের বিরুদ্ধে লড়াই করে বিদ্রোহীরা শহরে প্রবেশ করতে পারল না। বিদ্রোহীদের ধ্বংস করবার জন্য পরদিন লরেন্স তাদের সদলবলে আক্রমণ করলেন। লক্ষ্ণৌ থেকে ৮ মাইল দূরে চিনহাটে যুদ্ধ হল। একজন ইংরেজ ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, দু' পক্ষে যখন ঘোরতর কামান যুদ্ধ চলেছে তখন "দেখা গেল যে, শত্রু-বাহিনীর মধ্যভাগ পিছনে হটে যাচ্ছে—মনে হল যেন আমাদেরই জয় হচ্ছে। ··· কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল ঝড়ের পূর্বেকার স্তব্ধতা। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রকাণ্ড মাঠটা যেন কেঁপে উঠল এবং আমাদের উপর দিয়ে লৌহের ঝড় বয়ে যেতে লাগল ও ঘাসের গোড়াগুলি থেকে, প্রত্যেক গর্ত থেকে ধোঁয়া বের হয়ে আমাদের দু' পাশ ছেয়ে ফেলে দিল। আমাদের কামানগুলি থেকেও অবিশ্রাম ধারায় গোলা বর্ষণ হতে থাকল। কিন্তু বন্যার স্রোত ক্রমশঃ এগিয়েই আসতে লাগল এবং শীঘ্রই শিখদের ভাসিয়ে নিয়ে গেল। ··· অযোধ্যার গোলন্দাজরা ও গাড়ি-চালকরা বিশ্বাসঘাতকতা করল। ···

১। ফরেষ্ট: "হিষ্ট্রি", ১ম, পৃঃ ৩৪৫।

॥ রেসিডেন্সী ভবন (লক্ষ্ণৌ) ॥
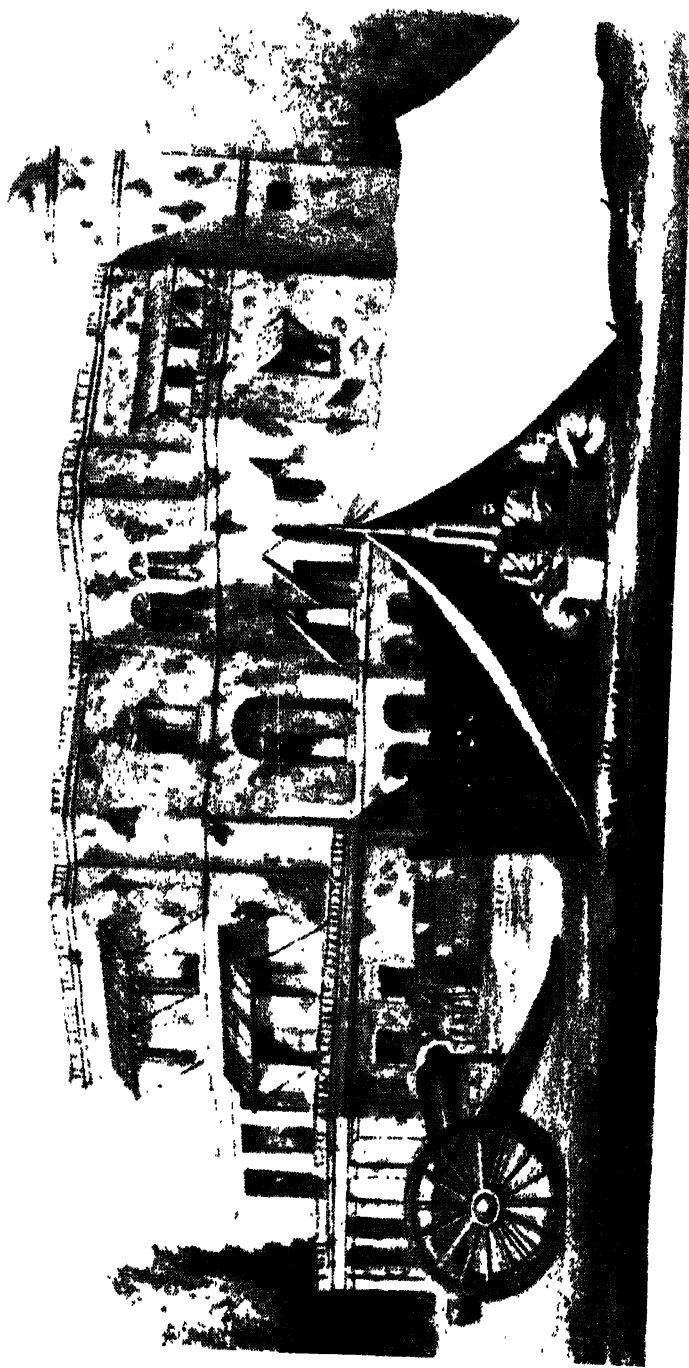
অশ্বারোহীদের আক্রমণ করতে বলা হল ··· কিন্তু শিখরা তাদের ঘোড়ার মুখ অন্য দিকে ঘুরিয়ে পালিয়ে গেল।" ইংরেজরা বারবার বিদ্রোহীদের হটাতে চেষ্টা করল, কিন্তু বারবার তারা ব্যর্থ হল। বিদ্রোহীরা এগোতেই থাকল এবং ইংরেজদের প্রায় ঘিরে ফেলবার উপক্রম করল। লরেন্স তখন বাধ্য হয়ে তাঁর সৈন্যদের পশ্চাৎ হটতে আদেশ দিলেন। তাদের এই পশ্চাদ্‌গমন পলায়নে পরিণত হল—"সর্বপ্রকার শৃঙ্খলাই নষ্ট হয়ে গেল।"[১]

বিদ্রোহীরা পলায়নপর ইংরেজদের পশ্চাদ্ধাবন করতে লাগল। ইংরেজরা শহরে ফিরে লৌহ-সেতু দিয়ে রেসিডেন্সীতে প্রবেশ করল। লৌহ-সেতু ও পাথর-সেতু দু' জায়গাতেই বিদ্রোহীরা বাধা পেল। "তারপর এই দুটি সেতুর কিছু দূরে তারা গোমতী পার হয়ে সাহসের সঙ্গে এগিয়ে গেল ও চারদিককার বাড়ি-গুলি দখল করে সেখান থেকে আমাদের পরিখার মধ্যে বন্দুক চালাতে লাগল। তখন থেকেই শুরু হল লক্ষ্ণৌ রেসিডেন্সীর বিখ্যাত অবরোধ।"[২]

এইভাবে ১লা জুলাইতে রেসিডেন্সী অবরোধ শুরু হল। রেসিডেন্সীতে ১,৭২০ জন সৈন্যের মধ্যে ১,০০৮ জন ছিল ইংরেজ আর ৭১২ জন ভারতীয়। আর ছিল বেসামরিক ১,২৮০ জন—তার মধ্যে ৬০০ জন ইংরেজ স্ত্রীলোক ও শিশু, আর বাদবাকি ৬৮০ জনের প্রায় সকলেই দাসদাসী। ৮৭ দিন যুদ্ধের পর ২৫শে সেপ্টেম্বর রেসিডেন্সীর অবরুদ্ধদের ইংরেজরা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিল। ১,০০৮ জন ইংরেজ সৈন্যের মধ্যে ২৫শে সেপ্টেম্বর মাত্র ৫৭৭ জনকে জীবিত পাওয়া গিয়েছিল এবং তাদেরও বেশীর ভাগ জখম কিম্বা অসুস্থ ছিল। মৃতদের মধ্যে ছিলেন হেনরী লরেন্স, জুডিসিয়াল কমিশনার ওমানি ও মেজর ব্যাঙ্কস্, চীফ ইঞ্জিনিয়ার এণ্ডারসন ইত্যাদি। ৯ জন ইংরেজ গোলন্দাজ-অফিসারের মধ্যে মাত্র ৪ জন বেঁচে ছিলেন। ৯ জন স্ত্রীলোক ও ৫৩ জন শিশু মারা গিয়েছিল। ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে নিহত হয়েছিল ১৩০ জন, আর পলায়ন করেছিল ২৩০ জন। অর্থাৎ অতি বিপজ্জনক ব্যাপার হওয়া সত্ত্বেও, প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ভারতীয় সৈন্য রেসিডেন্সী ত্যাগ করেছিল।[৩] এই পলাতকদের মধ্যে শিখদের সংখ্যাও কম ছিল না।[৪]

লক্ষ্ণৌর অবরুদ্ধদের উদ্ধার করবার জন্য জেনারেল হ্যাভলক ২০শে জুলাইতে কানপুর থেকে যাত্রা করলেন। ২৯শে জুলাই উনাও শহর থেকে ৮ মাইল দূরে

১। ফরেষ্ট ঃ পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২৩৩। (চিনহাটের যুদ্ধে ইংরেজ বাহিনীর ১১৮ জন ইংরেজ অফিসার ও সৈন্যের প্রাণ গিয়েছিল, আর ৫৪ জন জখম হয়েছিল। তাদের ভারতীয় সৈন্যের মৃতের সংখ্যা হয়েছিল ১৮২)। ২। ঐ, পৃঃ ২৩৬। ৩। ঐ, পৃঃ ২৩৭। ৪। ঐ, পৃঃ ৩৩৩।

বসিরতগঞ্জে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুদ্ধ হল। ফরেস্ট এই যুদ্ধ সম্বন্ধে বলেছেন: "যখন আমাদের লোকরা গ্রামটার দিকে অগ্রসর হল, তখন বাড়িগুলির দেওয়ালের ছিদ্রগুলি থেকে ভয়ানকভাবে গুলী বর্ষণ হতে লাগল। ··· আমরা গ্রামটাতে আগুন ধরিয়ে দিলাম, তারপরেও তারা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগল। ··· অযোধ্যার গোলন্দাজরা, যারা সৈনিক হিসেবে খুব ভাল শিক্ষা পেয়েছিল, কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে একগুঁয়ের মতো যুদ্ধ করে চলল এবং তাদের কামানের পাশে দাঁড়িয়ে ধ্বংস হল।"[১] হ্যাভলকেরও এত ক্ষতি হল যে, তাঁকে পিছু হটে গিয়ে মঙ্গলভারে অপেক্ষা করতে হল, যখন নতুন সৈন্যদল এসে পৌঁছল তখন আবার তিনি লক্ষ্ণৌর দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টা করলেন। পুনরায় ৫ই আগস্টে বসিরতগঞ্জের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যুদ্ধ হল। বিদ্রোহীদের প্রতিরোধ এতই তীব্র হল যে, হ্যাভলককে আবার মঙ্গলভারে ফিরে যেতে হল। ইংরেজরা ফিরে যাবার সময় বিদ্রোহীরা ১২ই আগস্ট বুড়িয়াকা-চৌকীতে আবার তাদের আক্রমণ করল। ইতিমধ্যে হ্যাভলক খবর পেলেন যে, কানপুরের অবস্থা আবার সংকটজনক হয়ে উঠেছে—৫,০০০ বিদ্রোহী কানপুর ও বিঠুরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। হ্যাভলককে বাধ্য হয়ে কানপুর ফিরতে হল। এইভাবে অবরুদ্ধ লক্ষ্ণৌর প্রথম উদ্ধারের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল। অবরুদ্ধ ইংরেজদের নায়ক ব্রিগেডিয়ার জন ইংলিশের স্ত্রী তাঁর ডায়েরিতে লিখেছিলেন: "শিখরাও যে বিক্ষুব্ধ তা সন্দেহ করা হয়েছিল। জন প্রয়োজনীয় সাবধানতার ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন। জন তাদের এমন জায়গায় কাজ দিলেন যে, তারা ৩২শ বাহিনীর (ইংরেজ) আয়ত্তের অধীনে থাকল এবং নিজেদের জীবনকে বিপদ্‌গ্রস্ত না করে আর তাদের পালাবার পথ থাকল না; তা সত্ত্বেও, আমাদের ঘরের মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতার কথাটা চিন্তা করতেও কি রকম ভয়ঙ্কর লাগে।"[২]

হ্যাভলক কানপুর ত্যাগ করে আবার ১৮ই সেপ্টেম্বর লক্ষ্ণৌর দিকে যাত্রা করলেন। ২১শে তারিখে যদিও একমাত্র মঙ্গলভার ছাড়া বিদ্রোহীদের সঙ্গে আর কোথায়ও সম্মুখ-যুদ্ধ হয়নি, তবুও তাদের গেরিলা যুদ্ধের ফলে ইংরেজদের অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়েছিল। রেসিডেন্সীর আত্মরক্ষার ক্ষমতা যে তখন শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছিল, তা সহজেই অনুমেয়; খাদ্যদ্রব্যের আর বিশেষ অবশিষ্ট ছিল না; সৈন্যসংখ্যাও অর্ধেকের বেশী কমে গিয়েছিল। এই অবস্থায় আর এক সপ্তাহও বোধ হয় তাদের টিকে থাকা সম্ভব হত না। রেসিডেন্সীর একজন ইংরেজ

১। ফরেষ্ট: "হিস্‌ট্রি···, ১ম, পৃঃ ৪৮৩-৮৫।

২। ইঞ্জ: "সীজ অব লক্ষ্ণৌ," পৃঃ ৬৩।

অফিসার লিখেছিলেন, "যদি তাঁরা (হ্যাভলক ও আউটরাম) শেষ মুহূর্তে এসে না পৌঁছতেন, তা হলে আমাদের নেটিভ সিপাহীরা, যারা এ পর্যন্ত খুবই মহত্ত্ব দেখিয়েছে এবং প্রশংসনীয় বিশ্বস্ততা দেখিয়েছে, নিশ্চয়ই আমাদের ত্যাগ করে চলে যেত। যদি তারা তা করত, তা হলে তাদের কোনো দোষও দেওয়া যেত না, কারণ জীবন হচ্ছে মধুর ; আর তা ছাড়া, আশা-ভরসা আমাদের একেবারেই ছিল না।"[১] কিন্তু নেটিভদের রাজভক্তি যে সব ইংরেজরাই সমানভাবে তারিফ করত তা নয়। হ্যাভলকের বীর সৈন্যরা প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, একটা বিদ্রোহীকেও তারা জীবিত রাখবে না এবং তারা কালা আদমী মাত্রকেই বিদ্রোহী বলে গণ্য করতে শিখেছিল। ২৬শে তারিখে রেসিডেন্সীতে ঢুকে প্রথমেই তারা তাদের বীরত্ব দেখাল কয়েকজন রাজভক্ত সিপাহীকে খুন করে।[২] ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের ইতিহাসে রাজভক্তির এরূপ বিয়োগান্ত উদাহরণ অনেক পাওয়া যায়।

কানপুর ত্যাগ করার পর আলমবাগ পর্যন্ত ৬ দিনের যুদ্ধের ফলে হ্যাভলকের বাহিনীর ২০৭ জন নিহত হয়েছিল, আর আলমবাগ থেকে রেসিডেন্সীতে পৌঁছতে ৩১ জন অফিসার ও ৫০৪ জন সৈন্য হতাহত হয়েছিল।[৩] নিহতদের মধ্যে ছিলেন ইংরেজদের একজন সর্বশ্রেষ্ঠ 'হিরো', জেনারেল নীল।

কিন্তু এত বড় বিজয়ের পরও রেসিডেন্সীর অধিবাসীরা খুব উৎফুল্ল হতে পারল না। রেসিডেন্সীর একজন ইংরেজ মহিলা ২৭শে সেপ্টেম্বর লিখেছিলেনঃ "এই দিনটা সকলের পক্ষেই খুব বেদনাদায়ক হয়েছিল ; সকলেই খুব ভগ্নোদ্যম এবং সকলেই বুঝতে পারল যে আমরা উদ্ধার পাইনি। আমাদের বিপদের তুলনায় আমাদের সৈন্যের সংখ্যা খুবই কম এবং মজুত খাদ্যের তুলনায় তারা খুবই বেশী।"[৪] এর উপর আবার খবর এল যে, শহরে ১ লক্ষ সশস্ত্র লোক জমায়েত হয়েছে এবং নানা সাহেবও উপস্থিত আছেন। সাংগঠনিক কাজে কিম্বা যুদ্ধক্ষেত্রে নানা সাহেব কোনো কৃতিত্ব না দেখালেও তাঁর নাম শুনলেই আবালবৃদ্ধবনিতা সকল ইংরেজই আতঙ্কিত হয়ে উঠত। এটাই ছিল তাঁর প্রধান কৃতিত্ব! আজও তারা তাঁকে ভুলতে পারেনি!

আরও অনেকদিন রেসিডেন্সীর আশ্রিতদের অবরুদ্ধ হয়েই থাকতে হল। ১০ই নভেম্বর বৃটিশ বাহিনীর কমাণ্ডার-ইন-চীফ সার কলিন ক্যাম্পবেল ৫,০০০ জন

১। রীজ : "পারসোনাল ন্যারেটিভ···", পৃঃ ২৪৮।

২। জন্স্ : "অর্ডিয়াল এ্যাট লক্ষ্ণৌ," পৃঃ ২৩৫। ৩। ফরেষ্ট : "হিষ্ট্রি···", ২য়, পৃঃ ৬৩।

৪। মিসেস্ কেইস্ : "ডে বাই ডে এ্যাট লক্ষ্ণৌ", পৃঃ ২২১।

সৈন্য ও ৩২টা কামান নিয়ে আলমবাগে পৌছলেন। ১৩ই তারিখে তাঁর আক্রমণ শুরু হবার পূর্বে তাঁর বাহিনীকে সম্বোধন করে তিনি বললেন: "জোয়ানরা, আমি তোমাদের বলতে চাই যে, আমাদের সামনের কাজটা খুবই কঠিন ও বিপদ্‌জনক। ক্রাইমিয়াতে আমরা যতটা বিপদের ও কঠিন কাজের সম্মুখীন হয়েছিলাম—আজকের কাজ তার চাইতেও বেশী কঠিন ও বিপদ্‌জনক।"[১] দিলখুসা ও লা মার্টিনিয়ের দখল করার পর ক্যাম্পবেল আকস্মিকভাবে সেকেন্দারাবাগ আক্রমণ করলেন। ২,৫০০ বিদ্রোহী অন্যত্র গিয়ে লড়বার জন্য এখানে জমায়েত হয়েছিল এবং এর পিছন দিকের সমস্ত দরজাগুলিই বন্ধ ছিল। তা ছাড়া, এই সিপাহীদের সঙ্গে কোনো কামানও ছিল না। শত্রুর কামানের গোলাতে তাদের বেশীর ভাগই ধ্বংস হল। তারপর ইংরেজরা বিদ্রোহীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্রতিটি বিদ্রোহীই শেষ পর্যন্ত লড়ে প্রাণ দিল।

এ ছাড়াও সেকেন্দারাবাগের যুদ্ধের আর একটি ঘটনা ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। সেকেন্দারাবাগের প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে একটা ঝাঁকড়া পিপ্পল গাছ ছিল ও তার গোড়ায় কতকগুলি জলের কলসী ছিল। একজন ইংরেজ অফিসার লিখেছেন, "হত্যাকাণ্ড যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, তখন আমাদের অনেক লোক ছায়ার জন্য ও তাদের অসহ্য তৃষ্ণা নিবারণের জন্য ঐ গাছের নীচে যাচ্ছিল।" কিন্তু কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল যে, অনেক ইংরেজ সৈন্য মৃত অবস্থায় গাছের গোড়ায় পড়ে আছে। এতে অনেকের সন্দেহ হল। ওয়ালেস্ নামক একজন ইংরেজ সৈন্য পিছনে হটে গাছের উপরে ভাল করে দেখতে লাগল। "পরক্ষণেই সে চেঁচিয়ে বলে উঠল 'আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি,' তারপর সে গুলী ছুঁড়ল এবং তৎক্ষণাৎ একটা লাল কোট ও গোলাপী রঙের সিল্কের পাতলুন পরা এক ব্যক্তির দেহ মাটিতে এসে পড়ল। জোরে পড়ার ফলে তার কোটের বোতাম ছিঁড়ে গিয়েছিল। কাছে গিয়ে দেখা গেল যে, সে একজন স্ত্রীলোক। তার সঙ্গে পুরানো ধরনের দুটি পিস্তল ছিল, একটি গুলীভরা অবস্থায় তার বেল্টেই ছিল এবং আর একটির দ্বারা সে ছয়জনের প্রাণ নষ্ট করেছিল।"[২]

চারদিন ধরে ঘোরতর যুদ্ধের পর ১৭ই নভেম্বর রেসিডেন্সী উদ্ধার হল। কিন্তু আবার ২২শ তারিখে সমগ্র ইংরেজ বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে রেসিডেন্সী ত্যাগ করে ক্যাম্পবেলকে কানপুর অভিমুখে ছুটতে হল। আউটরাম তাঁর বাহিনী নিয়ে আলমবাগে রয়ে গেলেন।

১। ফোরবস্-মিচেল: "রেমিনিসেন্সেস্ অব দি গ্রেট মিউটিনি," পৃঃ ৩৩।

২। ঐ, পৃঃ ৫৮।

॥ সেকান্দার বাগ (লক্ষ্ণৌ) ॥

[সমসাময়িক প্রাচীন চিত্রকর হইতে]

কানপুর হস্তচ্যুত হওয়ার পর তাঁতিয়া তোপী নানা সাহেবের অনুমতি নিয়ে গোয়ালিয়র চলে যান। সেখানকার শক্তিশালী গোয়ালিয়র কনটিনজেণ্ট জুন মাস থেকে বিদ্রোহ ঘোষণা করে নিষ্ক্রিয় ভাবে বসেছিল, অবশেষে তারা তাঁতিযার সঙ্গে যোগ দিতে সম্মত হয়ে ৯ই সেপ্টেম্বর কল্পিতে এসে পৌছল। ২৭শে নভেম্বর নানা সাহেব কানপুর আক্রমণ করলেন ও জেনারেল উইণ্ডহামকে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করে কানপুর পুনরায় দখল করলেন; উইণ্ডহাম ইনট্রেঞ্চমেণ্টে আশ্রয় নিলেন। নানা এইখানে মস্ত বড় একটা ভুল করলেন—গঙ্গার উপরকার নৌকোর সেতু ভেঙে দিলেন না। ২৯শ তারিখে ক্যাম্পবেলের বাহিনী এক রকম বিনা বাধায় সেতু পার হয়ে কানপুরে প্রবেশ করল; এর ফলে এলাহাবাদের পথ, যে পথ দিয়ে একটা বিরাট ইংরেজ বাহিনী আসছিল, তাদের নিকট খোলাই রইল। নানা সাহেব আরও ভুল করলেন শত্রুকে ৫।৬ দিন সময় দিয়ে। ক্যাম্পবেলের বাহিনী তখন লক্ষ্ণৌর স্ত্রীলোক, শিশু ও অসুস্থদের এলাহাবাদ পৌছিয়ে দিতে ব্যস্ত। এই সুযোগে যদি বিদ্রোহীরা ক্যাম্পবেলকে পূর্ণোদ্যমে আক্রমণ করত, তা হলে তাদের প্রতিরোধ করা কিম্বা সেতু রক্ষা করার মত শক্তি ক্যাম্পবেলের ছিল না। তাঁতিয়া ৪ঠা ডিসেম্বরে এই ভুল সংশোধন করার চেষ্টা করলেন; তিনি প্রচণ্ড-ভাবে ইংরেজদের আক্রমণ করলেন ও সেতু ধ্বংস করে দেবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু এই শেষ মুহূর্তে তাঁকে ব্যর্থ হতে হল।

ঠিক এই সময় ৪ঠা ও ৫ই ডিসেম্বর কলকাতা থেকে ৫,৬০০ সৈন্যের একটা ইংরেজ বাহিনী ৩৫টা কামান নিয়ে কানপুর পৌছে গেল। তা ছাড়া দিল্লী থেকেও একটা বড় বাহিনী হোপ গ্র্যাণ্টের নেতৃত্বে এদের সঙ্গে এসে যোগ দিল। ৬ই তারিখে ইংরেজরাই বিদ্রোহীদের উপর আক্রমণ শুরু করল। সমস্ত দিন ও রাত্রিব্যাপী যুদ্ধের পর বিদ্রোহীরা কানপুর ত্যাগ করল এবং নানা সাহেবও নদী পার হয়ে অযোধ্যায় চলে গেলেন।

কিছুদিন পর ফতেগড় আক্রান্ত হল। কানপুর থেকে ৮০ মাইল উত্তরে গঙ্গার ধারে এই সামরিক গুরুত্বপূর্ণ শহরে জনসাধারণ ও সিপাহীরা ফরাক্কাবাদের নবাবের অধীনে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল এবং কর্নেল স্মিথ ও অন্যান্য ইংরেজদের পালাতে হয়েছিল। ১৮৫৮ সালে জানুয়ারি মাসে ফতেগড় দু' ধার থেকে ইংরেজদের দ্বারা আক্রান্ত হল—একদল এল দিল্লী থেকে আর একদল কানপুর থেকে। ৩রা জানুয়ারি ১৮৫৮ সালে ইংরেজরা আবার ফতেগড় অধিকার করল। ঐ দিনই ফরাক্কাবাদের নবাবকে ফাঁসি দেওয়া হল। "প্রথমতঃ, তাঁর শরীরে সর্বত্র শুয়োরের চর্বি ঢেলে দেওয়া হল, ও ঝাড়ুদার দিয়ে তাঁকে

বেত মারা হল, তারপর তাঁকে ফাঁসিতে ঝোলানো হল। এটা করা হয়েছিল কমিশনারের হুকুমে।"[১]

কমিশনার পাওয়ার সমগ্র ফতেগড় জেলা ঘুরে বেড়ালেন ও জোয়ান লোক দেখা মাত্রই তাদের ধরে ধরে ফাঁসিতে ঝোলালেন। একমাত্র মাও নামক একটা ছোট জায়গায় তিন দিনের মধ্যে একটা বড় পিপ্পল গাছের শাখায় ১০০ লোককে তিনি ফাঁসিতে ঝুলিয়েছিলেন। পাওয়ারের বন্ধুরা তাঁর গুণমুগ্ধ হয়ে তাঁকে 'হ্যাঙ্গিং পাওয়ার' ('Hanging Power') বলে ডাকতেন।[২] ফতেগড় সম্বন্ধে ফোরবস্-মিচেল বলেছেন: "কমিশনার পুলিস স্টেশনে তাঁর আদালত বসালেন। আমি জানি না বন্দীদের কিভাবে বিচার করা হয়েছিল, অথবা কি রকম সাক্ষ্য প্রমাণ তাদের বিরুদ্ধে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। আমি এইটুকু মাত্র জানি যে, বন্দীদের দলে দলে মার্চ করিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং তার পরক্ষণেই পুলিস স্টেশনের সামনেই যে একটা মস্ত বড় বটগাছ ছিল, সেখানে আবার মার্চ করিয়ে নিয়ে যেয়ে তাদের ফাঁসিতে ঝোলানো হয়েছিল। এই কাজ শুরু হয় বেলা ৩টার সময় এবং অনবরত চলতে থাকে পরের দিন সকালবেলা পর্যন্ত। তখন দেখা গেল যে, গাছে আর একটুও স্থান খালি নেই এবং ঐ সময়ের মধ্যে ১৩০ জনকে ঝোলানো হয়ে গিয়েছে। একটা ভয়াবহ দৃশ্য সন্দেহ নেই।" যে বিখ্যাত ইংরেজ বীরপুরুষ নিরস্ত্র বন্দী মোগল শাহজাদাদের স্বহস্তে খুন করে খ্যাতি অর্জন করেছিল, সেই হড্‌সনও এই ঘটনার সময় উপস্থিত ছিল। সেই হড্‌সন হেন বীরপুরুষও এই বীভৎস দৃশ্য দেখে ঘৃণায় বলে উঠেছিল: "এই সব কাজ আর আমার সহ্য হচ্ছে না। আমার যে এখন কোনো ডিউটি নেই, তাতে আমি খুবই খুশী।"[৩]

কানপুর ও ফতেগড় দখলের পর সমগ্র গঙ্গা-যমুনা দোয়াব, অন্ততঃ তার শহরগুলি, ইংরেজের অধিকারে এল এবং কলকাতা থেকে লাহোর, পেশোয়ার পর্যন্ত সমস্ত গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডটাই ইংরেজ সৈন্য ও সাজসরঞ্জামের যাতায়াতের জন্য মুক্ত হল। কিন্তু তখনও উত্তরে সমগ্র রোহিলখণ্ড ও অযোধ্যা এবং দক্ষিণে সমগ্র বুন্দেলখণ্ড সম্পূর্ণ বিদ্রোহীদের অধিকারেই রয়ে গেল।

১। ফোরবস্-মিচেল: পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১৬৯।

২। গর্ডন-আলেক্জাণ্ডার: "রিকলেক্সনস্ অব এ হাইল্যাণ্ড সাবঅল্টার্ন", পৃঃ ২১০।

৩। ফোরবস্ মিচেল: পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১৬৯-৭১।

নানা সাহেব

পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও ১৮১৮ সালে যুদ্ধে হেরে গিয়ে ইংরেজের নিকট আত্মসমর্পণ করে ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে বৎসরে ৮ লক্ষ টাকার পেন্সনে কানপুর থেকে ১৫ মাইল উত্তরে গঙ্গার ধারে বিঠুরে বাস করতে লাগলেন। ১৮৫১ সালে তাঁর মৃত্যুর সময় তিনি উইল করে তাঁর দত্তক দন্দুপন্থ নানাকে তাঁর সব কিছুর উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করে গেলেন। কিন্তু ইংরেজ সরকার নানাকে পেশোয়া বলেও স্বীকার করলেন না, ৮ লক্ষ টাকা পেন্সনও বন্ধ করে দিলেন এবং অন্যান্য অধিকারগুলি থেকেও তাঁকে বঞ্চিত করলেন। পেন্সনের জন্য তাঁর দরখাস্ত গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিল যখন নামঞ্জুর করলেন, তখন নানা সাহেব কোর্ট অব ডাইরেক্টার্সের নিকট আপিল করবার জন্য আজিমুল্লা খানকে ইংল্যাণ্ডে পাঠালেন।

আজিমুল্লা খান অতি সাধারণ অবস্থা থেকে নিজের অধ্যবসায়ে ইংরেজী ও ফরাসী ভাষা শিখে উন্নতি লাভ করেছিলেন। ইংল্যাণ্ডে যদিও তিনি সম্ভ্রান্তবংশীয় মহিলা মহলে যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করেছিলেন, কিন্তু নানা সাহেবের পেন্সন সম্বন্ধে তিনি ইংরেজ কর্তৃপক্ষকে রাজী করাতে পারলেন না। তারপর লণ্ডন থেকে ভারতে ফেরবার পূর্বে তিনি ক্রাইমিয়ার যুদ্ধ দেখবার জন্য কন্‌স্টাণ্টিনোপল যান। "যেসব রুস্তমরা, অর্থাৎ রুশরা, ইংরেজ ও ফরাসী উভয়কে হারিয়ে দিয়েছে" তাদের দেখবার জন্য তিনি ব্যগ্র হয়ে ওঠেন।[১] যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থেকে তিনি রুশ ব্যাটারির কার্য পরিদর্শন করেছিলেন। এটাও শোনা যায় যে, কন্‌স্টাণ্টিনোপলে থাকাকালীন আসন্ন ভারত বিদ্রোহে সাহায্যার্থে তিনি কয়েকজন রুশ প্রতিনিধির সঙ্গেও আলাপ আলোচনা করেছিলেন। কিন্তু এর সত্যাসত্য নির্ণয় করা খুবই

১। রাসেল: "মাই ডায়েরি ইন ইণ্ডিয়া", ১ম, পৃঃ ১৬৫।

কঠিন। তবে এ সম্পর্কে ফোরবস্-মিচেল যেটুকু ইতিহাস দিয়েছেন তা হল এই যে, রুরকির ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত মোহাম্মদ আলি খান ইংরেজের হাতে বন্দী হয়েছিলেন। ১২ই ফেব্রুয়ারি ১৮৫৮ সালে তাঁর ফাঁসি হয়। ফাঁসির পূর্বে ফোরবস্-মিচেলকে মোহাম্মদ আলি কতকগুলি কথা বলেন। আজিমুল্লার সঙ্গে তিনিও ইংল্যাণ্ডে গিয়েছিলেন, তারপর ক্রাইমিয়াতেও তাঁর সঙ্গে যান। তিনি আরও বলেন, "সেখানে আমরা ১৮ই জুন তারিখে বৃটিশের আক্রমণ ও পরাজয় দেখেছিলাম। সেখান থেকে আমরা কনস্টান্টিনোপলে ফিরে যাই। সেখানে আমরা কয়েকজন প্রকৃত অথবা কৃত্রিম রুশ প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। আজিমুল্লা যদি ভারতে বিদ্রোহ ঘটাতে পারেন, তা হলে প্রচুর বাস্তব সাহায্যের ব্যবস্থা করবেন বলে তাঁরা বড় বড় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সেই সময়ই আমি ও আজিমুল্লা কোম্পানি সরকারকে খতম করবার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি।"[১]

যাই হোক, এখন বিদ্রোহকালীন প্রসঙ্গে আসি। কানপুরের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক অবস্থানের জন্য এখানে একটি ইংরেজ গোলন্দাজ বাহিনী ও প্রায় ২,৫০০ সিপাহীর থাকবার জন্য একটা বড় ক্যান্টনমেন্ট ছিল এবং অন্যান্য শহরের তুলনায় এখানে বেসামরিক ইংরেজ, ফিরিঙ্গী ও খৃষ্টান অধিবাসীর সংখ্যা কম ছিল না। মিরাট ও দিল্লীর বিদ্রোহের খবরের পর থেকেই শহরের অবস্থা দিনের পর দিন চঞ্চল হতে থাকল। কানপুর বাহিনীর নায়ক জেনারেল হুইলার যে-কোনো দিন বিদ্রোহের আশঙ্কা করতে লাগলেন। ২২শে তারিখে নানা সাহেব ২টি কামানসহ ৩০০ সৈন্য ইংরেজদের সাহায্যের জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। কানপুরের ম্যাজিস্ট্রেট হিলার্সডনের তখনও নানা সাহেবের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল এবং সেজন্য তিনি নানা সাহেবের উপর ধনাগার, যেখানে ১০ লক্ষ টাকা মজুত ছিল, রক্ষার ভারও ছেড়ে দিলেন।

১লা জুন ২য় অশ্বারোহী বাহিনীর সুবাদার টীকা সিং এবং আরও কয়েকজন নানা সাহেবের সঙ্গে বিদ্রোহ সম্বন্ধে আলোচনা করলেন। ২রা জুন একজন মাতাল ইংরেজ অফিসার ২য় অশ্বারোহী বাহিনীর একজন প্রহরীকে গুলী করে। পর দিন সামরিক আদালতের বিচারে অচেতন অবস্থায় গুলী ছোঁড়ার অজুহাতে ইংরেজ বীর পুরুষটি মুক্তি লাভ করে। ৪ঠা জুন হুইলার সমস্ত ইংরেজদের নিয়ে ও এক মাসের খাদ্যদ্রব্য নিয়ে সুরক্ষিত ইনট্রেঞ্চমেণ্টে প্রবেশ করলেন। ৫ই জুন কানপুরের সিপাহীরা যুদ্ধ ঘোষণা করল। সুবাদার টীকা সিংকে ২য় অশ্বারোহী-দের জেনারেল, জমাদার দলভঞ্জন সিংকে ৫৩ম পদাতিকদের কর্নেল ও সুবাদার

১। ফোরবস্-মিচেল: "রেমিনিসেন্সেস্ অব দি গ্রেট মিউটিনি", পৃঃ ১৮৬।

॥ নানা সাহেব ॥

গঙ্গাদীনকে ৫৬ম পদাতিকদের কর্নেল নিযুক্ত করা হল। নানা সাহেবের বাহিনীর কমাণ্ডার জওলাপ্রসাদ হলেন ব্রিগেডিয়ার।

এখানে টীকা সিং সম্পর্কে একটু বলা প্রয়োজন মনে করি। টীকা সিং সম্বন্ধে সার জর্জ ট্রিভেলিয়ান তাঁর 'কানপুর' নামক গ্রন্থে লিখেছিলেন: "টীকা সিং তাঁর দুঃসাহস ও কর্মদক্ষতার দ্বারা সিপাহীদের নেতৃস্থান অধিকার করেছিলেন।"—(পৃঃ ৬৭)। যখন বিদ্রোহী সিপাহীরা নানা সাহেবের অনুরোধে কানপুরে ফিরে এল, "টীকা সিং তৎক্ষণাৎ ম্যাগাজিনে চলে গেলেন।··· যেসব কামান কার্যকরী অবস্থায় ছিল সেগুলিকে তৎক্ষণাৎ ইনট্রেঞ্চমেণ্টের দিকে পাঠিয়ে দিলেন, আর যেগুলি তখনই ব্যবহার করবার মতো অবস্থায় ছিল না সেগুলিকে পরিষ্কার করার জন্য মিস্ত্রীদের কাজে লাগিয়ে দিলেন। বিদ্রোহীদের বেশীর ভাগই তাঁর মতো দূরদর্শিতা ও ধীরতা দেখাতে পারেনি।"—(পৃঃ ৮৮)। ৬ই তারিখে "টীকা সিং অস্ত্রাগারে সারাদিন কাজ করলেন। বড় বড় কামানগুলি ঠিকভাবে ব্যবস্থা করে ঠিক ঠিক জায়গায় পাঠিয়ে দিতে লাগলেন। যেই কামানগুলি আসতে লাগল, তখনই সেগুলিকে সঠিক স্থানে বসানো হল এবং স্বেচ্ছাসেবকরা তার ভার গ্রহণ করল। পরদিন দ্বিপ্রহরের মধ্যে ব্যাটারির বেষ্টনী তৈরি করা শেষ হল এবং আমাদের ইনট্রেঞ্চমেণ্ট চারদিক থেকে ২৪-পাউণ্ড গোলার আঘাতে কাঁপতে লাগল।"—(পৃঃ ১০০)।

এই টীকা সিং ইত্যাদিকে নিয়ে নানা সাহেব যখন বাহিনী গঠন করলেন, তখন বিদ্রোহী সিপাহীদের একদল প্রতিনিধি নানা সাহেবের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে বলেন: "মহারাজ, আপনি যদি আমাদের সঙ্গে যোগ দেন, তা হলে একটা রাজ্য আপনার জন্য অপেক্ষা করে আছে, কিন্তু আপনি যদি শত্রুদের সঙ্গে যান, তা হলে আপনার মৃত্যু অনিবার্য।" নানা সাহেব এর উত্তরে বলেছিলেন, "ইংরেজদের সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ? আমি সম্পূর্ণরূপে তোমাদেরই।"[১] বিদ্রোহ করেই সিপাহীরা দিল্লী অভিমুখে রওনা হল। তারা যখন ৬ মাইল চলে গিয়েছে, তখন নানা সাহেব তাদের ফিরিয়ে আনলেন। বিদ্রোহীরা ফিরে এসেই ইনট্রেঞ্চমেণ্ট অবরোধ করল। ২৬শে জুন নানা সাহেব হুইলারের নিকট প্রস্তাব করে পাঠালেন, "যারা লর্ড ডালহাউসির কাজের জন্য দায়ী নয় ও যারা আত্মসমর্পণ করবে, তাদের নিরাপদে এলাহাবাদ যেতে দেওয়া হবে।" এই শর্তে ঐ তারিখেই জেনারেল হুইলার আত্মসমর্পণ করলেন।

১। হোমস: "হিষ্ট্রি অব দি ইণ্ডিয়ান মিউটিনি", পৃঃ ২২৪।

২৭শে জুলাই ইংরেজরা সতীচৌরা ঘাটে এসে নৌকোয় উঠল। বেলা ৯টা আন্দাজ সকলের শেষে মেজর ভিবার্ট নৌকোতে চড়লেন। "মেজর ভিবার্ট নৌকোতে ওঠা মাত্রই 'চল' বলে নৌকো ছাড়ার আদেশ দেওয়া হল। কিন্তু কিনারা থেকে একটা সঙ্কেত পেয়ে নেটিভ মাঝিরা—প্রত্যেক নৌকোয় তারা ৯ জন করে ছিল—জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল ও কিনারার দিকে চলল। আমরা তৎক্ষণাৎ তাদের গুলী করলাম, কিন্তু বেশীর ভাগই পালাতে সক্ষম হয়েছিল।"[১] টম্‌সনের উক্তিতেই দেখা যাচ্ছে যে, ইংরেজরাই—যারা তখনও একরকম বন্দী অবস্থাতেই ছিল—প্রথমে গুলী চালায় ও কয়েকজন ভারতীয় মাঝিকে হত্যা করে। তারপর বিদ্রোহীরাও গুলী চালাতে শুরু করে। প্রায় সকল পুরুষই এবং অনেক স্ত্রীলোক ও শিশুও এতে নিহত হয়েছিল এবং টম্‌সন্‌কে নিয়ে মাত্র ৪ জন প্রাণ নিয়ে পালাতে পেরেছিল। এই ঘটনার ৩৭ বৎসর পরে কর্নেল মড্‌ তাঁর 'মেমরীজ অব দি মিউটিনি'তে লিখেছিলেন:

"কর্নেল উইলিয়ামস্‌ (কানপুরের পুলিস কমিশনার) যেসব তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন, তা খুব ভালভাবে পড়ে এবং কোনো পক্ষপাতিত্ব না করে বলা যায় যে, নানা সাহেব এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিলেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। বরং আমার মত এই যে, যদিও তিনি দোষী, আমি বলব যে তাঁর রক্তপিপাসু অনুচররাই তাঁকে এ বিষয়ে জড়িত করেছিল, যাদের কাজে তিনি বাধা দিতে সাহস করতেন না। এমন কি, আজও এবং আমাদের দেশেই দেখিয়ে দেওয়া যেতে পারে যে, অনুরূপ পাশবিকতাকে ওই একই ভাবে সহ্য করে যাওয়া হচ্ছে। এটা ঠিক যে, নানা সাহেব অনেকবার অসহায় লোকদের সাহায্য করেছিলেন, এমন কি, তাদের প্রতি সত্যিকারের দয়াও দেখিয়েছিলেন।"[২]

যেসব ইংরেজ কানপুরের এই হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে এত পবিত্রতাপূর্ণ ক্রোধ দেখিয়েছেন, তাঁদের আর একটি কথাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন। জেনারেল নীল অনেক আগেই কানপুরের অবরুদ্ধদের উদ্ধার করতে পারতেন এবং হুইলারের আত্মসমর্পণ করবার কোনো প্রয়োজনই হত না। কিন্তু নীল নেটিভ 'নিগার'দের পাইকারীভাবে ফাঁসি দিয়ে, স্ত্রী, পুরুষ, শিশু নির্বিশেষে হত্যা করে এবং গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস করে বিদ্রোহীদের শিক্ষা দিতে এতই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, কানপুরে পৌঁছতে তাঁর বেশ কিছুদিন বিলম্ব হয়ে গিয়েছিল। জেনারেল নীলের হত্যাকাণ্ড ও পাশবিক অত্যাচার আগে ঘটেছিল এবং সতীচৌরা ঘাটের হত্যাকাণ্ড পরে

১। মৌব্রে টম্‌সন্‌: "ষ্টোরি অব কানপুর," পৃঃ ১৬৩।

২। মড্‌: ১ম, পৃঃ ১০৮-৯।

হয়েছিল। নীলের অমানুষিক হত্যাকাণ্ডের খবর কানপুরে পৌঁছতে বিলম্ব হয়নি, এবং তা যে কানপুর অধিবাসীদের প্রতিশোধ নেবার আকাঙ্ক্ষাকে উত্তেজিত করে তুলেছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

সতীচৌরা ঘাটের হত্যাকাণ্ডের পর যেসব ইংরেজ বেঁচে ছিল, তাদের মধ্যে পুরুষদের গুলী করা হল, ২০০ স্ত্রীলোক ও শিশুদের বিবিঘরে বন্দী করে রাখা হল। ১লা জুলাইতে নানা সাহেব নিজেকে পেশোয়া বলে ঘোষণা করলেন, কিন্তু তাঁকে পেশোয়াশাহী পতাকার পাশে বাদশাহী পতাকা তুলে বিদ্রোহী রাজধানীর আনুগত্য স্বীকার করতে হল। এর কিছুদিন পরেই কানপুর তাঁকে ছাড়তে হল। জেনারেল হ্যাভলক ১৭ই জুলাই কানপুর প্রবেশ করলেন। কানপুর ত্যাগ করার পূর্বে বিবিঘরের সমস্ত বন্দীদের হত্যা করে একটা কূপের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছিল।

যখন ২০শ তারিখে জেনারেল নীল এসে পৌঁছলেন, তখন হ্যাভলক তাঁর উপর কানপুরের ভার দিয়ে ২৫শে জুলাই লক্ষ্ণৌর দিকে রওনা হয়ে গেলেন। নীল যুদ্ধ-ক্ষেত্রে কখনও কোনো রকমের কৃতিত্ব দেখাননি, কিন্তু নিরস্ত্র, অসহায় ও নির্দোষ লোকের উপর পাইকারীভাবে নৃশংস ও পাশবিক প্রতিশোধ নিতে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। বস্তুতঃ বারাণসী হতে কানপুর পর্যন্ত তিনি যেভাবে জল্লাদের কাজ করেছেন, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাসেও তার উদাহরণ খুব কমই আছে। কানপুর থেকে তাঁর এক বন্ধুকে তিনি লিখেছিলেন:

"আমি নেটিভদের দেখাতে চাই যে, এই ধরনের কাজের জন্য (সতীচৌরা ঘাট ও বিবিঘরের হত্যাকাণ্ড) তাদের আমরা যে শাস্তি দেব, তা হবে খুবই কঠোর, তা তাদের মনোবৃত্তিকে জঘন্যভাবে আঘাত করবে এবং চিরকালের জন্য তা তাদের মনেও থাকবে। আমি যে নিম্নলিখিত হুকুমটি জারী করেছিলাম, তা আমাদের কয়েকজন ব্রাহ্মণ মনোভাবাপন্ন বৃদ্ধ ভদ্রলোকদের নিকট যতই আপত্তি-জনক হোক না কেন, আমি মনে করি কানপুরে তা খুবই ঠিক হয়েছিল।"[১]

নীলের হুকুম ছিল এই যে, মৃত্যুদণ্ডের আদেশের পর প্রত্যেকটি অপরাধীকে বিবিঘরে নিয়ে যাওয়া হবে এবং মৃত্যুর পূর্বে তাকে কয়েক ইঞ্চি করে রক্তের দাগ জিভ দিয়ে চেটে পরিষ্কার করতে হবে। "যদি কেউ এ কাজ করতে রাজী না হয়, তা হলে প্রোভেস্ট-মার্শাল তাকে বেত মারতে থাকবে—যতক্ষণ পর্যন্ত না অপরাধী তার ঐ কাজ সম্পন্ন করবে।" তারপর উক্ত চিঠিতেই নীল লিখছেন: "প্রথম অপরাধী ছিল একজন ৬ষ্ঠ বাহিনীর সুবাদার, উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। তাকে আধ-বর্গ ফুট পরিষ্কার করতে হয়েছিল। সে প্রথমে আপত্তি করেছিল, সঙ্গে সঙ্গে তার

১। কে': পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ২য়, পৃঃ ৩৯৮—৪০০।

উপর পড়ল বেত। রক্ত পরিষ্কারের কাজটুকু করবার পর তাকে ফাঁসি দেওয়া হল। আরও অনেককে এইভাবে আনা হল, তার মধ্যে একজন ছিল মুসলমান—আমাদের দেওয়ানী আদালতের কর্মচারী ও একজন নেতৃস্থানীয় বদমাশ লোক। … এটা যে খুবই একটা অদ্ভুত নিয়ম তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু পরিস্থিতির পক্ষে খুবই প্রযোজ্য এবং আশা করি যে, ঘরটা এইভাবে সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত আমাকে কেউ বাধা দেবে না। … ভগবানের আশীর্বাদে ও সাহায্যে আমি আমার কাজের সার্থকতা দেখাতে পারব।"

নীলের পাশবিক হত্যাকাণ্ডের ফলে যেসব হিন্দু-মুসলমান ভারতবাসীর প্রাণ দিতে হয়েছিল, তাঁরা তাঁদের অদৃষ্টকে ধীর ও শান্ত ভাবেই বরণ করে নিয়েছিলেন। কি ভাবে হিন্দু মুসলমানেরা এই মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছিলেন সে সম্বন্ধে কর্নেল মড্ লিখেছিলেন, "মুসলমানরা গর্বিত ও ক্রুদ্ধভাবে মৃত্যুকে উপেক্ষা করেছিলেন, আর হিন্দুরা অদ্ভুত রকমের একটা উদাসীনতা দেখিয়েছিলেন। … অনেক হিন্দু, যেন তাঁরা কোথায়ও ভ্রমণে যাচ্ছেন এই ভাবে মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছিলেন।"[১]

সতীচৌরা ঘাটের ন্যায় বিবিঘরের হত্যাকাণ্ডের জন্যও প্রায় সকল ইংরেজ লেখকই নানা সাহেবকে দোষী করেছেন। বস্তুতঃ আইনসঙ্গতভাবে ও নৈতিকভাবে তিনিই এই সমস্ত কাজের জন্য দায়ী। তিনিই ছিলেন রাষ্ট্রের প্রধান, সুতরাং সব কাজের জন্যই চরম দায়িত্ব তাঁরই। কিন্তু এটাও বিবেচনা করতে হবে যে, বিবি-ঘরের হত্যাকাণ্ড কখন ঘটেছিল—তা নানা সাহেবের কানপুর পরিত্যাগ করবার পূর্বে, না পরে? এটা খুবই সম্ভব যে, এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল একদল চরমপন্থীর দ্বারা এবং নানা সাহেব কানপুর পরিত্যাগ করার পর। ব্যক্তিগতভাবে নানা সাহেব যে এই সব হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী ছিলেন, কিম্বা তাঁর জ্ঞাতসারে ও তাঁর সম্মতিতে যে এই সব ঘটনা ঘটেছে—তার কোনো নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। কানপুর পুনর্দখলের পর কর্নেল উইলিয়ামস্ এ সম্বন্ধে যেসব সাক্ষ্য সংগ্রহ করেছিলেন, ইংরেজ ঐতিহাসিকরাও তার খুব বেশী মূল্য দেননি।[২] কেবল ঐতিহাসিক ফরেস্ট তাঁর 'হিস্ট্রি অব দি ইণ্ডিয়ান মিউটিনি'র ভূমিকায় যা লিখেছিলেন, তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য: "উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের পুলিস কমিশনার কর্নেল উইলিয়ামস্ যে ৬৩ জন লোকের সাক্ষ্য নিয়েছিলেন, তা আমি পড়েছি। ঐ সাক্ষ্যগুলি স্ববিরোধী উক্তিতে পরিপূর্ণ এবং খুব সতর্কতার সঙ্গে সেগুলি বিচার করতে হবে। কর্মচারীদের প্রদত্ত এবং অন্যান্য গুপ্ত রিপোর্টগুলিও আমি দেখেছি। এইসব থেকে দেখা

১। মড্: "মেমরিজ অব দি মিউটিনি", ১ম, পৃঃ ২২৪।

২। ঐ, পৃঃ ২২৪-৫২; কে': পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ২য়, পৃঃ ৩৭২; ফরেষ্ট: "হিসটি" ১ম, ৪৭৮-৭৯।

যায় যে, যদিও তাতে কলঙ্কময় কৃষ্ণবর্ণের প্রাধান্যই বেশী, তা হলেও চিত্রটিকে যতখানি কালো করে চিত্রিত করা হয়েছে তা ততখানি কালো নয়। কর্নেল উইলিয়ামস্ বলেছেন: 'প্রথম দিকে সাধারণভাবে সর্বত্র অহেতুক মনে করা হত যে, আমাদের বন্দী স্ত্রীলোকরা লাঞ্ছিত ও কলঙ্কিত হয়েছিলেন; সে ধারণা আমাদের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সংগৃহীত তথ্যের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন বলেই প্রমাণিত হয়েছে।' তথ্যর দ্বারা এটাও প্রমাণিত হয় যে, যেসব সিপাহী বন্দীদের পাহারা দিচ্ছিল, তারা তাদের হত্যা করতে অসম্মত হয়। এই ঘৃণ্য দুষ্কর্ম ঘটেছিল একজন দুঃশ্চরিত্রা স্ত্রীলোকের প্ররোচনায় নানা সাহেবের পাঁচজন বডি গার্ডের দ্বারা। এই নিষ্ঠুর কাজের জন্য একটা সমগ্র জাতিকে অভিযুক্ত করা যেমন ক্ষুদ্রমনের পরিচায়ক, তেমনই অসত্য'।"—(পৃঃ XI)।

যাই হোক, রাজনীতি ও মানবতার দিক থেকে বিচার করলে, বিবিঘরের হত্যাকাণ্ডের কোনো সার্থকতাই ছিল না। এই হত্যাকাণ্ডের দ্বারা বিদ্রোহীরা কিছুই লাভবান হয়নি, বরং ক্ষতিগ্রস্তই হয়েছিল, কারণ ইংল্যাণ্ডে ও ইউরোপে ভারতবিরোধী প্রচারে এই সব ঘটনা ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের খুবই সহায়ক হয়েছিল; যদিও এটাও ঠিক যে, বিবিঘরের ঘটনা না ঘটলেও ইংরেজ শাসকদের পক্ষে ঐ রকম কিছু আবিষ্কার করে প্রচারকার্য চালানো কিছুই কঠিন হত না। সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের সকল যুদ্ধের সময়েই, বিশেষ করে ঔপনিবেশিক যুদ্ধের সময়, এ রকম বরাবরই করে থাকে।

লক্ষ্ণৌর পতন

১৮৫৭ সালে ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে কমাণ্ডার-ইন-চীফ ক্যাম্পবেল গভর্নর জেনারেল ক্যানিংকে লিখেছিলেন যে, লক্ষ্ণৌর অবরুদ্ধ ইংরেজদের উদ্ধার করবার সময় অযোধ্যার লোক যেরূপ দুর্দান্ত মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিল, তাতে তাঁর অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, অযোধ্যা জয় করতে হলে তাঁর অন্ততঃ ৩০,০০০ সৈন্যের প্রয়োজন হবে; কেবলমাত্র লক্ষ্ণৌকে বশ করবার জন্যই ২০,০০০ সৈন্যের প্রয়োজন।[১] তাই তিনি আপাততঃ রোহিলখণ্ড আক্রমণ করাই শ্রেয় মনে করলেন। কিন্তু ক্যানিং বললেন, "অযোধ্যাই প্রথম আক্রমণ করতে হবে, কারণ অযোধ্যায় এক রাজবংশ আছে; বিদ্রোহীরা এই রাজবংশকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছে; লক্ষ্ণৌ ও অযোধ্যা এখন দিল্লীর স্থান অধিকার করছে; সারা ভারতবর্ষ এখন অযোধ্যার দিকে তাকিয়ে আছে এবং রাজারাও দেখছেন, আমরা যা জয় করেছি তা রাখতে পারি কিনা।"

আবার ১৮৫৮ সালের ৮ই জানুয়ারিতে ক্যানিং লিখলেন যে, এখনই লক্ষ্ণৌ আক্রমণ করতে হবে, রোহিলখণ্ড নয়, এবং গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কারণেই এটা করা বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। নানা সাহেবের লোকরা সাগর আক্রমণ করবার পরিকল্পনা করছে, আর নানা সাহেব নিজে "পশ্চিম ভারতের মারাঠাদের সঙ্গে চক্রান্ত করছেন। যদি তিনি তাঁদের দেখাতে পারেন যে, বিদ্রোহীরা আমাদের কাছ থেকে লক্ষ্ণৌ ছিনিয়ে নিয়েছে, তা হলে তাঁর আবেদন একটা বিপদ্‌জনক শক্তি হয়ে দাঁড়াবে এবং রোহিলখণ্ড জয় করলেও সে শক্তির সমান হওয়া যাবে না।" ক্যানিং আরও লিখলেন: "তারপর রয়েছে সব থেকে ভয়ানক বিপদ ও বিদ্রোহের গুপ্ত স্থান হায়দরাবাদ, যে হায়দরাবাদ হচ্ছে বিশেষ করে মুসলমানপ্রধান ও

১। ফরেষ্ট: "হিষ্ট্রি…," ২য়, পৃঃ ২৫২।

গভীরভাবে অযোধ্যার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ; কারণ তারা ভয় করে, যদিও সে ভয় অহেতুক, তাদেরও পরিণতি অযোধ্যার মতো হবে।" বিদ্রোহী অযোধ্যার প্রভাব যে শুধু ভারতবর্ষেই বিস্তৃত হচ্ছিল তা নয়, দূরদূরান্তেও যে তা প্রসার লাভ করে স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষী মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে তুলছিল, তা ইংরেজ শাসকরা ভালভাবেই জানতেন। উক্ত চিঠিতেই ক্যানিং লিখেছিলেন: "পেগুর রিপোর্টে দেখা যায় যে, সুদূর আভা রাজ্যে লোকে উদগ্রীব হয়ে লক্ষ্ণৌর খবর জানতে চায়।"[১]

ক্যানিং-এর অযোধ্যা আক্রমণ মনোনয়নের আর একটি মস্ত বড় কারণ ছিল। হেনরী লরেন্স অযোধ্যায় চীফ কমিশনার হয়ে আসার পরই যখন তিনি বিদ্রোহের পূর্বাভাস পেলেন, তখন তিনি ক্যানিংকে লিখলেন যে, যদি বিদ্রোহ ঘটে তা হলে নেপালের প্রধান মন্ত্রী জঙ্গবাহাদুরের নিকট সাহায্য চাওয়ার অনুমতি তাঁকে দেওয়া হোক। লক্ষ্ণৌতে আসার পূর্বে হেনরী লরেন্স কাঠমুণ্ডতে ইংরেজ সরকারের রেসিডেন্ট ছিলেন। ক্যানিং তার উত্তরে লরেন্সকে জানালেন: "জঙ্গবাহাদুরের সাহায্য চাইবার ক্ষমতা আপনাকে দেওয়া হল। আমার পক্ষে এরূপ অনুমতি দেওয়া খুবই অপ্রীতিকর ; এটা হচ্ছে আমাদের অপমানজনক দুর্বলতার স্বীকৃতি।"[২] আত্মসম্মানে আঘাত লাগলেও, বিদ্রোহ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই হেনরী লরেন্স জঙ্গবাহাদুরের কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছিলেন, জঙ্গবাহাদুরও খুব আগ্রহসহকারে তাঁর সাহায্য নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন। জন লরেন্স যেমন তাঁর শিখ রাজাদের ও গোলাব সিংকে জানতেন, হেনরী লরেন্সও তেমনি তাঁর জঙ্গবাহাদুরকে জানতেন।

ইংরেজকে সাহায্য করার জন্য জঙ্গবাহাদুরের এত আগ্রহের একটা গুরুতর কারণ ছিল। 'যৌবনে তিনি জুয়া খেলে কাটিয়েছিলেন', যার ফলে তিনি নিঃস্ব ও হতাশ হয়ে পড়েন। তাঁর পিতৃব্য যখন নেপালের প্রধান মন্ত্রী হলেন, তখন তিনিও দরবারে ভূমিকা গ্রহণ করতে বদ্ধপরিকর হলেন। "এই দরবারই ছিল তাঁর মতো প্রতিভার বিকাশের জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্র। সেখানে তিনি আশ্চর্য রকমের দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন এবং এমন নানা রকমের কার্য করেছিলেন, যা পাশ্চাত্ত্য জগতে নৈতিক বিধি অনুসারে আইনসঙ্গত বলে গণ্য হবে না। এ কাজগুলির মধ্যে একটা হল তাঁর পিতৃব্যকে খুন করা, যে কাজ তিনি করেছিলেন মহারানীর প্ররোচনায়। একটি নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হল ও তিনি হলেন কমাণ্ডার-ইন-চীফ। আরও বৃহৎ আকারে হত্যাকাণ্ডের সুযোগ তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল। নতুন

১। ফরেষ্ট: পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২৫৫।
২। গিবন: "লরেন্সেস্ অব দি পাঞ্জাব", পৃঃ ২৫৫।

প্রধান মন্ত্রীও নিহত হলেন এবং মহারানী, যাঁর তিনি প্রধান প্রিয়পাত্র ছিলেন, প্রতিশোধ দাবি করলেন। নিহত মন্ত্রীর একজন সহকর্মীকে সন্দেহ করা হল। এই সন্দিগ্ধ লোকটিকে খুন করবার জন্য তিনি আর একজন সহকর্মীকে নির্দেশ দিলেন। ··· এই ব্যক্তি ইতস্ততঃ করাতে তিনি তাঁকে বন্দী করে রাখা স্থির করলেন এবং তাঁকে ধরবার জন্য সঙ্কেত করলেন। এই ব্যক্তির পুত্র নিরাপত্তার ভয়ে শঙ্কিত হয়ে পিতাকে রক্ষা করবার জন্য ছুটে এলেন, কিন্তু তাঁকে কেটে ফেলা হল। পিতা প্রতিশোধ নিতে উদ্যত হলে জঙ্গবাহাদুরের একটা গুলী পিতাকে পুত্রের পাশে শুইয়ে দিল। ··· ১৪ জন বিরোধী সর্দার জঙ্গ-এর সম্মুখীন হল, ··· কয়েকজন বিশ্বস্ত লোকের সাহায্যে জঙ্গ সকলকেই হত্যা করলেন। প্রভাত হবার পূর্বেই জঙ্গ নিজেকে প্রধান মন্ত্রী বলে ঘোষণা করলেন ··· রানীকে তাঁর দু' ছেলে সঙ্গে নিয়ে দেশ ছেড়ে চলে যেতে বললেন।"[১] কিছুদিন পরে জঙ্গ নেপালের রাজাকেও বন্দী করেছিলেন। তারপর এক নাবালককে সিংহাসনে বসিয়ে তিনি নিজেই রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতা অধিকার করে বসলেন। এই সব ঘটনা ঘটেছিল ১৮৪৯-৫০ সালে। এই হল জঙ্গবাহাদুরের চরিত্র!

এতগুলি নিহত ও নির্বাসিত ব্যক্তিদের মধ্যে ইংরেজের বন্ধুর সংখ্যা কম ছিল না। সুতরাং ইংরেজ সরকারের সঙ্গে জঙ্গবাহাদুরের সম্বন্ধটা ঠিক বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল না। তবে জঙ্গবাহাদুর নিজে মোটেই ইংরেজের শত্রু ছিলেন না—তিনি শুধু চেয়েছিলেন নিজের ক্ষমতা বিস্তার করতে। এখন এই বিদ্রোহকালে ইংরেজ সরকারের ঘোরতর বিপদের সময় তাদের সাহায্য করে নিজেকে তাদের পরমবন্ধু হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য এবং নেপাল রাজ্যে নিজের স্বৈরাচারী ক্ষমতা সুদৃঢ় করবার জন্য জঙ্গবাহাদুর একটা মস্ত বড় সুযোগ পেলেন। তা ছাড়া আরও কয়েকটা কারণ ছিল। প্রথমটা হল, ১৮১৪-১৫ সালে ইংরেজ সরকারের নেপাল আক্রমণের পর ইংরেজ সরকার গোরখপুর থেকে গোপ নদী পর্যন্ত পাহাড়ের তলদেশে ১০০ মাইল ব্যাপী যে অঞ্চল কেড়ে নিয়েছিল, তারই অনেকটা নেপালকে আবার ফিরিয়ে দেওয়া হবে, এই প্রতিশ্রুতিও জঙ্গবাহাদুরকে দেওয়া হয়েছিল। এ বিষয়ে লক্ষ্ণৌর পতনের পর ক্যানিং নেপালের রাজাকে প্রকাশ্যভাবেই ১৭ই মে ১৮৫৮ সালে লিখেছিলেন: "বৃটিশ সরকারের তরফ থেকে আমি স্থির করেছি যে, পাহাড়ের নিম্নভাগে গুর্খাদের পূর্বেকার স্থানগুলি নেপাল রাজ্যকে ফেরত দেওয়া হবে।"[২]

১। থর্নটন্: "গেজেটিয়ার", ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৭২৩-২৪।

২। উইলিয়াম ডিগবী: "নেপাল এণ্ড ইণ্ডিয়া", পৃঃ ৬৭।

নেপালের বিরুদ্ধে ঐ যুদ্ধের সময় অযোধ্যা রাজ্যই ছিল ইংরেজদের প্রধান ঘাঁটি। ইংরেজ বাহিনীর বেশির ভাগ সৈন্যই ছিল অযোধ্যার লোক; এ সব ছাড়াও অযোধ্যার নবাবকে সৈন্য, খাদ্যদ্রব্য, ঋণ ইত্যাদি দিয়ে ইংরেজদের সাহায্য করতে হয়েছিল। আজ ইংরেজরাই আবার গুর্খাদের বন্ধু সেজে অযোধ্যা-বাসীদের ও লক্ষ্ণৌর নবাব পরিবারের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার জন্য তাদের উত্তেজিত করতে লাগল, যেমন তারা উস্কানি দিয়েছিল শিখদের, তাদের পুরাতন শত্রু মোগল ও পুরবিয়াদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে। পাঞ্জাবের মতোই এখানেও দেওয়া হল অবাধ লুণ্ঠনের প্রলোভন। বস্তুতঃ গুর্খারাও ইংরেজ সৈন্যদের মতো লুণ্ঠিত ধনরত্ন বোঝাই হয়েই যুদ্ধের পর দেশে ফিরে গিয়েছিল।

ইংরেজকে সাহায্য করবার জন্য লক্ষ্ণৌ রেসিডেন্সীতে জঙ্গবাহাদুর ১০০ গুর্খা সৈন্য পাঠিয়েছিলেন। তারপর, তিনি জুলাই মাসে গোরখপুরে কর্নেল সমসের সিং-এর অধীনে ৩০০০ গুর্খা পাঠালেন এবং সর্বশেষে ডিসেম্বর মাসে ১০,০০০ সৈন্যের এক গুর্খা বাহিনী নিয়ে নিজেই লক্ষ্ণৌ অভিযানে অযোধ্যায় প্রবেশ করলেন। এই গুর্খা বীর গর্ব করে বলেছিলেন যে, লক্ষ্ণৌ পৌছনো পর্যন্ত তিনি ৬০০০ বিদ্রোহীকে হত্যা করেছিলেন!

গোরখপুরে পুরাতন নবাব সরকারের নাজিম মহম্মদ হাসানের নেতৃত্বে জন-সাধারণ ও সিপাহীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। এই বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধেই গুর্খাদের প্রথম যুদ্ধ হয়। তারপর ছয় মাস ধরে গোরখপুর, আজিমগড়, জুযানপুর, স্থলতানপুর, সোহনপুর ইত্যাদি স্থানে ইংরেজ ও গুর্খা বাহিনীর সঙ্গে বিদ্রোহীদের অনবরত যুদ্ধ করতে হয়। ২০শে সেপ্টেম্বর মুণ্ডোরীতে এবং ৩১শে অক্টোবর চান্দাতে যে ভয়ানক যুদ্ধ হয়, তাতে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে গুর্খাদেরই ইংরেজদের তুলনায় অনেক বেশী যুদ্ধ করতে হয়েছিল। চান্দার যুদ্ধের অধিনায়ক কর্নেল রাউটন সরকারকে লিখেছিলেন: "লেফটেনাণ্ট গম্ভীর সিং এখন ক্ষতবিক্ষত হয়ে শুয়ে আছে। এই অফিসারের সাহস সম্বন্ধে আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, যে সাহসের জন্য আমাদের দেশের লোক সর্বোচ্চ সম্মান লাভ করে থাকে। সাত জন বিদ্রোহী একটা কামান রক্ষা করছিল; এই অফিসারটি তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পাঁচজনকে কেটে ফেলে, আর দু'জন জখম অবস্থায় পালিয়ে যায়। তাঁর নিজের শরীরেও ৮ জায়গায় তলোয়ারের আঘাত লেগেছে।"[১] বিদ্রোহীরাও প্রতিটি যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব দেখিয়েছে। তারা যুদ্ধে পরাজিত হয়েও হার মেনে নেয়নি। একটা স্থানে হেরে গিয়ে আবার আর একটা স্থানে

১। ফরেস্ট: "হিষ্ট্রি ...", ২য়, পৃঃ ২৫৮।

জমায়েত হয়ে শত্রুকে আক্রমণ করেছে। যখন জঙ্গবাহাদুর স্বয়ং ১০,০০০ সৈন্য নিয়ে ১৮৫৮ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে অযোধ্যায় প্রবেশ করলেন, তখন তাঁকেও লক্ষ্মৌ পৌঁছবার পূর্বে গোরখপুর প্রভৃতি নানা স্থানে যুদ্ধ করতে হয়েছিল।

ইতিমধ্যে কানপুর থেকে ক্যাম্পবেলও লক্ষ্মৌ আক্রমণের জন্য ফেব্রুয়ারি মাস থেকে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। ইংরেজ বাহিনীগুলি কলকাতা, মাদ্রাজ ও পাঞ্জাব থেকে আসতে লাগল। দিল্লী থেকে খুব বড় একটা সীজ-ট্রেন এল, আর দুটো ৬৮ পাউণ্ডার কামান এল এলাহাবাদ থেকে। পীলের নাবিক বাহিনীও নদী দিয়ে আসতে লাগল। স্থির হল, ক্যাম্পবেল দক্ষিণ-পশ্চিম আর জঙ্গবাহাদুর ও জেনারেল ফ্র্যাঙ্ক পূর্ব দিক থেকে একই সঙ্গে অযোধ্যার রাজধানী আক্রমণ করবেন। তা ছাড়া, জেনারেল আউটরামও একটা ৫,০০০ হাজারের বাহিনী নিয়ে লক্ষ্মৌর নিকটেই আলমবাগে অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু বিদ্রোহীরা আউটরামকে সেখানে একদিনের জন্যও শান্তিতে থাকতে দেয়নি। জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি, এই দুই মাসের মধ্যে বিদ্রোহীরা ৬ বার তাঁকে ভয়ানকভাবে আক্রমণ করেছিল। এই রকম একটা আক্রমণের সময় বেগম হজরত মহল নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থেকে বিদ্রোহীদের উৎসাহ দিয়েছিলেন। এই সব আক্রমণের ফলে আউটরামের বাহিনীর এত ক্ষতি হচ্ছিল যে, তিনি আলমবাগ পরিত্যাগ করতে মনস্থ করেছিলেন। এই সব আক্রমণে বিদ্রোহীদের সাহস, বীরত্ব ও দৃঢ়চিত্ততার কোনো অভাব ছিল না। দিল্লীতে তারা যে সাহস দেখিয়েছিল, এসব ক্ষেত্রেও তার কোনো ব্যতিক্রম হয়নি। কিন্তু ঠিক দিল্লীর মতোই এই সব ক্ষেত্রেও উপযুক্ত নেতৃত্ব, সামরিক পরিকল্পনা, রণনীতি ও কৌশল (strategy and tactics), সৈনাপত্য (Generalship)—এই সমস্ত গুণগুলির খুবই অভাব ছিল।

ফরেস্ট আলমবাগের যুদ্ধ সম্বন্ধে লিখেছেন: "সিপাহীরা তাদের অত্যধিক মৃত্যু-সংখ্যার দ্বারাই প্রমাণ করেছে যে, তাদের সাহসের কোনো অভাব ছিল না। দিল্লীর মতো এখানেও তাদের যেটার অভাব ছিল, সেটা হচ্ছে নেতৃত্ব। তারা যদি যুদ্ধবিদ্যায় জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের নেতৃত্ব পেত, তা হলে ইংরেজ সেনানায়কের পক্ষে তাঁর ঘাঁটি রক্ষা করা ও কানপুরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা খুবই কঠিন হত।"[১]

ইংরেজের আক্রমণ যতই নিকটবর্তী হতে লাগল, বিদ্রোহী সরকারের লক্ষ্মৌ সুদৃঢ় করার কাজও ততই দ্রুত অগ্রসর হতে লাগল। তিন মাস ধরে হাজার হাজার লোক এই কাজে নিযুক্ত ছিল। কাইজারবাগ ও রাজপ্রাসাদের ৪ মাইল

১। "হিস্ট্রি অব দি ইণ্ডিয়ান মিউটিনি", ২য়, পৃঃ ২৯০।

পরিধিকে একটা সুরক্ষিত দুর্গে পরিণত করা হল। শহরের পূর্বদিকে গোমতী থেকে যে খাল দক্ষিণে চলে গিয়েছে, সেটাকেই করা হল আত্মরক্ষার প্রথম লাইন; সেটাকে আরও গভীর করা হল, সেতুগুলি সব ভেঙে দেওয়া হল। গোমতী থেকে শুরু করে চরবাগ পর্যন্ত খালের ধার দিয়ে বুরুজ সমেত এক বিরাট মাটির প্রাচীর তৈরি করা হল এবং এই খালের উপর ৩টি রাস্তার সংযোগ স্থানে শক্তিশালী কামানের ব্যাটারি প্রস্তুত করা হল। দ্বিতীয় লাইন গোমতী থেকে শুরু হয়ে মোতি মহলের সামনে দিয়ে শহরের প্রধান রাস্তা হজরতগঞ্জ পর্যন্ত। সর্বশেষ তৃতীয় লাইন হল সমকোণ হয়ে খাল থেকে কাইজারবাগ পর্যন্ত।

এই সব বিভিন্ন স্থানগুলিতে ১৩০টা কামান বসানো হয়েছিল। এ সব বিশেষ ব্যবস্থা ছাড়াও প্রত্যেকটি বাড়িও সুরক্ষিত করা হল এবং দেওয়ালগুলিতে ছিদ্র করা হল। প্রতিটি গেটে ও রাস্তার মোড়ে মোড়ে বুরুজ ও ব্যারিকেড তৈরী হল। এই সব আত্মরক্ষার ব্যবস্থাগুলি যে খুবই মজবুত হয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তাতে একটা মস্ত বড় ফাঁক থেকে গিয়েছিল। যাতে পিছন দিক থেকে গোমতী পার হয়ে শত্রু পশ্চাদ্‌ভাগ আক্রমণ না করতে পারে, তার কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়নি এবং শত্রুরা বিদ্রোহীদের এই দুর্বলতার সুযোগ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেছিল।

২রা মার্চ ক্যাম্পবেল লক্ষ্ণৌ আক্রমণ শুরু করলেন। সেই দিনই তিনি দিলখুসা অধিকার করলেন। ৪ঠা মার্চ ইংরেজরা রাত্রিতে গোমতীর উপর দুটি সেতু নির্মাণ করতে সক্ষম হল। ৫ই তারিখে জেনারেল ফ্র্যাঙ্ক এসে পৌছলেন। ক্যাম্পবেলের এখন মোট সৈন্যসংখ্যা হল ২৫,৬৬৪ ও কামান ১৬৪—"এ পর্যন্ত ভারতে এটাই সব থেকে বড় ও সব থেকে উৎকৃষ্ট সৈন্য বাহিনী।"[১] রাত্রির গভীর অন্ধকারের মধ্যে ক্যাম্পবেল ও আউটরাম উভয়েই নদী পার হলেন ও ৯ই তারিখে লা মার্টিনিয়ের ও ছক্কর মঞ্জিল দখল করলেন। ১০ই তারিখে জঙ্গবাহাদুর ১০,০০০ গুর্খা সঙ্গে নিয়ে পৌছলেন। পরদিন সমস্ত দিনব্যাপী ভয়ঙ্কর যুদ্ধের পর বেগমকুঠি বিদ্রোহীদের হস্তচ্যুত হল। প্রতিটি প্রাঙ্গণে, প্রতিটি কামরায় বিদ্রোহীরা শেষ পর্যন্ত লড়েছিল। "মধ্যস্থলের প্রাঙ্গণে ৮৬০ জন বিদ্রোহীর শবদেহ পাওয়া গিয়েছিল। কেউ জীবন ভিক্ষা চায়নি, দেওয়াও হয়নি।"[২] প্রাঙ্গণের মধ্যে যখন ভয়ঙ্করভাবে সম্মুখ যুদ্ধ চলেছে, তখন ইংরেজরা কি রকম বীরত্ব দেখিয়েছিল, তার একটি নিদর্শন হলো এই: "পাইপ-মেজর জন ম্যাকলিয়ড

১। ফরেষ্ট: পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৩১৭।

২। ফোরবস্‌-মিচেল: "মাই রেমিনিসেন্সেস্‌ অব ইণ্ডিয়ান মিউটিনি", পৃঃ ২১০।

প্রাঙ্গণের ভিতর এমনভাবে সানাই বাজাচ্ছিলেন যে, সকলের মনে হয়েছিল যেন তিনি বাহিনীর উৎসবের সময় অফিসারদের মেসের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।"[১] বেগমকুঠির যুদ্ধে মোগল শাহজাদাদের হত্যাকারী হড্‌সনের মৃত্যু হয়। "শিবিরে সকলেই জানত যে, লুট করবার সময় হডসন্ নিহত হয়।"[২]

১৯শ তারিখে ইংরেজরা বিদ্রোহীদের শেষ ঘাঁটি মুসাবাগ দখল করল। কিন্তু ফয়জাবাদের মৌলভী তখনও আশা ছেড়ে দেননি। তিনি একদল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোক নিয়ে ২২শ তারিখ পর্যন্ত যুদ্ধ করলেন। ইংরেজরা মৌলভীকে ঘেরাও করে ফেলবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু অবশিষ্ট ২০,০০০ বিদ্রোহী নিয়ে তিনি লক্ষ্ণৌ ত্যাগ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ২০ দিনব্যাপী যুদ্ধের পর ২২শে মার্চ লক্ষ্ণৌ পুনরায় সম্পূর্ণরূপে ইংরেজদের হস্তগত হল।

এই কয়দিন বেগমকে যুদ্ধক্ষেত্রের সর্বত্রই দেখা গিয়েছিল। মুসাবাগের যুদ্ধেও তিনি উপস্থিত ছিলেন। মুসাবাগের পতনের পর তিনি লক্ষ্ণৌ ত্যাগ করেন। লক্ষ্ণৌর যুদ্ধে আরও অনেক স্ত্রীলোককে অংশ গ্রহণ করতে দেখা গিয়েছিল। একজন ইংরেজ অফিসার সেকেন্দরাবাগের কয়েকজন 'এমাজন নিগ্রেস্'-এর কথা এই বলে উল্লেখ করেছেন: "তারা হিংস্র বিড়ালের মতো যুদ্ধ করেছিল এবং তারা যে স্ত্রীলোক তা তারা নিহত হবার পূর্বে বোঝা যায়নি।"[৩] আর একজন অফিসার একজন বৃদ্ধার কথা বলেছেন। লক্ষ্ণৌর পতনের পর লৌহ-সেতুর উপর তাঁর মৃতদেহ পাওয়া যায়; তাঁর হাতের পাশে সল্‌তের মত আংশিক পোড়া একটুকরা কাপড় পড়ে ছিল এবং তাঁর মৃতদেহের পাশে পড়ে ছিল একটা বাঁশ—যার ভিতর ছিল বোমার সল্‌তে। এই বাঁশটা প্রকাণ্ড একটা 'মাইনে'র সঙ্গে সংযুক্ত ছিল।[৪]

দিল্লীর পতনের পর ঐ শহরে যা ঘটেছিল, লক্ষ্ণৌতেও তাই ঘটল—অবাধ লুণ্ঠন, হত্যা, ধ্বংস। সর্বত্র উত্তেজিত ইংরেজ, গুর্খা, শিখ ও পাঠানরা সব হিংস্র জন্তুর মত ঘুরে বেড়াচ্ছিল। "লক্ষ্ণৌর যেদিকে তাকানো যেত, সেখানেই যে দৃশ্য চোখে পড়ত, তা বর্ণনা করার ভাষা খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। হজরতগঞ্জ, ইমামবাড়া এবং কাইজারবাগের মধ্যে ও চারপাশে যে উন্মত্ত ধ্বংস ও অরাজকতা চলেছিল, তা একমাত্র নরকেই সম্ভব। 'লুণ্ঠনের মাতলামি'—কথাটা পূর্বে

১। ঐ, পৃঃ ২১০।

২। রবার্টস্: "ফর্‌টি-ওয়ান ইয়ার্স ইন ইণ্ডিয়া," ১ম, পৃঃ ৪০৪।

৩। গর্ডন আলেকজাণ্ডার: "রিকলেকসন্‌স অব এ সাবঅল্টার্ন।"

৪। ম্যাজেণ্ডি: "আপ এমাং দি প্যানডিজ", পৃঃ ২৩৬-৩৮।

শুনেছিলাম, এবার চোখের সামনে তার সত্যিকারের পরিচয় পেলাম। সৈন্যরা লুণ্ঠনে উন্মত্ত ও উত্তেজনায় হিংস্র হয়ে উঠল ; তাদের পিছনে পিছনে শিবির-সহচরের দল—যারা যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে অতি কাপুরুষ, কিন্তু গৃধিনীর মতো ক্ষুধার্ত—পরাজিত শত্রুর মৃতদেহের উপর সকলেই সমানভাবে লাফিয়ে পড়ল।"[১]

লক্ষ্ণৌর লুণ্ঠনের পরিমাণ কত হয়েছিল, তা কয়েকটি উদাহরণ থেকেই কিছুটা বোঝা যায়। ৯৩ম হাইল্যাণ্ডার্স বাহিনী (স্কটিশ) সোনা ও হীরা দিয়ে তৈরী লক্ষ লক্ষ টাকা মূল্যের তাজিয়াটা লুট করল—"তার অর্ধচন্দ্র ও নক্ষত্রটার দামই ছিল ৫ লক্ষ টাকা।"[২] ঐ বাহিনীর একজন লেফটেনান্টের অংশে হীরা ও মূল্যবান পাথর দিয়ে তৈরী তাজিয়ার গম্বুজটা পড়েছিল। কিছুকাল পরে লণ্ডনে ঐটি ৮০,০০০ পাউণ্ডে (৮ লক্ষ টাকায়) বিক্রি হয়।[৩] ফোরবস্-মিচেল বলেছেন : "আমি একজনের নাম করতে পারি, যিনি লক্ষ্ণৌ লুণ্ঠনের দু' বৎসরের মধ্যেই তাঁর ১৮০,০০০ পাউণ্ডে (১৮ লক্ষ টাকায়) বন্ধকী সম্পত্তিটা মুক্ত করতে পেরেছিলেন।"[৪] ফোরবস্-মিচেলও উক্ত বাহিনীর একজন সার্জেণ্ট ছিলেন। লুটের অংশে তিনি নিজে কতটা ভাগ বসিয়েছিলেন, সে সম্বন্ধে তিনি কোনো উচ্চবাচ্য না করলেও, তাঁর কাহিনী থেকে তা কতকটা আন্দাজ করা যায়। যুদ্ধের পর যখন জাহাজে করে মিচেল গার্ডেনরীচে পৌঁছলেন, তখন একজন সৈন্য তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ফোরবস্-মিচেল, ঐ রকম একটা প্রাসাদের মালিক হলে তোমার কি রকম লাগবে ?" মিচেল অন্যমনস্কভাবে তার জবাব দিয়েছিলেন, "ভারতবর্ষ ত্যাগ করবার পূর্বে আমি ঐ প্রাসাদের ও বাগানের মালিক হব।" কিছুকাল পরে মিচেল ডায়মণ্ডহারবারে ঐ প্রাসাদটি কিনেছিলেন ও তার পাশে একটা পাটকল স্থাপন করেছিলেন।[৫] ঐ বাহিনীরই ডোবিন নামক আর একজন সার্জেণ্ট কানপুর রেলওয়ে হোটেলের মালিক হয়েছিলেন।[৬] এই সব ব্যক্তিগত লুট ছাড়াও

১। ফোরবস্-মিচেল : পৃঃ ২২৯। লণ্ডন টাইমসের প্রতিনিধি প্রত্যক্ষদর্শী রাসেল তাঁর 'মাই ডায়েরি ইন ইণ্ডিয়া'তে এই বীভৎস ঘটনার সজীব বর্ণনা দিয়েছেন।

২। ফোরবস্-মিচেল : "মাই রেমিনিসেন্স অব ইণ্ডিয়ান মিউটিনি", পৃঃ ২২৬।

৩। ঐ, পৃঃ ২২৭। ৪। ঐ, পৃঃ ২২৮। ৫। ঐ, পৃঃ ৮।

৬। ঐ, পৃঃ ৪৭। সকল সৈন্যই যে করিতকর্মা ছিল, তা নয়। অনেকে লুটপাট করতে পারেনি, কিম্বা করবার চেষ্টা করেননি। "আমি নিজেই এক ডজনের বেশী লোকের নাম করতে পারি, যারা সব যুদ্ধেই লড়েছিল এবং তাদের মধ্যে দুজন ভিক্টোরিয়া ক্রশেও ভূষিত হয়েছিল, যাদের দেশের আমস্-হাউসে (দানশালায়) মৃত্যু হয়েছিল এবং কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছিল ক্যালকাটা ডিস্ট্রিক্ট্ চ্যারিটেবল সোসাইটির দানশালায়।" (ঐ, পৃঃ ২২৯)।

সরকারীভাবে যেসব 'পুরস্কার' সংগ্রহ করা হয়েছিল, সে সম্বন্ধে মিচেল বলেছেন : "আমরা লক্ষ্ণৌ পরিত্যাগ করার পূর্ব পর্যন্ত 'প্রাইজ-এজেন্ট'রা যে সমস্ত লুট সংগ্রহ করেছিল, লণ্ডন টাইম্‌স্‌-এর মতে (৩১শে মে, ১৮৫৮) তার মূল্য স্থির করা হয়েছিল ৬০ লক্ষ টাকা, কিন্তু এক সপ্তাহ পরে তার পরিমাণ হয়েছিল এক কোটি পঁচিশ লক্ষ টাকা।" তারপর, শিবির-সহচররা যা লুট করেছিল, সেগুলি কেড়ে নেওয়া হল। তার মূল্যও এক কোটি ২৫ লক্ষ টাকার কম নয়।[১]

১। ফোরবস্‌-মিচেল : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২২৮।

রোহিলখণ্ড

লক্ষ্ণৌ দখল করার পর, ক্যাম্পবেল রোহিলখণ্ড আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হলেন। ১৭৭৪ সালে ইংরেজ ও অযোধ্যার নবাবের দ্বারা রোহিলখণ্ড আক্রান্ত হলে হাফিজ রহমত খানের নেতৃত্বে রোহিলারা যুদ্ধ করে। হাফিজ রহমত সেই যুদ্ধে নিহত হন ও রোহিলখণ্ড অযোধ্যা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়, কিন্তু ১৮০১ সালে ইংরেজরা সরাসরিভাবে এই প্রদেশ নিজেদের রাজ্যভুক্ত করে নেয়। সেই বৎসরই ইংরেজদের বিরুদ্ধে রোহিলারা বিদ্রোহ করেছিল।

মিরাট ও দিল্লীর বিদ্রোহের পর থেকেই রোহিলখণ্ডের বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ হতে শুরু করে। ১৯শে মে মোরাদাবাদে ২৯ম বাহিনী বিদ্রোহ করে ও ৩১শ তারিখে বেরিলি ব্রিগেডও বিদ্রোহে যোগ দেয়। বিদ্রোহ করার সঙ্গে সঙ্গে সিপাহীরা দিল্লী কিম্বা লক্ষ্ণৌ চলে যায়। হাফিজ রহমত খানের পৌত্র, প্রায় ৮০ বৎসরের বৃদ্ধ খান বাহাদুর খান, দিল্লীর বাদশাহের অধীনে রোহিলখণ্ডে বিদ্রোহী সরকার স্থাপন করলেন। বিদ্রোহের প্রথম দিকেই শক্তিশালী রাজপুত ঠাকুররা বিদ্রোহে যোগ দিয়ে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে নিলেন। খান বাহাদুর খানের মন্ত্রিসভায় একজন ব্যতীত সকলেই ছিলেন হিন্দু। রাজপুতদের নেতা জয়মল সিং ছিলেন তাঁর দক্ষিণ হস্ত, আর শোভারাম ছিলেন অর্থমন্ত্রী। তা ছাড়া আর একটি কমিটি গঠিত হয়েছিল, তাতে ছিল ৬ জন মুসলমান ও ২ জন হিন্দু। এই কমিটির প্রধান দায়িত্ব ছিল দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা।[১]

শাসনভার গ্রহণ করেই খান বাহাদুর খান গোহত্যা বন্ধ করবার আদেশ দিলেন। বেরিলি ব্রিগেড দিল্লী চলে যাবার সময় বেরিলির রাজকোষ সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল। তার ফলে রোহিলখণ্ডেও দিল্লীর মতোই ধনীদের নিকট থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে হয়েছিল। এই সব ধনীদের বেশির ভাগই ছিল হিন্দু এবং

১। ইংলিশ: "রিপোর্ট", পৃঃ ৬।

এদের অনেকে ছিল ইংরেজের বন্ধু, কারণ ইংরেজের আমলেই এরা তাদের ধন-দৌলত, বাড়িঘর, জায়গা-জমি—সবই করেছিল। মিহির বৈজনাথ ও কুনজেত লালের নিকট থেকে একবার বিদ্রোহী সরকার ৫৪,০০০ টাকা নিয়েছিল ; পরে আরও দু' একবার তাদের টাকা দিতে হয়েছিল। এদিকে কিন্তু বৈজনাথের সঙ্গে সর্বদাই ইংরেজের যোগাযোগ ছিল এবং সে তার অনুচরের দ্বারা গুরুত্বপূর্ণ খবরা-খবর নিয়মিত তাদের সরবরাহ্ করত।[১] এর পুরস্কার স্বরূপ, বিদ্রোহ শেষ হয়ে যাবার পর, ইংরেজ সরকার তাকে বড় জমিদারি দিয়ে 'রাজা' খেতাবে ভূষিত করে! এই শ্রেণীর 'হিন্দু'দের নিকট খান বাহাদুর খানের 'মুসলমান' সরকার যে খুব জনপ্রিয় ছিল না, তা সহজেই অনুমেয়।

এরূপ একটা অদ্ভুত পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ইংরেজরা যে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে বিদ্রোহীদের দুর্বল করবার চেষ্টা করবে, তা খুবই স্বাভাবিক। সাম্প্রদায়িকতা ও জাতিবৈষম্যকে ইংরেজরা সর্বত্রই তাদের একটা প্রধান অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করবার চেষ্টা করেছে—রোহিলখণ্ডে ও বেরিলিতেও সে চেষ্টার কোনো ত্রুটি হয়নি। রোহিলখণ্ডের জনসংখ্যার একটা বড় অংশ ছিল রাজপুত ; এবং অতীতে এই রাজপুতদের সঙ্গে রোহিলা পাঠানদের সংঘর্ষও অনেকবার হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে পরিবর্তিত সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থায় সে প্রাচীন বিরোধ-সংঘর্ষের স্থানও ছিল না, অর্থও ছিল না। বিদ্রোহের সময় ইংরেজরা সেই পুরাতন স্মৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করে রাজপুত ঠাকুরদের খান বাহাদুর খানের সরকারের বিরুদ্ধে কাজে লাগাবার যথেষ্ট চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাতে তারা একেবারেই সফল হয়নি। বরং অনেকেই সক্রিয়ভাবে বিদ্রোহেই যোগ দিয়েছিল এবং অনেকে ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রাণও দিয়েছিল।

বিদ্রোহী বাহিনীগুলি যখন রোহিলখণ্ড ছেড়ে চলে গেল, তখন তারা তাদের কামান ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রগুলিও সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল। তার ফলে খান বাহাদুর খানের বিদ্রোহী সরকারের যেমন কোনো অর্থও ছিল না, তেমনি কোনো সুশিক্ষিত সৈন্য কিম্বা অস্ত্রশস্ত্রও ছিল না। জনসাধারণকে নিয়েই খান বাহাদুর খানকে নতুন সৈন্যবাহিনী গঠন করতে হয়েছিল। ইংরেজরা তাদের গুপ্তচরদের মারফত বিশ্বস্তসূত্রে এই সম্বন্ধে যে খবর পেয়েছিল, তা হচ্ছে এই :

"খান বাহাদুর খান বেরিলিতে দুটি কামান, ১০টি পল্টন ও কিছু অশ্বারোহী রেখেছেন। সমগ্র রোহিলখণ্ডের জন্য আছে ৩০টি পল্টন (প্রতিটি পল্টনের সৈন্য-সংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন) ও ২১টি কামান। এই বাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র কিছু নেই।

১। ইংলিশ : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৫।

কিছু লোকের বন্দুক আছে, আর সব লোকের আছে তলোয়ার, বল্লম ইত্যাদি। এদের অনেকেই বন্দুক ছুঁড়তে জানে না। তাঁর গোলন্দাজরাও বিশেষ পটু নয়। নেটিভ গোয়েন্দাদের মারফত এইটুকুই জানা গিয়েছে।"[১]

খান বাহাদুর খান যে গেরিলা যুদ্ধ-নীতির উপরই বেশী জোর দিতে চেয়েছিলেন, তা তাঁর নিম্নলিখিত ঘোষণা থেকেই বেশ বোঝা যায়:

"শত্রু বাহিনীর সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধ এড়িয়ে চলবে, কারণ, তাদের বাহিনীগুলি তোমাদের চাইতে অনেক বেশী শক্তিশালী ও তাদের শৃঙ্খলা অনেক বেশী। তা ছাড়া, তাদের অনেক কামান আছে। কিন্তু তাদের গতিবিধির দিকে লক্ষ্য রাখবে; নদীর সব ঘাটগুলিতে ভাল করে পাহারা দেবে; তাদের যানবাহন ধ্বংস করবে; তাদের সাজসরঞ্জাম, খাদ্যদ্রব্য কেড়ে নেবে; তাদের পিকেট ও ডাকগাড়ি বিচ্ছিন্ন করে দেবে; তাদের ক্যাম্পের কাছাকাছি থাকবে; আর তাদের এক মুহূর্তও শান্তিতে থাকতে দেবে না।"

১৮৫৮ সালে এপ্রিল মাসে ৪টি বিভিন্ন ইংরেজ বাহিনী চারদিক দিয়ে রোহিলখণ্ড আক্রমণ শুরু করে। এদের একটি বাহিনী জেনারেল ওয়ালপোলের অধীনে ১৫ই এপ্রিল রাজপুত রাজা নিরপত সিং-এর রুইয়া দুর্গ আক্রমণ করে। ওয়ালপোলের বাহিনী ছিল ইংরেজদের একটা শ্রেষ্ঠ বাহিনী; তাতে ছিল ৪২ম, ৭৯ম, ৯৩ম ক্রাইমিয়া যুদ্ধের অভিজ্ঞ ইংরেজ বাহিনীগুলি ও একটি পাঞ্জাব বাহিনী। কিন্তু ইংরেজের এই আক্রমণ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল এবং অসংখ্য হতাহতের পর ইংরেজ বাহিনীকে ক্যাম্পে ফিরে যেতে হয়েছিল। নিহতদের মধ্যে ছিলেন ইংরেজদের একজন শ্রেষ্ঠ ও জনপ্রিয় অফিসার ব্রিগেডিয়ার এড্রিয়ান্ হোপ এবং আরও অনেক অফিসার। "মৃতদের কবর দেবার পর সৈন্যরা এত উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল যে, তখন যদি কোনো নন্‌কমিশনড্ অফিসার নেতৃত্ব দিত, তা হলে জেনারেল ওয়ালপোলের জীবন এক মুহূর্তে শেষ হয়ে যেতে পারত।"[২] নিরপত সিং এই পরাজিত ও ভগ্নোদ্যম ইংরেজ বাহিনীকে পুনরায় আক্রমণ করার পরিবর্তে, রাতের অন্ধকারে দুর্গ পরিত্যাগ করে চলে গেলেন। রুইয়ার যুদ্ধের আর একটি দ্রষ্টব্য বিষয় হচ্ছে এই যে, এখানে একজন ইউরোপীয় বিদ্রোহীকে খুব কৃতিত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করতে দেখা গিয়েছিল এবং একজন ইংরেজ অফিসারের মতে তাঁর গুলীতেই এড্রিয়ান্ হোপ নিহত হন। তিনি আরও মনে করেন যে, এই ইউরোপীয়টি ছিলেন একজন রুশ।[৩]

১। মুইর: "রেকর্ডস্ অব দি ইনটেলিজেন্স ডিপার্টমেণ্ট", ১ম, পৃ: ২১৮।

২। ফোরবস্-মিচেল: "মাই রেমিনিসেন্সেস্ অব ইণ্ডিয়ান মিউটিনি," পৃ: ২৪৬।

৩। ঐ. পৃ: ২৭৯।

৫ই মে ইংরেজ বাহিনীগুলি বেরিলি শহর আক্রমণ করল। রোহিলা গাজীদের অপূর্ব বীরত্বকাহিনীর জন্য বেরিলির যুদ্ধ ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ফরেস্ট একটা যুদ্ধের এইভাবে বর্ণনা দিয়েছেন :

"রোহিলারা যে রকম দৃঢ়তার সঙ্গে আমাদের বাম পার্শ্বের ব্যূহ ভেদ করে আমাদের আক্রমণ করল, তা ভারতের এই বিদ্রোহের ইতিহাসে অতুলনীয়। ··· রোহিলারা সোজা গিয়ে আমাদের একটি সেরা বাহিনী, ৪র্থ পাঞ্জাব বাহিনীর উপর আক্রমণ করল ও তাদের ছত্রভঙ্গ করে পিছনে হটিয়ে দিল। পিছনেই ছিল কমাণ্ডার-ইন-চীফের সঙ্গে ৪২ম হাইল্যাণ্ডরারা। ··· তলোয়ার উঁচু করে তীব্র গতিতে ঐ উন্মত্তের দল এক মুহূর্তের মধ্যে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, একদল তাদের কেন্দ্র আক্রমণ করল, আর একদল তাদের বাম পার্শ্ব আক্রমণ করে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে পশ্চাদ্‌ভাগে আক্রমণ শুরু করল। অনেকক্ষণ ধরে বেয়নেটে আর তলোয়ারে লড়াই হল। ··· জেনারেল ওয়ালপোল গুরুতরভাবে আহত হলেন, আরও কয়েকজন ইংরেজ এসে পড়াতেই তিনি বেঁচে গেলেন। ··· রোহিলারা প্রত্যেকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়ে প্রাণ দিয়েছিল।"[১]

রোহিলা গাজীদের মধ্যে "কেউই পালাবার চেষ্টা করেনি ; হয় মারবে, নয়ত মরবে—তারা নিশ্চয়ই এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে এসেছিল।"[২] এই রকম গাজীদের একটা আক্রমণে স্বয়ং কমাণ্ডার-ইন-চীফেরই প্রাণ যেতে উপক্রম হয়েছিল। একজন আহত গাজী মৃতবৎ মাটিতে পড়ে ছিল, ক্যাম্পবেল যখন তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, সেই সময় সেই গাজী তার তলোয়ার তুলে তাঁকে আঘাত করতে যাচ্ছিল—এমন সময় একজন শিখ সর্দার তার মাথা কেটে ফেলেছিল।[৩] মোগল শাহজাদা ফিরোজ শাহ বেরিলির কয়েকটা আক্রমণে নিজে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর এই রকম আক্রমণে টাইম্‌স্-প্রতিনিধি রাসেলও এইভাবে মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন, কিন্তু ধাক্কা সামলাতে তাঁকে বেশ কিছুদিন হাসপাতালে কাটাতে হয়েছিল।[৪]

দু দিন এইভাবে যুদ্ধ করার পর, ইংরেজরা ৭ই মে তারিখে বেরিলি অধিকার করল। খান বাহাদুর খান অন্যত্র আরও কতকগুলি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে নানা সাহেব প্রভৃতির সঙ্গে ১৮৫৯ সালের শেষভাগে নেপাল প্রবেশ করেন। জঙ্গবাহাদুরের সৈন্যদের হাতে তিনি বন্দী হন, কিন্তু সেখান থেকে পালিয়ে ছদ্মবেশে বেরিলিতে ফিরে আসেন। কিছুদিন পরে কোতোয়াল তাহির বেগের হাতে তিনি আবার ধরা পড়েন ও ইংরেজের বিচারালয়ে তাঁর প্রাণদণ্ড হয়।

১। ফরেষ্ট : "হিষ্ট্রি···" ৩য়, পৃঃ ৩৬৯-৭০। ২। ফোরবস্-মিচেল : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২৫৫।
৩। ফরেষ্ট : "হিষ্ট্রি···" ৩য়, পৃঃ ৩৭১। ৪। ফোরবস্-মিচেল : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২৫৬।

অযোধ্যার গণযুদ্ধ

লক্ষ্ণৌ শহরে পরাজিত হয়ে বিদ্রোহীরা সমগ্র অযোধ্যায় ছড়িয়ে পড়ল। ক্যাম্পবেল যখন বেরিলির যুদ্ধে ব্যস্ত, তখন একদল সৈন্য নিয়ে ফয়জাবাদের মৌলভী তাঁকে পশ্চাৎ থেকে আক্রমণ করবার জন্য অগ্রসর হয়েছিলেন। সাজাহানপুরে ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়। বেরিলির পরাজয়ের পর মৌলভী অযোধ্যায় ফিরে যাবার জন্য প্রস্তুত হন। অযোধ্যা-রোহিলখণ্ডের সীমানায় ৫ই জুন পোভেইন নামক স্থানে তিনি একজন ইংরেজভক্ত রাজার দুর্গ আক্রমণ করেন। একটা হাতীর উপর বসে যখন তিনি দুর্গের গেট ভাঙবার চেষ্টা করছিলেন, তখন শত্রু-পক্ষের গুলীর আঘাতে তিনি নিহত হন। তারপর মৌলভীর মাথাটা কেটে রাজভক্ত রাজা সাজাহানপুরের ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠিয়ে দেন। ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট ঐ মাথাটি কোতোয়ালির সামনে অনেক দিন ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। পুরস্কার স্বরূপ রাজা ৫০,০০০ টাকা পেয়েছিলেন! মৌলভীর মৃত্যুতে বিদ্রোহীরা তাদের একজন শ্রেষ্ঠ নেতাকে হারাল। ম্যালিসন ফয়জাবাদের মৌলভীর সম্বন্ধে লিখেছিলেন:

"দেশপ্রেমিক যদি তিনিই হন, যিনি তাঁর মাতৃভূমির স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য ষড়যন্ত্র করেন ও যুদ্ধ করেন, তা হলে মৌলভী নিশ্চয়ই একজন প্রকৃত দেশ-প্রেমিক ছিলেন। তিনি কোনো হত্যার দ্বারা তাঁর তরবারি কলঙ্কিত করেননি, কিম্বা কোনো হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতও হননি। যে বিদেশীরা অন্যায়ভাবে তাঁর দেশের স্বাধীনতা অপহরণ করেছে ও তাঁর দেশকে দখল করেছে, তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে মানুষের মতো, সম্মানজনকভাবে ও দুর্দান্তভাবে লড়েছেন। সর্বদেশের সাহসী ও সৎ প্রকৃতির মানুষেরই তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা উচিত।"[১]

১। ম্যালিসন: "হিষ্ট্রি অব ইণ্ডিয়ান মিউটিনি," ২য়, পৃঃ ৫৪১।

লক্ষ্ণৌ ও রোহিলখণ্ড জয় করার পর অযোধ্যার বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য ২রা নভেম্বর ১৮৫৮ সালে ইংরেজদের অভিযান শুরু হল। ফতেগড় থেকে একটি বাহিনী, সাজাহানপুর থেকে একটি, গোরখপুর থেকে একটি এবং এলাহাবাদের নিকট সোরাওন থেকে স্বয়ং কমাণ্ডার-ইন-চীফের বাহিনী—এইভাবে চারটি বাহিনী বিদ্রোহীদের ধ্বংস করতে করতে নেপালের জঙ্গলে ম্যালেরিয়া ও হিংস্র জন্তুর মুখে ঠেলে নিয়ে যাবে—এই ছিল ইংরেজ সরকারের প্ল্যান।

লর্ড ক্লাইভ (কলিন ক্যাম্পবেলের 'লর্ড' উপাধিতে ভূষিত হবার পর নতুন নাম), ওয়েদারঅল ও গ্র্যাণ্ট হোপ একসঙ্গে ৩রা নভেম্বর বৈশওয়ারার খানপুরিয়া রাজপুত রাজাদের রামপুর-কুশিয়ার শক্তিশালী দুর্গ আক্রমণ করলেন। তারপর ৭ই তারিখে আসেথীর রাজার দুর্গ আক্রান্ত হল। রাজা ইংরেজের নিকট আত্ম-সমর্পণ করলেন, কিন্তু বিদ্রোহীরা তিন দিন ধরে শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করল, তারপর ১১ই তারিখে রাতের অন্ধকারে দুর্গ ত্যাগ করে চলে গেল।

সেখান থেকে বিদ্রোহীরা শঙ্করপুরের রাজা বেণীমাধবের পতাকা তলে সমবেত হয়েছিল। অযোধ্যার রাজপুত রাজাদের মধ্যে বেণীমাধবই ছিলেন সব থেকে শক্তিশালী ও ইংরেজবিরোধী। এখনও অযোধ্যার লোকেরা গ্রামে গ্রামে বেণী-মাধবের শৌর্য-বীর্য ও স্বদেশপ্রেমের কথা গানের মধ্য দিয়ে স্মরণ করে থাকে।

এদিকে ক্লাইভের বাহিনী আবার তিন দিক থেকে ১৫ই নভেম্বর শঙ্করপুর ঘেরাও করে ফেলল। শঙ্করপুর সম্বন্ধে একজন ঐতিহাসিক বলেছেন: "এটা একটা গৌরবময় দেশ এবং অসংখ্য গ্রাম, শস্যক্ষেত্র, প্রচুর ফলের বাগান, আখের ক্ষেত, গরুবাছুর ও সর্বপ্রকারের শাকসবজিতে পরিপূর্ণ।"[১]

ইতিমধ্যে ২রা নভেম্বর ক্লাইভ বিদ্রোহীদের আত্মসমর্পণ করতে আহ্বান জানিয়ে একটা ঘোষণাপত্র প্রচার করেছিলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন: "যেখানে বিদ্রোহীরা আত্মসমর্পণ করবে, সেখানে বাড়ি-ঘর, শস্য, সবই ঠিক থাকবে, শহরে কিম্বা গ্রামে কোথায়ও লুটপাট হবে না। কিন্তু যেখানে বিদ্রোহীরা প্রতিরোধ করবে, কিম্বা আমাদের বিরুদ্ধে একটা গুলীও ছুঁড়বে, সেখানে অধিবাসীদের ভাগ্যে যা আছে তাই ঘটবে। তাদের বাড়ি-ঘর সব কিছু লুট হবে ও তাদের গ্রামগুলি জ্বালিয়ে দেওয়া হবে। তালুকদার থেকে সব চেয়ে গরীব প্রজা পর্যন্ত, সকলের প্রতিই এই ঘোষণা প্রযোজ্য।"[২]

ক্লাইভ এই ঘোষণাপত্রটি বেণীমাধবের নিকট পাঠিয়ে দিয়ে তাঁকে আত্মসমর্পণ করতে বললেন। "রাজপুত রাজা উত্তর দিলেন যে, তিনি নিজে আত্মসমর্পণ

১। ফরেষ্ট: "হিষ্ট্রি…", ৩য়, পৃঃ ৫১৬। ২। ঐ, পৃঃ ৫১২।

করতে পারেন না, কারণ তাঁর দেহ তাঁর নিজের নয়, তা হচ্ছে তাঁর দেশের রাজার ; রাজার আদর্শের জন্য তিনি লড়তে বাধ্য। কিন্তু তিনি তাঁর দুর্গ সমর্পণ করতে রাজী আছেন, কারণ তা তাঁর নিজের।"[১]

ক্লাইভ বেণীমাধবকে একেবারে ঘেরাও করে ফেলবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু বেণীমাধব তাঁর লোকজন নিয়ে মাঝরাতে রায়বেরিলির উত্তর-পশ্চিমের জঙ্গলে চলে গেলেন। যখন ইংরেজরা শঙ্করপুরের বিশাল দুর্গের ভিতর প্রবেশ করল, তখন সেখানে কয়েকজন পুরোহিত ও ফকির ছাড়া আর কেউ ছিল না।

রায়বেরিলিতে এসে ক্লাইভ 'সঠিক' খবর পেলেন যে, বেণীমাধবকে একই দিনে একই সময়ে ৩১টি বিভিন্ন স্থানে দেখা গিয়েছিল! যাই হোক, কানপুরের ২০ মাইল উত্তরে দুন্দিয়াখেরা নামক একটা স্থানে ক্লাইভ গঙ্গার উপর বেণী-মাধবকে আবার আক্রমণ করলেন। অনেকক্ষণ যুদ্ধের পর আবার শত্রুর চোখে ধুলো দিয়ে তিনি দুন্দিয়াখেরা পরিত্যাগ করলেন। তাঁকে পুনরায় ঘেরাও করবার জন্য ক্লাইভ অনেক চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু নভেম্বর মাসের শেষদিকে বেণীমাধব গোগরা নদী পার হয়ে উত্তরে চলে গেলেন।

ব্রিগেডিয়ার এভেলে ২রা ডিসেম্বর লক্ষ্ণৌর ২০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে কয়েক ঘণ্টাব্যাপী একটা যুদ্ধের পর ওমেরিয়ার দুর্গ দখল করলেন। ওমেরিয়ার দুর্গ ধূলিসাৎ করে দিতে ইংরেজদের তিন দিন লেগেছিল। উত্তরে মেহেন্দী থেকে ব্রিগেডিয়ার টুপ, আর সান্দেলা থেকে ব্রিগেডিয়ার বরাকার বিসভাতে মিলিত হলেন ; তাঁরা ফিরোজ শাহকে এখানে ঘেরাও করবার চেষ্টা করলেন। ক্লাইভও তাঁর বিরুদ্ধে একটা বাহিনী পাঠালেন। "কিন্তু কৃষকদের নিকট খবর পেয়ে, ফিরোজ শাহ ইংরেজদের চোখে ধুলো দিয়ে গঙ্গা পার হয়ে গেলেন। তাঁর উপস্থিতি দোয়াবে খুব উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল এবং প্রত্যেকটি দস্যু ও বিদ্রোহী পুনরোদ্দীপ্ত আশা নিয়ে তাঁর এটোয়ার দিকে যাওয়া লক্ষ্য করছিল।"[২] এটোয়ার ম্যাজিস্ট্রেট হিউম (যিনি পরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিলেন) হরচাঁদপুরে ফিরোজ শাহকে ধরতে গিয়ে খুব অল্পের জন্য বেঁচে গিয়েছিলেন। ফিরোজ শাহ অন্যান্য বিদ্রোহী নেতাদের মতো ইংরেজের ফাঁদে পা বাড়ালেন না। তিনি উত্তরে না গিয়ে, যমুনা পার হয়ে বুন্দেলখণ্ডে তাঁতিয়া তোপীর সঙ্গে মিলিত হলেন।

১। ফরেষ্ট ঃ পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৫১৭।

২। ঐ, পৃঃ ৫২৩।

গ্র্যান্ট হোপ ২২শে ডিসেম্বর ফৈজাবাদে এসে পৌছলেন। বিদ্রোহীরা তখন গোগরার অপর পারে অবস্থান করছিল। ২৫শে ডিসেম্বর একটা যুদ্ধ হয়। এই সময় বিদ্রোহী গোণ্ডা রাজার বাহিনীর সঙ্গেও এই অঞ্চলে ইংরেজদের কয়েকটা যুদ্ধ হয়।

ক্লাইভ ৫ই ডিসেম্বর লক্ষ্ণৌ ত্যাগ করে ফৈজাবাদের দিকে অগ্রসর হলেন। নবাবগঞ্জ বরবাঁকীতে পৌঁছে শুনলেন যে, বেণীমাধব ২০ মাইল দূরে বৈরামঘাটে বিদ্রোহীদের সঙ্গে রয়েছেন। গোগরা পার হবার পূর্বেই বেণীমাধবকে ধরবার জন্য অশ্বারোহীদের নিয়ে ক্লাইভ ছুটলেন। কিন্তু সেখানে এসে দেখলেন যে, বিদ্রোহীরা সকলেই নদী পার হয়ে গিয়েছে; তা ছাড়া, একটি নৌকোও আর এ ধারে নেই। ক্লাইভ তখন ফৈজাবাদ হয়ে সেক্রোরার দিকে চললেন।

অন্য ধারে ব্রিগেডিয়ার রোক্রফ্‌ট নানা সাহেবের ভাই বালা রাওকে ২৩শে ডিসেম্বর একটা যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে তুলসীপুর দখল করলেন। সেক্রোরা থেকে ক্লাইভ ১৫ই ডিসেম্বর বারাইচে পৌছলেন, যেখানে নানা সাহেব ও বেগম হজরত মহল বিদ্রোহীদের সঙ্গে অবস্থান করছিলেন। বিদ্রোহীরা তখন ২০ মাইল দূরে নানপারায় চলে গেল ও সেখান থেকে বারোডিয়াতে। সেখানে ২৩শ তারিখে কয়েকঘণ্টা ব্যাপী একটা ঘোরতর যুদ্ধ হয় এবং সে যুদ্ধে ক্লাইভ স্বয়ং আহত হয়েছিলেন। পরদিন ৬ মাইল দূরে মসজিদিয়াতে আরও একটা যুদ্ধ হয়।

৩০শে ডিসেম্বর ক্লাইভ সংবাদ পেলেন যে, নানপারা থেকে ২০ মাইল দূরে রাপ্তি নদীর ধারে বরবাঁকীতে নানা, বেণীমাধব ও বেগম অবশিষ্ট বিদ্রোহীদের নিয়ে সমবেত হয়েছেন। পরদিন ৩১শে ডিসেম্বর বরবাঁকীর উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে একটা যুদ্ধের পর বিদ্রোহীরা জঙ্গলে প্রবেশ করল। "সেখানে নিজেদের পুনর্গঠন করে তারা ইংরেজদের উপর ভালভাবে লক্ষ্য করে গুলী চালাতে লাগল। গোলন্দাজরা ও অশ্বারোহীরা জঙ্গলের ভিতর তাদের আক্রমণ করতে পারছিল না।"[১] ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে যুদ্ধ চলল। কয়েক দিক থেকে ইংরেজরা বিদ্রোহীদের ঘিরে ফেলতে লাগল। বিদ্রোহীরা তখন জঙ্গলের ধার দিয়ে রাপ্তির দিকে চলতে লাগল। এমন সময় ইংরেজ অশ্বারোহীরা তাদের আক্রমণ করল। বিদ্রোহীরা তখন নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। নদীর মধ্যেও অনেকক্ষণ সম্মুখ-যুদ্ধ হল—তাতে অনেকেরই মৃত্যু হল এবং রাপ্তির দ্রুত স্রোতে অনেকেই ভেসে গেল।

১৮৫৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের বরবাঁকীর যুদ্ধই অযোধ্যা বিদ্রোহের শেষ যুদ্ধ। এই শেষ যুদ্ধগুলি সম্বন্ধে ক্লাইভ বলেছিলেন: "এই শেষ যুদ্ধগুলির চরিত্র

১। ফরেষ্ট: পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৫৩৬

॥ বেগম হজরত মহল ॥

থেকেই বোঝা যায় যে, যদিও কোনো বড় যুদ্ধ হয়নি, তবুও ছোট ছোট যুদ্ধের সংখ্যা ছিল অনেক।"[১]

বরবাঁকী যুদ্ধের পর ফরাক্কাবাদের নবাব তফজ্জল হুসেন, মেন্দি হুসেন, মহম্মদ হাসান প্রভৃতি কয়েকজন ইংরেজের নিকট আত্মসমর্পণ করলেন। মাম্মু খান, জওলা প্রসাদ[২] ও আরও অনেককে নেপাল সরকার ইংরেজ সরকারের নিকট সমর্পণ করলেন। কিছু কালের মধ্যেই গোণ্ডার রাজা দেবী বক্স, বালা রাও, আজিমুল্লা প্রভৃতির তেরাইতে ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু হয়। নেপালের সৈন্যরা যখন বেণীমাধবকে ধরবার জন্য অগ্রসর হয়, তখন তিনি, তাঁর ভাই যোগরাজ সিং ও তাঁদের অনেক সিপাহী নিহত হন। নানা সাহেব সম্বন্ধে আর কোনো সঠিক খবর পাওয়া যায়নি। বেগম হজরত মহল তাঁর অবশিষ্ট জীবন নেপালেই কাটিয়েছিলেন। ইংরেজ সরকার যখন তাঁকে পেন্সন দিতে চেয়েছিল, তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন।

১। ফরেষ্ট: পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৫৩৭।

২। ৩রা মে, ১৮৬০ সালে কানপুরে সতীচৌরা ঘাটে জওলা প্রসাদের ফাঁসি হয়।

কুমার সিং

পাটনার কাছে দানাপুরে ১৮৫৭ সনের ২৫শে জুলাই একদল সিপাহী বিদ্রোহ করে জগদীশপুরে কুমার সিং-এর কাছে এসে উপস্থিত হল। রাজা কুমার সিং-এর বয়স তখন ৮০ বৎসরের উর্ধ্বে হলেও, তিনি বিদ্রোহের জন্য এক রকম প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। সিপাহীদের নিয়ে তিনি সাহাবাদ জেলার প্রধান শহর আরা আক্রমণ ও দখল করলেন; কেবলমাত্র একটি সুরক্ষিত গৃহ ইংরেজদের অধীনে রইল। এই গৃহ ৩ দিন অবরুদ্ধ থাকার পর, ২৯শে জুলাই কুমার সিংকে আক্রমণ করবার জন্য দানাপুর থেকে ডানবারের নেতৃত্বে প্রায় ৩৫০ জন ইংরেজ ও ১৫০ জন শিখ মাঝরাতে আরার ৩ মাইলের মধ্যে এসে পৌছল। আর একটি মাত্র আমবাগান পার হতে পারলেই হয়ে যায়। কিন্তু এইখানেই কুমার সিং-এর বাহিনী প্রস্তুত হয়ে ছিল। চতুর্দিক থেকে ইংরেজদের সম্পূর্ণভাবে ঘেরাও করে তাদের উপর আক্রমণ শুরু হল। প্রথম দিকেই ডানবার নিহত হলেন। এই অবস্থায় ইংরেজরা পলায়ন করাই শ্রেয় মনে করল। কিন্তু মাইলের পর মাইল, যেখান দিয়েই তারা পালাবার চেষ্টা করে, সেখানেই তারা সিপাহীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। পরদিন এইভাবে মাত্র ৫০ জন ইংরেজ কোনোমতে প্রাণ নিয়ে দানাপুর ফিরে যেতে পেরেছিল।

৩রা আগস্ট মেজর এইর কাশী থেকে একটি বড় বাহিনী ও কামান নিয়ে আরা আক্রমণ করলেন। কুমার সিং তখন আরা ত্যাগ করে জগদীশপুরে চলে এলেন। কিন্তু বড় বড় কামানের বিরুদ্ধে জগদীশপুরের লড়বার শক্তি ছিল না। ১২ই আগস্ট এইর হাউইটজার কামান দিয়ে জগদীশপুর ধ্বংস করে দিলেন। ফরেস্ট বলেন: "১০ম ইংরেজ ফুসিলিয়ার বাহিনী দৈত্যের মত লড়াই করেছিল··· তারা আহত ও নিহতদের দেড় মাইলব্যাপী রাস্তার দু' ধারে গাছের শাখা থেকে

ঝুলিয়ে দিল। ... এই ধরনের কার্য অত্যন্ত দুঃখ ও ঘৃণার সঙ্গেই লিপিবদ্ধ করতে হয়, কিন্তু এর একটা শিক্ষামূলক দিকও আছে।"[১]

জগদীশপুর ত্যাগ করে কুমার সিং ৮ মাইল দূরে অবস্থিত আতাউরা শহরে তাঁর প্রাসাদে আশ্রয় নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেখানেও এইর তাঁর বাহিনী নিয়ে তাঁকে আক্রমণ করায় কুমার সিংহ সে স্থানও ছেড়ে যেতে বাধ্য হলেন। মেজর এইর গভর্নর জেনারেলকে আতাউরা থেকে লিখলেন: "আমি এই শহর ধ্বংস করে দিচ্ছি, রাজপ্রাসাদ ও অন্যান্য অট্টালিকাগুলিকেও উড়িয়ে দিচ্ছি। আজ আমি একটা হিন্দু মন্দিরও ধ্বংস করে দিলাম—যে মন্দির সম্প্রতি কুমার সিং অনেক টাকা খরচ করে বড় করে গড়ে তুলেছিলেন। আমি এটা করেছি এই কারণে যে, ব্রাহ্মণরা বিদ্রোহের উস্কানি দিয়েছিল।"[২]

সামান্য সংখ্যক লোক নিয়ে কুমার সিং তাঁর আত্মীয় রেওয়ার রাজার নিকট আশ্রয়প্রার্থী হলেন। কিন্তু ইংরেজরাই রেওয়া-রাজের ছিল 'আরও নিকটতম আত্মীয়', তাই তিনি কুমার সিংকে আশ্রয় দিলেন না। ৬।৭ মাস ধরে অশীতিপর বৃদ্ধ কুমার সিং বনে জঙ্গলে কাটাতে লাগলেন। এই অবস্থায় ইংরেজরা তাঁকে ঘেরাও করে ধরে ফেলবার জন্য অনেকবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু গ্রামবাসীদের সাহায্যে কুমার সিং তাদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ করে দিয়েছেন। যেসব স্থানে ইংরেজরা তাঁকে কোনোকালেই দেখবার আশা করেনি, সেই রকম স্থানগুলিতে তিনি হঠাৎ এসে হাজির হয়েছেন এবং রসদ ও অর্থ সংগ্রহ করে আবার অন্তর্হিত হয়েছেন।

তারপর ১৭ই মার্চ তারিখে ইংরেজরা একটি খবর শুনে অত্যন্ত আতঙ্কিত হয়ে উঠল। ইংরেজদের সমস্ত সতর্কতা ব্যর্থ করে দিয়ে কুমার সিং গঙ্গা পার হয়ে পূর্ব-অযোধ্যায় আজিমগড় থেকে ২০ মাইল দূরে আত্রোলিয়া নামক একটি জায়গায় উপস্থিত হলেন। কিছুদিন পূর্বে এখানকার সমগ্র অঞ্চলটিকে জঙ্গবাহাদুরের ভাড়াটিয়া গুর্খারা ও জেনারেল ফ্রাঙ্কের ইংরেজ বাহিনী বিদ্রোহীদের হাত থেকে মুক্ত করে লক্ষ্ণৌ ও কানপুরে বিদ্রোহ দমনের জন্য চলে গিয়েছেন। এই সব স্থানে যে আবার বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়বে, তা ইংরেজরা ভাবতেই পারেনি।

আজিমগড় কেন্দ্রের কমাণ্ডার কর্নেল মিলম্যান ২১শে মার্চ কুমার সিংকে আত্রোলিয়াতে আক্রমণ করলেন। বিদ্রোহীরা সামান্য যুদ্ধ করে পিছনে হটে গেল। এই বিজয়ের পর ইংরেজরা মহা আনন্দে তাদের প্রাতের আহার প্রস্তুতের

১। "হিষ্ট্রি...", ৩য়, পৃঃ ৪৫৫।

২। ঐ, পৃঃ ৪৫৫।

কাজে লেগে গেল। কুমার সিং সেই সুবর্ণ সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিলেন; হঠাৎ তিনি ইংরেজদের আক্রমণ করলেন। সমস্ত জিনিসপত্র রেখে মিলম্যানের বাহিনীকে পালাতে হল। তল্পিবাহকরা পালিয়ে গেল। সমস্ত দিন ও রাত বিদ্রোহীরা ইংরেজদের ধাওয়া করে যেতে লাগল। মিলম্যান কোনোমতে প্রাণ বাঁচিয়ে আজিমগড়ে এসে তাঁর দুর্গে আশ্রয় নিলেন এবং কাশী, লক্ষ্ণৌ ও এলাহাবাদে জরুরী সাহায্য প্রার্থনা করে খবর পাঠালেন।

খবর পাওয়া মাত্র কাশী থেকে কর্নেল ডেইমস্ একটা বাহিনী নিয়ে মিলম্যানকে বাঁচাবার জন্য এলেন। কিন্তু আজিমগড়ে পৌঁছতে না পৌঁছতে ডেইমসের বাহিনীও প্রায় শেষ হয়ে এল এবং অবশিষ্ট কয়েকজন লোক নিয়ে তাঁকে মিলম্যানের দুর্গে আশ্রয় নিতে হল।

গভর্নর জেনারেল ক্যানিং তখন এলাহাবাদে ছিলেন। দুই দুইজন বৃটিশ কর্নেলের পর পর শোচনীয় পরাজয়ের সংবাদ পেয়ে তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। কুমার সিং-এর দুর্দান্ত সাহসের কথা তিনি আগেই জানতেন এবং এই বৃদ্ধ যে তাঁকে একটা ভয়ঙ্কর বিপদ্‌জনক পরিস্থিতির মধ্যে ফেলেছেন, তা তিনি ভালভাবেই বুঝতে পারলেন। ক্যানিং আরও উদ্বিগ্ন হলেন এই কারণে যে, কুমার সিং-এর এই জয় "বাংলা দেশে গুরুতর প্রভাব বিস্তার করবে। তা ছাড়া কুমার সিং যদি কাশীর দিকে রওনা হন, তা হলে কলকাতা ও লক্ষ্ণৌর মধ্যে যোগাযোগ নষ্ট হয়ে যাবে।"[১]

কুমার সিং-এরও ঠিক সেই পরিকল্পনাই ছিল। ইংরেজরা যখন লক্ষ্ণৌ, ফয়জাবাদ প্রভৃতি নিয়ে ব্যস্ত, তখন তিনি পূর্ব-অযোধ্যা, কাশী, বিহার ইত্যাদি স্থানে ইংরেজদের আঘাত করতে স্থির করলেন। কুমার সিং-এর এই উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করবার জন্য ক্যানিং ক্রাইমিয়ার যুদ্ধের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন 'একজন অত্যন্ত সাহসী ও সুচতুর' জেনারেল, লর্ড মার্ক কেরকে পাঠালেন। তা ছাড়া, ইতিমধ্যে ২০শে মার্চ লক্ষ্ণৌতে বিদ্রোহীদের পরাজয় ঘটল। সুতরাং বাধ্য হয়েই কুমার সিংকে কাশী দখল করার পরিকল্পনা ছেড়ে দিতে হল।

৬ই এপ্রিল মার্ক কের কাশী থেকে তাঁর বিরাট ইংরেজ বাহিনী ও ৮টি কামান নিয়ে কুমার সিংকে আজিমগড়ের ৮ মাইল দূরে আক্রমণ করলেন। কুমার সিং-এর কোনো কামান ছিল না। কিন্তু তিনি তাঁর বাহিনী এমনভাবে সমাবেশ করলেন যে, তিনিই মার্ক কেরকে পশ্চাতে ও পার্শ্বে আক্রমণ করবার সুযোগ পেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই মার্ক কেরের অবস্থা খুব বিপদ্‌জনক হয়ে উঠল।

১। ফরেষ্ট: পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৪৬০।

রণক্ষেত্র ত্যাগ করে তাঁকে তাড়াতাড়ি আজিমগড় অভিমুখে চলে যেতে হল। কুমার সিং স্বয়ং অশ্বারোহণে এই যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন।

ফরেস্ট আজিমগড়ের ৬ই এপ্রিলের যুদ্ধ এইভাবে বর্ণনা করেছেন: "কতক্ষণ ধরে আমাদের কামানগুলি খুব গোলা বর্ষণ করতে থাকল। কিন্তু শত্রুদের উপর তার কোনো প্রতিক্রিয়াই হল না। অট্টালিকাগুলি ও আম বাগানের প্রতিটি গাছের শাখা বন্দুকধারী সিপাহীতে ভর্তি ছিল। আমাদের লম্বা কনভয়টি ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিল, হাতির মাহুত ও গরুর গাড়ির চালকরা সকলেই পলায়ন করেছিল। ... এই সময় শত্রুরা সুসংগঠিতভাবে আমাদের পার্শ্বভাগে আক্রমণ শুরু করল। আমাদের অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর আকার ধারণ করল।"[১]

মার্ক কের যখন কাশী থেকে কুমার সিংকে আক্রমণ করবার জন্য আসছিলেন, প্রায় ঠিক সেই সময় আর একটি ইংরেজ বাহিনী জেনাবেল সার এডোয়ার্ড লুগার্ডের অধীনে এলাহাবাদ থেকে রওনা হয়েছিল। ইংরেজ সবকার চেয়েছিল, তাদের এই দুটি বাহিনীর মাঝখানে ফেলে কুমার সিংকে ও বিদ্রোহীদের সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। কিন্তু কুমার সিং যুদ্ধবিদ্ না হয়েও যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শিতা দেখিয়ে ইংরেজের সেই প্রচেষ্টা একেবারে ব্যর্থ করে দিয়ে জগদীশপুর অভিমুখে রওনা হলেন।

ইতিমধ্যে লুগার্ড প্রায় বিদ্রোহীদের নিকটে পৌছে গিয়েছেন। কেবলমাত্র টন্স নদীর সেতু পার হলেই বিদ্রোহীদের তিনি পথরোধ করে দাঁড়াতে পারবেন। কুমার সিং ৩০০ জন বাছাই করা-সিপাহীর উপর ভার দিলেন, অন্ততঃ কয়েক ঘণ্টার জন্য ইংরেজদের যেন সেই সেতু কোনোমতেই পার হতে না দেওয়া হয়। এই ছোট্ট বিদ্রোহী বাহিনীটির উপর বারবার আক্রমণ চালিয়েও লুগার্ড তাদের হটাতে পারলেন না। এই সুযোগে কুমার সিং তাঁর প্রধান বাহিনী নিয়ে ইংরেজের নাগালের বাইরে অনেকদূর চলে গিয়েছেন। ম্যালিসন বলেছেন: "এই সিপাহীরা অত্যন্ত ঝানু সৈনিকের মতো অসীম দৃঢ়তা ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে এই সেতুটি রক্ষা করেছিল। শুধু তখনই তারা এই সেতু ছেড়ে দিয়ে চলে গিয়েছিল, যখন তারা জানল যে তাদের দলটি নিরাপদ স্থানে পৌছে গিয়েছে।"[২] সেতুর যুদ্ধের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল এই যে, পশ্চিম বিহারের কুখ্যাত নীলকর ভেনাবেল এই যুদ্ধে নিহত হন।

১। ফরেষ্ট: পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৪৬১-৬২।

২। ম্যালিসন: "হিষ্ট্রি অব দি ইণ্ডিয়ান মিউটিনি," ৪র্থ, পৃঃ ৩৩০।

এইভাবে কুমার সিংকে আরও কয়েকবার ঘেরাও করবার চেষ্টা হয়; কিন্তু প্রতিবারই কুমার সিং সেচেষ্টা ব্যর্থ করে দেন এবং এজন্য তাঁকে গঙ্গা পার হবার পূর্বে আরও কয়েকবার ইংরেজের সঙ্গে লড়তে হয়। বিশেষ করে কুমার সিং যাতে গঙ্গা পার না হতে পারেন, তার জন্য ইংরেজ সরকার যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু ইংরেজের এত উদ্যোগ সত্ত্বেও তিনি ১৮৫৮ সালের ২১শে এপ্রিল গঙ্গাতীরে এসে উপস্থিত হলেন। ইংরেজরা চতুর্দিক থেকে বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পেল যে, কুমার সিং তাঁর বাহিনী নিয়ে বালিয়ায় গঙ্গা পার হবেন। নৌকা সংগ্রহ না করতে পারায় হাতি চড়েই সকলে গঙ্গা পার হবেন। ইংরেজরা যখন বালিয়া ও নিকটবর্তী স্থানগুলিতে গোপনে অপেক্ষা করছিল, ১০ মাইল দূরের ঘাটে রাত ২টার সময় কুমার সিং তাঁর লোকদের গঙ্গা পার করছিলেন। জেনারেল ডগলাস এই খবর পাওয়া মাত্রই সেখানে ছুটে গিয়ে দেখলেন যে, সকলেই গঙ্গা পার হয়ে গিয়েছে—কেবলমাত্র শেষ নৌকাটি নদীর মাঝামাঝি গিয়ে পৌঁছেছে। সব লোকজনদের আগে পার করে দিয়ে এই শেষ নৌকায় ছিলেন কুমার সিং স্বয়ং। যখন তিনি মাঝ গঙ্গায় এসেছেন, এমন সময় ইংরেজের একটি গুলী তাঁর হাতে বিদ্ধ হয়ে তাকে গুরুতরভাবে জখম করল। ঐ হাতটি তখনই কেটে ফেলে দেওয়ার প্রয়োজন হল। অন্য হাতে তিনি নিজের তরবারি বের করে আহত হাতটি কেটে পবিত্র গঙ্গায় বিসর্জন দিলেন।

৮ মাস ধরে অনবরত যুদ্ধ করার পর ২২শে এপ্রিল ১৮৫৮ সালে ১,০০০ সৈন্য ও ২টি কামান নিয়ে কুমার সিং আবার তাঁর জন্মস্থান জগদীশপুরে ফিরে এলেন। তাঁর প্রাসাদে বৃটিশ পতাকার পরিবর্তে আবার নিজের স্বাধীন পতাকা উড়তে লাগল।

এই সংবাদে আরার কম্যাণ্ডিং অফিসার লেগ্রাণ্ড অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে দুটি হাউইটজার কামান এবং একদল ইংরেজ ও শিখ সৈন্য নিয়ে তৎক্ষণাৎ জগদীশপুর আক্রমণ করতে চললেন। এই আট মাস ধরে বিদ্রোহীরা একদিনের জন্যও ভালভাবে বিশ্রাম ও আহারের সুযোগ পায়নি। জগদীশপুর পৌঁছেই তাদের আবার পরের দিনই ইংরেজ শত্রুর সম্মুখীন হতে হল। দুই ঘণ্টা ধরে উভয় পক্ষে আক্রমণ প্রতি-আক্রমণ চলল। তারপর হঠাৎ বিদ্রোহীরা ৬০ম ইংরেজ বাহিনীকে দক্ষিণ ও বাম পার্শ্ব, উভয় দিক থেকেই আক্রমণ করল এবং ইংরেজেরা যাতে পলায়ন না করতে পারে, তার জন্য বিদ্রোহী অশ্বারোহীরা পশ্চাদ্দিক থেকেও তাদের পথরোধ করে দাঁড়াল। কিন্তু প্রাণ বাঁচাবার জন্য ইংরেজদের এবারও কামান ইত্যাদি ছেড়ে দিয়েই পলাতে হল। ফরেস্ট বলেছেন: "যে যেদিকে পারল

উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল। কেউ কারও কথা শুনল না—সামরিক হুকুমে কেউ কান দিল না; লোকগুলি তখন হিংস্র উন্মাদের মতো ছোটাছুটি করছে। এইভাবে খোলা রাস্তার উপর যখন তারা এসে পৌছল, তখন তারা যেন সন্ন্যাসরোগে ধরাশায়ী হতে লাগল; তাদের কোনো শুশ্রূষার উপায় ছিল না ··· ঐ অবস্থাতেই তাদের ফেলে রেখে আসতে হল।"[১] আর একজন ইংরেজ ঐতিহাসিক হোয়াইট বলেছেন যে, বৃটিশের এই রকম শোচনীয় পরাজয়ের উদাহরণ আর পাওয়া যায় না। চার্লস্ বল্ তাঁর বিরাট ইতিহাস লিখতে গিয়ে বলেছেন যে, এইরূপ একটা লজ্জাকর কাহিনীর বিবরণ লিখতে তাঁর মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে। ঐদিন কয়েক শত ইংরেজ সৈন্যের মধ্যে মাত্র ৮০ জন প্রাণ নিয়ে আরায় ফিরতে পেরেছিল।

এই বিজয়ের তিন দিন পরে ১৮৫৮ সনের ২৬শে এপ্রিল কুমার সিং তাঁর জগদীশপুরের প্রাসাদে, স্বাধীন পতাকার তলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। পশ্চিম বিহারের স্বাধীনতা-সংগ্রাম এইখানেই শেষ হয়নি। কুমার সিং-এর মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা অমর সিং এই একই গেরিলা যুদ্ধ-নীতি অনুসরণ করে অক্টোবর মাস পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছিলেন। ১৯শে অক্টোবর নোনাদী নামক একটি গ্রামে শেষ যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে তাঁর ৪০০ লোকের মধ্যে ৩০০ লোক নিহত হয়। বাকী ১০০ লোক নিয়ে তিনি ইংরেজের ব্যূহ ভেদ করার চেষ্টা করেছিলেন; সেই চেষ্টায় আবার ৩ জন ব্যতীত আর সকলেই প্রাণ হারালেন। এই ৩ জন, যাঁরা প্রাণ নিয়ে পালাতে পেরেছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন অমর সিং। কিন্তু তাঁর আর কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।

১। ফরেষ্ট: "হিষ্ট্রি অব দি ইণ্ডিয়ান মিউটিনি"," ৩য়, পৃঃ ৪৭২।

ঝান্সীর রানী লক্ষ্মীবাঈ

১৮৫৩ সালে ঝান্সীর রাজা গঙ্গাধর রাও-এর মৃত্যুর পর, ইংরেজ সরকার তাঁর দত্তককে রাজ্য দিতে অস্বীকার করে ঝান্সী তাদের সাম্রাজ্যভুক্ত করে নেয়। রানী লক্ষ্মীবাঈ-এর বয়স তখন ১৭ কি ১৮ বৎসর। রানীকে যখন বৃটিশ সরকারের সিদ্ধান্ত জানানো হল, তখন তিনি তেজোদৃপ্ত কণ্ঠে বলে উঠেছিলেন, 'মেরী ঝান্সী নেহি দেউঙ্গী।' অল্পবয়স্কা রানী হয়ত একটা সাময়িক উত্তেজনার বশেই এ কথা বলেছিলেন। কিন্তু রানীর এই ভাস্বর উক্তি প্রতিটি ভারতবাসীর নিকট চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে, কারণ তাঁর এই উক্তিতে ভারতের অপরাজেয় মনুষ্যত্বেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

শুধু যে রাজ্যই গেল তা নয়। তাঁর স্বামীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি থেকেও তিনি বঞ্চিত হলেন। তিনি যখন বারাণসীতে গিয়ে বাস করতে চেয়েছিলেন, সে অনুমতি দিতেও ইংরেজ সরকার অস্বীকার করেছিল। ঝান্সী-রাজের গৃহদেবতা মহালক্ষ্মী মন্দিরের ব্যয় নির্বাহের জন্য যে দুখানি দেবত্র গ্রাম ছিল, তাও বিদেশী সরকার বাজেয়াপ্ত করল। তারা রানীকে জানাল, "আপনার ভগবানের দায়িত্ব আমাদের"! ইংরেজ কর্মচারীদের গরু ও শুয়োরের মাংস সরবরাহ করার জন্য শহরের মাঝখানে একটা কসাইখানাও স্থাপন করা হল।

মিরাট ও দিল্লীর বিদ্রোহের কিছু দিন পরে ৪ঠা জুন, ঝান্সীর ১২শ বাহিনীর ৬০০ সিপাহী বিদ্রোহ ঘোষণা করে। প্রায় ১০০ জন ইংরেজ পুরুষ, স্ত্রী ও শিশু দুর্গের ভিতর আশ্রয় নেয়। ৬ই জুন সিপাহীরা দুর্গ অবরোধ করে। দুর্গ থেকে যখন একজন ভৃত্য পালাবার চেষ্টা করে, তখন লেফটেনাণ্ট পোইস তাকে হত্যা করে। এ দেখে পোইসের ভৃত্যই তার প্রভুকে তলোয়ার দিয়ে কেটে ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে, ভৃত্যরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, এই রব তুলে সব ভৃত্যকে ইংরেজরা খুন করল।
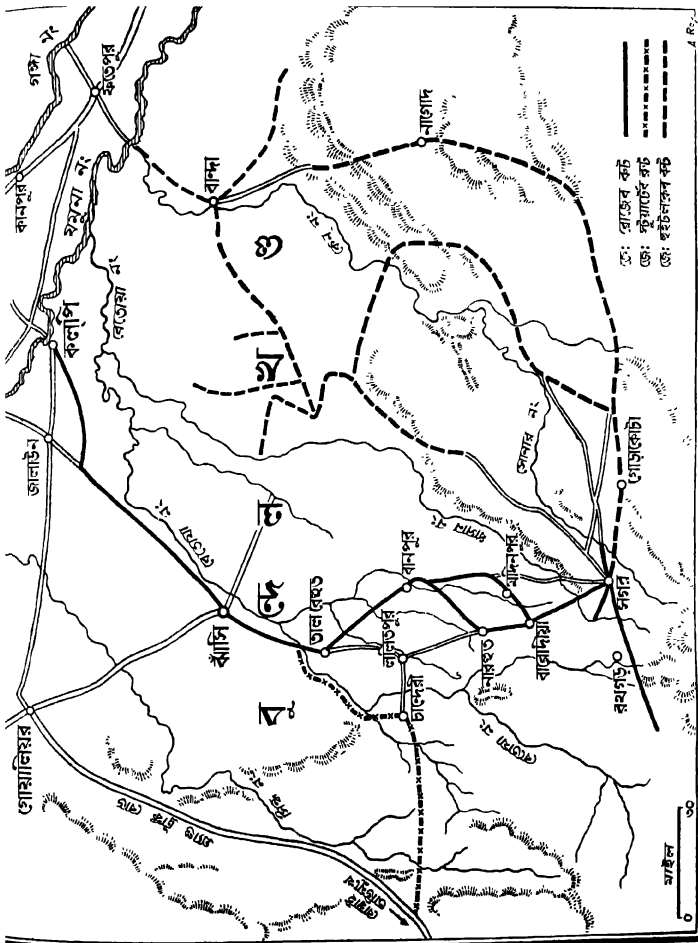
ঝান্সী প্রতিরোধ ও বৃটিশ আক্রমণের মানচিত্র

এর প্রতিশোধ উঠল ৮ই জুন। ইংরেজরা আত্মসমর্পণ করার পর ওই তারিখে জোকারবাগে নিয়ে গিয়ে ৫৬ জন ইংরেজকে হত্যা করা হল। তারপর সিপাহীরা রানীর কাছ থেকে এক লক্ষ টাকা নিয়ে দিল্লী চলে গেল। এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে রানী জড়িত ছিলেন না; বরং তিনি স্ত্রীলোক ও শিশুদের বাঁচাবারই চেষ্টা করেছিলেন।

সিপাহীরা চলে যাবার পর ঝান্সী সম্পূর্ণ অরক্ষিত হয়ে পড়ল। রানীর মাত্র ৪০ জন বডি গার্ড ছাড়া রাজ্য রক্ষার জন্য আর কোনো সৈন্যবাহিনী থাকল না। তিনি সাগর বিভাগের লেফটেনাণ্ট এরস্কিনকে সমস্ত ঘটনা জানিয়ে সাহায্য চেয়ে পাঠালেন। এরস্কিন রানীর হাতে ঝান্সীর শাসনভার দিয়ে তাঁকে খাজনা আদায় ও পুলিশ বাহিনী গঠন করে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে বললেন।

ইতিমধ্যে ঝান্সীকে অসহায় অবস্থায় দেখে পুরাতন সামন্ততান্ত্রিক কলহ প্রবল হয়ে উঠল। গঙ্গাধর রাও-এর মৃত্যুর পর সদাশিব রাও ঝান্সীর রাজ্য দাবি করেছিলেন। এখন তিনি ঝান্সী আক্রমণ করে বসলেন ও নিজেকে ঝান্সীর মহারাজা বলে ঘোষণা করলেন। রানী তাঁকে ঝান্সীর দুর্গে বন্দী করে রাখলেন। মারাঠা রাজ্য ঝান্সীর সঙ্গে দতিয়া ও অরছা রাজপুত রাজ্যগুলিরও কলহ অনেক প্রাচীন। এঁরাও নিঃসহায় ঝান্সীকে গ্রাস করবার জন্য একসঙ্গে আক্রমণ করলেন। এরস্কিন ভারত সরকারকে ২রা অক্টোবর লিখলেন :

"রানী নামে মাত্র ঝান্সীর শাসক। সেখানে সর্বত্র ব্যাপক অরাজকতা চলেছে। তেহরীর (অরছা) রানীর সেনাপতি এবং দতিয়ার রাজা দু'দিক থেকে ঝান্সী আক্রমণ করবার ফলে বিপন্ন রানী সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছেন।"

বলা বাহুল্য, ইংরেজরা রানীকে কোনো সাহায্য পাঠায়নি এবং তখন তাদের সাহায্য পাঠাবার ক্ষমতাও ছিল না। আরও একটি দ্রষ্টব্য বিষয় এই যে, রানী তখনও বিদ্রোহ ঘোষণা করেননি, সুতরাং আইনতঃ ঝান্সী তখনও ইংরেজ সরকারেরই এলাকা। তা সত্ত্বেও, আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ইংরেজ সরকার তেহরীর রানীকে কিম্বা দতিয়ার রাজাকে ঝান্সী আক্রমণে বাধাও দেয়নি, তাঁদের কোনো প্রকার হুমকি পর্যন্ত দেয়নি।

ইংরেজ সরকারের এই অস্বাভাবিক কার্য সম্বন্ধে এরস্কিন নিজেই তাঁর একটা গুপ্ত সরকারী রিপোর্টে ব্যাখ্যা লিখেছিলেন :

"ঝান্সীর বিদ্রোহী রানী বানপুরের রাজার সঙ্গে আমাদের বিরুদ্ধে একটা জোট পাকাবার জন্য কথাবার্তা চালাচ্ছেন এবং তেহরীর রানীকে আক্রমণ করবার জন্য

গোয়ালিয়র বাহিনীকেও দলে টানবার চেষ্টা করেছেন—যে তেহরীর রানী আমাদেরই স্বার্থের জন্য ঝান্সী রাজ্য আক্রমণ করেছিলেন।”[১]

অবশ্য শেষ পর্যন্ত নিজেদের শক্তির উপরই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে লক্ষ্মীবাঈ ইংরেজ সমর্থিত দতিয়া ও তেহরীর আক্রমণকারীদের পরাস্ত করে ঝান্সী রাজ্য মুক্ত করলেন। এই আত্মরক্ষার কাজেই রানীকে ১৮৫৮ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল।

১৮৫৪ সালে ইংরেজরা ঝান্সী রাজার যেসব সৈন্যদের বরখাস্ত করেছিল, রানী তাদের ডেকে আবার তাঁর বাহিনী গড়ে তুললেন। সেই বাহিনীতে অনেক বুন্দেলা, রাজপুত, পাঠান মকরানী মুসলমানদেরও নিলেন। রানী একটি নারী বাহিনীও গঠন করলেন; তাদের বন্দুক ছুঁড়তে, তরবারি চালনা করতে এবং সঙ্গে সঙ্গে নার্সিং করতেও শেখালেন। রানী এই সময় কতকগুলি কামানও তৈরি করিয়েছিলেন। তেহরী ও দতিয়ার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময়ই রানী তাঁর সংগ্রাম-চেতনা ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি নিঃসঙ্কোচে হিন্দু-মুসলমান সৈন্যদের সঙ্গে সমানভাবে মিশতেন, বিপদের সময় পাশে দাঁড়িয়ে তাদের সাহায্য করতেন এবং আহতদের অনেক সময় নিজের হাতে শুশ্রূষা করতেন। এক ধারে এই মানবিকতা, অন্যধারে দুর্দমনীয় সাহস ও অসাধারণ কর্মক্ষমতা—এই সব গুণের দ্বারাই তিনি প্রত্যেকটি সৈনিকের, প্রত্যেকটি নাগরিকের হৃদয় জয় করতে পেরেছিলেন।

১৮৫৮ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত রানী ইংরেজ সরকারের আনুগত্য স্বীকার করেই কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন এবং কর্তৃপক্ষকে অনেকগুলি চিঠিও লিখেছিলেন। এই সব চিঠিগুলি ও আরও কিছু নথিপত্র বিশ্লেষণ করে এবং অনেক কূট তর্কের অবতারণা করে শ্রদ্ধেয় ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ‘প্রমাণ’ করেছেন, “রানী ১৮৫৮ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত নিজেকে নির্দোষ বলে ও বৃটিশের প্রতি আনুগত্য জানিয়ে পরিষ্কার ভাষায় ইংরেজ কর্তৃপক্ষের কাছে করুণ আবেদন পাঠিয়েছিলেন, সম্ভবতঃ (?) পরেও পাঠিয়েছিলেন।

“এমন কি ১৮৫৮ সালের মার্চ পর্যন্ত, যখন সার হিউগ রোজ মধ্য ভারতে তাঁর অভিযান শুরু করে দিয়েছেন, রানী স্থির করতে পারেননি, তিনি বৃটিশের বিরুদ্ধে লড়বেন, না তাদের সঙ্গে একটা সমঝোতা করবেন। যদি তিনি তাঁর

১। এরস্কিন: “রিপোর্ট অব ডিভিসনাল কমিশনার অব সাগর এণ্ড নর্মদা ডিভিসন ফর দি উইক এণ্ডিং ২৫-১১-১৮৫৭”।

বিরুদ্ধে বৃটিশের সন্দেহ দূর করতে সমর্থ হতেন, তা হলে তিনি দ্বিতীয় পন্থাটিই অবলম্বন করতেন।

"যে সময় তিনি নিঃসন্দেহে জানতে পারলেন যে, বিদ্রোহের জন্য ও ঝান্সীতে ইংরেজদের হত্যার জন্য বৃটিশ সরকার তাঁকেই দায়ী করছে এবং এই অভিযোগে তাঁকে একটা বিচারের সম্মুখীন হতে হবে, সেই সময় তিনি যুদ্ধ করাই স্থির করলেন —ফাঁসি-কাঠে ঝোলার চাইতে যুদ্ধক্ষেত্রে সম্মানজনক মৃত্যুই তিনি বেছে নিলেন।"[১]

সহজ ভাষায় ডাঃ মজুমদারের উক্তির অর্থ হচ্ছে এই যে, রানী লক্ষ্মীবাঈ দেশ-প্রেমিক ছিলেন না, প্রকৃত পক্ষে তিনি ইংরেজ-ভক্তই ছিলেন, ইংরেজরাই তাঁকে বিদ্রোহের দিকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঠেলে দিয়েছিল। বাহাদুর শাহকে যেমন সিপাহীরা জোর করে, ভয় দেখিয়ে বিদ্রোহে যোগ দিতে বাধ্য করেছিল, সেই রকম লক্ষ্মীবাঈও অনিচ্ছায় বিদ্রোহে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। দেখা যাচ্ছে, ডাঃ মজুমদারের নিকট মানুষের সাধারণ ইতিহাসটাও যেমন সহজ, বিদ্রোহ করাটাও তেমনই জলবৎ তরলম্। এ বিদ্রোহের জন্য প্রয়োজন নেই দুঃসহ অন্তরবিক্ষোভের, দেশপ্রেমের! বস্তুতঃ বিদ্রোহী দেশপ্রেমিকদের মানস-গঠন ও অন্তরাত্মার যথাযথ আন্তরিক পরিচয় না পেলে, তা উপলব্ধি না করতে পারলে বিদ্রোহীদের দেশপ্রেমের বা তাদের বিক্ষোভ-বিদ্রোহের বিশ্লেষণ করা যায় না। এর জন্যে ঐতিহাসিককে যান্ত্রিক হলে চলে না, তার চেয়ে বেশী কিছু হতে হয়।

জুন মাসে ঝান্সীর সিপাহীরা বিদ্রোহ করেছিল। কিছুদিন পরে যদিও গোয়া-লিয়রের সিপাহীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল, কিন্তু তারা নভেম্বর মাস পর্যন্ত সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয়ে বসেছিল। ঝান্সীর চারপাশের মারাঠা, রাজপুত ও মুসলমান রাজারা, গোয়ালিয়র, ইন্দোর, ভূপাল, তেহরী, অরছা ইত্যাদি—সকলেই বৃটিশানুগত। মধ্য-ভারতের জনসাধারণও বিদ্রোহের দিকে তখনও অগ্রসর হয়নি। সেই প্রতিকূল অবস্থায় একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের নিঃসহায়, নিঃসম্বল ও শত্রু-পরিবেষ্টিত ২১।২২ বৎসরের একজন বিধবা স্ত্রীলোকের পক্ষে বিদ্রোহ ঘোষণা করা যে সম্ভব নয়, তা বিদ্রোহ করার তাৎপর্য কি, সে সম্বন্ধে যাঁদের কিছুমাত্রও ধারণা আছে তাঁরাই স্বীকার করবেন। এই অবস্থায়, প্রস্তুতির জন্য রানীর সর্বপ্রধান প্রয়োজন ছিল সময়। তাই শত্রুর চোখে ধুলো দেবার জন্যই হয়ত রানী এই শঠতাপূর্ণ চিঠিগুলি লিখেছিলেন। এরূপ ক্ষেত্রে কূটনীতির কোনো স্থান নেই, রানীর চিঠিগুলিকে সরল অর্থেই নিতে হবে—এ কথা সরলপ্রাণ ডাঃ মজুমদার অবধার্য বলে মেনে

১। ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার: "সিপয় মিউটিনি এণ্ড দি রিভোল্ট অব···", পৃঃ ১৫৫।

॥ যোদ্ধৃবেশে ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাই ॥

[প্রাচীন চিত্রকলা হইতে]

নিলেও, বৃটিশ শাসকশ্রেণী মেনে নিতে রাজী হননি। তাঁরা প্রথমে রানীকে নির্দোষ ভেবেছিলেন—কিন্তু তাঁদের সে ভুল ভাঙতে এতটুকু বিলম্ব হয়নি। রানীর আনুগত্য প্রকাশে তাঁরা এতটুকু বিভ্রান্ত হননি। কিছু দিনের মধ্যেই রানীর বিদ্রোহের প্রস্তুতি সম্বন্ধে যেসব সংবাদ তাঁরা পেয়েছিলেন, তাতে তাঁরা নিঃসন্দেহে বুঝতে পেরেছিলেন যে, মধ্যভারতে তাঁদের প্রধান শত্রু হচ্ছে ঝান্সীর রানী লক্ষ্মীবাঈ।

এই প্রসঙ্গে আর একটি প্রশ্ন হচ্ছে যে, যে-ব্যক্তি ইংরেজের এত অনুগত, যিনি ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার কথা কোনো দিন চিন্তাও করেননি, সেই ব্যক্তিই, এবং তিনি একজন অল্পবয়স্কা বিধবা স্ত্রীলোক মাত্র, ইংরেজদের ভুলের জন্য হঠাৎ একদিন বিদ্রোহ করে বসলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে অতিশয় কৃতিত্বের সঙ্গে হাজার হাজার সৈন্য নিয়ে বাহিনী গঠন করলেন ও কৃতিত্বের সঙ্গে তাদের চালনা করতে লাগলেন, কামান বাহিনী গঠন করলেন, প্রচণ্ড শক্তিশালী শত্রুর বিরুদ্ধে একটা বড় অবরুদ্ধ শহরকে দিনের পর দিন রক্ষা করলেন এবং তারপর একজন অভিজ্ঞ সেনানায়কের ন্যায় সম্মুখ যুদ্ধে অশ্বারোহণে বারবার শত্রুর সম্মুখীন হয়ে আশ্চর্য রকমের সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিলেন, এরূপ অভূতপূর্ব ঘটনাবলী কোনো মানুষের জীবনেই হঠাৎ রাতারাতি ঘটতে পারে না—আরব্য উপন্যাসেই তা সম্ভব, মানুষের ইতিহাসে নয়।

১৮৫৭ সালের শেষ দিকে মধ্যভারতের সর্বত্র—গোয়ালিয়র, মালোয়া, ইন্দোর, বান্দা, গড়কোটা, বানপুর, চিরখরী, চান্দেরী, শাহগড় রাথগড়ে—আগুন জ্বলে উঠল। গোয়ালিয়র, ইন্দোর, বরোদা, ভূপালের ইংরেজের আশ্রিত রাজারা শত চেষ্টা করেও বিদ্রোহ দমিয়ে রাখতে পারলেন না। রানীও জানুয়ারি মাসে খোলাখুলিভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন এবং দুর্গের উপর উড়িয়ে দিলেন, ক্ষমা ও ত্যাগের প্রতীক মারাঠা গৈরিক পতাকার পরিবর্তে, নাকাড়া ও চামর চিহ্নিত সংগ্রামের প্রতীক লালপতাকা!

মধ্যভারতের ইংরেজ বাহিনীর সেনানায়ক হিউগ রোজ ১৮৫৭ সালের ডিসেম্বর মাসে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করলেন। রাথগড়, বারোদিয়া, গড়কোটা, নারুত, মদনপুর ইত্যাদি স্থানে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুদ্ধ করার পর ২১শে মার্চ ১৮৫৮ সালে ইংরেজ বাহিনী ঝান্সী দুর্গের সম্মুখে এসে দাঁড়াল। ঠিক এই সময়, আর একটা ইংরেজ বাহিনী ব্রিগেডিয়ার স্টুয়ার্টের নেতৃত্বে চান্দেরী দখল করার পর রোজের সঙ্গে এসে ঝান্সীতে মিলিত হল।

১৫ দিন ধরে সমানে দুই পক্ষে কামান যুদ্ধ হল। শিবির থেকে তাঁর রিপোর্টে রোজ লিখেছিলেন (২৬শে মার্চ): "বিদ্রোহীদের কামানগুলি একজন সুদক্ষ

গোলন্দাজের দ্বারা চালিত হচ্ছিল। দূরবীন দিয়ে আমরা দেখছিলাম যে, তিনি তাঁর কামানগুলি দিয়ে এমনভাবে লক্ষ্য ঠিক করছিলেন যে, তা আমাদের পক্ষে খুব ক্ষতিকর হচ্ছিল।" রানীর সর্বশ্রেষ্ঠ গোলন্দাজ ছিলেন গোলাম ঘউস খান ও সর্দার কৌর খোদাবক্স। দুজনই ২৬শে মার্চ কামান ছোঁড়বার সময় ইংরেজের গোলার আঘাতে নিহত হন। ঝান্সী-অবরোধ সম্বন্ধে ইংরেজ ঐতিহাসিক এই ভাবে বর্ণনা দিয়েছেন:

"বিদ্রোহীদের অনেক কামান আমরা বিকল করে দিয়েছিলাম। কিন্তু তারা সেগুলিকে তাড়াতাড়ি মেরামত করে আবার ব্যবহার করছিল। যখন ছাদের দেওয়ালগুলি আমরা ভেঙে দিচ্ছিলাম, তখন, আমরা দেখেছিলাম, স্ত্রীলোকরা সেগুলি মেরামত করছিল। বিদ্রোহীরা অবিচলিতভাবে মৃত্যুবরণ করছিল।··· বিদ্রোহীদের যথেষ্ট ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও তাদের আমাদের বিরুদ্ধে লড়বার ক্ষমতা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞা এতটুকু কমেনি। উপরন্তু বলা যেতে পারে যে, বিপদ যত ঘনিয়ে আসছিল, তাদের সাহসও তত বেড়ে যাচ্ছিল।"[১]

এইভাবে ১০ দিন অবরোধের পর রাও সাহেব (নানা সাহেবের ভ্রাতুষ্পুত্র) কল্পি থেকে একটা ১০,০০০ সৈন্যের বাহিনী তাঁতিয়া তোপীর নেতৃত্বে রানীর সাহায্যার্থে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সামন্ততান্ত্রিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার বশেই হোক, কিম্বা অন্য যে কোনো কারণেই হোক, বেতোয়া নদীর ধারে খানিকক্ষণ একটু যুদ্ধ করেই তাঁতিয়া তাঁর বাহিনী নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে চলে গেলেন। ঐ বিরাট বাহিনী নিয়ে তাঁতিয়া যদি দৃঢ়ভাবে রোজকে সেদিন আক্রমণ করতেন, তা হলে বিদ্রোহের ইতিহাস অন্য রকমের হতে পারত।

রোজ সাহেব এই ভাবে মুক্ত হয়ে ঝান্সী ধ্বংস করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন। ৩রা এপ্রিল অবরোধের পালা শেষ করে ঝান্সীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। রাস্তায় রাস্তায়, বাড়িতে বাড়িতে যুদ্ধ হল। এইভাবে ইংরেজ বাহিনী যখন রাজপ্রাসাদে পৌঁছল, যুদ্ধ যেন তখন আবার নতুন করে শুরু হল। বিদ্রোহীরা প্রতিটি কামরা হিংস্রভাবে রক্ষা করবার চেষ্টা করল। এইভাবে দু' ঘণ্টা যুদ্ধ হবার পর রানীর বডি গার্ডরা আস্তাবলে আশ্রয় নিল। তখন আস্তাবলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হল। "তাদের একটা দল আধ-পোড়া অবস্থায় আস্তাবল থেকে বেরিয়ে এল; তাদের পোশাকে আগুন ধরে গিয়েছিল। সেই অবস্থায় তারা তাদের আক্রমণকারীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।"[২] ইংরেজরা প্রাসাদ দখল করার পর আরও একদিন ধরে শহরে ভয়ানকভাবে যুদ্ধ চলেছিল।

১। ফরেষ্ট: "হিস্ট্রি অব দি ইণ্ডিয়ান মিউটিনি", ৩য়, পৃঃ ১৯৮। ২। ঐ, পৃঃ ২১৫।

যুদ্ধের পর অন্যান্য শহর—দিল্লী, লক্ষ্ণৌ ও কানপুরে যা ঘটেছিল, ঝান্সীতেও তাই ঘটল—অবাধ, লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ড। ইংরেজরা সামনে যাকেই পেয়েছিল তাকেই হত্যা করেছিল। "যারা পালাতে পারেনি, তারা তাদের স্ত্রীলোকদের ও শিশুদের কুয়োতে ফেলে দিয়েছিল, তারপর নিজেরাও তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।"[১] এই সময় ইংরেজরা ঝান্সীর মূল্যবান গ্রন্থাগারটি ধ্বংস করে দেয়।

একদল পাঠান সৈন্য পরিবেষ্টিত হয়ে ঘোড়ায় চড়ে ইংরেজ বাহিনীর ব্যূহ ভেদ করে রানী ঝান্সী থেকে কল্পিতে চলে এলেন এবং সেখানে রাও সাহেব, বান্দার নবাব ও তাঁতিয়া তোপীর সঙ্গে মিলিত হলেন। ২৩শে মার্চ কল্পির কিছু দূরে কুঞ্চে আবার যুদ্ধ হল। সেখানে হেরে যাবার পর বিদ্রোহী নেতারা হঠাৎ গোয়ালিয়রে উপস্থিত হলেন এবং ১লা জুন বিনা যুদ্ধে ঐ শহর দখল করলেন। গোয়ালিয়রের মহারাজা পালিয়ে গিয়ে আগ্রায় ইংরেজের আশ্রয় নিলেন। ১৭ই জুন ১৮৫৮ সালে ইংরেজ বাহিনী যখন বিদ্রোহীদের আবার গোয়ালিয়রে আক্রমণ করল, তখন রানী লক্ষ্মীবাঈ কোট-কী-সরাই-এর যুদ্ধে নিহত হলেন।

গভর্নর জেনারেল ক্যানিং সব থেকে ভীত হয়েছিলেন মধ্যভারত সম্পর্কে ও বিশেষ করে ঝান্সীর রানী সম্বন্ধে। মধ্যভারতের অন্যান্য নেতাদের তুলনায় লক্ষ্মী-বাঈ-এর রাজনীতিই ছিল সব থেকে বৈপ্লবিক সম্ভাবনাপূর্ণ। রানী নিজে মারাঠা হলেও মারাঠা রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার কোনো আওয়াজ তোলেননি। নানা সাহেব ও তাঁতিয়া তোপী পেশোয়াশাহীর পুনঃপ্রতিষ্ঠার ঘোষণা করে ভুল করেছিলেন। লক্ষ্মীবাঈ এরূপ অদূরদর্শিতার পরিচয় দেননি। মধ্যভারতের অধিকাংশ লোকই ছিল বুন্দেলা, রাজপুত, বঘেয়া ও পাঠান, আর সিপাহীদের অধিকাংশ ছিল অযোধ্যাবাসী; মারাঠাদের সংখ্যা ছিল খুবই অল্প। পেশোয়াশাহীর আওয়াজ মধ্যভারতের জনসাধারণের নিকট কোনো সহানুভূতি জাগিয়ে তুলতে পারেনি। এমন কি, মধ্য ভারতের মারাঠা রাজারাও এতে সাড়া দেননি। মহারাষ্ট্রের জনসাধারণের মধ্যেও নানা সাহেবের পেশোয়াশাহীর দাবি গ্রহণযোগ্য ছিল কি না, তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তাঁতিয়া যদি এই ভুল রাজনৈতিক আদর্শ বর্জন করতে পারতেন, তা হলে তিনি মধ্যভারতের বিদ্রোহী জনসাধারণের মধ্যে আরও অনেক বেশী সাফল্য অর্জন করতে পারতেন।

লক্ষ্মীবাঈ এরূপ কোনো রাজনৈতিক ভুল করেননি। এই কারণেও বটে এবং তাঁর যোগ্যতার জন্যও বটে, তিনিই ছিলেন মধ্যভারতে নেতৃত্ব দেবার একমাত্র

১। লো' ঃ "সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া", পৃঃ ২৫৯

উপযুক্ত ব্যক্তি। এই কারণেই বুন্দেলা, রাজপুত, পাঠান, মারাঠা—সকলেই সমান আগ্রহ নিয়ে তাঁর পতাকাতলে সমবেত হয়েছিল। ঝান্সী অবরোধের সময় কল্পিতে বিদ্রোহী নেতারা স্থির করেছিলেন, মধ্যভারতের যুদ্ধের নেতৃত্ব থাকবে রানী লক্ষ্মীবাঈ-এর হাতে। ঝান্সীর পরাজয়ের পর কুঞ্চে যে যুদ্ধ হয় তার নেতৃত্ব ছিল রানীরই উপর। রানীকে কেন্দ্র করেই সমগ্র মধ্যভারতের বিদ্রোহ একটা বিরাট ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে রূপান্তরিত হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল।

তাঁতিয়া তোপী

লক্ষ্মীবাঈ যখন ১৮৫৮ সালের ২০শে জুন যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ করলেন, তাঁতিয়া আর রাও সাহেব কিছু লোকজন সঙ্গে নিয়ে গোয়ালিয়র ছেড়ে চলে গেলেন। তখন তাঁতিয়ার সঙ্গে কোনো কামান নেই, রসদ নেই, সৈন্যবাহিনী বলতে যা বোঝায়, তাও নেই। তা ছাড়া, অন্যান্য স্থানেও বিদ্রোহীদের অবস্থা তখন অত্যন্ত শোচনীয়। অনেক দিন পূর্বেই ইংরেজের দ্বারা দিল্লী অধিকৃত হয়েছে। বেরিলি, লক্ষ্ণৌ, কানপুর ইত্যাদি বড় বড় শহরগুলি আবার ইংরেজরা দখল করে নিয়েছে। কুমার সিংহ কয়েক মাস পূর্বেই প্রাণত্যাগ করেছেন। ইংরেজ তখন ইংল্যাণ্ড থেকে প্রচুর সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র আমদানি করে এবং একটা একটা করে বিদ্রোহীদের ঘাঁটিগুলি দখল করে দিনের পর দিন অধিকতর শক্তিশালী হয়ে উঠেছে।

এরূপ অন্ধকারাচ্ছন্ন ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে কিন্তু তাঁতিয়া তোপী ও রাও সাহেব কোনো প্রকার নিরুৎসাহ হলেন না। নতুন পরিকল্পনা নিয়ে শিবাজীর গেরিলা যুদ্ধনীতি অবলম্বন করে ইংরেজ-বিরোধী সংগ্রাম চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর হলেন। এখন থেকে তাঁদের প্রধান নীতি হল ৩টি : (১) শত্রুর সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধ এড়িয়ে চলতে হবে ; (২) শত্রুর উপর সুযোগ বুঝে হঠাৎ আক্রমণ করে, বিশেষতঃ তার পশ্চাদ্‌ভাগে সর্বদা হামলা চালিয়ে তাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতে হবে ; (৩) নিজের বাহিনীর জন্য কামান, অস্ত্রশস্ত্র, রসদ ও টাকা-পয়সা সংগ্রহের জন্য মধ্য-ভারতের অসংখ্য ধনী, রাজা, নবাব ও জমিদার—যাঁরা প্রজাদের লুণ্ঠন করে প্রভূত ধনসম্পদের মালিক হয়ে ইংরেজের দাসত্ব বরণ করে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধাচরণ করছিলেন—তাঁদের উপর অনবরত হামলা চালাতে হবে।

এই নীতি অবলম্বন করে তাঁতিয়া যে গেরিলা বাহিনী সংগঠন করেন, তা খুব অল্প মালপত্র নিয়ে যাতায়াত করতে পারত। ইংরেজ বাহিনীর মতো প্রচুর মালপত্র,

রসদ, তাঁবু ইত্যাদির বোঝায় তারা ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ত না। এই কারণে তাঁতিয়ার গতিবিধি খুব দ্রুত হয়ে পড়ল এবং এই নীতি অবলম্বন করার ফলেই তাঁর পক্ষে ইংরেজের বিরাট বাহিনীর বিরুদ্ধে আরও প্রায় এক বৎসর কাল ধরে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল। তাঁতিয়ার পক্ষে আরও একটি অনুকূল অবস্থা ছিল এই যে, মধ্যভারতে প্রচুর পাহাড়-পর্বত, নদনদী, বনজঙ্গল থাকার জন্য গেরিলা যুদ্ধ চালনা করবার উপযুক্ত ক্ষেত্র তিনি পেয়েছিলেন।

কিন্তু কেবলমাত্র রণকৌশল (ট্যাক্‌টিক্‌স) বদল করেই তাঁতিয়া ক্ষান্ত হলেন না। তাঁকে একটা নতুন রণনীতি (স্ট্র্যাটেজি) গ্রহণ করতে হল। পূর্বে তাঁর রণনীতি ছিল কানপুর, গোয়ালিয়র ও ঝান্সীকে কেন্দ্র করে সমস্ত দক্ষিণ ভারতের দিকে অগ্রসর হওয়া। এখন এই সকল প্রধান শক্তিকেন্দ্র হস্তচ্যুত হওয়ায় তাঁতিয়ার প্রধান লক্ষ্য হল—নর্মদা নদী পার হয়ে মহারাষ্ট্র দেশের অভ্যন্তরে নতুন করে বিদ্রোহের প্রধান শক্তিকেন্দ্র নির্মাণ করা। কিন্তু এরূপ একটি দুঃসাহসিক পরিকল্পনা করা এক কথা, আর তাকে কার্যকরী করা আর এক কথা। আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি যে, তাঁতিয়া নিঃস্ব অবস্থায় নানাস্থানে পলাতক হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, আর তাঁর চারিদিকে ইংরেজ বাহিনী তাঁকে ঘেরাও করে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে। এই অবস্থায় শত শত মাইলব্যাপী পাহাড়-পর্বত, বনজঙ্গল, নদনদী অতিক্রম করে নর্মদা পার হওয়া একটা অসাধ্য কর্ম বলেই সাধারণ লোকের কাছে মনে হওয়া স্বাভাবিক।

তাঁতিয়া যখন দক্ষিণ দিকে রওনা হবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, ঠিক সেই সময় ২৯শে জুন আগ্রা থেকে একটি ইংরেজ বাহিনী তাঁকে গোয়ালিয়র থেকে ২০ মাইল পশ্চিমে জৌরা আলিপুরে আক্রমণ করে। ইংরেজ জেনারেল রবার্ট নেপিয়ার ভেবেছিলেন, তাঁতিয়াকে আচমকা আক্রমণ করে তাঁকে খতম করে দেবেন। কিন্তু শিকারকে ফাঁদে ফেলা গেল না। তাঁতিয়া ইংরেজের ব্যূহ ভেদ করে নিজেকে মুক্ত করলেন, তবে দক্ষিণাভিমুখে যাওয়া আর আপাতত তাঁর পক্ষে সম্ভব হল না, কারণ ইংরেজ তখন সেখানে তাঁর পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে।

তাঁতিয়া তখন ঠিক করলেন, তিনি জয়পুর অধিকার করবেন। সেখান থেকে বিশ্বস্তসূত্রে খবর পেয়েছিলেন যে, জয়পুরের মহারাজা ইংরেজের গোলামি স্বীকার করে নিলেও তাঁর প্রজা, সৈন্য ও পুলিস বাহিনী বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। কিন্তু তাঁতিয়ার জয়পুরের দিকে রওনা হবার খবর পেয়েই সমগ্র রাজপুতানার ইংরেজ সেনানায়ক রবার্টস্ (পরে তিনি ফিল্ড মার্শাল লর্ড রবার্টস্ হয়েছিলেন) নাসিরাবাদ থেকে এসে জয়পুর দখল করে ফেললেন। তাঁতিয়া

দিল্লী
বিকানীর
আলোয়ার
সেলুইর
দেভাসা
আগ্রা
এটাওয়া
জয়পুর
যমুনা নং
আজমীর
কোসানী
নুসিরাবাদ
জওড়া আলিপুর
গোয়ালিয়র
টঙ্ক
চম্বল নং
বেতোয়া নং
ঝাঁসি
সাঙ্গানের
তালবেহুত
চান্দেরী
কোটারিয়া
বারোদ
সিন্দোয়া
উদয়পুর
মংগ্রৌলা
জিরাপুর
সিরঞ্জ
খোরাই
প্রতাপগড়
রাজগড়
বাগরোদ
আমেদাবাদ
ভূপাল
উজ্জয়িনী
গুজরাট
ইন্দোর
হোসাঙ্গাবাদ
মউ
বরোদা
ছোট উদয়পুর
নর্মদা নং
রাজপুর
তাপ্তী নং
বোম্বাই অভিমুখে
আরব সাগর
Atul Roy
তাঁতিয়া তোপীর গোরিলা অভিযান
১৮৫৮ এর ২০শে জুন গোয়ালিয়রে তাঁহার পরাজয়ের
পর হইতে ১৮৫৯ এর মার্চে সিরঞ্জের নিকট বন্দী হওয়া
পর্য্যন্ত
0 ৩০ ৬০
মাইল
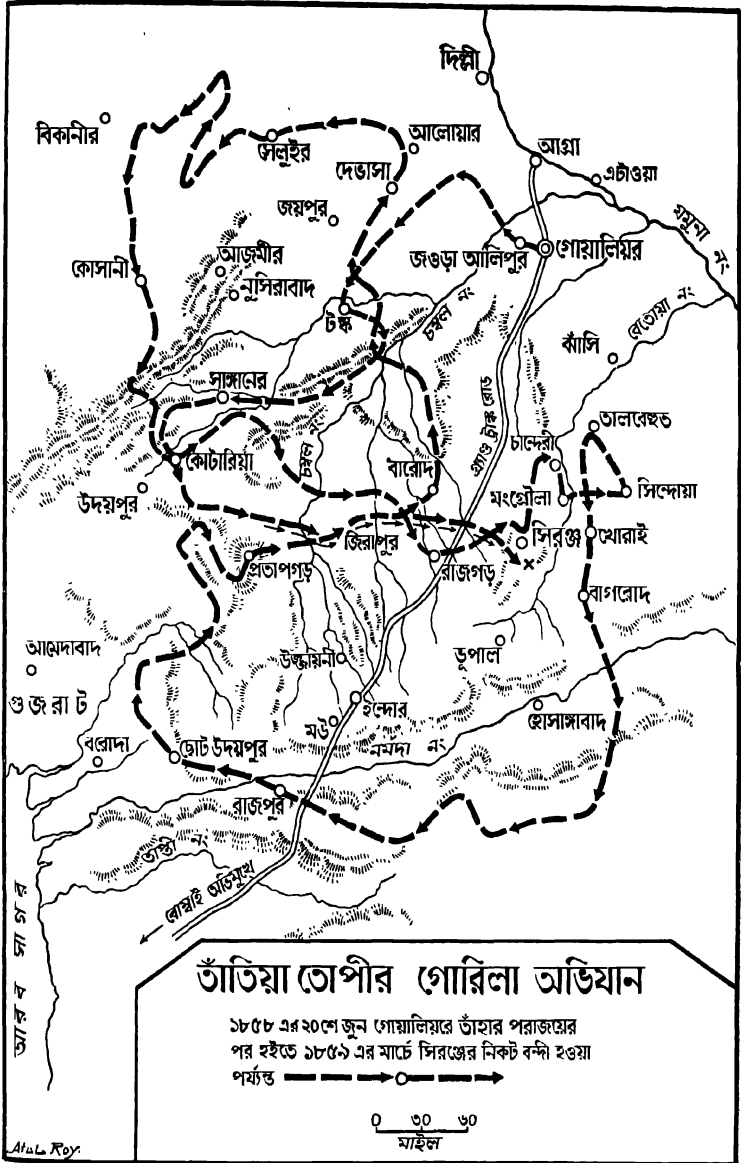
তখনও জয়পুর থেকে ৬০ মাইল দূরে। জয়পুর দখল করবার আশা ছেড়ে দিয়ে তখন তাঁতিয়া টঙ্কের দিকে অগ্রসর হলেন। তাঁর বিরুদ্ধে লড়বার জন্য টঙ্কের নবাব ৪টি কামান সমেত একটি বাহিনী পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু এই গোটা বাহিনীটিই তাঁতিয়ার বিরুদ্ধে লড়ার পরিবর্তে সমস্ত কামান নিয়ে তাঁর দলভুক্ত হয়ে গেল। এইভাবে নতুন করে তাঁতিয়া আবার কতকগুলি কামান, অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ পেয়ে ১০ই জুলাই দক্ষিণাভিমুখে রওনা হলেন। ইতিমধ্যে রবার্টস্ ও হোম্স দুই ধার থেকে দুটি ইংরেজ বাহিনী নিয়ে টঙ্কে পৌছে তাঁতিয়াকে ধারে কাছে কোথায়ও খুঁজে পেলেন না। তাঁতিয়া তখন অনেক দূরে সরে গেছেন। এইভাবে গোয়ালিয়রের দক্ষিণ-পশ্চিমে ২০০ মাইল দূরে বিদ্রোহী গেরিলা বাহিনী চম্বল নদীর ধারে ইন্দ্রগড়ে এসে পৌছল।

চম্বল নদী পার হতে পারলেই বিনা বাধায় তাঁতিয়া আবার নর্মদার দিকে অনেকখানি অগ্রসর হতে পারেন। কিন্তু ইতিপূর্বে কয়েকদিন ধরে প্রচুর বৃষ্টি হওয়ার ফলে চম্বল তখন ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে। স্ফীত চম্বলের দ্রুত খরস্রোতে সেনদী তখন পার হওয়া অসম্ভব। আবার এদিকে রবার্টস্ ও হোম্স তাঁর দিকে ধাওয়া করে আসছেন। তাঁতিয়া তখন বুঁদির দিকে রওনা হলেন এবং দ্রুত মার্চ করে নিমচ নাসিরাবাদ অঞ্চলে এসে পৌছলেন। এক বৎসর পূর্বে এই অঞ্চলটি একটি বিখ্যাত বিদ্রোহ-কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। তারপর এখান থেকে বিদ্রোহীরা উদয়পুরের দিকে অগ্রসর হলেন। এই রাজপুত রাজা ও জনসাধারণ তাঁতিয়াকে অভ্যর্থনা করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে ছিল। উদয়পুর শহরের মাত্র ৮০ মাইল দূরে যখন তিনি পৌছেছেন, তখন রবার্টস্ আর হোম্স তাঁর পথরোধ করে দাঁড়ালেন। এইখানে বাধ্য হয়ে ভীলওয়ারা নামক একটি স্থানে তাঁতিয়াকে ইংরেজের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে লড়তে হল। কিন্তু অন্ধকার রাত্রে তিনি আবার দ্রুত মার্চ করে ইংরেজের কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করলেন। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। বৃটিশ বাহিনী ধীরে ধীরে তাঁকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলল। যেদিকেই যাবার চেষ্টা করেন, সেদিকেই তাঁর সামনে শত্রুবাহিনী। আরাবল্লী পর্বতমালায় পরিবেষ্টিত রাজসমন্দ হ্রদের ধারে কাক্রোলীর নিকট ইংরেজ বাহিনী ১৩ই ও ১৪ই আগস্ট আবার বিদ্রোহীদের প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করল। এবার সত্য সত্যই তাঁতিয়া ইংরেজের ফাঁদে পড়লেন। তা ছাড়া, দিনের পর দিন দ্রুত মার্চ করার ফলে ও বহু বিনিদ্র রজনী যাপন করার ফলে বিদ্রোহী বাহিনী অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল।

কিন্তু তা সত্বেও যখন তাঁতিয়া দেখলেন যে, ইংরেজের হাত থেকে এবার আর নিস্তার নেই, তখন তিনি মরিয়া হয়ে লড়বার জন্য প্রস্তুত হলেন। তাঁর সঙ্গে মাত্র

৪টি ছোট ছোট কামান ; আর তাঁকে লড়তে হবে ইংরেজের অনেকগুলি বড় বড় কামানের বিরুদ্ধে। তিনি পর্বতের এমন একটি স্থানে তাঁর কামানগুলি বসালেন যে, ইংরেজ বাহিনীকে তার ফলে অনেকক্ষণ ধরে তিনি একটি স্থানে সীমাবদ্ধ করে রাখতে পেরেছিলেন এবং ইংরেজরাও তাদের বড় কামান দিয়ে তাঁর বিশেষ ক্ষতি করতে পারেনি। সমস্ত দিন এইভাবে যুদ্ধ চলার পর মুষ্টিমেয় সৈন্যকে ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত রেখে, অধিকাংশ সৈন্য নিয়ে বান নদী সাঁতরিয়ে পার হয়ে তাঁতিয়া আবার অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

তাঁতিয়াকে আবার সবই হারাতে হল। যে কয়টি কামান ছিল, সবগুলিই তাঁকে নদীর অপর পারে রেখে আসতে হল, সব বন্দুকও সঙ্গে আনতে পারেননি। এইভাবে একরকম রিক্তহস্তে তিনি আবার ছুটে চললেন নর্মদা নদীর দিকে। এক মুহূর্তের জন্যও তাঁর বিশ্রাম করবার সুযোগ নেই। ইংরেজরাও চুপ করে বসে নেই। তারাও ছুটছে, নতুন সৈন্যদল ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আবার তাঁতিয়াকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলার জন্য।

এইভাবে প্রায় ২০০ মাইল বন-জঙ্গল পাহাড়-পর্বত অতিক্রম করে, কোথাও বা শত্রুকে পাশ কাটিয়ে, কোথাও বা তার সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ করে, ২০শে আগষ্ট তারিখে তিনি চম্বল নদীর ধারে এসে পৌছলেন। তাঁর পিছনে দুটি ও সামনে নদীর অপর প্রান্তে তিনটি বৃটিশ বাহিনী। নদী পার হলেই আবার তাঁকে ইংরেজদের ফাঁদে পড়তে হবে। তা ছাড়া চম্বলের যেরকম অবস্থা, তাতে তা পার হওয়া ইংরেজরা অসম্ভব বলেই ধরে নিয়েছিল। তাঁতিয়া ইংরেজের চোখের সামনেই বর্ষাকালের ভয়ঙ্কর এই চম্বল নদী পার তো হলেনই, তাদের মাঝখান দিয়েই তিনি দ্রুত বেগে চলে গেলেন এবং সোজা ঝালোয়ার রাজ্যের রাজধানী ঝালরাপতনে এসে উপস্থিত হলেন। এখানকার অত্যধিক ইংরেজভক্ত রাজা রানা পৃথ্বীসিং তাঁতিয়াকে বাধা দেবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু টঙ্কে যা ঘটেছিল এখানেও তাই হল। ঝালরাপতনের সৈন্যরা ও জনসাধারণ তাঁতিয়ার সঙ্গে মিলিত হয়ে বিদ্রোহের পতাকা উড়িয়ে দিল। এ পর্যন্ত তাঁতিয়ার নিকট একটিও কামান ছিল না, কোনো রসদ ছিল না, কোনো টাকা-পয়সাও ছিল না। ঝালরাপতনে তিনি পেলেন ৩০টি কামান, ১৫ লক্ষ টাকা, অনেক নতুন সৈন্য, প্রচুর রসদ, ঘোড়া, হাতি, বন্দুক ইত্যাদি। এইখানে ৫ দিন বিশ্রাম করে রায়গড় হয়ে ইন্দোর পৌছবার জন্য সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিকে তাঁতিয়া আবার যাত্রা শুরু করলেন।

যে কোনো কারণেই হোক, রায়গড় পৌছতেই তাঁর দু' সপ্তাহ কেটে গেল। ইতিমধ্যে ইংরেজরা আবার চারিদিকে সতর্ক হয়ে উঠল। তাঁতিয়া রায়গড়ে

পৌঁছানোর ফলে এই যুদ্ধে একটা বৈপ্লবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হল। আগ্রা থেকে গোয়ালিয়র ও ইন্দোর হয়ে যে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড বোম্বে পর্যন্ত চলে গিয়েছে, সেই রাস্তার ধারেই রায়গড় অবস্থিত। সেখান থেকে মাত্র ১৫০ মাইল দক্ষিণে ইন্দোর, আর তার আরও ৫০।৬০ মাইল দক্ষিণে নর্মদা। ইন্দোরের সৈন্যবাহিনী ও তার জনসাধারণ তাঁতিয়ার আগমনের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিল। ইন্দোরে তাঁতিয়ার আগমনের অর্থ—সমগ্র মহারাষ্ট্র দেশের দরজা তাঁর কাছে সম্পূর্ণভাবে খুলে যাওয়া এবং জাতীয় বিপ্লবের একটা নতুন অধ্যায়ের সূচনা হওয়া।

কিন্তু ইতিমধ্যে তাঁতিয়ার রায়গড় আগমনে বিলম্ব হওয়ার সুযোগ নিয়ে জেনারেল মিচেল তাঁতিয়ার ইন্দোরে যাবার পথরোধ করে দাঁড়ালেন এবং ১৫ই সেপ্টেম্বর বিওউরাতে তাঁতিয়াকে আক্রমণ করলেন। তারপর বিদ্রোহীরা চান্দেরী দখল করবার চেষ্টা করল। সেখানে ব্যর্থ হবার পর ১০ই অক্টোবর মাংগ্রোলীতে তাদের মিচেলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হল। কিন্তু এখানেও ইংরেজ জেনারেলের চোখে ধুলো দিয়ে অবশেষে তাঁতিয়া নর্মদা নদী পার হয়ে নাগপুর প্রদেশে প্রবেশ করলেন। অসিরগড় ও তারপর কুরগাওঁ-এ এসে তিনি দেখলেন, শত্রুরা এখানে সর্বত্র তাঁর জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। তাঁর সঙ্গে যে অল্পসংখ্যক সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র ছিল, তা নিয়ে, তিনি দেখতে পেলেন যে, শত্রু কর্তৃক সুরক্ষিত গিরিসংকট অতিক্রম করে মহারাষ্ট্র দেশের অভ্যন্তরে পৌঁছানো সম্ভবপর নয়। তাঁতিয়া ও রাও সাহেব মহারাষ্ট্রে পৌঁছানোর যে স্বপ্ন এতদিন ধরে দেখে আসছিলেন, যার জন্য এত অক্লান্ত পরিশ্রম, এত অসাধারণ বীরত্ব, ত্যাগ ও অধ্যবসায় দেখিয়ে এসেছেন, তাঁদের সেই স্বপ্ন যে মুহূর্তে বাস্তবে পরিণত হবার উপক্রম হল, সেই মুহূর্তেই তা আবার শূন্যে বিলীন হয়ে গেল।

বাধ্য হয়ে তাঁতিয়া ও রাও সাহেবকে আবার নর্মদা পার হয়ে উত্তরের দিকে আসতে হল। এইবার তাঁর লক্ষ্য ছিল মারাঠা রাজ্য বরোদার রাজধানী। কিন্তু সেখানেও তিনি পৌঁছতে পারলেন না। বরোদা থেকে ৫০ মাইল দূরে ছোট উদয়পুরে ইংরেজরা তাঁকে আক্রমণ করল। এই দিকে ব্যর্থ হয়ে বাঁসোয়ারা, মেওয়ার, প্রতাপগড়, মন্দিসোর, জিরাপুর হয়ে ১৮৫৯ সালের জানুয়ারিতে তিনি কোটা রাজ্যে প্রবেশ করলেন। এইখানে নারওসারের বিদ্রোহী রাজপুত রাজা মানসিং এসে তাঁতিয়ার সঙ্গে মিলিত হলেন। এই সময় শাহজাদা ফিরোজ শাহও ইন্দ্রগড়ে এসে যখন তাঁতিয়ার সঙ্গে যুক্ত হলেন, তখন তাঁদের মিলিত সৈন্যসংখ্যা হল মাত্র ১৫০০। জয়পুর ও ভরতপুরের মাঝে দেভাষা নামক স্থানে ব্রিগেডিয়ার সাওয়ার্স তাঁদের ১৪ই জানুয়ারি আক্রমণ করে ঘেরাও করে ফেললেন। বিদ্রোহীদের

এই সময়কার দুরবস্থা সম্বন্ধে কর্নেল সমারসেট তাঁর ১লা জানুয়ারির রিপোর্টে লিখেছিলেন:

"সব সময় বিদ্রোহীদের পশ্চাতে লেগে থাকার ফলে ও অনবরত যুদ্ধের জন্য তাদের সংখ্যা খুবই কমে গিয়েছিল। বাস্তবিকই, এটা খুবই আশ্চর্য যে, নেতাদের ঘোড়াগুলির এখনও দাঁড়াবার জন্য পাগুলো আছে, কিম্বা তাদের আরোহীদের জিনের উপর বসে থাকবার শারীরিক সামর্থ্য এখনও আছে। ... অনেক ভাল ভাল যুদ্ধের ঘোড়া রাস্তার ধারে পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে; তাদের পিঠ পোকায় ভর্তি হয়ে গিয়েছে, আর তাদের খুরগুলি একেবারে ক্ষয়ে গিয়েছে।"[১]

খুব অল্প শক্তি নিয়েই তাঁতিয়া ও ফিরোজ শাহকে শক্তিশালী ইংরেজ বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়তে হল। তাদের ২০০ জন নিহত হল। কিন্তু এবারও তাঁতিয়া, রাও সাহেব ও ফিরোজ শাহ শত্রুকে ফাঁকি দিতে সমর্থ হলেন। আবার ৭ দিন পর আর একটা নতুন ইংরেজ বাহিনী জয়পুর থেকে ৬৪ মাইল দূরে শিকার নামক একটা স্থানে বিদ্রোহীদের আক্রমণ করল। এবারও ইংরেজরা বিদ্রোহী নেতাদের ধরতে পারল না। এই যুদ্ধের পরই রাও সাহেব, ফিরোজ শাহ ও তাঁতিয়া পরস্পর মন্ত্রণা করে তিন জন বিভিন্ন দিকে যাত্রা করলেন।

কিছুদিন পর, রাও সাহেব ও ফিরোজ শাহ আবার মিলিত হয়ে মার্চ মাসে সেরঞ্জ-এর জঙ্গলে প্রবেশ করলেন। ৬টা ইংরেজ বাহিনী চতুর্দিক থেকে ৪০ মাইল পরিধির সেরঞ্জ-জঙ্গল ঘেরাও করে অগ্রসর হতে লাগল। বিদ্রোহীদের সঙ্গে কতকগুলি যুদ্ধও হল; অনেক লোক দুপক্ষেই নিহত হল। কিন্তু এবারও বিদ্রোহী নেতাদের ইংরেজরা ধরতে পারল না। সেরঞ্জ-এর যুদ্ধের পর রাও সাহেব ও ফিরোজ শাহ আবার পৃথক হলেন। ছদ্মবেশে রাও সাহেব চলে যান উজ্জয়িনী, সেখান থেকে উদয়পুর। সেখান থেকে তাঁর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে দিল্লী হয়ে জম্মুতে চেনানি নামক স্থানে বাস করতে থাকেন। কিছুকাল পরে তিনি ইংরেজের হাতে গ্রেপ্তার হন ও তাঁর ফাঁসি হয়। ফিরোজ শাহ কান্দাহার, কাবুল, তেহেরান ও ইস্তাম্বুল হয়ে মক্কায় পৌছান এবং ১৭ই ডিসেম্বর ১৮৭৭ সালে সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়।

তাঁতিয়া চলে গিয়েছিলেন মানসিং-এর সঙ্গে পেরনের জঙ্গলে। ২রা এপ্রিল ১৮৫৯ সালে মানসিং ইংরেজের নিকট আত্মসমর্পণ করলেন। "পাঁচ দিন পর মানসিং তাঁর মহান জাতির আদর্শের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে, তাঁর অতিথি তাঁতিয়া

১। ফরেষ্ট: "হিষ্ট্রি অব দি ইণ্ডিয়ান মিউটিনি", পৃঃ ৬১২।

তোপীকে ধরিয়ে দিতে রাজী হলেন। ৭ই এপ্রিল একজন বুদ্ধিমান নেটিভ অফিসারের নেতৃত্বে বোম্বাই নেটিভ পদাতিক বাহিনীর একদল সিপাহীকে জঙ্গলে পাঠিয়ে দিলেন। সেখানে রাত ২টা পর্যন্ত তারা লুকিয়ে রইল। তারপর তাঁতিয়া যেখানে দুজন লোকের সঙ্গে ঘুমিয়ে ছিল, মানসিং তাদের সেখানে নিয়ে গেল। মানসিং গিয়েই তাঁতিয়ার অস্ত্র ধরে ফেললে, আর সকলে তাঁকে বন্দী করল। সূর্যোদয়ের সময় তারা বন্দীকে ক্যাপ্টেন মীডের ক্যাম্পে নিয়ে এল।”[১] সিপ্রিতে ১৫ই এপ্রিল সামরিক আদালতে তাঁতিয়ার বিচার হয়; ১৮ই এপ্রিল ১৮৫৯ সালে তাঁর ফাঁসি হয়। তাঁতিয়ার মৃত্যুতে ভারতীয় মহাবিদ্রোহেরও যবনিকা-পতন হল।

মহাবিদ্রোহের নেতাদের মধ্যে তাঁতিয়া তোপী, কুমার সিং ও ফিরোজ শাহই সব থেকে বেশী সামরিক উৎকর্ষ দেখিয়েছিলেন, যদিও বিদ্রোহের পূর্বে তাঁদের কারও কোনো প্রকার সামরিক শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা ছিল না। যাঁদের বিরুদ্ধে তাঁদের লড়তে হয়েছিল, তাঁরা ছিলেন ইংল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ পেশাদার সামরিক অফিসার; তাঁদের সকলের পিছনেই ছিল ২০-৩০-৪০ বৎসরের যুদ্ধের অভিজ্ঞতা। তাঁরা প্রায় সকলেই ক্রাইমিয়া ও অন্যান্য যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন; কমাণ্ডার-ইন-চীফ লর্ড ক্লাইভ যুদ্ধ শুরু করেছিলেন নেপোলিয়নের সময়ে—তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধগুলিতে যোগদান করে। তা ছাড়া, তাঁদের পিছনে ছিল ভারত সরকারের, ইংল্যাণ্ডের ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের অর্থবল, লোকবল ও যুদ্ধের অন্যান্য সকল রকমের সাজসরঞ্জাম ও তখনকার দিনের সর্বাধুনিক ও সর্বশ্রেষ্ঠ সংগঠন। তা সত্ত্বেও এই সব অনভিজ্ঞ বিদ্রোহী নেতারা যে এতদিন ধরে এই প্রকার দুর্ধর্ষ শত্রুর বিরুদ্ধে এত কৃতিত্বের সঙ্গে লড়তে পেরেছিলেন, তা প্রত্যেক ভারতবাসীরই গর্বের বিষয়।

এঁদের মধ্যে কুমার সিং-ই রণনীতিতে (strategy) সব চেয়ে বেশী পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন। তাঁর যুদ্ধ পরিকল্পনা ছিল অপূর্ব ও তাঁর আক্রমণ-গুলিও ছিল অসাধারণ সাহসিকতাপূর্ণ। দরকার মতো তিনি যেমন শত্রুকে এড়িয়ে চলেছেন, তেমনি আবার সুযোগ মতো শত্রুকে বারবার প্রচণ্ড আঘাতও করেছেন। একমাত্র তিনিই গেরিলা যুদ্ধের এই প্রধান দুটি নীতিকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পেরেছিলেন। তাঁতিয়া তোপী (এবং কতক পরিমাণে ফিরোজ শাহও) অসাধারণ সাংগঠনিক ক্ষমতা ও দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন। গোয়ালিয়রের পরাজয়ের পর প্রায় এক বৎসর ধরে তিনি যে বিরামহীন যুদ্ধ চালিয়েছিলেন, তার উদাহরণ

১। ফরেষ্ট: পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৬২১-২২।

।। বন্দী অবস্থায় তাঁতিয়া তোপী

জগতের ইতিহাসে খুবই বিরল। এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি বারবার বড় বড় শহর ও দুর্গ দখল করেছেন, বারবার কামান, লোকবল ও অস্ত্রশস্ত্র হারিয়েছেন, আবার তা সংগ্রহ করেছেন ; পাহাড় পর্বত ডিঙিয়ে, নদনদী, বনজঙ্গল অতিক্রম করেছেন ও অনেক সময় দৈনিক ৬০ মাইল ধরে অনবরত অশ্বারোহণে চলেছেন। বারবার ইংরেজ বাহিনী তাঁকে ঘেরাও করে ফেলেছে, বারবার তিনি শত্রুব্যূহ ভেদ করে ইংরেজের চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছেন। শক্তিশালী অগণিত শত্রুর শত চেষ্টা সত্ত্বেও তাদের চোখে ধূলি দিয়ে তিনি নর্মদা পার হয়েছেন। কিন্তু গেরিলা নেতার আর একটি কর্তব্যে তিনি নৈপুণ্য দেখাতে পারেননি—অনেকবার সুযোগ পেয়েও তিনি শত্রুকে আঘাত করতে পারেননি। তাঁতিয়ার সব থেকে বড় ভুল হয়েছিল নর্মদা অতিক্রম করে মহারাষ্ট্রের দ্বারদেশে পৌঁছে আবার সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করা। তিনি পূর্বে অনেকবার যেরূপ অসাধ্যসাধন করেছিলেন, এবারও যদি মরিয়া হয়ে চেষ্টা করতেন, হয়ত তাঁর স্বপ্ন সফল হত।

শেষ কথা

বিনায়ক দামোদর সাভারকারই প্রথম ভারতীয়, যিনি জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের ইতিহাস লিখবার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি তাঁর 'দি ইণ্ডিয়ান ওয়ার অব ইণ্ডিপেণ্ডেন্স' লিখেছিলেন ১৯০৮ সালে, কিন্তু ইংরেজ সরকারের দৌলতে তা ভারতে কিম্বা ইংল্যাণ্ডে ছাপানো সম্ভব হয়নি। পরে তা গোপনে হল্যাণ্ডে ও প্যারিসে ছাপানো হয়েছিল এবং তার প্রায় ৪০ বৎসর পরে ১৯৪৭ সালে ভারতে প্রথম ছাপা হয়। সাভারকারই হলেন প্রথম ভারতীয়, যিনি ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহকে 'সিপাহী বিদ্রোহ' না বলে তাকে ভারতের 'স্বাধীনতার যুদ্ধ' আখ্যা দিলেন। পরবর্তী ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে সমগ্র ভারতের হিন্দু-মুসলমানের এই ঐক্যবদ্ধ প্রথম জাতীয় সশস্ত্র অভ্যুত্থানের যে ঐতিহাসিক মূল্য আছে, তা সাভারকারই প্রথম ভারতবাসীর সামনে তুলে ধরলেন। কিন্তু সাভারকারের গ্রন্থের দুর্বলতার কারণ হল এই যে, তিনি ঐতিহাসিক বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এই জাতীয় বিদ্রোহকে বিচার করেননি। তা ছাড়া, নানা সাহেবের পেশোয়া-শাহীর পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে এত উচ্ছ্বসিত ও উগ্রভাবে প্রশংসা করেছেন এবং কোনো ইতিহাসগ্রাহ্য তথ্য প্রমাণ দাখিল না করেই নানা সাহেবকে বিদ্রোহীদের নায়করূপে চিত্রিত করে তাঁকে এত বড় একটা মহামানব বানিয়ে দিয়েছেন যে, তা একদিকে যেমন ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রগতিশীলতাকে খর্ব করেছে, অন্যদিকে তাঁর গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্যও ক্ষুন্ন করেছে।

বাস্তবিক পক্ষে, বিদ্রোহের পূর্বে ভারতব্যাপী কোনো প্রকার ষড়যন্ত্র হয়েছিল কি না, সে সম্বন্ধে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। চর্বিযুক্ত টোটা চালু করবার চেষ্টার পর থেকে বিভিন্ন স্থানের সিপাহীদের মধ্যে চিঠির আদান-প্রদান হয়েছিল, সিপাহী প্রতিনিধিদের পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করবার চেষ্টা চলেছিল,

কোনো কোনো রাজা সিপাহীদের নিকট তাঁদের প্রতিনিধি পাঠিয়েছিলেন, সিপাহী প্রতিনিধিদের গুপ্ত বৈঠকও বসেছিল। এই সব সম্বন্ধে অনেক প্রমাণই পাওয়া যায়। এ থেকেই বোঝা যায়, এলাকাগতভাবে যে বিদ্রোহের একটা সলাপরামর্শ চলেছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

কর্নেল স্মাইদ, যাঁর হুকুমের ফলে মিরাটে বিদ্রোহ শুরু হয়, গর্ব করে বলেছিলেন যে, ১০ই মে তারিখে বিদ্রোহ ঘটিয়ে তিনি বৃটিশ সাম্রাজ্যকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। ক্র্যাক্রফ্‌ট উইলসন, যাঁকে মিরাট ডিভিশনে শান্তি স্থাপন করবার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল, তাঁর রিপোর্টে বলেছিলেন, "আমি জোর করে বলতে পারি যে, সমগ্র বেঙ্গল আর্মিতে বিদ্রোহ শুরু করবার দিন স্থির করা হয়েছিল ৩১শে মে, ১৮৫৭, রবিবার এবং প্রত্যেক রেজিমেণ্টে তিন জন সভ্য নিয়ে বিদ্রোহ চালনা করবার জন্য এক একটা করে কমিটি হয়েছিল ; কিন্তু সাধারণ সিপাহীরা এই সব প্ল্যান সম্বন্ধে কিছুই জানত না।"[১] আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সিপাহীরা ২২শে জুন পলাশী যুদ্ধের শতবার্ষিকীর দিন বিদ্রোহ শুরু করবে ঠিক করেছিল।

চক্রান্ত যে একটা চলছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই ; কিন্তু তা কতদূর অগ্রসর হয়েছিল, এবং তা কেবলমাত্র সিপাহীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল কি না ; বাহাদুর শাহ, নানা সাহেব, লক্ষ্মীবাঈ, বেগম হজরত মহল প্রভৃতি তাতে জড়িত হয়েছিলেন কি না ; তা কোনো সঠিক কেন্দ্র-সংহত আকার ধারণ করেছিল কি না ; কিম্বা কোনো বৈদেশিক শক্তির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল কি না—এ সব সম্বন্ধে সঠিকভাবে জানবার কোনো উপায় নেই। চক্রান্ত সাধারণতঃ গোপনেই হয়ে থাকে এবং অনেক সময় তা গোপনই থেকে যায়। ভারতের তৎকালীন অবস্থায় কিছুটা চক্রান্ত হওয়া মোটেই অসম্ভব ছিল না। তাই চক্রান্ত একেবারেই হয়নি, এ কথাটাও খুব জোর করে বলা যায় না। ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন যে, যেহেতু ১৮৫৭ সালের জাতীয় বিদ্রোহ চক্রান্তের ফলে ঘটেনি, সেজন্য একে একটা সংগঠিত জাতীয় বিদ্রোহ বলে গণ্য করা যায় না (পৃঃ ২১৮)। চক্রান্ত না করেও এবং সক্ষম কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব না থাকলেও জাতীয় বিদ্রোহ হতে পারে। গণ-আন্দোলনের ফলেই ও জাতীয় দাবির উপর ভিত্তি করেই জাতীয় বিদ্রোহ ঘটে ; চক্রান্ত তাকে একটা বিশিষ্ট রূপ দিতে পারে, তাকে চালিতও করতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে এই বিদ্রোহ সক্ষম কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের দ্বারা পরিচালিত হয়, আবার অনেক ক্ষেত্রে উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাব ঘটে। উপযুক্ত কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব না থাকলেই বিদ্রোহের জাতীয় চরিত্র নষ্ট হয়ে যায় না।

১। কে' : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ২য়, পৃঃ ১১০।

অনেকের মতে সিপাহীরা ও জনসাধারণ ছিল ধর্মান্ধ, তাদের মধ্যে কোনো রাজনৈতিক চেতনা ছিল না। তারা বিদ্রোহ করেছিল তাদের ধর্মকে বাঁচাবার জন্য ; 'ধর্ম বাঁচাও'—এই ছিল তাদের আওয়াজ ; তাদের মধ্যে দেশাত্মবোধ কিম্বা জাতীয়তাবোধ ছিল না—ডাঃ মজুমদারেরও এই মত (পৃঃ ২২৯-৩০)। ধর্মের প্রশ্ন যে মানুষের জীবনে অতীতে সর্বদেশেই একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে এবং এখনও অনেক দেশে করে থাকে, তা কেউই অস্বীকার করতে পারেন না এবং ধর্মকে কেন্দ্র করে যে অনেক যুদ্ধও ঘটে গিয়েছে, তাও কারও অজানা নেই। ভারতবর্ষে ধর্মের স্থান সেদিন পর্যন্ত কত উঁচুতে ছিল, সে সম্বন্ধে 'আত্মশক্তি' নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

"আমাদের দেশে কল্যাণশক্তি সমাজের মধ্যে। তাহা ধর্মরূপে আমাদের সমাজের সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া আছে। সেইজন্য এতকাল ধর্মকে সমাজকে বাঁচানোই ভারতবর্ষ একমাত্র আত্মরক্ষার উপায় বলিয়া জানিয়া আসিয়াছে। রাজত্বের দিকে তাকায় নাই, সমাজের দিকেই দৃষ্টি রাখিয়াছে। এইজন্য সমাজের স্বাধীনতাই যথার্থভাবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা। কারণ, মঙ্গল করিবার স্বাধীনতাই স্বাধীনতা, ধর্মরক্ষার স্বাধীনতাই স্বাধীনতা।"[১]

বিদেশী শত্রু ভারতবাসীর রাজ্য কেড়ে নিয়েছে, তার রাজনৈতিক স্বাধীনতা হরণ করেছে, তাদের ধনদৌলত লুণ্ঠন করেছে, তাদের শিল্প-বাণিজ্য-কৃষি ধ্বংস করেছে। এখন তাদের শেষ অবলম্বন ধর্ম, যে ধর্মকে তারা যুগ যুগ ধরে নিজের জীবনের থেকেও উঁচুতে স্থান দিয়ে এসেছে, সেই ধর্মেরই মূলে তাদের বিদেশী শত্রু ফিরিঙ্গীরা আজ শেষ আঘাত হানতে চলেছে, তাদের যুগ-যুগান্তরের নিজস্ব সভ্যতা, কৃষ্টি ও জাতীয় বৈশিষ্ট্য ধ্বংস করে তাদের বিজাতীয় করতে চলেছে। তাই তাদের কাছে চর্বিযুক্ত টোটা হল ইংরেজের শেষ শয়তানি অস্ত্র, বিদেশী শত্রুর চ্যালেঞ্জ। তাদের সব কিছু বিক্ষোভ টোটাতেই এসে কেন্দ্রীভূত হল। কিন্তু যে প্রেরণা তাকে নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তুলল, তা ধর্মের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না, তাকে সোজা রাজনীতি ক্ষেত্রে নিয়ে গেল। এইভাবে হল সিপাহী ও সাধারণ ভারতবাসীদের মধ্যে বর্তমান যুগের জাতীয় চেতনার প্রথম উন্মেষ।

টোটার বিরুদ্ধে সংগ্রামের তাৎপর্য আমাদের দেশের কয়েকজন 'আলোকপ্রাপ্ত' পণ্ডিত না বুঝতে পারলেও, তখনকার ইংরেজ শাসকদের বুঝতে বিলম্ব হয়নি। বাহাদুর শাহর বিচারের সময় সরকারী প্রসিকিউটর এ সম্বন্ধে যা বলেছিলেন, তা প্রণিধানযোগ্য :

১। "রবীন্দ্র রচনাবলী", ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৫৫৩।

"ধর্মে, বর্ণে, আচার-ব্যবহারে, চিন্তায় ও সর্বপ্রকারে যারা বিদেশী, সেই বিদেশীদের দেশ থেকে বিতাড়িত করে নিজেদের দ্বারা ক্ষমতা ও আসন দখল করবার এই যে আন্দোলন, যা কেবলমাত্র রাজনৈতিক বলেই প্রমাণ হচ্ছে, তাকে শুধু ধর্মের আন্দোলন বললে ভুল হবে।··· মিরাটে ও দিল্লীতে কোনো মুসলমান অথবা হিন্দুর টোটা ব্যবহার করতে সত্যিকারের কোনো আপত্তি ছিল না, তা খুব ভালভাবেই প্রমাণ হয় যখন দেখা যায় যে, কি আগ্রহের সঙ্গে তারাই ওগুলি ব্যবহার করেছিল ইউরোপীয় অফিসারদের খুন করার জন্য অথবা বন্দীর (বাহাদুর শাহর) পতাকাতলে সমবেত হয়ে দিনের পর দিন ইংরেজদের আক্রমণ করার জন্য।··· অনেক স্থলে যেখানে সিপাহীরা বিদ্রোহ করেছে সেখানে টোটা সম্বন্ধে কোনো উচ্চ-বাচ্যই হয়নি। ··· আমি জোর করেই বলব যে, এই চর্বিযুক্ত টোটার চাইতে আরও অনেক গভীর ও শক্তিশালী কিছু এই বিদ্রোহে ছিল। ··· এত বড় একটা ভয়াবহ কাণ্ড এইরকম ভাবে হঠাৎ ঘটে যাওয়া কি সম্ভব হত, যদি টোটার প্রশ্ন উঠবার পূর্বে সিপাহীরা সন্তুষ্ট ও সুস্থ মনে থাকত? ··· ঘটনাবলীর স্বাভাবিক বিকাশের সঙ্গে তুলনা করলে এটা কি সঙ্গত মনে হয় যে, এই একটামাত্র উত্তেজনার ফলেই এতবড় একটা ভয়ঙ্কর হিংসাত্মক কাণ্ডের শুরু হয়ে যেতে পারে? ··· অথবা মিরাটের মাত্র তিনটি বাহিনীর পক্ষে, কেবলমাত্র দিল্লীর বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে, বৃটিশ সরকারকে ধ্বংস করে দেওয়ার কল্পনা করার মতোও এত বড় একটা দুঃসাহসিক কাজ কি সম্ভব হত? এটা বলা যেতে পারে—এই টোটার ব্যাপারটা, যার উপর ১০ই মে তারিখের পূর্ব পর্যন্ত এত জোর দেওয়া হয়েছিল, আস্তে আস্তে একেবারেই অস্পষ্ট হয়ে গেল; ··· দিল্লীতে বিদ্রোহীদের প্রথম যুদ্ধের আওয়াজ যুগিয়েই তার উদ্দেশ্য সাধন হয়ে গেল; তারপর তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হল—তার স্বাভাবিক মৃত্যু হল এবং তার স্থানে দেখা গেল উদ্দেশ্যের একটা বাস্তবতা ও দৃঢ় সংকল্প।"[১] এতে কোনো সন্দেহই নেই যে, যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল একটা ধর্মের প্রশ্ন নিয়ে, তা রূপ নিল একটা রাজনৈতিক বিদ্রোহে।

ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ১৮৫৭-৫৯ সালের বিদ্রোহ যে কেবলমাত্র সিপাহীদেরই বিদ্রোহ ছিল, এটা যে মোটেই একটা জাতীয় বিদ্রোহ ছিল না—তা প্রমাণ করবার জন্য এত প্রাণপণে চেষ্টা করেছেন যে, কোনো ইংরেজ লেখকও তা করবার জন্য এতটা পরিশ্রম করেননি। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের "তিন কোটি সোয়া চার লক্ষ লোকের মধ্যে আমরা মনে করি না যে, ৫০,০০০-এর বেশী লোক বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল" —১৮৫৭ সালের জুলাই মাসের (ডাঃ মজুমদার তারিখ দেননি) লণ্ডন টাইমস্

১। "টু হিষ্টোরিক্ ট্রায়ালস্ ইন রেড ফোর্ট," পৃঃ ৩৯২-৯৩।

থেকে এই উদ্ধৃতি দিয়ে (২২৩ পৃঃ) ডাঃ মজুমদার বলছেন—এই দেখো, একে কি জাতীয় বিদ্রোহ বলা যায় ? (একমাত্র বেরিলি শহরেই যে ৫০,০০০-এর বেশী লোক যুদ্ধ করেছিল, তা ডাঃ মজুমদারের নিশ্চয়ই অজানা নেই !)। অথচ এই প্রসঙ্গেই রবার্টস্ (যিনি পরে ফিল্ড-মার্শাল লর্ড রবার্টস্ হয়েছিলেন) যখন একটা বাহিনী নিয়ে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাচ্ছিলেন, তখন বুলান্দসর থেকে ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৮৫৭, লিখেছিলেন : "বিদ্রোহ কেবলমাত্র সিপাহীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ —টাইম্‌স্ এ সব কি বাজে কথা বলছে (What nonsense 'The Times' talks)। এই জেলাতে কোনো বাহিনী ছিল না—মাত্র ৬০ জন সিপাহী একটা ক্যাম্পে ছিল, তথাপি এই জেলা অন্যান্য জেলার মতোই খারাপ ব্যবহার করেছে। প্রায় সমস্ত পুলিস ও বেসামরিক কর্মচারীই বিদ্রোহের একেবারে প্রথম দিকেই তাতে যোগ দিয়েছে এবং অনেক স্বাধীন রাজাও আমাদের বিরুদ্ধে তাদের পতাকা তুলে ধরেছে।"[১]

এই সব তথ্যগুলি ঐতিহাসিক কে', ফরেস্ট, ম্যালিসন, বল্ এবং ১৮৫৭ সালের উপর যে কোনো লেখকের রচিত গ্রন্থেই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত উল্লিখিত রয়েছে—যার কিছু কিছু এই গ্রন্থেও উদ্ধৃত করা হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় যে, তথ্যান্বেষী ও সত্যসন্ধানী ডাঃ মজুমদারের মতো একজন প্রাচীন ঐতিহাসিকের সেগুলি একেবারেই চোখে পড়ল না! কে' রোহিলখণ্ড ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের গণবিদ্রোহ সম্বন্ধে লিখেছেন:

"মিরাট ও বেরিলি ডিভিশনের কতকগুলি জেলাতে সিপাহীদের বিদ্রোহের ভয় থেকে জনসাধারণের বিদ্রোহের ভয়ই ছিল বেশী। প্রথম বিপদ এসেছিল বিক্ষুব্ধ সম্প্রদায়গুলি থেকে ; সিপাহীরা তখনও বিশ্বস্তই ছিল। ·· সাহারানপুর মুজফ্‌ফরনগর, মোরাদাবাদ ও বুদায়নে তা বিশেষভাবে ঘটেছিল। ··· বেসামরিক শ্রেণীদের দ্বারা এই উদাহরণ স্থাপিত হবার পর সিপাহীরা তাতে যোগ দিয়েছিল। ··· সিপাহীরা যখন অন্ততঃ বাহ্যত শান্ত ছিল, তখন জনসাধারণের উত্তেজনা চারদিকে ফেটে পড়ছিল—এক শ্রেণী আর এক শ্রেণীর বিরুদ্ধে, সবল দুর্বলের বিরুদ্ধে, দেনাদার মহাজনের বিরুদ্ধে, পরাজিত প্রতিবাদী বিজেতা বাদীর বিরুদ্ধে। তাদের সর্বাধিক আনন্দের বিষয় ছিল ইংরেজ বিচারালয়ের রায়গুলি বদ্ধমুষ্টি দেখিয়ে উল্টে দেওয়া। ··· জমিদারেরা নীচ শ্রেণীর সঙ্গে একত্র হয়ে গিয়েছিল। বিদ্রোহ, কেবলমাত্র লুণ্ঠনই নয়, বেশির ভাগ লোককে উদ্বুদ্ধ

১। "লেটার্স", পৃঃ ৭৫।

করেছিল। ··· সৈন্যরা বিদ্রোহ করতে পারে, কিন্তু শান্তিপ্রিয় গ্রামবাসীদের মধ্যে এই দ্রুত পরিবর্তন বুঝতে পারা খুবই কঠিন।"[১]

মধ্যভারতে জেনারেল রোজ্ যখন তাঁর অভিযান চালাচ্ছিলেন, তখন তাঁর পক্ষে খাদ্যদ্রব্য যানবাহন ইত্যাদি সংগ্রহ করা খুবই কঠিন হচ্ছিল। সর্বত্র জনসাধারণ ইংরেজদের প্রতি 'বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন' ছিল ও তাদের থেকে অনেক দূরে থাকত। খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য জিনিসপত্রের জন্য রোজ্কে নির্ভর করতে হত ভূপালের বেগম ও বোম্বাই সরকারের উপর। ঝান্সীর যুদ্ধের সময় ঐ রাজ্যের সমস্ত জনসাধারণ তাতে অংশ গ্রহণ করেছিল। তাঁতিয়া তোপীর গেরিলা অভিযানের সময়ও তাঁকে খাদ্য, খবরাখবর, সৈন্য ইত্যাদি দিয়ে সর্বতোভাবে জনসাধারণই সাহায্য করেছিল। কুমার সিং-ও পশ্চিম বিহারের জনসাধারণের নিকট থেকে স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে এইরূপ সহযোগিতাই পেয়েছিলেন।

অযোধ্যার গণ-বিদ্রোহ যে সব থেকে ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল, সে বিষয়ে দ্বিমত নেই। কেবলমাত্র লক্ষ্ণৌর যুদ্ধের সময় বিদ্রোহী পক্ষে মোট সৈন্য-সংখ্যা ছিল প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার। তার মধ্যে বিদ্রোহী সিপাহীদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩৫,০০০ ; আর বাকি ৮৫,০০০ ছিল তালুকদারদের লোকজন ও ভলান্টিয়ারের দল।[২] অযোধ্যার অন্যান্য স্থানের জনসাধারণ, বিশেষ করে কৃষকরা, এরূপ সক্রিয়ভাবে বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করেছিল। এই ব্যাপক গণবিদ্রোহ সম্বন্ধে আলেকজাণ্ডার ডাফ-এর নিম্নলিখিত বিখ্যাত বর্ণনাটি দুঃখের বিষয় ডাঃ মজুমদারের চোখে পড়েনি। বর্ণনাটি হল এই :

"যখনই শত্রুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হচ্ছে, তখনই তাদের পরাজিত করে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হচ্ছে ও তাদের কামানগুলি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু বারবার পরাজয় সত্ত্বেও তারা আবার জমায়েত হচ্ছে ও পুনরায় যুদ্ধের জন্য তৈরী হচ্ছে। একটা শহর দখল করার সঙ্গে সঙ্গেই আর একটা শহরে বিপদ ঘনিয়ে আসছে। ··· একটা জেলায় ইংরেজ সৈন্যরা যেই এসে শান্তি স্থাপন করছে, তখনই আর একটা জেলায় অশান্তি ছড়িয়ে পড়ছে। যেই দুটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে গমনাগমনের জন্য একটা বড় রাস্তা মুক্ত করা হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে তা আবার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং এক বৎসরের জন্য তাতে গমনাগমন বন্ধ থাকছে। একটা অঞ্চল থেকে বিদ্রোহীদের উৎখাত করা মাত্রই দ্বিগুণ, তিনগুণ শক্তি নিয়ে তারা আর একটা অঞ্চলে গিয়ে হাজির হচ্ছে। যে মুহূর্তে একটি দ্রুতগামী বাহিনী শত্রুদের ভেদ করে চলে যাচ্ছে, সেই মুহূর্তে তারা পশ্চাৎ-

১। কে' : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ৩য়, পৃঃ ২৪৬-৫০।

২। ফরেষ্ট : "ষ্টেট পেপার্স", ৩য়, পৃঃ ৪৫৪।

ভাগ দখল করে বসছে। শত্রু বাহিনীর সংখ্যা হ্রাসের ক্ষতি মুহূর্তের মধ্যে পূরণ হয়ে যাচ্ছে।"[১] ...

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহও যে আংশিকভাবে সিপাহী বিদ্রোহ ছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই মহাবিদ্রোহের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তখন ভারতে কোনো রাজনৈতিক দল ছিল না। শিক্ষিতদের মধ্যে যাঁরা রাজনীতির চর্চা করতেন, তাঁরা সশস্ত্র বিদ্রোহের কথা চিন্তাও করতে পারতেন না। তাঁদের রাজনীতি ছিল মুষ্টিমেয় ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। একমাত্র সিপাহীরাই ছিল তখন ভারতব্যাপী একটা সুসংগঠিত শক্তি এবং তারাই অধিকাংশ স্থলে বিদ্রোহে অগ্রণী হয়ে এসেছিল। ভারতের সাধারণ মানুষের একটা বিরাট অংশ তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। বেঙ্গল আর্মির ১ লক্ষ সিপাহীর মধ্যে ৬০ থেকে ৭০ হাজার সিপাহী বিদ্রোহ করেছিল। যদি মাত্র এই কয়জন সিপাহীর মধ্যেই বিদ্রোহ সীমাবদ্ধ থাকত, তা হলে কয়েক মাসের মধ্যেই ইংরেজরা তা দমন করতে পারত। লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ এই বিদ্রোহে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিল বলেই এবং আরও লক্ষ লক্ষ মানুষের এই বিদ্রোহের প্রতি সহানুভূতি ছিল বলেই বৃটিশ সাম্রাজ্যের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেও এই বিদ্রোহ দমন করতে ইংরেজের দু' বৎসর সময় লেগেছিল।

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ মূলতঃ গণবিদ্রোহ ছিল এবং এটাই যে ভারতের প্রথম জাতীয় বিদ্রোহ ছিল, সে সম্বন্ধে পূর্বেই কিছুটা আলোচনা করা হয়েছে। ডাঃ মজুমদারের মতে এই বিদ্রোহ জাতীয় বিদ্রোহ ছিল না।[২] তিনি বলেন: "১৮৫৭ সালে কিম্বা তার পূর্বে ভারতে কোনো জাতীয় স্বাধীনতার যুদ্ধ আমরা আশা করতে পারি না। কারণ জাতীয়তাবাদ অথবা স্বদেশপ্রেম, সঠিক

১। "ইণ্ডিয়ান রিবেলিয়ন", পৃঃ ২২৩।

২। দু' একজন প্রগতিশীল ব্যক্তিও এই মতই পোষণ করেন। মিরাট ষড়যন্ত্রের মামলার (১৯২৯-৩৩) একজন আসামী লেষ্টার হাচিনসন ডাঃ মজুমদারের অনেক পূর্বেই লিখেছিলেন যে, এই বিদ্রোহ "জাতীয় সংগ্রাম ছিল না, কারণ তখনও ভারতে কোনো জাতি গড়ে ওঠেনি, যদিও বৃটিশের একত্রীকরণের নীতির ফলে তা তাড়াতাড়ি গড়ে উঠেছিল। ঐতিহাসিক ভাবে দেখতে গেলে এই বিদ্রোহ ছিল জাতীয়তাবাদ ও বর্তমান যুগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ; এটা ছিল ইতিহাসের ঘড়িকে উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দেবার প্রচেষ্টা, দেশকে সামন্ততান্ত্রিক স্বৈরাচারে, চরকায় ও তাঁতে এবং প্রাচীন যানবাহনের যুগে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটা প্রচেষ্টা।"—("এম্পায়ার অব দি নবাবস্," পৃঃ ১৩৬)। লক্ষ লক্ষ সংগ্রামী মানুষের প্রতি কি অবজ্ঞা; জাতীয়তাবাদ ও স্বাধীনতা ready made অবস্থায় আকাশ থেকে পাকা ফলের মতো পড়ে না। তাকে আনবার জন্যই সংগ্রামের প্রয়োজন, যা বিদ্রোহীরা ১৮৫৭ সালে করেছিল।

অর্থে (in the true sense), ভারতে তার অনেক পরে প্রকাশ পায়। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহকে জাতীয় রূপ দেওয়া কিম্বা ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রাম বলে গণ্য করা হচ্ছে ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞানের (true knowledge) অভাবের পরিচয় দেওয়া।"

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ যে জাতীয় বিদ্রোহ ছিল না, তা প্রমাণ করার জন্য ডাঃ মজুমদারের প্রধান যুক্তি হচ্ছে এই যে, এই বিদ্রোহ কেবলমাত্র অযোধ্যা, রোহিলখণ্ড এবং পশ্চিম-বিহার ও বুন্দেলখণ্ডের কোনো কোনো অংশে সীমাবদ্ধ ছিল ; এতে বাংলা, পাঞ্জাব, রাজপুতানা, হায়দরাবাদ ও সমগ্র দাক্ষিণাত্য, অর্থাৎ ভারতের বড় অংশটাই এতে যোগ দেয়নি ; ভারতের বড় বড় রাজারা, যেমন সিন্ধিয়া, হোলকার, গাইকোয়াড়, নিজাম, কাশ্মীর, ভূপাল, পাতিয়ালা, নাভা, ঝিন্দ, জয়পুর, যোধপুর, আলোয়ার ইত্যাদি সকলেই ইংরেজ সরকারকে সাহায্য করেছিলেন। এমন কি বিদ্রোহের যে কেন্দ্র ছিল অযোধ্যা, সেখানেও অনেক লোক ইংরেজের উপর সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল, কিম্বা সক্রিয়ভাবে বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করেনি ;…"এই সব বিবেচনা করে, এমন কি অযোধ্যার ও পশ্চিম-বিহারের বিদ্রোহকেও প্রকৃত অর্থে (in the true sense of the term) গণবিদ্রোহ কিম্বা জাতীয় বিদ্রোহ বলা কঠিন।"—(পৃঃ ২২৬)।

এই 'প্রকৃত অর্থ' কথাটা বারংবার ব্যবহার করলেও এই বস্তুটি কি, তা ডাঃ মজুমদার কোথায়ও ব্যাখ্যা করেননি। যাই হোক, এইরূপ 'প্রকৃত অর্থে' ১৬৪৮ সালের ইংল্যাণ্ডের বিপ্লব, ১৭৭৫-৮৩ সালের আমেরিকান বিপ্লব, ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লব, ১৮৩০ ও ১৮৪৮ সালের ইউরোপের বিপ্লব, ১৯০৫ ও ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লব এবং সর্বশেষে, বর্তমানের চীন, ইন্দোচীন প্রভৃতির বিপ্লবগুলিকেও 'জাতীয়' বলা যায় না ; কারণ, এই সব দেশের সর্বশ্রেণীর সব লোকই এই সব বিদ্রোহগুলিতে যোগ দেয়নি। আমেরিকার বিপ্লবের সময় অনেক আমেরিকান ইংল্যাণ্ডের দিকে ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল ; তা ছাড়া সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রই বিদ্রোহে যোগ দেয়নি। ফরাসী ও রুশ বিপ্লবের সময় ঐ দেশগুলির সব অংশই বিদ্রোহে যোগ দেয়নি ; প্রচুর সংখ্যক ফরাসী ও রুশ বিদেশী আক্রমণকারীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে নিজেদের মাতৃভূমির বিরুদ্ধে লড়েছিল। ডাঃ মজুমদারের 'প্রকৃত অর্থে' বাংলার ও ভারতের অগ্নিযুগের বৈপ্লবিক আন্দোলনকেও জাতীয় আন্দোলন বলা যায় না, তার কারণ বিপ্লবীদের সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য, সমগ্র দেশের লোক তাতে যোগ দেয়নি এবং অনেক ভারতীয় পুলিস অফিসার, গোয়েন্দা, রায় বাহাদুর, খাঁ বাহাদুর ইংরেজদেরই সাহায্য করেছিল। কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনকেও 'জাতীয়' বলা

যায় না, কারণ তা মাত্র কয়েকটি অঞ্চলেই প্রকাশ পেয়েছিল—ভারতের অনেক বড় বড় অঞ্চলে তা বিশেষ বিস্তারলাভ করেনি ; রাজা, মহারাজা, জমিদাররা তার বিরুদ্ধে ছিলেন ; ভারতের ৩৫ কোটি লোকের মধ্যে মাত্র ৮০,০০০ লোক কারাবরণ করেছিলেন এবং তার চাইতে বেশী সংখ্যক লোক ইংরেজের পক্ষেই ছিল ![১]

ফিচেটের মতো সকল ইংরেজ লেখকই স্বীকার করেছেন, "এটা মনে রাখতে হবে যে, সক্রিয় বিদ্রোহী জেলাগুলির আয়তন ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া ও প্রুশিয়া এই সবগুলি দেশের সমান এবং লোকসংখ্যায় এদের চাইতে বেশী।" এডোয়ার্ড টমসনের কথায় : "এতগুলি বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের সমাবেশ পূর্বে আর কোনো বিদেশী বিজেতার বিরুদ্ধে হয়নি।" তা ছাড়া এ কথাটাও মনে রাখতে হবে যে, বিদ্রোহের এই বিরাট কেন্দ্র ছাড়াও বাংলাদেশ থেকে শুরু করে পেশোয়ার পর্যন্ত এবং সিমলা থেকে হায়দরাবাদ ও মহারাষ্ট্র পর্যন্ত ১৮৫৭-৫৮ সালে অসংখ্য খণ্ড খণ্ড বিদ্রোহ তো ঘটেছিলই সমগ্র ভারতের জনসাধারণেরও অধিকাংশের, বিশেষ করে কৃষক শ্রেণীর, সহানুভূতি বিদ্রোহীদের দিকেই ছিল, তা পূর্বেই অনেক তথ্যপ্রমাণ দিয়ে এ বইতে দেখানো হয়েছে। তার পুরো ইতিহাস লেখা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নয়।

এমন কি মাদ্রাজ, যেখানে বিদ্রোহের ঢেউ গিয়ে পৌছতে পারেনি, সেই মাদ্রাজও যে অক্ষত ছিল, তা একেবারেই বলা যায় না। কলকাতায় রওনা হওয়ার কালে মাদ্রাজ ৮ম অশ্বারোহী বাহিনী বাঙ্গালোর থেকে মাদ্রাজের পথে কতকগুলি দাবি-দাওয়া নিয়ে বিদ্রোহ করে। তাদের দাবি মিটিয়ে দিলে তারা আবার চলতে থাকে, কিন্তু কয়েক মাইল যাওয়ার পরই তারা ঘোষণা করে : "তারা তাদের দেশবাসীদের বিরুদ্ধে লড়তে যাবে না।"[২] এই রকম ঘটনা থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়, ১৮৫৭ সালে মাদ্রাজীরা যে ইংরেজ ভক্ত ছিল, তা মেনে নেবার কোনো কারণই নেই।

১৮৫৭-৫৯ সালের মহাবিদ্রোহে ভারতীয় জনসাধারণের অংশ গ্রহণ করাটাই হয়েছিল সব থেকে বড় বৈপ্লবিক ঘটনা। জনসাধারণের শ্রেণী-চেতনা তখন যে স্তরেই থাকুক না কেন, এমন কি তাদের চেতনা সামন্তযুগের পর্যায়ে

১। ডাঃ মজুমদারের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই কিনা জানি না, একজন বেনামী লেখক একটি ভারতীয় সাপ্তাহিক পত্রিকায় বর্তমানের আলজেরিয়ার বিদ্রোহ যে জাতীয় বিদ্রোহ নয়, তা 'প্রমাণ' করবার চেষ্টা করেছেন। "আলজেরিয়ার তথাকথিত জাতীয় আন্দোলন হচ্ছে অধিকসংখ্যক মুসলমানদের আনুগত্য জোর করে আদায় করবার জন্য কতকগুলি হত্যাকারী গুণ্ডাদলের আন্দোলন।"-- ("ইষ্টার্ন ইকনমিষ্ট"-এ 'একটি জাতির বিবেক' নামক প্রবন্ধ, ৫ই এপ্রিল ১৯৫৭)।

২। মণ্টোগোমারি মার্টিন : "ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার", ৩য়, পৃঃ ৭২।

থাকলেও, তারা মহাবিদ্রোহে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে কেবলমাত্র সাম্রাজ্যবাদকেই আঘাত করেনি, ভারতের সামন্ত ব্যবস্থার উপরও প্রবলভাবে আঘাত করেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের ভারত আর মধ্যযুগীয় মোগল ভারত ছিল না। সে তখন অর্থনৈতিক ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার অংশ বিশেষ। সুতরাং ১৮৫৭-৫৯ সালে জাতীয় গণবিদ্রোহ সফল হলে, ভারতের পক্ষে মধ্যযুগে ফিরে যাওয়া সম্ভবপর হত না, কাজেই তার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশও ঔপনিবেশিক দেশের মতো হত না বরং একটা স্বাধীন দেশের মতোই প্রগতির পথেই তা দ্রুত অগ্রসর হত।

প্রত্যেক বিপ্লব ও বিদ্রোহের সময় উভয়পক্ষেই নানাপ্রকারের নৃশংসতা ঘটে থাকে। আগ্নেয়গিরি যখন তার লাভা উদ্‌গিরণ শুরু করে, তখন যারা তার সম্মুখে থাকে তারাই তার প্রথম বলি হয়। একজন ইংরেজ ঐতিহাসিক লিখেছিলেন: "উভয়পক্ষই অনেক নৃশংসতার কাজ করেছিল। এখন তার উপর একটা পর্দা টেনে দেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।"[১] এরূপ একটা ভাবালুতা আজকাল অনেক উদারনৈতিক ভারতীয়ও প্রকাশ করে থাকেন। কিন্তু এঁরা একটা কথা ভুলে যান যে, এইরূপ নৃশংসতার মূল কারণ সাম্রাজ্যবাদ। যতক্ষণ পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক আধিপত্য দুনিয়া থেকে বিলুপ্ত না হয়ে যাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের নৃশংসতার উপর পর্দা টেনে দেওয়া যায় না। এখনও সাম্রাজ্যবাদীদের পাশবিক নৃশংসতা দুনিয়ার বুকের উপর দিয়ে অবাধে চলেছে—ইংরেজ অধিকৃত মালয়ে, সাইপ্রাসে, কেনিয়ায়; ফরাসীদের আলজেরিয়ায়, ইন্দোচীনে; আমেরিকানদের ফরমোসায়, গুয়াটেমালায়, ইন্দোচীনে; পর্তুগীজ অধিকৃত গোয়াতে। আমাদের চোখের সামনেই মিশরের মতো একটা ছোট অনগ্রসর জাতির উপর শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদীদের আরও একটা নৃশংস আক্রমণ ঘটে গেল। অনেকে, এবং তাঁদের মধ্যে ভারতবাসীও আছেন, দু' পক্ষের নৃশংসতাকেই সমানভাবে দেখেছেন এবং নৈতিক মানদণ্ড দিয়ে উভয় পক্ষকেই সমানভাবে নিন্দা করেছেন। কিন্তু এতে করে তাঁরা মানুষের সভ্যতার ইতিহাসের একটা মূল প্রশ্নকে এবং প্রকৃত নৈতিক বিচারকে এড়িয়েই গিয়েছেন। বিদেশীরা তলোয়ারের জোরেই পরদেশ জয় করে ও তলোয়ারের জোরেই তাকে অধীনে রাখে। সাধারণ ডাকাতের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণকারীর কোনো পার্থক্যই নেই। আত্মসম্মান-জ্ঞানসম্পন্ন প্রত্যেক মানুষেরই কর্তব্য ডাকাতের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করা এবং এই আত্মরক্ষার কাজে দস্যুদলকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেবার নৈতিক অধিকারও তার আছে।

১। ফ্রাঙ্ক ব্রাইট: "হিস্ট্রি অব ইংল্যাণ্ড", ৪র্থ, পৃঃ ৩২৮।

ভারতের ঐশ্বর্যে প্রলুব্ধ হয়ে সাতসমুদ্র তের নদী পার হয়ে ইংরেজ এই দেশে এসেছিল। পূর্বে ভারতবাসীর সঙ্গে তাদের কোন শত্রুতাও ছিল না। ক্রমশঃ এই সব বিদেশী দস্যুদল ছলে-বলে-কৌশলে ভারতবাসীর দেশ, ধনরত্ন, মানসম্ভ্রম সবই অপহরণ করেছিল। ১৮৫৭ সালের দেশময় 'মারো ফিরিঙ্গীকো' আওয়াজ এক-শত বৎসরের ইংরেজ-দস্যুবৃত্তির বিরুদ্ধে ভারতবাসীর পুঞ্জীভূত ঘৃণা ও আক্রোশের বহিঃপ্রকাশ।

ইতিহাসের এই সত্যটা অন্ততঃ একজন ইংরেজ বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি ছিলেন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শ্রমিক নেতা আর্নস্ট জোনস্। সমসাময়িক একটা ইংরেজী পত্রিকায় কানপুরের হত্যাকাণ্ড ও বিদ্রোহ সম্বন্ধে তিনি যা লিখেছিলেন, তা প্রণিধানযোগ্য : [১]

"সমগ্র ইউরোপে ভারতের বিদ্রোহ সম্বন্ধে একটি মাত্র মতই হওয়া উচিত। পৃথিবীর ইতিহাসে যত বিদ্রোহের চেষ্টা হয়েছে, এটা তার মধ্যে একটা সব থেকে মহান, ন্যায়সঙ্গত ও প্রয়োজনীয় বিদ্রোহ। ··· কোন্ পক্ষ অবলম্বন করা হবে সে সম্বন্ধে ইতস্ততঃ করার কথা আমরা ভাবতে পারি না। ··· পোলাণ্ডের বিদ্রোহ কি ঠিক হয়েছিল ? তা যদি হয়, তা হলে হিন্দুস্থানেও তাই। হাঙ্গেরীর বিদ্রোহ কি ন্যায়সঙ্গত হয়েছিল ? তা হলে হিন্দুস্থানেও তাই। ইটালীর বিদ্রোহ কি সমর্থনযোগ্য ছিল ? তা হলে হিন্দুস্থানেও তাই। যার জন্য পোলাণ্ড, হাঙ্গেরী, ইটালী লড়েছিল, হিন্দুস্থানীরাও আজ তার জন্য লড়ছে। ··· আশ্চর্যের বিষয় এই নয় যে, আজ ১৭ কোটি ভারতবাসী বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে ; আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে এই যে, এতদিন ধরে তারা পরাধীনতা মেনে নিয়েছিল।" (পৃঃ ৫১-৫২)।

"এইগুলি (কানপুর ও অন্যান্য স্থানের হত্যাকাণ্ড) হচ্ছে বৃটিশের এত-দিনকার একই রকমের জঘন্য ও বর্বর দুষ্কর্মের ফল। ··· মানুষের পক্ষে তার পূর্বপুরুষদের দুষ্কর্মের কথা ভুলে যাওয়া স্বাভাবিক হতে পারে এবং এই দুষ্কর্মের প্রতিফলস্বরূপ যা নিঃসন্দেহে ঘটবে, তা সে নিজের আত্মগরিমার বশে উপেক্ষা করে। কিন্তু এই শঠ, এই দস্যু, এই দুর্বৃত্ত জাতির নিকট ভারতীয়রা যে বড় শিক্ষা পেয়েছে, তা তারা কখনই ভুলতে পারে না। এই জাতিই তাদের মনে নিষ্ঠুরতা ও নৃশংসতার ছাপ মেরে দিয়েছে ; এই জাতিই যে বীজ বপন করেছিল, তার রক্তাক্ত ফসল আজ ভারতে তাকে সংগ্রহ করতে হচ্ছে।"—(পৃঃ ৫৪)।

১। আর্নষ্ট জোনস : "রিভোল্ট অব হিন্দুস্থান অর দি নিউ ওয়ার্লড্" (ইষ্টার্ণ ট্রেডিং কোম্পানি, কলিকাতা, ১৯৫৭)।

"একটা জাতি কখনও অত্যাচারের কথা ভোলে না, এমন কি তার শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্তও না এবং যখন অত্যাচারিতেরা অন্যায়ের প্রতিশোধ নেবার জন্য রুখে দাঁড়াবে, তখন অভিশপ্তদের উপরই সেই প্রচণ্ড প্রতিশোধের আঘাত পড়বে।" (পৃঃ ৫৫)।

কিন্তু এই নৈতিক অধিকার থাকা সত্ত্বেও বিদ্রোহীরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ইংরেজ অফিসারদের, স্ত্রীলোক ও শিশুদের সুযোগ পেয়েও হত্যা করেনি। অযোধ্যায় অনেক স্থানে বিদ্রোহ করার পর সিপাহীরা তাদের ইংরেজ অফিসারদের টাকা পয়সা দিয়ে নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়ে দিয়েছিল। বিদ্রোহীরা বিভিন্ন স্থানে তাদের শত্রুদের প্রতি যে মানবতা প্রদর্শন করেছিল, ইংরেজরা কোথাও তা দেখায়নি। বিদ্রোহীরা যে কয়জন বেসামরিক ইংরেজকে হত্যা করেছিল, ইংরেজরা তার এক হাজার গুণ বেশী ভারতীয়কে হত্যা করেছিল। বিদ্রোহীরা যে কয়জন ইংরেজ স্ত্রীলোক ও শিশু হত্যা করেছিল, ইংরেজরা তার অনেক গুণ বেশী ভারতীয় নারী ও শিশু হত্যা করেছিল। জেনারেল নীল কাশী থেকে কানপুর যাবার পথে প্রতিটি গ্রাম জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস করে গেছেন; যে কোনো ভারতীয় তাঁর সামনে পড়েছিল, তাকেই তিনি হত্যা করেছেন এবং তাঁর এই পাশবিক হত্যাকাণ্ডের প্রতিক্রিয়ার ফলেই যে কানপুরের হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল, যথাস্থানে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

সাম্রাজ্যবাদীরা তখন কিরূপ রক্তপিপাসু হয়ে উঠেছিল, তা ইংরেজ বীর নিকল্‌সন ও মার্কিন প্রতিনিধির দাবিগুলি থেকেই বোঝা যায়। নিকল্‌সন চেয়েছিলেন: "বিদ্রোহীদের শরীর থেকে চামড়া খুলে নিতে হবে, কিম্বা আগুনে পুড়িয়ে মারবার জন্য একটা আইন পাস করতে হবে। ··· বর্বরগুলোকে কেবলমাত্র ফাঁসি দিয়েই ক্ষান্ত হব, এটা ভাবতেই আমাকে পাগল করে দিচ্ছে।"[১] অবশ্য ইংরেজ বীরপুঙ্গব আইন পাস করবার জন্য মোটেই অপেক্ষা করেননি। আর মার্কিন মন্ত্রী বলেছিলেন যে, বিদ্রোহীরা "ফিজি দ্বীপের মনুষ্য-খাদকদের সমতুল্য এবং মনুষ্য জাতির শত্রু এবং কেবল একটি মাত্র জাতির দ্বারা নয়, সমগ্র মনুষ্য জাতির দ্বারা এদের ধরাপৃষ্ঠ থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া দরকার।"[২]

১৮৫৭-৫৯ সালের বিদ্রোহের মতো এত বড় একটা বিরাট গণবিদ্রোহ কেন বিফল হল, এ প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হবার প্রধান কারণ হল এই যে, তাকে সুসংগঠিত ও সুপরিচালিত করার জন্য কোনো রাজনৈতিক দল

১। কে': পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ২য়, পৃঃ ৪০১।

২। হিন্দু: "মিউটিনিজ এণ্ড দি পিপল", পৃঃ ৫।

তখন ভারতে ছিল না। বিদ্রোহ ঘটেছিল স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং অনেক বিদ্রোহই এরূপ স্বতঃস্ফূর্তভাবেই ঘটে থাকে, কিন্তু এই বিরাট শক্তিকে সংহত করে পরিচালনা করার মতো তখন কারও ক্ষমতা ছিল না। যাঁরা এ বিদ্রোহে বর্তমান-যুগোপযোগী সক্ষম নেতৃত্ব দিতে পারতেন, তাঁরা ছিলেন তখনকার গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার বাহক বুদ্ধিজীবী শ্রেণী ; কিন্তু নিজেদের স্বার্থপরতার জন্যই হোক, কিম্বা অন্য যে কোনো কারণেই হোক, তাঁরা এ বিদ্রোহে যোগ দেননি। তাঁরা যে ইংরেজের দিকে ছিলেন, একথা বলাও ভুল হবে। বস্তুতঃ তাঁরা ছিলেন নিরপেক্ষ। অন্ততঃ বাংলা দেশের জমিদারদের মতো ইংরেজকে সাহায্য করবার জন্য তাঁরা সরাসরি এগিয়ে যাননি। ডাফ এঁদের সম্বন্ধে বলেছিলেন, "তারা এখনও এই ব্যাপারটার প্রতি একটা অযৌক্তিক উদাসীনতাই দেখিয়ে আসছে। তারা রাজভক্তও নয়, আবার রাজদ্রোহীও নয়, যদিও কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ে বিক্ষোভ জমা হয়ে আছে।"[১]

এ বিদ্রোহে যারা বিশেষ করে অংশ গ্রহণ করেছিল—তারা ছিল কৃষক, শিল্পজীবী, শহরবাসী মধ্যবিত্ত ও তালুকদার জমিদার শ্রেণী, কয়েকজন বঞ্চিত রাজা ও সিপাহী। শ্রেণীগত ভাবে সিপাহীরা বেশির ভাগই ছিল কৃষক। যদিও কৃষকরাই ছিল এ বিদ্রোহে সংখ্যাগরিষ্ঠ, কিন্তু নেতৃত্ব দেবার মতো তাদের সংগঠনও ছিল না, শিক্ষাও ছিল না। সুতরাং সামন্তশ্রেণীভুক্ত যে অংশ বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল, নেতৃত্ব অনেক সময় তাদেরই হাতে গিয়েছিল। কিন্তু সিপাহীরা যে অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের হাতে নেতৃত্ব রাখবার ও গণতান্ত্রিক উপায়ে যুদ্ধ পরিচালনা করবার চেষ্টা করেছিল, তারও যথেষ্ট উদাহরণ রয়েছে। যেহেতু এই দুই শ্রেণীর লোকই এই বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করেছিল, সেই কারণে, এই দুই শ্রেণীর লোকই নেতৃত্ব দেবার চেষ্টা করেছিল, যার ফলে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই একটা মিশ্রিত নেতৃত্বেরই (composite leadership) সৃষ্টি হয়েছিল। ভারতবর্ষে তখন পর্যন্ত পাকাপোক্ত বুর্জোয়া শ্রেণী জন্মগ্রহণ করেনি। কাজেই বিদ্রোহী অঞ্চলেও কোনো বুর্জোয়াশ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল না।

যাদের অস্তিত্ব ছিল, তারা হল কম্প্রাডোর বুর্জোয়া, যারা ইংরেজ-পক্ষপুটের আশ্রয়ে জন্মগ্রহণ করেছিল ও তাদেরই উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল ছিল। এই শ্রেণীর কিছু কিছু লোক যে বিদ্রোহের পক্ষে ছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই ; কারণ খান বাহাদুর খান সরকারের মন্ত্রিসভার অর্থসচিব ছিলেন শোভারাম ; তিনি ছিলেন একজন বড় মহাজন। কিন্তু সাধারণতঃ এই শ্রেণীর বেশির ভাগ

১। ডাফ : "ইণ্ডিয়ান রিবেলিয়ান," পৃঃ ১৮০।

লোকই ছিল বিশ্বাসঘাতক এবং নানা উপায়ে ইংরেজের সহায়তা করে এরা বিদ্রোহের বিরুদ্ধাচরণই করেছিল।

দিল্লীর যুদ্ধ আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি, কিভাবে সিপাহীদের 'মিলিটারী কোর্ট' গণতান্ত্রিক উপায়ে বিভিন্ন কমিটির মারফত সিপাহীদের ক্ষমতা বিস্তার করছিল এবং কিভাবে বাদশাহের সামন্ততান্ত্রিক দরবারের সঙ্গে তাদের দিনের পর দিন সংঘর্ষ বাধছিল এবং সর্বশেষে আমরা এ-ও দেখেছি, কিভাবে এই অন্তর্দ্বন্দ্বে সিপাহীদেরই জয় হয়েছিল। দিল্লীতে যে গণতান্ত্রিক চেতনার ক্রমবিকাশ ও তদনুসারে কার্যাবলীর ক্রমপরিণতি দেখা গিয়েছিল, অন্যান্য স্থানেও সেই একই ধরনের ক্রমবিকাশ লক্ষিত হচ্ছিল। দিল্লীর মতো লক্ষ্ণৌতেও অনুরূপ মিলিটারী কোর্ট স্থাপিত হয়েছিল এবং সেখানকার কার্যধারা দিল্লীর মতোই গণতান্ত্রিক লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। ঝান্সীতে 'মিলিটারী কোর্ট' স্থাপন না হলেও, নানা প্রকারের গণতান্ত্রিক সংগঠন গড়ে উঠেছিল। গ্রামাঞ্চলেও তালুকদার ও জমিদাররা তাঁদের একাধিপত্য স্থাপন করতে পারেনি। বিদ্রোহী কৃষকদের পঞ্চায়েতগুলি ক্রমশঃ শক্তিশালী হয়ে উঠছিল। কয়েকটি ক্ষেত্রে অযোধ্যায় এমনও দেখা গিয়েছে যে, সিপাহীদের এইরূপ স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার ফলে জমিদাররা প্রথম সুযোগেই ইংরেজের নিকট আত্মসমর্পণ করেছিল।

সুতরাং, ১৮৫৭-৫৮ সালের বিদ্রোহ একটা সামন্ততান্ত্রিক বিদ্রোহ ছিল এবং জয়যুক্ত হলে ভারতবর্ষকে তা মধ্যযুগে ফিরিয়ে নিয়ে যেত, ভারতের অগ্রগামী ঘড়ির কাঁটা পশ্চাতে ঘুরে যেত, এ সব কথা যাঁরা বলেন, তাঁরা গণবিদ্রোহের গতি-বিজ্ঞানকে (dynamics) উপেক্ষা করেই এ কথা বলেন। একটা গণবিদ্রোহ কখনও পশ্চাদ্‌মুখী হয় না। অনেক সময় তাকে আঁকাবাকা পথে চলতে হয় বটে, কিন্তু তার নিজস্ব অন্তর্নিহিত গতিশীলতার বশে তাকে এগিয়েই চলতে হয়। টোটাই হচ্ছে তার একটা চমৎকার উদাহরণ। যে টোটা ব্যাবহার করার বিরুদ্ধে এত 'গোঁড়ামি' দেখিয়ে তারা বিদ্রোহ করল, সেই টোটাই শত্রুর বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে সেই একই সিপাহীরা এতটুকু ইতস্তত: করেনি, অথবা ধর্ম নষ্ট হয়ে যাবার কথা ভাবেনি।[১]

দিল্লীতে আমরা এটাও লক্ষ্য করেছি যে, বিদ্রোহী ও জনসাধারণ ক্রমশঃ এক প্রকারের নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের (constitutional monarchy) দিকেই অগ্রসর হচ্ছিল। ১৮৫৭ সালে যদিও মোগল বাদশাহ বাহাদুর শাহকে ভারতের সম্রাট বলে ঘোষণা করা হয়েছিল, তবু বিদ্রোহী সিপাহী ও জনসাধারণের গণতান্ত্রিক

১। এড্‌মণ্ড্‌ কক্স: "এ সর্ট হিষ্ট্রি অব দি বম্বে প্রেসিডেন্সী," পৃঃ ৩৪৮।

চিন্তাধারার প্রধান প্রস্তাব (chief premise) হল এই যে, সমস্ত রাষ্ট্র-ক্ষমতার উৎস ছিল সিপাহী ও জনসাধারণ। সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রের ও সামন্ততান্ত্রিক ক্ষমতার মেরুদণ্ড হল 'ভগবান প্রদত্ত ক্ষমতা' (Divine right of kings)। এটাই ছিল সর্বত্র—ইউরোপ, এশিয়া ও মোগলদেরও স্বৈরাচারের ভিত্তি। ১৮৫৭ সালে স্বৈরাচারের এই ভিত্তি আর রইল না—বাদশাহ হলেন জনসাধারণের অনুগত এবং জনসাধারণের দ্বারা বিশেষ এক বৈপ্লবিক পরিবেশে নির্বাচিত বা সমর্থিত। সুতরাং তিনি হলেন নিয়মতান্ত্রিক রাজা। নির্বাসিত ওয়াজেদ আলির নাবালক পুত্র বিরজিস্ কাদেরকেও এইভাবেই অযোধ্যার নবাব নির্বাচিত করা হয়েছিল। ইংরেজি শিক্ষিত নব্য বুদ্ধিজীবীদের মতো বার্ক, মিল, লক, মেকলে না কণ্ঠস্থ করেও যে সিপাহী ও জনসাধারণ নিজেদের বুদ্ধি ও চেতনার বলে এতখানি অগ্রসর হতে পেরেছিল, এটা কম প্রসংশনীয় কথা নয়। তৎকালীন ভারতের যে সামাজিক অবস্থা ছিল, তাতে এর বেশি অগ্রসর হওয়া বিদ্রোহীদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি প্রশ্ন বিবেচনা করা প্রয়োজন—সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে একটা অনগ্রসর দেশের বিদ্রোহে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক শক্তির অস্তিত্ব ও তার নেতৃত্ব পূর্ব-শর্তরূপে থাকা প্রয়োজন কি না এবং যদি সেরূপ কোনো গণতান্ত্রিক শক্তির অস্তিত্ব না থাকে ও তা যদি সামন্ততান্ত্রিক নেতৃত্বেই পরিচালিত হয়, তা প্রগতিশীলদের দ্বারা সমর্থিত হতে পারে কি না। যখন আফগানিস্তানের আমানুল্লা ও আবিসিনিয়ার হাইলে সেলাসী, সামন্ততান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী রাজা হওয়া সত্ত্বেও, সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে নিজেদের দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছিলেন, তখন সমগ্র তুনিয়ার প্রগতিশীল মানুষের সমর্থন পেয়েছিলেন। তার কারণ—যা মানুষের সব থেকে বড় শত্রু সেই সাম্রাজ্যবাদকে আঘাত করে তাকে তাঁরা তুর্বল করেছিলেন। বৈদেশিক শাসনকে, বৈদেশিক শত্রুকে যে কোনো শক্তিই আঘাত করুক না কেন, তা যদি সামন্ততান্ত্রিকও হয়, তাও সমর্থনযোগ্য। এ ক্ষেত্রে বিচার্য বিষয় এই যে, কোনো বৈদেশিক শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে নিয়মতান্ত্রিক-ভাবে সামন্ততান্ত্রিক নেতৃত্ব থাকলেও তার ভিতর গণতান্ত্রিক শক্তির অঙ্কুর নিহিত থাকা সম্ভব কি না।

চীন দেশে তাইপিং বিদ্রোহের সময় (১৮৫১-৬৪) তার নেতা হুং সিউ-চুয়ান নিজেকে 'স্বর্গীয় রাজা' বলে ঘোষণা করেছিলেন ও মধ্যযুগীয় মিং বংশের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও মার্ক্স্ তাইপিং বিদ্রোহকে বলে ছিলেন (১৪ই জুন ১৮৫৩) একটা 'বিরাট বিপ্লব' ('formidable revolution')—"তা যে কোনো সামাজিক কারণেই ঘটুক না কেন এবং যে কোনো ধর্ম-

নৈতিক, রাজবংশ সম্পর্কীয় ও জাতীয় আকারই ধারণ করুক না কেন।"[১] এঙ্গেল্‌স্‌ এই মত সমর্থন করে মার্ক্‌স্‌কে ৫ই জানুয়ারি ১৮৫৭ সালে লিখেছিলেন, "এটা আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, এই যুদ্ধ হচ্ছে ধর্ম ও দেশের জন্য (*pro aris et focis*), চীন জাতিকে রক্ষা করবার জন্য একটা গণযুদ্ধ— কুসংস্কার, নির্বুদ্ধিতা, পণ্ডিতী অজ্ঞতা ও পাণ্ডিত্যগর্বী বর্বরতা থাকা সত্ত্বেও এটা একটা গণযুদ্ধ" ("In short......we have better recognise that this is a war *pro aris et focis*, a popular war for the maintenance of Chinese nationality, with all its overbearing prejudice, stupidity, learned ignorance and pedantic barbarism, if you like, but yet a popular war."[২] মার্ক্‌স্‌-এঙ্গেলস্‌ ১৮৫৭ সালের ভারতের মহাবিদ্রোহকেও এই একই কারণে সমর্থন জানিয়েছিলেন।

অনেকে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহকে সামন্তশ্রেণীর ক্ষমতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার একটা শেষ প্রচেষ্টা বলে বর্ণনা করেছেন। সর্দার কে. এম. পানিক্কার বলেছেন যে, এটা ছিল একটা "বৃটিশকে তাড়িয়ে দেবার জন্য পুরাতন শাসকশ্রেণী, মারাঠা ও মোগলদের শেষ দৃঢ় কিন্তু ব্যর্থ প্রচেষ্টা।"[৩]

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ভারতের প্রকৃত সামন্ততান্ত্রিক শাসকরা—যাঁরা বড় বড় রাজ্য মধ্যযুগীয় প্রথা অনুসারে শাসন করতেন, লক্ষ লক্ষ প্রজার হর্তাকর্তা বিধাতা ছিলেন এবং যাঁদের সৈন্যবাহিনী ছিল—কেউই বিদ্রোহে যোগ দেননি। ছোট ছোট রাজা-জমিদাররাও বিদ্রোহী অঞ্চল ছাড়া আর কোথায়ও বিদ্রোহ করেননি। মারাঠা রাজারা, সিন্ধিয়া, হোলকার, বরোদা প্রভৃতি কেউই বিদ্রোহে যোগ দেননি এবং কাশ্মীর, হায়দরাবাদ, পাতিয়ালা, নাভা, ঝিন্দ, কাপুরতলা, জয়পুর, যোধপুর, মহীশূর ও ত্রিবাঙ্কুরের রাজারাও নয়। ছোট ছোট রাজা ও জমিদারদের নিয়ে এঁরাই ছিলেন ভারতের সামন্ততন্ত্রের ভিত্তি ও স্তম্ভ। এঁরা সকলেই ছিলেন ইংরেজের পক্ষে এবং ইংরেজদেরই তাঁরা সর্বপ্রকারে সাহায্য করেছিলেন। ভারতে সামন্ততন্ত্রের প্রধান শক্তি ও ধ্বজাধারী এই সব রাজারা যদি বিদ্রোহে যোগ দিতেন, তা হলেও ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহকে জাতীয় চেতনার পরিপন্থী আখ্যা দেওয়া সম্ভব ছিল না। যে সামন্ততন্ত্র বিদ্রোহের

১। ডোনা টর সম্পাদিত: "মার্ক্‌স্‌ অন চায়না", পৃঃ ১।

২। ঐ, পৃঃ ৫০।

৩। সর্দার কে. এম. পানিক্কার: "এশিয়া এণ্ড ওয়েষ্টার্ন ডমিনেন্স"।

আঘাতে চুরমার হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল, ইংরেজ সরকারকে সাহায্য করে, তাদের আশ্রয়ে ও তাদের সহযোগিতায় সেই সামন্ততন্ত্রকেই এই সব রাজা ও জমিদাররা আরও একশত বৎসরের জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন। এই সব সামন্ততান্ত্রিক রাজা ও জমিদাররা বৃটিশ প্রতিবিপ্লবকে সাহায্য করে ও কোটি কোটি মানুষের গলায় পরাধীনতার শৃঙ্খলকে আরও কষে বেঁধে ভারতের ঔপনিবেশিক বর্বরতার যুগের মেয়াদ আরও একশত বৎসরের জন্য বাড়িয়ে দিলেন।

অন্য ধারে বিদ্রোহে যে সামন্ততান্ত্রিক শক্তি যোগ দিয়েছিল, তার শক্তিও যেমন ছিল সামান্য, তার আয়ুও ছিল তেমনি ক্ষয়িষ্ণু; তা ছিল মরণোন্মুখ। বাহাদুর শাহ ছিলেন রাজ্যহীন, ক্ষমতাহীন নামমাত্র বাদশাহ ও ডাঃ মজুমদারের মতে—বিদ্রোহীদের একজন বন্দী ও হাতের পুতুল এবং নানা সাহেবও তাই; অযোধ্যার নবাব একজন নাবালক আর ক্ষুদ্র ঝান্সী রাজ্যের জনসংখ্যা মাত্র এক লক্ষ! এঁদের এত শক্তি যে, এঁরা দিতেন প্রগতির ঘড়ির কাঁটা পেছনে ঘুরিয়ে, এঁরাই নিয়ে যেতেন মধ্যযুগে ফিরিয়ে লক্ষ লক্ষ বিদ্রোহী মানুষকে, যাদের হাতে ছিল অস্ত্র, যারা বৈপ্লবিক নবচেতনায় বলীয়ান হয়ে উঠছিল ও যারা নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে ছিল সচেতন![১]

বর্তমানের বুর্জোয়া পণ্ডিতরা ও কোনো কোনো প্রগতিশীল ব্যক্তি নিজেদের কুসংস্কার (prejudice) ও আত্মম্ভরিতার বশে এই বিদ্রোহের প্রকৃত চরিত্র না বুঝতে পারলেও, তখনকার সাম্রাজ্যবাদীরা ও তাদের পোষ্য জমিদাররা তা যে বুঝতে পেরেছিলেন, তা তাদের একজন 'হিন্দু' নামধারী প্রতিনিধির লেখা 'মিউটিনিজ এণ্ড দি পিপ্‌ল্' থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডাইরেক্টর ম্যাঙ্গল্‌স্ বিদ্রোহের সময় জমিদারদের 'universal good conduct'-এর জন্য যে সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন, সে সম্বন্ধে গদগদভাবে অনেক কিছু বলে 'হিন্দু' লিখেছেন:

১। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ যে জাতীয় বিদ্রোহ ছিল না, তা প্রমাণ করার জন্য ডাঃ মজুমদার বলেছেন, "ভারতের 'ঐতিহাসিক রাজপরিবারগুলির' (historic ruling houses) মধ্যে কেউই বিদ্রোহে যোগ দেননি, বরং তাঁরা সকলে সক্রিয়ভাবে ইংরেজকে সাহায্য করেছিলেন। কেবলমাত্র কয়েকজন ছোট ছোট রাজা বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিলেন এবং তাঁদের সংখ্যা, যাঁরা যোগ দেননি তাঁদের তুলনায়, শতকরা এক ভাগও হবে না।"—(পৃঃ ২২৫)। তাই যদি হয়, যদি সামন্ততন্ত্রের মূল ও প্রধান শক্তি বিদ্রোহের বিপক্ষেই যায়, তা হলে সেই বিদ্রোহ পুরোপুরি সামন্ততান্ত্রিক হয় কি করে? ডাঃ মজুমদারের বইতে এরূপ স্ববিরোধী উক্তির অভাব নেই!

"যেসব চিন্তাশীল ব্যক্তি জমিদারদের প্রতি দৃঢ়ভাবে এ পর্যন্ত বিমুখ ছিলেন, তাঁরা এখন বুঝতে পারছেন যে, এরূপ বিষম বিপদের (১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ) বিরুদ্ধে ইংরেজ সরকারের শ্রেষ্ঠ রক্ষা-কবচ হচ্ছে লর্ড কর্নওয়ালিসের অতি দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন ও রাষ্ট্রনৈতিক নিপুণতাপূর্ণ চিরস্থায়ী ভূমি-বন্দোবস্ত প্রথার ব্যাপক প্রসারণ।"—(পৃঃ ১৩)। [লক্ষ্য করার বিষয় যে, অযোধ্যা, রোহিলখণ্ড ও আরও অনেক স্থানে তাই করা হয়েছিল।]

"সকল উচ্চপদ ও ঐশ্বর্যকে সমতল করে দেওয়া যদি বিপ্লবের চরিত্র হয়,···তা হলে সিপাহী বিদ্রোহে এই সাধারণ নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম ঘটেনি। ··· ইউরোপীয় ও খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে সিপাহীদের এই যুদ্ধকেও জমিদারদের ধনসম্পত্তি ও সমৃদ্ধির বিরুদ্ধে সিপাহীদের যুদ্ধে পরিণত করা হয়েছিল।"—(পৃঃ ৫৮)।

"যদিও দেশীয় রাজাদের প্রতি বৃটিশ সরকারের সাম্প্রতিক ব্যবহার খুব বন্ধুত্ব-পূর্ণ ছিল না, ··· তথাপি এই সমস্ত রাজা তাদের সত্যকারের প্রবৃত্তি (true instinct) ও বিশ্বাসের বশে, এমন কি, যখন ইংরেজদের ভাগ্য বিশেষ সুপ্রসন্ন ছিল না, তখনও সেই ইংরেজদের পক্ষ সমর্থন করেছিল।"—(পৃঃ ১৩০)।

ফরেস্টও এই কথাই বলেছিলেন: "দেশীয় রাজারা খুব স্পষ্টভাবেই দেখতে পেয়েছিলেন যে, ··· তাদের ক্ষমতা ও স্বার্থগুলি সংরক্ষণ করা, বৃটিশ শাসন রক্ষা করার সঙ্গে অভিন্ন।"[১]

নিজেদের ব্যক্তিগত ও সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণীস্বার্থ বজায় রাখবার জন্যই দেশীয় রাজারা, ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ থাকলেও এবং তাদের হাতে অনেক লাঞ্ছিত হলেও, নিজেদের দেশের লোকের বিরুদ্ধে বিদেশী শাসকদের পাশেই এসে দাঁড়ালেন। নিজামের কাছ থেকে অন্যায় করে ইংরেজরা কিছুদিন পূর্বে বেরার প্রদেশ কেড়ে নিয়েছিল। সিন্ধিয়াকেও এইভাবে তাঁর রাজ্যের কতক অংশ থেকে বঞ্চিত হতে হয়েছিল। অন্যান্য রাজ্যের মতো ভারতের এই দুটি সর্বপ্রধান গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যেও জনসাধারণ বিদ্রোহের পক্ষেই ছিল, এমন কি, এ সব রাজ্যের দরবারের একটা প্রতিপত্তিশালী অংশও বিদ্রোহের অনুকূলে ছিল। আবার এটাও স্মরণ রাখতে হবে যে, এই দুটি রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী, হায়দরাবাদের সালার জঙ্গ ও গোয়ালিয়রের দিনকর রাও, দুজনেই ছিলেন ইংরেজ সরকার কর্তৃক মনোনীত। প্রভুভক্তিতে এঁরা ছিলেন অদ্বিতীয় এবং নিজাম ও সিন্ধিয়ার দরবারে কড়া নজর রেখে ইংরেজের প্রতি যে বিশ্বস্ততা দেখিয়েছিলেন, তার উদাহরণ খুব কমই পাওয়া যায়। অথচ এই দুজন রাজার মধ্যে যদি একজনও

১। ফরেষ্ট: "হিষ্ট্রি···", ভূমিকা, পৃঃ xxvi.।

বিদ্রোহে যোগ দিতেন, তা হলে ইংরেজ সরকারের জিতবার খুব কমই আশা ছিল। লর্ড ক্যানিং-এর ঠিক এই আশঙ্কা ছিল বলেই তিনি বলেছিলেন: "যদি সিন্ধিয়া বিদ্রোহে যোগ দেন, তা হলে কালকেই আমাকে তল্পিতল্পা গুটোতে হবে।"

তা ছাড়া ভারতীয় রাজাদের অনেককে ইংরেজরাই গদিতে বসিয়েছিল; ইংরেজ রাজত্বের অস্তিত্বের সঙ্গেই তাদেরও ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। প্রজাদের দিক থেকেও যেমন তাঁদের ভয় ছিল, আবার বিদ্রোহ সফল হলে তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বীরা গদি দখল করবে—তাঁদের এই আশঙ্কাটাও ভিত্তিহীন ছিল না।

ইংরেজ শাসকরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, সামন্ত শ্রেণীর লোকেরা তাঁদের শত্রু নয়। বিদ্রোহের সময় তাঁরা দেখতে পেয়েছিলেন, কিভাবে রাজা-জমিদাররা (ক্যানিং-এর কথায়) "প্লাবনের বিরুদ্ধে একটা মজবুদ বাঁধের মতো আমাদের রক্ষা করেছিল এবং এই বাঁধ না থাকলে এক ঢেউতে আমাদের একেবারে ভাসিয়ে নিয়ে যেত।" বিদ্রোহের পর ইংরেজরা তাঁদের রাজস্বের অনেক ক্ষতি স্বীকার করেও জনসাধারণের ভবিষ্যৎ বিদ্রোহের রক্ষা-কবচ হিসেবে এই বাঁধটাকে আরও মজবুত করে গড়ে তুলেছিল। শুধু রাজাদেরই নয়, জমিদারদেরও ক্ষমতা বাড়িয়ে দেওয়া হল। সক্রিয়ভাবে বিদ্রোহ করা সত্ত্বেও অযোধ্যার তালুকদারদের দুই-তৃতীয়াংশের তালুকদারি তো ফিরিয়ে দেওয়া হলই, উপরন্তু তাঁদের ১৮৫৬ সালের চাইতে অনেক ভাল শর্তও দেওয়া হল। তা ছাড়া জমিদারী প্রথা সমগ্র ভারতে চালু করা হবে কি না, এই প্রশ্ন "১৮৫৮ সাল থেকে ১৮৬২ সাল পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডে ও ভারতবর্ষে খুবই আলোচিত হয়েছিল।"[১] সম্বলপুরে ও মধ্যভারতে, বিশেষ করে বিদ্রোহী অঞ্চলগুলিতে, মালগুজারী প্রথা প্রবর্তিত হল। এমন কি পাঞ্জাবের অনেক স্থানেও যেসব কৃষক ছিল জমির স্বত্বাধিকারী, কলমের এক খোঁচায় তারা হয়ে গেল উঠবন্দী প্রজা!

১৮৫৭-৫৯ সালের মহাবিদ্রোহ কি বিরাট আকার ধারণ করেছিল, সে সম্বন্ধে ডাঃ মজুমদারই এক স্থানে বলে ফেলেছেন: "সব রকমের গলদ থাকা সত্ত্বেও, সিপাহীরা ও ভারতীয় বিদ্রোহীরা তাদের সংখ্যার জোরে ও অনুকূল অবস্থার জন্য বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিকে ধ্বংস করবার উপক্রম করেছিল। বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভাগ্য একটা সুতোয় ঝুলছিল এবং তার প্রায় যায়-যায় অবস্থা হয়েছিল। যদি অদৃষ্ট ভারতীয়দের প্রতি সামান্য একটুও অনুকূল হত, তা হলে ফলাফল হয়ত অন্যরকম হত।"—(পৃঃ ২৭৭)। এটা যদি কেবলমাত্র সিপাহীদের ও সামন্ততান্ত্রিক বিদ্রোহই হত, যদি একটা বিরাট জাতীয় গণবিদ্রোহ না হত, তা হলে প্রবল

১। এইচ্. এস. কানিংহাম: "বৃটিশ ইণ্ডিয়া এণ্ড ইট্স্ রুলার্স," পৃঃ ১৬২।

পরাক্রান্ত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের যে এরূপ দুরবস্থা হত না, তা সহজেই বোঝা যায়।

তাই ইংরেজকে বোম্বে আর্মি, মাদ্রাজ আর্মি এবং তার নতুন ভারতীয় বাহিনী ছাড়াও ইংল্যাণ্ডের বাহিনীর অর্ধেক সৈন্য, অর্থাৎ ১,১২,০০০ লোককে এই বিদ্রোহ দমন করতে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাতে হয়েছিল। বিদ্রোহ যখন শেষ হয়েছিল, তখন দেখা গিয়েছিল, "দুই বৎসরে নানা ভাবে এক লক্ষেরও উপর সিপাহীর জীবন নষ্ট হয়েছিল। অন্যান্য বিদ্রোহীদের নিহতের সংখ্যা ছিল তার চাইতে অনেক বেশী। বিজেতাদেরও এই নিষ্ঠুর পরীক্ষা থেকে অনেক ক্ষতি স্বীকার করে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল।"[১]

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের সব থেকে বড় দুর্বলতা ছিল যে, বিদ্রোহী জনসাধারণ কোথাও কোনো প্রকারের বিধান সভা গড়ে তুলবার চেষ্টা করেনি। তারা তাদের 'স্বাভাবিক নেতাদের' হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়েই নিশ্চিন্ত ছিল। বেসামরিক সংগঠনের অভাবের জন্যই সামরিক সংগঠনও দুর্বল হয়ে পড়েছিল। যখন ইংরেজরা দিল্লীর দুয়ারে এসে হানা দিচ্ছিল, তখন বিদ্রোহী জেনারেলরা নিজেদের ব্যক্তিগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বিদ্বেষ, ঝগড়াঝাঁটি নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। এই সব জেনারেলরা বিদ্রোহের পূর্বে ছিলেন ইংরেজ বাহিনীতে ছোট ছোট অফিসার। সারা জীবন ইংরেজ অফিসারদের হুকুম মানতেই ছিলেন তাঁরা অভ্যস্ত। সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করার মতো অভিজ্ঞতা অথবা ব্যক্তিত্ব তাঁদের ছিল না। বিদ্রোহের ফলে হঠাৎ এত ক্ষমতা হাতের মধ্যে এসে যাওয়াতে তাঁরা অনেকেই দাম্ভিক ও অহঙ্কারী হয়ে পড়লেন, যা প্রায় সব বিদ্রোহতেই হয়ে থাকে। রাজনৈতিক চক্রান্তে তাঁরা এত জড়িত হয়ে পড়লেন যে, যুদ্ধে জয়লাভ করার জন্য প্রচেষ্টা বিশেষ কিছুই করলেন না। বিদ্রোহের সময় যখন পুরাতন সংগঠন ও শৃঙ্খলা একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়, তখন সামরিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পারে একমাত্র বেসামরিক সংগঠন। কিন্তু জনসাধারণের এই প্রকার কোনো সংগঠন না থাকাতে, জেনারেলদের শাসনে রাখার মতো কেউ ছিল না। আবার জেনারেলদেরও সিপাহীদের উপর বিশেষ ক্ষমতা ছিল না। খাদ্য, বেতন, গোলাবারুদ ইত্যাদি নিয়ম মতো না পাওয়ার জন্যও সিপাহীদের বিশৃঙ্খলা আরও বেড়ে গিয়েছিল। নেপোলিয়ান বলেছিলেন যে, একটা আর্মি তার উদর দিয়ে মার্চ করে। একটা বাহিনীর যদি খাওয়া-পরার প্রশ্নের সমাধান না হয়, তা হলে তার শৃঙ্খলার ও কর্মক্ষমতার ব্যাঘাত ঘটবেই। সিপাহীরা ব্যক্তিগতভাবে যত বীরত্ব, আত্মোৎসর্গ, সাহস ও বুদ্ধির পরিচয়ই

১। এল. ট্রটার: "ইণ্ডিয়া আণ্ডার কুইন ভিক্টোরিয়া", ২য়, পৃঃ ৮৯।

দিক না কেন, শৃঙ্খলার অভাবের জন্য তারা প্রকৃতপক্ষে কোনো সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলতে পারেনি।

দিল্লীই ছিল বিদ্রোহের কেন্দ্রস্থল ও অক্ষনাভি। সেখানে কিরূপ অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, তা আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি। ৯০ বৎসর বয়সের একজন বৃদ্ধ, মোগল বাদশাহ বাহাদুর শাহকে সম্রাট বলে ঘোষণা করা হল। সেই সময়কার ভারতের বাস্তব অবস্থায় বিদ্রোহীদের পক্ষে এর চাইতে উৎকৃষ্টতর বৈপ্লবিক চাল আর কিছু হতে পারত না। তিনি ছিলেন একজন কবি, শিল্পী ও অতি মহৎ প্রকৃতির লোক, কিন্তু একটা বৈপ্লবিক পরিস্থিতিতে একটা গণবিদ্রোহ পরিচালনা করবার মতো শারীরিক বল বা মানসিক শক্তি—কোনোটাই তাঁর ছিল না, যদিও তিনি তাঁর ক্ষমতা অনুসারে বিদ্রোহকে জয়যুক্ত করবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর অক্ষমতা ও সিপাহীদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে একদল অপদার্থ শাহজাদা জেনারেলের পোশাক পরে নিজেদের স্বার্থের জন্য ধনী বানিয়াদের অবাধে লুট করছে; আর দরবারের আর একদল পরজীবী চাটুকার ও বিশ্বাসঘাতক শত্রুকে সাহায্য করে ভিতর থেকে বিদ্রোহীদের সর্বনাশ করছে; পুরাতন শাসন যন্ত্র ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে, কিন্তু তার স্থানে নতুন কাঠামো তৈরী হচ্ছে না, যার ফলে বিশৃঙ্খলা বেড়েই যাচ্ছে; জোর করে লক্ষ লক্ষ টাকা আদায় করা হচ্ছে, কিন্তু তার অপব্যবহারই বেশী হচ্ছে, তাতে সাধারণ রাজকার্যও চলছে না, সিপাহীরা তাদের সামান্য বেতনও পাচ্ছে না। জেনারেল ও অফিসাররা নিজেদের অক্ষমতার জন্য কোনো মিলিটারি কমাণ্ডই গঠন করতে পারছে না, শত্রুকে উপেক্ষা করে আত্মঘাতী কলহেই তাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করছে; আর অন্যধারে সিপাহীরা খাদ্য ও বেতনের জন্য মাঝে মাঝে চিৎকার করছে, আর দিনের পর দিন অন্ধের মতো পাথরের দেওয়ালে মাথা ঠুকছে। দলে দলে বীরের মতো অনর্থক প্রাণ দিচ্ছে, তারপর ক্ষতবিক্ষত হয়ে ফিরে যাচ্ছে। অনভিজ্ঞ জনসাধারণও কোনো প্রকার রাজনৈতিক নেতৃত্ব গঠন করবার চেষ্টা করছে না। অবশ্য অন্যান্য অঞ্চলে বিদ্রোহীদের সাংগঠনিক অবস্থা দিল্লীর ন্যায় এতটা খারাপ ছিল না; ঝান্সীতে শৃঙ্খলা ও সুযোগ্য নেতৃত্ব—দুইই ছিল।

মিরাট ও দিল্লীর বিদ্রোহের পর যখন পরিষ্কার হয়ে গেল যে, এইবার শত্রুর সঙ্গে শেষ বোঝা-পড়া করার সময় এসে গিয়েছে, অন্যান্য স্থানে সিপাহীদের দোদুল্যমান মনের অবস্থা তখনও কাটেনি। এক এক স্থানে এক এক সময় বিক্ষিপ্ত-ভাবে তারা বিদ্রোহ করেছে। এইভাবে তারা শত্রুকে বিদ্রোহ দমন করবার সময় ও সুযোগ দিয়েছে। এটা ঠিক যে, এত বড় একটা বিরাট দেশে তখন একই দিনে

একই সময়ে সব বাহিনীগুলির পক্ষে বিদ্রোহ করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু একটা অল্প নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে তা করা খুবই সম্ভব ছিল। পাঞ্জাবে সিপাহীদের সংখ্যা ছিল ৩৫,০০০ এবং তারা প্রায় সকলেই বিদ্রোহী ভাবাপন্ন ছিল। কিন্তু তাদের ইতস্ততঃ করার ফলে, ইংরেজরা এক একটা বাহিনীকে পৃথক পৃথক ভাবে ধ্বংস করবার সুযোগ পেয়েছিল। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে, সিপাহীরা বিদ্রোহ করার সুবর্ণসুযোগগুলি ছেড়ে দিয়েছে, কিন্তু পরে তারাই আবার খুব প্রতিকূল অবস্থায় বিদ্রোহ করেছে। ফিলুরের সিপাহীদের উদাহরণ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। আর একটি উদাহরণ হল রুরকির মাইনার্স ও স্যাপার্সরা। তারাও বিদ্রোহী ভাবাপন্ন ছিল, কিন্তু ১১ই মে যখন তাদের মিরাট অভিমুখে যাত্রা করতে হুকুম করা হল, তারা বিদ্রোহ করল না, কিন্তু মিরাটে আসা মাত্রই যখন তারা বুঝতে পারল যে, তাদের নিরস্ত্র করা হবে, তখন তারা (৫০০ জন) বিদ্রোহ করল। ইংরেজরা এর জন্য তৈরী হয়েই ছিল এবং স্যাপার্স ও মাইনার্সদের শেষ লোকটি পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে গেল।

বিদ্রোহীদের দুর্বলতার আর একটা কারণ ছিল এই যে, বিদ্রোহী অঞ্চলগুলি পরস্পরের সংলগ্ন হলেও সর্বত্র যোগাযোগ স্থাপন করার জন্য ও পরস্পরকে সাহায্য করার জন্য এই সব অঞ্চলগুলি নিয়ে একটা কেন্দ্রীয় সংগঠন সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হয়নি। এর ফলে বিদ্রোহী বাহিনীগুলি পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েই থাকল। তার সুযোগ ইংরেজরা সম্পূর্ণভাবেই নিয়েছিল। তারা একই সময়ে বিভিন্ন ফ্রণ্টে যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়নি, যা করা তাদের পক্ষে সম্ভব হত না। তার জন্য পৃথক পৃথক ভাবে ইংরেজরা বিদ্রোহীদের ধ্বংস করতে পেরেছিল।

বিদ্রোহীদের হেরে যাবার সব থেকে বড় একটা কারণ ছিল এই যে, অস্ত্রশস্ত্রে তারা ইংরেজদের চাইতে অনেক নিকৃষ্ট ছিল। ইংরেজ বাহিনী সর্বত্রই এন্‌ফিল্ড রাইফেলে সজ্জিত ছিল। এই রাইফেল-যুদ্ধের ব্যাপারটি ঐ সময়ের একটা বৈপ্লবিক আবিষ্কার। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে—এই রাইফেলের টোটা উপলক্ষ্য করে কিভাবে বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল এবং এই রাইফেল হাতে পাবার আশায় সিপাহীরা কতখানি আনন্দিত হয়েছিল। কিন্তু বিদ্রোহের পূর্ব পর্যন্ত এন্‌ফিল্ড রাইফেল, যাকে প্রচলিত ভাষায় মিনি রাইফেল বলা হত, তখনও ভারতে বিশেষ আমদানি হয়নি। সুতরাং সিপাহীরা এই রাইফেল বেশী সংগ্রহ করতে পারেনি। একজন ইংরেজ ঐতিহাসিক এ সম্বন্ধে ঠিকই বলেছিলেন:

"যদি বেঙ্গল আর্মির বিদ্রোহী সিপাহীদের হাতে মিনি রাইফেল থাকত, তা হলে দিল্লী হয়ত মোগলদেরই থাকত এবং তৈমুরের বংশধর আজ বন্দিশালায়

একটা ঘৃণিত চারপাই-এর উপর না বসে, তাঁর পূর্বপুরুষদের প্রাসাদে মণিমুক্তার সিংহাসনেই বসতেন।"[১]

এন্‌ফিল্ড রাইফেলের সামনে যে সিপাহীরা দাঁড়াতে পারছে না, তা বিদ্রোহের প্রথম দিনেই প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল। ১৮৫৭ সালে ১২ই জুলাই-এর শিয়ালকোট যুদ্ধের সম্বন্ধে কে' লিখেছিলেন:

"কিছুক্ষণের মধ্যেই ৫২ম ইংরেজ বাহিনীর এন্‌ফিল্ড রাইফেলগুলি মারাত্মকভাবে প্রমাণ দিতে শুরু করল যে, সিপাহীদের মাস্কেট বন্দুকগুলি কতকগুলি খেলার পুতুলের মতো তাদের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতায় নেমেছে।...সত্য কথা এই যে, এন্‌ফিল্ড রাইফেলের নিকট বিদ্রোহীরা সম্পূর্ণ অক্ষম। তাদের অনেক বীরত্ব ও কষ্ট স্বীকার করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাদের 'ব্রাউন বেস' বন্দুক আমাদের কামান ও এন্‌ফিল্ড রাইফেলের বিরুদ্ধে কি করতে পারবে?"[২]

আহত ইংরেজ সৈন্যদের মধ্যে খোঁজ নিয়ে টাইম্‌স্‌-এর প্রতিনিধি রাসেল জানতে পেরেছিলেন যে, খুবই সাংঘাতিক ও মারাত্মক আঘাতগুলির "বেশির ভাগই তলোয়ারের আঘাত।" পরাজয়ের পর বিদ্রোহীদের কাছ থেকে ইংরেজরা যেসব অস্ত্র বাজেয়াপ্ত করেছিল, তা থেকেই বোঝা যায় ইংরেজদের তুলনায় বিদ্রোহীদের কি রকম আদিম অস্ত্র ব্যবহার করতে হয়েছিল: ৬৮৪ কামান, ১,৮৬,১৭৭ মাস্কেট বন্দুক, ৫,৬১,৩২১ তলোয়ার, ৫০,৩১১ বল্লম ও ৬,৩৮,৬৮৩ ছোট অস্ত্র।

যুদ্ধের একটা সাধারণ নিয়ম হচ্ছে যে, শত্রুকে পরাজিত করবার জন্য তাকে আক্রমণ করতে হবে। বিদ্রোহীদের এ কথাটা অজানা ছিল না। কিন্তু আক্রমণ করবার জন্য আবার আক্রমণাত্মক অস্ত্রেরও প্রয়োজন, যা বিদ্রোহীদের ছিল না। তা সত্ত্বেও তারা বারবার ইংরেজদের আক্রমণ করেছে, কিন্তু তাদের অস্ত্রের নিকৃষ্টতা ছিল একটা প্রধান বাধাস্বরূপ, যার জন্য তাদের বারবার হটে আসতে হয়েছে। বেরিলির যুদ্ধে আমরা দেখেছি যে, জেহাদীরা তলোয়ার নিয়ে ইংরেজ বাহিনীকে আক্রমণ করেছে, কিন্তু বেয়নেট অতিক্রম করে তাদের তলোয়ার শত্রুকে স্পর্শও করতে পারেনি। ইংরেজরা উৎকৃষ্টতর অস্ত্রে সুসজ্জিত ছিল বলেই বিদ্রোহীদের থেকে সংখ্যায় অল্প হলেও যুদ্ধে জিততে পেরেছিল।

অনেকেই বলেছেন যে, বিদ্রোহীদের পরাজয়ের প্রধান কারণ হচ্ছে তাদের সামন্ততান্ত্রিক নেতৃত্ব। বিদ্রোহের নেতৃত্ব সর্বত্র যে পুরোপুরি সামন্ততান্ত্রিক ছিল না,

১। বল্: পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ২য়, পৃ: ৬০৯। ২। কে': পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ২য়, পৃ: ৬৪১।

তা পূর্বেই দেখানো হয়েছে। দিল্লীর যুদ্ধ বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছে যে, সিপাহীরাই তাদের 'মিলিটারি কোর্টের' মারফত সমস্ত ক্ষমতা দখল করেছিল। তারপর জুলাই মাসে যখন বেরিলি বাহিনী এসে পৌছল, তখন বাহাদুর শাহ সিপাহী অফিসারদের সম্মতি নিয়েই জেনারেল বখ্‌ত খানকে ডিক্টেটরের ক্ষমতা দিলেন। সিপাহী অফিসাররা সুযোগ্য নেতৃত্ব গঠন করতে পারেননি, সে দোষ বাহাদুর শাহর নয়, তা তাঁদের নিজেদেরই অক্ষমতা ও রাজনৈতিক অনভিজ্ঞতারই ফল। বাহাদুর শাহ তাঁদের কোনো কাজেই বাধা দেননি, বরং সর্বতোভাবে তাঁদের সাহায্যই করেছিলেন, যার জন্য অনেকেই বলেছেন যে, তিনি সিপাহীদের হাতের পুতুল ছিলেন মাত্র।

১৮৫৭-৫৯ সালের বিদ্রোহের একটা বিশেষ দ্রষ্টব্য বিষয় হচ্ছে এই যে, হাজার হাজার পেশাদার সিপাহী এই বিদ্রোহে অগ্রণী হয়ে আসা সত্বেও এবং তারা অনেক বীরত্বপূর্ণ কাজ করলেও, তাদের মধ্য থেকে একজনও যোগ্য জেনারেল বা নায়ক বের হয়ে আসেনি। জেনারেল বখ্‌ত খান বিদ্রোহের একটা স্বর্ণ মুহূর্তে যে অপূর্ব সুযোগ ও ক্ষমতা পেয়েছিলেন, তাঁর যদি সামান্য একটুখানি যোগ্যতাও থাকত, তা হলে তিনি ভারতের ইতিহাসে একটা বিপ্লব ঘটিয়ে দিতে পারতেন।

মহাবিদ্রোহের সময় যেটুকু সুযোগ্য নেতৃত্ব দেখা গিয়েছিল, তা এসেছিল বেসামরিক লোকদের কাছ থেকে, সামন্ততান্ত্রিক নেতাদের কাছ থেকে, ঝান্সীর রানী, কুমার সিং, ফিরোজ শাহর কাছ থেকে, আর এসেছিল দু'জন সাধারণ লোক—তাঁতিয়া তোপী ও ফৈজাবাদের মৌলভী আহম্মদ শাহর কাছ থেকে। এঁরা কেউই পেশাদার সৈনিক না হয়েও যে রণনৈপুণ্য, যে দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন, তাতে তাঁরা ঝানু ইংরেজ জেনারেলদেরও নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছিলেন। তাঁরা সামন্ততন্ত্রীই হোন আর যাই হোন, প্রত্যেকটি দেশপ্রেমিক ভারতবাসী সগর্বে চিরকাল তাঁদের স্মরণ করবে।

অনেকে এ প্রশ্নও তোলেন যে, বাহাদুর শাহ, ঝান্সীর রানী, হজরত বেগম প্রভৃতি নিজেদের রাজ্য ফিরে পাবার জন্য ও তালুকদাররা তাঁদের তালুকদারি ফিরে পাবার জন্যই বিদ্রোহ করেছিলেন, তাঁরা কেবলমাত্র নিজেদের স্বার্থের কথাই ভেবেছিলেন, তাঁদের মধ্যে দেশপ্রেম ছিল না। শ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিক ডাঃ মজুমদার বলেছেন: "অনেকে এই যুক্তি দেন যে, যদিও তাঁরা প্রধানতঃ নিজেদের স্বার্থের দ্বারাই প্রণোদিত হয়েছিলেন, তবুও হয়ত তাঁরা কিছুটা দেশেপ্রেমের দ্বারাও উদ্বুদ্ধ হলেও হতে পারেন, কিন্তু তার সমর্থনে কোনো যুক্তি পাওয়া যায় না।"—(পৃঃ ২২৫)।

তিনি ঝান্সীর রানী সম্বন্ধে বলেছেন, "ভারতের কিম্বা ঝান্সীর স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে ঝান্সীর রানীর নাম সংযুক্ত করার মতো ভুল আর কিছু হতে পারে না।"—(পৃঃ ২৪১)।

ঝান্সীর রানী না হলেও, কিছু কিছু রাজা ও তালুকদার যে নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্যই বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। আবার অনেকে যে স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্যই বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিলেন, তারও প্রচুর দৃষ্টান্ত রয়েছে। এই সব দৃষ্টান্তগুলি কোন কোন ঐতিহাসিকের চোখে না পড়লেও, ইংরেজ শাসকরা ভালভাবেই জানতেন। ক্যানিং জেনারেল আউটরামকে লিখেছিলেন :

"আপনি মনে করছেন, অযোধ্যার রাজা ও জমিদারদের বিদ্রোহ করার কারণ হচ্ছে যে, তাঁরা আমাদের রাজস্ব-নীতির ফলে ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। কিন্তু এসম্বন্ধে আরও চিন্তা করার প্রয়োজন। চান্দা, ভিঙ্গা ও গোণ্ডার রাজারা আমাদের প্রতি যতটা ঘৃণা দেখিয়েছিলেন, এতটা ঘৃণা আর কেউ দেখায়নি। চান্দার রাজার কোনো গ্রাম তো কেড়ে নেওয়া হয়নি, বরং দেয় কর কমিয়েই দেওয়া হয়েছিল। ভিঙ্গার রাজাকেও আমরা যথেষ্ট উদারতা দেখিয়েছিলাম। গোণ্ডার রাজার ৪০০ গ্রামের মধ্যে আমরা মাত্র ৩টি নিয়েছিলাম, কিন্তু তার পরিবর্তে তাঁর কর ১০,০০০৲ টাকা কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল। রাজ্য পরিবর্তন হওয়ার ফলে নওপারার নাবালক রাজার চাইতে আর কেউ বেশী লাভবান হয়নি। ইংরেজ শাসন প্রবর্তন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, অন্যান্য দাবিদারদের উপেক্ষা করে, ইংরেজ সরকার তাঁকে ১,০০০ গ্রাম দিয়েছিল এবং তাঁর মাতাকে অভিভাবক নিযুক্ত করেছিল। কিন্তু এই মহিলার সৈন্যরা প্রথম থেকেই লক্ষ্ণৌতে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। ধুরার রাজাও রাজ্য পরিবর্তনের সময় প্রচুর উপকৃত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর লোকেরাই ক্যাপ্টেন হার্সিকে আক্রমণ করেছিল ও তাঁর স্ত্রীকে বন্দী করে লক্ষ্ণৌর কারাগারে পাঠিয়েছিল।··· এই সব উদাহরণগুলি—এবং এরূপ উদাহরণ আরও অনেক দেওয়া যেতে পারে—প্রমাণ করে যে, কেবলমাত্র ব্যক্তিগত ক্ষতির জন্যই রাজা ও তালুকদাররা বিদ্রোহ করেননি।"[১] লক্ষ্ণৌর যুদ্ধের পর রাজা বেণী মাধবকে লর্ড ক্লাইভ আত্মসমর্পণ করতে আহ্বান জানিয়ে খুব ভাল শর্তই দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেননি ; শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করে যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণ দিয়েছিলেন। দেশের স্বাধীনতার জন্য আত্মোৎসর্গের এরূপ উদাহরণ আরও অনেক আছে।

১। সাভারকার : "দি ইণ্ডিয়ান ওয়ার অব ইণ্ডিপেণ্ডেন্স," পৃঃ ৪০১-২।

ডাঃ মজুমদারের উপরোক্ত যুক্তি অনুসারে পৃথ্বিরাজ, প্রতাপ সিংহ, শিবাজী, আমানুল্লা, হাইলে সেলাসী প্রভৃতি কারোরই দেশপ্রেম ছিল না—সকলেই নিজের ক্ষমতা, নিজের সিংহাসনের জন্যই শুধু লড়েছিলেন। এই সব ক্ষেত্রে দেখতে হবে যে, তাঁদের স্বার্থ ও দেশবাসীর স্বার্থের মধ্যে কোন বিরোধিতা ছিল কি না। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ সামন্তবাদীদের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক শক্তির লড়াই ছিল না। এটা ছিল মূলতঃ বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে সকল শ্রেণীর ভারতবাসীর মিলিত জাতীয় স্বাধীনতার যুদ্ধ। যাঁরা এই বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের কেউ কেউ নিজেদের সিংহাসন পুনরুদ্ধার করার মতো স্বার্থের জন্য সচেষ্ট থাকলেও তাঁরা স্বদেশ-প্রেমিকই ছিলেন; কারণ সামন্তশ্রেণীর হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা আপসহীন সংগ্রাম করেছিলেন বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে—দেশবাসীর বা দেশের কৃষক-শ্রমিকদের বিরুদ্ধে নয়।

পলাশীর যুদ্ধের পর এক শ' বছর ধরে ভারতের রঙ্গভূমিতে টুকরো টুকরো ভাবে যে বিক্ষোভ ও খণ্ড বিদ্রোহ চলেছিল, ভিন্ন ভিন্ন অংশে, কখনও সিপাহীদের দ্বারা, কখনও কৃষকদের দ্বারা, কখনও বা আদিবাসীদের দ্বারা,—তারই হঠাৎ যবনিকা উঠে গেল ১৮৫৭ সালে; বিভিন্ন ধারা, বিভিন্ন স্রোত এক মহাসমুদ্রে মিশে গর্জন করে উঠল! এই মহান গণ-অভ্যুত্থানের সময় যদিও ভারতবাসীকে বিপ্লবকালীন সব রকম দুর্ভোগই ভোগ করতে হয়েছিল, তবুও অনভিজ্ঞতা ও অপরিপক্কতার জন্য ভারতবাসী বৈপ্লবিক শক্তি অর্জন করতে পারেনি। এই মহাবিদ্রোহের সময়, ভারতের নরনারী কি ধাতু দিয়ে তৈরী—তাদের অসাধারণ কর্মশক্তি, মহান আত্মোৎসর্গ ও মনুষ্যোচিত বীরত্বের দ্বারাই—তারা তার পরিচয় দিয়েছিল। কিন্তু একটিমাত্র ক্ষেত্রে তারা ব্যর্থ হয়েছিল—তারা বৈপ্লবিক চিন্তাধারা দ্বারা চালিত হতে পারেনি। তা সত্ত্বেও, দেশভক্ত ভারতের সেইসব নরনারীর মনুষ্যত্বের উত্তরাধিকারকে যদি আজ কোনো ছলে আমরা অস্বীকার করি, তা হলে তাতে আমাদেরই ক্ষুদ্রত্ব প্রকাশ পাবে—তাদের নয়। জাতির কোনো অংশের বীর্য ও বলিষ্ঠতার ইতিহাসকে যদি আজ অস্বীকার করি—তা হলে তা হবে কলঙ্ককর আত্ম-অবমাননা। জাতির উন্নতি ও বিকাশের পথে ইতিহাসের প্রেরণা চাই; ভারতীয় মহাবিদ্রোহের ইতিহাস—অবশ্যই সেই জাতীয় ইতিহাস; উপযুক্ত নেতৃত্ব পেলে ভারতবাসী কি অসাধ্যসাধন করতে পারে, এ ইতিহাস তারই ইঙ্গিত।

গ্রন্থপঞ্জী

1. Selections from the Writings of Harish Chandra Mukherjee, Edited by Naresh Chandra Sengupta.
2. Military Analysis of the Remote and Proximate Causes of the Indian Rebellion by General Sir Robert Gardiner.
3. Selections from the letters, despatches and other State Papers, 1857-1858, Edited by G. W. Forrest.
4. A History of the Sepoy War in India, 3 Vols. by Sir John William Kaye.
5. History of the Indian Mutiny, 3 Vols. by G. W. Forrest.
6. History of the Indian Mutiny, 6 Vols. by Col. G. B. Malleson.
7. The Indian War of Independence, 1857, by Vinayak Damodar Savarkar.
8. History of the Indian Mutiny, 3 Vols. by Charles Ball.
9. Punjab Govt. Mutiny Records, Edited by Raynor.
10. History of Political Thought in India by Biman Bihari Mazumdar.
11. India Struggles for Freedom by Hirendranath Mukherjee.
12. Records of the Intelligence Department of the Govt. of India During 1857, Edited by Sir William Muir.
13. The Crisis in the Punjab by F. Cooper.
14. Punjab and Delhi in 1857, 2 Vols. by Cave-Brown.

15. Reminiscences of the Great Mutiny by Forbes-Mitchell.
16. History of the Siege of Delhi by an Officer who served there.
17. History of the Indian Mutiny by T. R. Holmes
18. Central India During the Rebellion of 1857 by Lowe.
19. Indian Empire, 3 Vols. by Montgomery Martin.
20. Sepoy Revolt by H. Mead.
21. Two Native Narratives of the Mutiny at Delhi, Edited by Sir T. Metcalfe.
22. Mutinies and the People by A Hindu.
23. Personal Narrative of the Siege of Lucknow by L. E. R. Rees.
24. Letters Written During the Mutiny by Field-Marshal Earl Roberts.
25. My Diary in India by Sir W. H. Russell.
26. Sepoy Mutiny and the Revolt of 1857 by Dr. Ramesh Chandra Mazumdar.
27. The Indian Rebellion by Dr. A. Duff.
28. সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস, ৫ খণ্ড—রজনীকান্ত গুপ্ত।
29. ঝান্সীর রানী—মহশ্বেতা ভট্টাচার্য।
30. মুক্তির সন্ধানে ভারত—যোগেশচন্দ্র বাগল।